

କିର୍ତ୍ତି ଅମ୍ବନିବାସ

ଶିଖିତାମନ୍ତ୍ର

ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ



ମନ୍ଦିର ଓ ଶୋଯ ପାବଲିଶର୍ସ ଆଃ ଲିଇ
୧୦, ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେ ହିଂଟ୍, କମର୍କାତା-୭୩

আষ্টম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪০০

—আশি টাকা—

প্রচন্ডপট

অঙ্কন : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ : অটোটাইপ

KIRITI OMNIBUS VOL. I

An anthology of detective fictions by Niharranjan Gupta published

by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.

10, Shyama Charan Dey Street, Calcutta - 700 073

Price Rs. 80/-

ISBN : 81-7293-166-2

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ ১৫২ মাণিকতলা
মেন রোড কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

অনেক চেষ্টার পরও এরচেয়ে ভাল করা গেল না। অনেক জায়গায় হয়ত অক্ষর অস্পষ্ট, আবার কোথাও উধাও হয়ে গেছে। আসলে মূল বইটার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল, সেখান থেকেই আপনাদের জন্য অনেক কষ্টে এইটুকু উদ্ধার করলাম। তবে আশার কথা হল, কিরীটি সমগ্র তত্ত্বাত্মক সুস্থ অবস্থায় পাওয়া গেছে, ফলে সেগুলো বিভাট ছাড়াই পড়া যাবে। এই অসুবিধার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃক্ষিত।

--অয়ন চট্টোপাধ্যায়

সংচীপন

কিরীটী-তত্ত্ব (ভূমিকা) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	[ক]	
কিরীটীর আবির্ভাব	...	১
রহস্যভেদী	...	৫৮
চক্ষী	...	৯৯
বৌরাণীর বিল	...	২২১
হাড়ের পাশা	...	৩৭৭

କିରୀଟୀ-ତତ୍ତ୍ଵ

କିରୀଟୀ ରାଯ় ରୋମାଣ୍-ଅନ୍ଦେସୀ କିଶୋର ମନେର ଚିରଳତନ ନାୟକ । ବୟାଙ୍ଗନିଧିର ବାଲକ ନିଜେକେ ଦୃଃସାହସର ପଥେ, ସଂଗ୍ରାମ ଓ ବୀରହେର ପଥେର ନାୟକ ବଲେ ଚିରକଳ କଳପନା କରତେ ଭାଲୋବାସେ । କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିକ୍ଷତ ବାଙ୍ଗଲୀ-ଜୀବନେ ମେ ରହସ୍ୟ, ରୋମାଣ୍, ସଂଘାତ, ବୀରହ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶେର ଅବକାଶ କୋଥାଯା ? ତାଇ କଳପନାଇ ତାକେ ଛୁଟିରେ ନିଯି ଚଲେ । ଏକକାଳେ ମେ ହେଲେ ପଞ୍ଚିରାଜେ ଆରାଟ୍ ରାଜପ୍ରତ୍ନ, ଚଲେଛେ ଶତବାଧାକ୍-ପର୍ଟିକତ ପଥେ, ରାକ୍ଷସଖୋକସ ବିନାଶ କରେ ପାତାଲପ୍ରାରୀତେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ଅପରାଧୀ ରାଜକନ୍ୟାକେ ଲାଭ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ । ସେକାଳ ଏଥିନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବିକ୍ଷିତ ପଥେ । କିନ୍ତୁ ମାନୁଷେର ଘର୍ଜ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଯେ ଅପରାବର୍ତ୍ତନୀୟ । ସ୍ଵତରାଂ ତାକେ ନୃତ୍ୟର ପଲ୍ଲ୍ୟା ଖଂଜେ ବାର କରତେ ହେଲେ । ଏ ରାଜପ୍ରତ୍ନ ମୋନାର ମୁକୁଟ ପରେ ନା, ପଞ୍ଚିରାଜେ ଚଢେ ନା, ନିତାଳ୍ତିତ୍ତି ଏ ସହଜ ସରଲ ମଧ୍ୟବିକ୍ଷତ ବାଙ୍ଗଲୀ ସ୍ଵବକ । ବାହିରେ ଥେକେ ଆର ପାଂଜନ୍ଯରେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରଭେଦ ନେଇ । ଅଥଚ ମେ ଅନ୍ତରେ ସେଇ ଚିରଳତନ ରାଜପ୍ରତ୍ନର—ନାଇବା ଥାକଲୋ ତାର ସାଜସରଙ୍ଗାମ, ପଞ୍ଚିରାଜେଘୋଡା । ବିଜ୍ଞାନ ଆଛେ ତାର ବାହନ । ମନ୍ତ୍ରପ୍ରତ୍ନ କୋଟାଲପ୍ରତ୍ନର ବଦଳେ ତାରଓ ଆଛେ ସୁଧୋଗ୍ୟ ସହକାରୀ । ରାକ୍ଷସ ଓ କି ଆଜକେର ଜଗତେ ଅପ୍ରତ୍ୱୁତ ? ନାନା ରୂପେ ନାନା ଛଞ୍ଚବେଶେ ମେ ରଯେଛେ । ଆଶାମୁକ୍ତ ମାନୁଷେର ଜୀବନେ ଟେନେ ଆନଛେ ଅନଳ୍ତ ବେଦନା । ସେଇ ଛଞ୍ଚବେଶୀ ରାକ୍ଷସ ଆଜକେର ଜଗତେ ହୟତ ନିଷ୍ଠର ହତ୍ୟାକାରୀ, ହୟତ ଅତୁଳ ସମ୍ପଦେର ଲୋଭେ ହିତାହିତ-ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ।

ତାଦେର ନିର୍ମୀକ ମୋଚନଇ ତାର ବ୍ରତ । ଅବଶ୍ୟ ତାର ସମ୍ମାନମୂଳ୍ୟ ଦିତେ କୋନ ରାଜୀ ତାଁର ରାଜକନ୍ୟା ଓ ରାଜମୁକୁଟ ନିଯି ଏଗିଯେ ଆସବେନ ନା ଏଠା ସତ୍ୟ । ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାୟକ ପାବେ ଯେ ଯଶୋମୁକୁଟ—ତାଓ ତୁଳ୍ଚ କରାର ନୟ । ବରାଂ ଆଜକେର ବାସତବ ଜଗତେର ଅଧିବାସୀ କିଶୋରେର କାହେ ଏଟାର ମୂଳ୍ୟାଇ ବୋଧ ହୟ ଆଗେରାଟିର ଥେକେ କିଛି ବୈଶି । ଆର ତାହାଡା ନିଜେକେ ଭରତାତାର ଭୂମିକାର ଦେଖିବାର ମୋହଇ ବା ଶାର କୋଥାସ ?

ସ୍ଵତରାଂ ଭାବାଲୁ, କିଶୋର ମନେର ଛାଯା ଅନ୍ତ୍ସରଣ କରେ ଗଡ଼େ ଓଠେ ଏକଜାତୀୟ ରହସ୍ୟ-ରୋମାଣ୍ କାହିନୀ । କିରୀଟୀ ରାଯ଼ ତାଁଦେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଥମ ସାରିର ଅଧିବାସୀ । ଦୌର୍ବ କରେକ ଦଶକ ଧରେ ବାଙ୍ଗଲୀ କିଶୋର ପାଠକମନକେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ-ଅସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଆଲୋଛାଯା ସେରା ଜଗତେ ଯୋହମୁଖ କରେ ରେଖେହେ ରହସ୍ୟଭେଦୀ କିରୀଟୀ ରାଯ଼ ।

“ପାଇଁ ସାଡ଼େ ଛୟ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବା, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ବଲିଷ୍ଠ ଚେହାରା । ମାଥା ଭାର୍ତ୍ତି କୌକଡ଼ାନୋ ଚାଲ, ବ୍ୟାକବ୍ରାଶ କରା ।

ଚୋଥେ ପରି ଲେଖେର କାଳୋ ସେଲ୍‌ଲ୍ୟେଡେର ଫ୍ରେମେର ଚଶମା ।

ଦାଢ଼ିଗୋଫ୍ ନିଖୁତଭାବେ କାମାନୋ ।

ମୁଖେ ହାସି ଯେନ ଲେଗେଇ ଆଛେ, ସଦାନନ୍ଦ, ଆମୁଦେ !”

ଏହି କିରୀଟୀ ରାଯ଼େର ପରିଚୟ । କଲେଜଜୀବନେ ଶଥେର ତାଡନାର ଯେ ନେଶାର ଶ୍ରବ୍ଦ, କ୍ରମେ ତାଇ ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପେଶାଯ ପରିଗତ ହେଲେ । କିରୀଟୀ ରାଯ଼େର କଲେଜଜୀବନେର ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲେର ରହସ୍ୟଭେଦୀର କାହିନୀ ଆଛେ ‘ରହସ୍ୟଭେଦୀ’ ଗଲେ । ଏହାଡାଓ ଆଛେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାଦେର କାହିନୀ—ଚକ୍ରୀ, ବୌରାଣୀର ବିଲ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥାନ

কাহিনী সেই স্মৃতিখাত কিংবা কুখ্যাত 'কালোপ্রমর' সম্পর্কিত কাহিনী 'কিরীটীর আবির্ভাবে'। গ্রন্থটির প্রথম কাহিনী 'কিরীটীর আবির্ভাব' হলেও, বস্তুতঃ রহস্যভেদীই এই সিংহাজের প্রথম গল্প, অন্তত কাহিনীর ধারা-বাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে। 'কিরীটীর আবির্ভাব'-এ কিরীটী এই কাহিনী-গ্রন্থীর অন্যতম বিখ্যাত প্রাত্যয় রাজ্য সনৎ ও সুরূতর সঙ্গে পরিচিত হন। এরপরই কালোপ্রমর কাহিনীর শুরু। বাঙ্লা-রহস্য কাহিনীর নায়ক কিরীটীর সঙ্গে দুর্বৃত্ত কালোপ্রমরও বাঙালী পাঠকচিত্তে স্মরণীয় স্থান পেয়ে গেছে। বাঙালী পাঠকের আগ্রহ কালোপ্রমরের কাহিনী পর্বে পর্বে নানাভাবে কখনও দেশে কখনও বিদেশে টেনে নিয়ে গেছে। বিশেষ ভাবে বর্মার রেঙ্গুন শহর, কলকাতার চীনাপাড়া—আমাদের কাছে স্বল্প-পরিচয়ের অবকাশে একটা রহস্য-কুহেলীর আবরণ টেনে কাহিনীর শীতল ভয়াল পরিবেশ রচনায় সহজে করেছে। কিশোর মনে ইরাবতী নদীর তীরে যিয়াং-এর পরিত্যক্ত জীর্ণ বৌজ প্যাগোড়া, তার সংশ্লিষ্ট ভগুমার্ত্ত, ড্রাগনের মৃথে ঝোলানো বালায় গৃহ্ণ ধনাগরের চাবি, গুপ্তধনের সংকেতবাহী লিপিতে দুর্বোধ্য ইশারা—

‘ত্রাগন দেখ বসে আছে
ধনাগরের চাবি কাছে
মৃথে তার লোহার বালা
দুলছে তাতে চিকণ শলা।
দুইএর পিঠে শুন্য নাও
শিশ দিয়ে গুণ দাও,
শুন্য র্যাদ যায় বাদ
সেই কবারে প্রবে সাধ।’

উত্তেজনা ও আবেগে কিরীটীর বৃক্কের মাঝে ঘন্থন 'চিবচিব' করে ওঠে তখন তার মানসিক সঙ্গী পাঠক কিশোর বা বালকের মনেও এই একই প্রতিক্রিয়া। অবশ্যে গৃহ্ণধন ভান্ডারের পাথর সরে গৃহ্ণপথ প্রকাশ পায়। পাতালপুরীর আঁধার কক্ষে দেখায়—

“ছোট একখানি ঘর। সেই ঘরের ছাদের ওপর হতে শিকলের মাথায় একটা কাঁচের প্রদীপদান ঝুলছে। সেই প্রদীপের স্বল্পালোকে দেখা যায় ঘরের চারিপাশে ছোট ছোট বেতের ঝাঁপিতে ভর্তি অসংখ্য গিনি। কে একজন আগামোড়া কালো পোশাক-পরা লোক নীচু হয়ে এক-একটা ঝাঁপির কাছে আসছে আর দুর্দ্বার দিয়ে সেই ঝাঁপি হতে মৃঠো করে গিনি তুলে নিয়ে পরক্ষণেই মৃঠো আলগা করে থারেছে—অর্মান স্মৃতির ঝনঝন শব্দ করে সেই সব গিনি কক্ষের রশ্মি ছাঁড়িয়ে পড়ছে।

এই অতুল ঐশ্বর্যের লোভ মানুষকে চিরকালই পাগল করে রেখেছে। তবে বয়স্ক মানুষের কাছে সেই ঐশ্বর্যের অর্থম্বল্য যতটা ছোটদের কাছে ততটা নয়। বরং তার অন্তস্থান ম্বারা আর্বিক্ষারম্ভল্য, রহস্যের নেশাতে ছুটে যাবার ম্ভল্যই বেশি। তাই স্বভাবতঃই তারা ষেন কিরীটীর এই কুর্তিত্বের সমান অংশবিদ্যার হয়ে পড়ে। পরে র্যাদ এই গৃহ্ণধনের সমগ্র ধনভান্ডারটাই তাদের আয়ন্তের বাইরে ঢেলেও যায় তাহলেও ষেন তাদের দ্রঃখ নেই। কেন না সেই কুখ্যাত দস্তুর কালোপ্রমর তো ধরা পড়েছে। বয়স্ক মানুষের হয়ত সেক্ষেত্রে একটি গোপন দৈর্ঘ্যনিঃবাসই পড়ত।

‘চৰ্কী’-র পরিবেশেও একটা রহস্যময় আবহাওয়া গড়ে তুলতে পারা গেছে। সমন্বয়ীরবতী’ পাহাড়ের চৰ্দায় খেয়ালী শিল্পীর পূরাতন অর্ধপূর্ণতাঙ্গ প্রাসাদ তার পটভূমি। সেখানে সাধারণের অঙ্গাতে বহুভূজ প্রেম এবং ধন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান্বিতার ও গোপন প্রতিহংসার লীলা চলেছে। এবং তার উপসংহারেও আছে আকস্মিকতার চমক।

‘বৌরাগীর বিল’-এ জীবন ও মৃত্যু যেনে পাশাপাশি অন্তরঙ্গ দ্বাই স্নোতে বহমান। একদিকে নিষ্ঠার হত্যার লীলা অন্যদিকে নতুন করে গড়ে-ওঠা হৃদয়-সম্পর্ক। এখানেও কাহিনী বয়নে ন্তনন্তের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়।

সব কটি গল্পের কাহিনী ও স্থানকালপাত্র প্রত্যেক হলেও সর্বত্র নায়ক রহস্যভেদী কিরীটী রায় ও তার স্মৃত্যোগ্য সরকারী সুরূত। কোথাও লেখকের জবানীতে কোথাও সহকারী সুরূতের জবানীতে (চৰ্কী) কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে।

রহস্য কাহিনীর অস্তিত্বের মূল বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিনের নয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কোথাও অন্তর্ভুক্ত ডিটেকটিভ উপন্যাস বা কাহিনীর ইঞ্জিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। সূত্রাং অতি স্বাভাবিক ভাবেই এই জাতীয় কাহিনী যে সাহিত্যের থেকে উদ্ভৃত তার প্রভাব থাকা সম্ভব। তবে তার অর্থ এই নয় যে বাংলা রহস্য-কাহিনী মাঝেই ইংরাজী বা মার্কিন কাহিনীর কঙ্কালে গঠিত। যে কোন উর্ণতশ্শীল সাহিত্যেই অপর শক্তিশালী সাহিত্যের ছায়াপাত ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে সেরকম ছায়াপাত দুর্লক্ষ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে তা অলঙ্কারের মত শোভমানই হয়ে উঠেছে বলা চলে।

এছাড়া রহস্য উপন্যাসের প্রাগবৰ্ত্ত যে ‘সাসপেন্স’ বা প্র্বৰ্ত্তপর কৌতুহল বজায় রাখবার প্রয়োজনীয়তা—এখানে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবে রুক্ষিত হয়েছে। ফলে রূপ্য-নিঃশ্বাসের দ্রঢ়পনাম্ব কাহিনীর শেষ প্রস্তা পর্যন্ত এক সক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের কল্পনাকে পরাজিত করে আকস্মিকভাবে অপ্রত্যাশিতজনকে অপরাধী বলে যখন উপস্থিত করা হয়—তখন কাহিনীর অন্যান্য পাত্রপাত্রীর সঙ্গে পাঠককেও বিমুচ্ছ হয়ে যেতে হয়। এবং কিরীটী রায় যখন সংশ্লেষণ ঘূর্ণিষ্ঠবাসের দ্বারা অপরাধীর কার্যপরম্পরাকে বিশ্লেষণ করে তখন আমাদের মনে হয়, এ তো নিতান্তই সহজ ও সরল। সহজ মাত্রেই যে সরল নয় সেকথা তখন আমাদের স্মরণে থাকে না। এবং কাহিনী শেষ করার সঙ্গে কাহিনীর উর্কে জেগে থেকে পাঠকর্মনে রহস্যকাহিনীর রহস্যভেদী নায়ক কিরীটী রায়ের ব্যক্তিষ্ঠ, তার তীব্রতাক্ষে যন্ত্রিকোধ, পরিমিতি বৈধ, ক্ষুরধার বৃক্ষের মালিন্যমুক্ত উজ্জ্বল্য নিয়ে। যা কিরীটী রায়কে সমসাময়িক ডিটেকটিভ কাহিনীর নায়কদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে এবং তার স্মৃষ্টিকে দিয়েছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রত্যক্ষ সাফল্য।

କିରୀଟୀ ଅମନିବାସ (୧ମ) — ୧

প্রীতভোজ উৎসব সুরতৰ বাড়িতে।

আমহাস্ট স্ট্রীটে প্ৰকাশ বাড়ি কিনেছে সুৱতৰা। সেই বাড়িতেই গ্ৰন্থবেশ উপলক্ষে এই প্রীতভোজেৰ উৎসব।

অনেক আৰম্ভণ্তই এসেছেন, তাঁদেৱ মধ্যে এসেছে বিশেষ একজন, কিৱীটী রায়।

ৱহস্যভেদী কিৱীটী রায়।

কিৱীটী রায় প্ৰায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, গোৱৰণ, বলিষ্ঠ চেহারা, মাথা-ভৰ্তি কোঁকড়ানো চূল, ব্যাকৰাশ কৰা।

চোখে প্ৰদৰু লেসেৰ কালো সেলুলৱেডেৰ ফ্ৰেমেৰ চশমা। দাঢ়িগোঁফ নিখৰ্ণতভাৱে কামানো। ঘৰখে হাসি যেন লেগেই আছে, সদানন্দ, আমদন্দে।

ওদেৱ পাড়াতেই এক নবলৰ্খ বৰ্ধৰ গৃহে কিৱীটীৰ সঙ্গে ওদেৱ আলাপ-পৰিচয় হয়।

প্রীতভোজেৰ পৰ বিদায়েৰ প্ৰৰ-মৃহুতে কিৱীটী বলে, এই কালো পাথৰেৰ ড্রাগনটি আমি চাই সুৱতৰাবু। অপ্ৰৰ মৃত্তিৰ গঠন কৌশল। ঈঁটি আমি আমাৰ মিৰ্জাজিয়ামে রাখতে চাই।

বেশ তো, তা নিন না! সুৱত বলে।

কিৱীটী বলে, শুধু যে মৃত্তি তা নয়, ওৱ সঙ্গে যাব নাম জড়িয়ে আছে, কেন জানি না, আপনাদেৱ কাহিনী শুনে সেই নামটিৰ প্ৰতিও আমাৰ একটা দুৰ্বলতা জল্পে গেছে।

সুৱত কিৱীটীৰ কথায় হেসে ফেলে, জানেন না বোথ হয়, মা বলেন, ওটা নাৰ্কি একটা অমঙ্গলেৰ চিহ্ন।

তবে তো ভালই হল। অমঙ্গলকে সাদৱে আমাৰ গৃহে বহন কৰে নিয়ে যাই আপনাদেৱ ঘৰ থেকে। দেখা থাক কি অমঙ্গল আমাৰ সঙ্গে ও নিয়ে আসে!

*

*

*

ৱাণি তাৱ ঘন কালো পক্ষ বিষ্টাৱ কৰে দিয়েছে বিৱাট এ কলকাতা মহানগৰীৰ বৃক্ষে।

কুক্ষপক্ষেৰ ৱাণি।

জনহীন ৱাস্তা যেন ঘৰমত অজগৱেৰ মত গা এলিয়ে পড়ে আছে। সাড়া নেই শব্দ নেই।...

কিৱীটী একা একা পথ অতিক্ৰম কৰে চলেছে। পকেটেৱ মধ্যে কালো পাথৰেৰ ড্রাগনটি।

আশ্চৰ্য, কিৱীটীৰ যেন মনে হয়, নিঃশব্দে কে বৰ্বৰি আসছে কিৱীটীৰ পিছু পিছু!

যে আসছে তাৱ পায়েৱ শব্দ পাওয়া যাব না কিন্তু স্পষ্ট বোৰা যাব, সে আসছে।

এৱকম নাৰ্কি ঘটে, শুনেছে কিৱীটী অনেকেৱ ঘৰখেই এবং এও শুনেছে,

চোখ ফেরালেও নার্কি তাকে দেখা থায় না। কেউ ওদের দেখতেও পায় না। অথচ বিশ্বি অস্বাস্তকৰ একটা অন্দুরুত ষেন সমগ্র চেতনাকে ওরা ধিরে থাকে। কখনও নিঃশব্দে ঘৰা চাঁদের আলোয় জনহীন প্রান্তরেও ওরা এমান করে হেঁটে বেড়ায়, অনসুরণ করে। কখনও বা অন্ধকারে পিছনে পিছনে আসে। তা আসে আসুক। অনসুরণ করে করুক।

কিরীটী এগিয়ে চলে। অভিশাপকে বরণ করে নিয়ে চলেছে নিজের গহে। কালো ভূমরের মৃত্যু-পরোয়ানা!

* * *

কালো পাথরের ড্রাগনটির কথা সকলে একরকম ভুলেই গিয়েছিল। তা হল না বলেই আবার এ কাহিনীর শুরু।

কালো ভূমর আবার ফিরে এল।

সেই তাদের মত বৰ্দ্ধি নিঃশব্দ পদস্থারে রাত্তির রহস্য-ঘন অন্ধকারে। প্রথমবৰ্ষ যখন ঘূর্মিয়ে পড়ে, নিঃসীম অতলাল্প অন্ধকারে চারিদিক যখন হয়ে আসে নিবড়ম, মাথার ওপরে শুধু তারায় ভৱা আকাশ বোবা দ্রষ্ট নিয়ে চেয়ে থাকে, রাতের বাতসের চূপিসড়ে তখন ষেন তাদের মতই আসে।

রহস্য দিয়ে ঘৰা কালো ভূমর। রহস্য-ঘন হয়েই ধৰা দেয় যেন।

কতটুকুই বা পরিচয় সনৎ-এর! সনৎ ভাবেঃ কতটুকুই বা সে জানে কালো ভূমরের! মৃখোশে ঢাকা ছিল। শুধু মৃখোশের দৃষ্টি ছিন্পথে অন্তর্ভুদী দৃষ্টি চোখের দ্রষ্টিতে।

কি সম্মোহন আছে ওই চোখের দ্রষ্টিতে! একবার সে-চোখের দিকে যে তার্কিয়েছে, সে ভুলবে না আবার সে দ্রষ্টি। ভুলতে পারে না।

চোখের তারা তো নয়, ষেন দৃষ্টি জৰুলন্ত অঙ্গার খণ্ড!

এখনও কত রাতে ঘূর্মের ঘোরে দৃঢ়স্বনের মত সেই চোখের দ্রষ্টি সনৎকে ষেন বিচলিত বিশ করে দেয়। কি এক অজ্ঞানিত আশঙ্কায় সর্বাঙ্গ শিউরে শিউরে ওঠে তার।

ভুলতে পারে না রাজু।

দস্তু কালো ভূমর।

শয়তান কালো ভূমর। কিন্তু সাত্যাই কি তাই তার একমাত্র পরিচয়! সেই বলিষ্ঠ পেশল উন্নত গঠন! তেজোদ্ধৃত কণ্ঠস্বর!

রাজু শুনেছিল—মস্ত বড় নার্কি একটা দল আছে কালো ভূমরের। অথচ আশচর্য, দলের লোকের কেউ নার্কি আজ পর্ণত জানে না, কালো ভূমরের আসল ও সাত্যিকারের পরিচয়। কে সে, কি সে এবং কেমন দেখতে সে!

দলের লোকেরা শুধু এইটুকুই জানে যে কঠোর তার অনুজ্ঞা। কঠোর তার নীতি। অপ্রৰ্ব্ব তার সংয়ৰ। নির্লোভ। আজন্ম প্রকাচারী। তবু সে শয়তান। তবু সে ডাকাত। তবু সে আতঙ্ক। তবু সে সমাজের বাইরে, সকলের ঘৃণা ও অভিশাপের পাত্র।

স্বরূপ। সে ভাবেঃ একটা তেজোদ্ধৃত অহঙ্কার। অন্তুত কোশলী, ডাকাত, দস্তু! কালো পাথরের ড্রাগনটির কথা মনে হলেই মনে পড়ে সেই দৃঢ়স্বন! রূপকথার কাহিনীর মত সেই সম্পত্তি-প্রাপ্তি! তার পর সেই নীল পারাপার-হীন মহাজলধি! কি অপ্ৰৰ্ব্ব বিৱাট বিস্ময়! মগের দেশ! বেচারী অধৰবাবু!

সাত্যই কি শয়তান কালো দ্রমর তার ওপরে প্রতিশোধ নেবে ?

আর ওদের সঙ্গে সঙ্গে ভাবে কিরীটী, রহস্যভেদী কিরীটী। রহস্য উদ্ঘাটনের ওর আছে একটা তীর নেশা। আছে একটা তীর আকাঙ্ক্ষা ও উত্তজনা। কালো দ্রমর সাধারণ ছিঁচকে ঢোর নয়। প্রথর বৃদ্ধি ও অর্মত শক্তির অধিকারী সে।

কালো দ্রমর সম্পর্কে তাই বুঝি কিরীটী এক অদ্য সংকেত অন্তর্ভুক্ত করে, কি এক গভীর রহস্য যেন ওকে আকর্ষণ করে।

বিচিত্র এই জগৎ ! আরও বিচিত্র এই জগতের মানুষ ! কেন মানুষ এমনি করে অধের মত ছুটে যায় সর্বনাশের পথে ? অকারণে আপনাকে বিপদের মধ্যে ফেলে কেন নিজেকে করে ব্যস্ত ? এও হয়তো একটা নেশা !

নেশা বৈকি। নেশা না হলে কি কেউ এমনি করে আপনাকে বিপদের মধ্যে ঢেনে নিয়ে যেতে পারে ? সাত্য, বিচিত্র এই জগতের মানুষ ! আরও বিচিত্র তার মৃত্যু-গার্তি।

॥ ১ ॥

বাদল-সম্মার আগম্তুক

শীতের সকাল নয়, এবারে বাদলার রাণি।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি বরছে বাইরে। মেঘ-মেদুর আকাশের গায়ে বিদ্যুতের সোনালী আলোর চাকিত ইশারা উঠেছে থেকে থেকে লকলাকয়ে।

মের্মানিবড় রাণির অন্ধকার সচ্চীভোদ্য। রাণি সাড়ে সাতটা আটটাৰ বেশী নয়।

সুরুত, সনৎ ও রাজ্য পাশাপাশি তিনখানা চেয়ারের ওপরে বসে কি একটা বিষয় নিয়ে তর্কে মেতে উঠেছে ঐ বাদলার সম্মারণে।

রাজ্যের মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর ডিশে গরম গরম পাঁপর, বেগনী ও মটরভাজা।

সুরুত এক লাফে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে আসে। দুঃ হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দেৎফুল কষ্টে বলে ওঠে, সাত্য মা, তোমাকে বে কি ভালবাসতে ইচ্ছা করছে, কেমন করে তুমি আমদের মনের এই মহৃত্তের আসল কথাটি টের পেলে বল তো ! এমন বাদলার রাতে তেলেভাজা ! আমাদের এক বৰ্দ্ধ কৰিব মণি দস্ত কৰিবগুরুর একটা কৰিবতার প্যারাডি করেছিল একবার—

সমাজ সংসার মিছে সব

মিছে এ জীবনের কলরব,—

পাঁপর ভাজা দিয়ে মটর সাথে নিয়ে

জিহবা দিয়ে শুধু অন্তর্ভুক্ত...

সুরুতের কৰিবতা শুনে মা হেসে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেও।

রাজ্য হাসতে হাসতেই বলে, দাদাগো, বিশ্বকর্বিকে আর এভাবে স্মরণ করো না। তাঁর সর্বজনপ্রিয় বৰ্ষা কৰিবতাটির এই অন্তর্ভুক্ত প্যারাডি শুনে, আর

ষাই হোক, তিনি নিশ্চয়ই পরিত্পত্তি হবেন না। তা এখন তিনি যেখানেই থাকুন।

কিন্তু এগুলো যে জুড়িয়ে গেল, বেশী রাত করিস্টেনে! আজ মটরশুটার খিচড়ি হচ্ছে। মা বলেন আবার মদ্দ হেসে।

সত্য! Three cheers for মা! সুব্রত বলে ওঠে। মা খোলা দরজাপথে ঘর হতে নিষ্কান্ত হয়ে যান।

সকলে আহাৰে মনোনিবেশ কৰে।

ঠিক এমনি সময় বাইরের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ পাওয়া গেল, খুঁট খুঁট

খুঁট।

রাজেই প্রথমে বলে, কে যেন কড়া নাড়ছে!

আবার কড়ানাড়ার শব্দ।

কে? সুব্রত উঠে দাঁড়ায় এবং দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

সুব্রত দরজাটা খুলে দিল। রাস্তার অদ্রবতী গ্যাসের আলো বৃংশ্টি-ভেজা পিচালা রাস্তার ওপরে পড়ে চিক্কিচিক্ক কৰছে।

মধ্যে মধ্যে এক-এক বলক জলকণাবাহী হাওয়া গায়ে চোখে ঘুঁথে এসে আপটা দেয়। সিৰ, সিৰ, কৰে ওঠে সৰ্বাঙ্গ।

দরজার ওপরেই গায়ে বৰ্ষাতি, মাথায় বৰ্ণ-টুপি, হাতে ঝোলানো একটি গ্যাডস্টেন ব্যাগ এক অপৰিচিত ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

এইটাই কি ১৮নং বাড়ি? যিঃ সুব্রত রায়?...আগন্তুক প্রশ্ন কৰেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই, তা আপনি...

আমাকে চিনতে পারছেন না, এই তো? তা সে হবে খন, আপাতত আমাকে এ বৃংশ্টির মধ্যে না দাঁড় কৰিয়ে রেখে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিলে—

বিলক্ষণ! আস্ন আস্ন।

সুব্রত আহবানে আগন্তুক এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কৰলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই রাজেই ও সনৎ ভদ্রলোকের ঘুঁথের দিকে তাকাল বিস্মিত ভাবে।

ভদ্রলোক প্রথমেই গায়ের ভেজা বৰ্ষাতিটা খুলে এণ্ডক-ওণ্ডিক দ্বিষ্টপাত কৰে ঘরের দেওয়ালে আলনায় ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর সকলের দিকে তাঁকিয়ে হাত জোড় কৰে জানালেন নমস্কার।

আগন্তুকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছীই বোধ হয় হবে, দেহের গড়ন দোহারা ও বলিষ্ঠ বলেই মনে হয়। ভদ্রলোক বেশ শৌখিন প্রকৃতির। মাথার চৰল কঁচায় পাকায় ঘেশানো। প্রয়োগলের নীচে একজোড়া তৈক্ষ্য অনুসন্ধানী চক্ষুরাকা। দাঁড়িগোঁফ নিখন্তভাবে কামানো।

আমায় চিনতে পারছেন না আপনারা কেউই, তাই সৰ্বাগ্রে পরিচয়টাই দিই, আমার নাম বনমালী বসু। ডিগ্রুগড় থেকে আসছি। কলকাতায় এসেছি আপনাদের কাছেই একটি বিশেষ জরুরী প্রায়াশ্রের জন্য। সুব্রত, রাজেন ও সনৎবাবু সকলের নিকটই আমার বক্তব্য আমি পেশ কৰব। কিন্তু তারও আগে যদি এক কাপ চা পেতাম! বৃংশ্টিতে ভিজে শরীর যেন একেবারে অবশ হয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই, এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত কুস্থা বোধ কৰছেন কেন? বলে তখনই সুব্রত ভৃতাকে ডেকে এক কাপ চা আনতে দিল।

কিছুক্ষণ পরে চা এলে, গরম চায়ের কাপে চৰ্মক দিতে দিতে ভদ্রলোক বললেন, শোনা যায় সত্যবুংগে অতিথি-সংকার কৱা গৃহস্থের একটা প্রধান ও

অবশ্য-করণীয় ধর্ম ছিল আর আজকাল ভিখারী ও প্রাথৰ্মীকে বাঁড়ি হতে তাড়িয়ে দেওয়াটাই হয়েছে একটা রীতি।

রাজ্য প্রতিবাদের সূরে বলল—হ্যাঁ, তার কারণও আছে। আজকাল সকলেই ফর্মাক দিয়ে স্বর্গলাভ করতে চায়। পরের মাথায় যে যত সুন্দরভাবে হাত বুলাতে পারে তারই জয়জয়কর।

তা যা বলেছেন। বলতে বলতে ভদ্রলোক নিঃশেষিত চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলেন।

বাইরে আবার জোরে বৃষ্টি নামল। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইতে শুরু করল।

আপনি কেন হঠাত এই ঝড়-বাদলের রাত্রে ডিবুগড় থেকে এত দ্রুত আমাদের কাছে এলেন তা তো কই শোনা হল না বনমালীবাবু এখনও? সুন্দরত প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, সে-কথাই এবাবে বলব। বলতে বলতে ভদ্রলোক একটু নড়েচড়ে বসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আরম্ভ করলেনঃ তা হলে খুলেই বলি কথাটা সুন্দরতবাবু, যে জন্যে এতদ্রুত ছুটে এসেছি তাই বলছি। একটা বিশেষ দুর্ভাবনায় পড়েছি মশাই।

সকলেই উদ্গীব হয়ে বনমালী বস্তু দিকে তাকাল।

বনমালী বলতে থাকেন, কেন আপনাদের কাছে আসতে হয়েছে জানেন? আমার কাকা অমর বস্তু ছিলেন রেঙ্গনের বিখ্যাত কাঞ্চ-ব্যবসায়ী মিঃ চৌধুরীর ফার্মের ম্যানেজার ও প্রাইভেট সেক্রেটারী।

ছিলেন যানে?—সকলে একসঙ্গে একই প্রশ্ন করলে।

হ্যাঁ ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই। কারণ গত ৩১শে তারিখে কোন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হয়েছেন।

নিহত হয়েছেন! অমরবাবু! এ আপনি কি বলছেন বনমালীবাবু? সুন্দরত উৎকণ্ঠিত ভাবে বলে।

বলো যা তার মধ্যে একবর্ণও মিথ্যা বা তৈরী নয়। কে বা কারা যে তাঁকে হত্যা করেছে তা অবিশ্য এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। দিন দশেক আগের এই ‘তার’ আমি রেঙ্গন থেকে পাই। এই দেখন,—, বলতে বলতে ভদ্রলোক বুকপকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে সকলের চোখের সামনে আলোর নীচে মেলে ধরলেন।

কাগজের ভাঁজ খুলে ধরবার সময় ভদ্রলোকের হাতের জামাটা একটু সরে যেতেই খোলা হাতের উপর সনৎ-এর নজর পড়ল মুহূর্তের জন্য। বিসময়ে আতঙ্কে চমকে উঠল সে, কিন্তু আর সকলে তখন সেই কাগজের লেখাগুলো পড়তেই বাস্ত, সেদিকে কারও নজর গেল না। কাগজে যা লেখা ছিল, তার বাংলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়—

গত শুক্রবার মিঃ চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ অমর বস্তুকে তাঁর শয়নঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তীক্ষ্ণ ছবির কিংবা ঐ জাতীয় কোন অঙ্গের সাহায্যে তাঁর মৃত্যুর্ধানি এমনভাবে বিকৃত করা হইয়াছে যে মিঃ বস্তুকে একেবারে চেনাই যায় না। অবশ্য মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হইয়াছে। সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর মিঃ সলিল সেন তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি ‘তার’ পাওয়া মাত্র এখানে আসিবেন।—ডি.

আই. জি.।

পড়া শেষ হলে ভদ্রলোক বললেন, সৌদিনকার স্থানীয় সংবাদপত্রে যে সংবাদ বেরিয়েছে তাৰও কাটিং যোগাড় কৰেছি। এই দেখন কাটিংটাৱ লেখা রয়েছে—

স্বৰ্গীয় মিঃ চোধুৱীৰ প্ৰাইভেট সেক্রেটাৱী মিঃ অমৱ বস্তুৰ অভাৱনীয় মত্তু!

আপনারা সকলেই জানেন, মাত্ৰ মাসখানেক আগে মিঃ বস্তু মত্ত মিঃ চোধুৱীৰ অন্যতম প্ৰধান সাক্ষীৰ কৰ্তব্য পালনেৰ জন্য কিভাবে অক্ষণ্ট পৰিৱ্ৰম কৰিয়া বিখ্যাত দস্তু 'কালো প্ৰমৱে'ৰ মুখেৰ গ্ৰাস ছিনাইয়া লইয়া উইল-সংক্রান্ত সমস্ত গোলমাল মিটাইয়া সব কিছুৰ নিষ্পত্তি কৰিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্ৰভুভূষ্ণি ও কৰ্তব্য-পৱায়ণতাৰ কথা এখনও শহুৱাবাসী কেহই আমৱা ভুলিতে পৰিব নাই। গতকাল তাঁহার মত্তদেহ তাঁহার শয়নকক্ষেৰ মধ্যে পাওয়া যায়। তৌক্ষ্য ছোৱা বা ঐ জাতীয় কোন অঙ্গেৰ সাহায্যে মুখচোখ এমনভাৱে বিকৃত কৰা হইয়াছে যে তাঁহাকে আৱ শ্ৰীষ্ট অমৱ বস্তু বলিয়া চেনাই যায় না। আগেৰ দিন প্ৰায় রাত ১২টা পৰ্যন্ত তিনি অফিস-সংক্রান্ত কাজ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। ১২টাৰ পৰি তিনি শয়নগৃহে ঘুমাইতে থান এবং ঐ দেশীয় ভৃত্যও আলো নিভাইয়া দিয়া শুইতে যায়। পৰদিন প্ৰত্যৰ্থে ভৃত্য প্ৰভাতী চা লইয়া মানবেৰ শয়নকক্ষে প্ৰবেশ কৰিয়া মানবেৰ বস্তু মত্তদেহ শয়াৰ উপৰ পাড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তখনই ফোনে প্ৰলিম্পে সংবাদ দেয়। ইল্সপেক্টাৱ মিঃ সলিল সেন তদন্তেৰ ভাৱ লইয়াছেন। কে বা কাহারা যে এইভাৱে তাঁহাকে হত্যা কৰিয়া গেল, আজ পৰ্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। তবে আমাদেৱ মনে হয় কালো দ্রুমৰ সম্পর্কে কৃত্পক্ষ একটু মনোযোগী হইলে ক্ষতি কি!

শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যন্ত সেই দ্রাগনেৰ মত্তু-প্ৰৱোয়ানাই সৰ্ত্ত হল, একজন দুৰ্ধৰ্ষ ডাকাতেৰ জেদই বজায় রাইল!—স্বৰূপ বললে।

সনৎ কিন্তু একটিও কথা না বলে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

॥ ২ ॥

গভীৰ নিশ্চীথে

এত বড় একটা দণ্ডখেৰ সংবাদ সকলেৰ মনই যেন কেমন বিষম কৰে দেয়। সেই উইল-সংক্রান্ত ঘটনাটা কি আজ পৰ্যন্ত কেউ ভুলিতে পেৰেছে? ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। স্বৰূপ ভাৰ্ছিলঃ অজানা বন্ধু, কেমন কৰে ছায়াৰ মতই পাশে পাশে থেকে সৌদিন তাদেৱ সকলকে সকল বিপদেৰ কবল হতে আড়াল কৰে রক্ষা কৰেছিল। এক কথায় বলতে গৈলে মিঃ বস্তু না থাকলে ঐ বিপুল সম্পত্তিপ্ৰাপ্তি তাদেৱ ভাগ্যে রম্ভা-প্ৰাপ্তিতেই পৰিগত হত।

কতক্ষণ এভাৱে নীৱৰে কেটে গেল। সৰ্বপ্ৰথম সনৎই সেই নীৱৰতা ভজণ কৰে বনমালীবাবুৰ দিকে তাৰিকয়ে বললে, তা আপনি এখনও বৰ্মা যায়া কৱেন নি কেন বনমালীবাবু?

সনৎ-এৰ প্ৰশ্নটা শুনে বনমালী বস্তু যেন প্ৰথমটা একটু চমকে উঠলেন;

କିନ୍ତୁ ପରକଣେଇ ନିଜେକେ ସାମଲେ ନିଯୋ ବଜଲେନ, ସାଇନି ତାରଓ କାରଣ ଆଛେ । ପ୍ରଥମତଃ ମେ ବିଦେଶ-ବିଭୁତି ଯଗେର ଦେଶ । କାଟକେ ଜାନି ନା, ଚିନିଓ ନା କାଟକେ । ଶିବତୀଯତଃ ମଶାଇ, ସଂତ୍ୟ କଥା ବଲତେ କି, ଆମ ଏକଟ୍ଟ ଭୀତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତର ଲୋକ । ଖବରେର କାଗଜେ ଆପନାଦେର କଥା ଓ କାକାର ସଙ୍ଗେ ଆପନାଦେର ଆଲାପ-ପରିଚୟେର କଥା ପଡ଼େଇଲାମ ଏବଂ ପରେ କାକାଓ ଆମାକେ ଆପନାଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଚିଠି ଦିଯେ-ଛିଲେନ । ଡି. ଆଇ. ଜି-ର ‘ତାର’ ପାଓଯାର ପର ପ୍ରଥମଟା ଅନେକ ଭାବଲାମ ଏବଂ ଭାବତେ ଭାବତେ କେନ ଜାନି ନା, ଆପନାଦେର କଥାଇ ଆମାର ମନେ ପଡ଼ିଲ । ତାର ପର ଅନେକ କଷେଟ ଆପନାଦେର ଠିକାଳା ସୋଗାଡ଼ କରେ ଏଥାନେ ଆସିଛି । ଏଥିନ ସିଦ୍ଧି ଆପନାଦେର ସହନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ! ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲେ ବନମାଲୀବାବୁ ଥାମଲେନ ।

ସନ୍ତେଷି ଆବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଆଛି ବନମାଲୀବାବୁ, ଠିକ କି ଧରନେର ସାହାଯ୍ୟ ଆପନି ଆମାଦେର କାହେ ଆଶା କରେ ଏଥାନେ ଏସେହେନ ବଲିଲ ତୋ ? କାରଣ ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ସେ ଠିକ କି ଭାବେ ଆପନାକେ ଆମରା ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ପାରି, ସଂତ୍ୟ କଥା ବଲତେ କି, ଯେନ ଠିକ ବୁଝେ ଉଠିଲେ ପାରିଛି ନା ।

ସାହାଯ୍ୟ ଅବିଶ୍ୟକ ଆପନାରା ଆମାକେ ଅନେକ ଭାବେଇ କରତେ ପାରେନ, ତବେ ଯେଜେନ ଆମ ଏତଦ୍ୱାରା ଆଶାଯ ଛାଟେ ଏସେହି, ସିଦ୍ଧି ଆପନାରା ଏକଟିବାର ଦୟା କରେ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ରେଣ୍ଗୁନେ ଥାନ, ତା ହିଲେ ଆପନାଦେର ସକଳେର ସାହାଯ୍ୟ ହୟତେ ବ୍ୟାପାରଟାର ଏକଟା ଭାଲ କରେ ଅନୁମ୍ଭଵ କରେ ଦେଖିଲେ ପାରତାମ । ତାହାଡ଼ା ଆଭ୍ୟାସ ବଲତେ ଆମାର ଐ କାକାଇ ସା ଏକଜନ ବେଂଚେଇଲେନ । ଭଦ୍ରଲୋକେର କଂଠ୍ଟର ଅଶ୍ରୁମୁକ୍ତ ହୟେ ଉଠେ ଯେନ । ଏକଟ୍ଟ ଥିଲେ ଆବାର ବଲତେ ଶୁଣି କରେନ, ଅବିଶ୍ୟକ ବଲାଇ ବାହୁଳ୍ୟ ସେ ଆପନାଦେର ସାତାଯାତେର ସବୀବିଧ ଖରଚ ଆନନ୍ଦେର ସଙ୍ଗେଇ ଆମ ବହନ କରବ ।

ଖରଚେର କଥା ବାଦ ଦିନ ବନମାଲୀବାବୁ । ଯେଭାବେ ଆମରା, ବିଶେଷ କରେ ଆମ ଅମରବାବୁର କାହେ ଖଣ୍ଡି, ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କଥା ମେଖାନେ ଉଠିଲେ ପାରେ ନା । କଥାଟା ବଲେ ସ୍ଵର୍ଗତ ।

ତାହାଡ଼ା ଆମାର କେନ ଯେନ ମନେ ହଞ୍ଚେ ମିଃ ରାଯ୍, ଆମାର ଖୁଡ଼ୋ ମଶାଇରେ ଏହି ନିଷ୍ଠ୍ର ହତ୍ୟାର ବ୍ୟାପରେ କୋଥାଓ ଯେନ ବେଶ ଏକଟ୍ଟ ଗୋଲମାଲ ଆଛେ ।

ଗୋଲମାଲ ଆଛେ ମାନେ ? ସ୍ଵର୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ।

ହଁ, ଗୋଲମାଲ । ଭେବେ ଦେଖୁନ, ହତ୍ୟାଇ ସଖନ ତାଁକେ କରା ହଲ, ତଥନ ଅମନ କରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଶ୍ରେର ସାହାଯ୍ୟ ମୂଳ୍ୟ ବସ୍ତିର ମୂଳ୍ୟ ବିକୃତ କରେ ଗେଲ କେନ ? କି ତାର ଉତ୍ୟେଶ ଛିଲ ? ତାରପର ସଂବାଦପତ୍ରେ ଐ ସେ ଦସ୍ୟ କାଲୋ ଭ୍ରମରେର କଥା ଇଞ୍ଜିଗତ କରେଛେ, କାରଣ ଭେବେ ଦେଖୁନ, ଆପନାଦେର ଉଇଲେର ବ୍ୟାପାର ଆମାର କାକା ଆପନାଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ ଐ କାଲୋ ଭ୍ରମରେର ବିପକ୍ଷେ ତାଁକେ ଦାଢ଼ାତେ ହୟେଇଲ, ସେ ବ୍ୟାପରେ କାଲୋ ଭ୍ରମରେର ଏକଟା ଆକ୍ରୋଷ କାକାର ଓପର ଥାକାଟାଓ ଅମ୍ଭବ ନନ୍ଦ—ତାତେ କରେ ଐ ଦସ୍ୟକେଇ ଆବାର ସନ୍ଦେହ ହୟ । ତାହାଡ଼ା ଆପନାଦେର ଉଇଲେର ବ୍ୟାପାର ନିଯେ କାଲୋ ଭ୍ରମରେର ଦଲେର ସଙ୍ଗେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ହୟେଛେ ବଲେ ଓ ବିଷୟେରେ ଆପନାଦେର ଖାନିକଟା ସାକ୍ଷାତ ଅଭିଭାବକ ତୋ ଆଛେ । ଏହି ସବ କାରଣେଇ ଆମ ଆପନାଦେର ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାଥିର୍ଥୀ ହୟେ ଏସେହି ।

ସନ୍ତେଷି ବଲଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ହତ୍ୟାର ବ୍ୟାପରେ ଆଦିପେଇ କାଲୋ ଭ୍ରମରେର କୋନ ହାତ ନାହିଁ ତୋ ଥାକତେ ପାରେ । କାଲୋ ଭ୍ରମରେର ଘାଡ଼େଇ ସା ଦୋଷଟା ଚାପାଇଛେ କେନ ? ହତ୍ୟାର ବ୍ୟାପରେ କାଲୋ ଭ୍ରମର ସେ ଜାଗାତ୍ତି ଆଛେ, ଏମନ କୋନ ନିର୍ଦର୍ଶନ କି ପାଓଯା

গেছে ? কিংবা সে কি কিছু রেখে গেছে ? সেটাই তো সংবাদপত্রের অভিমত—

সনৎ-এর কথায় বাধা দিয়ে স্মৃত ও রাজ্য বলে উঠল, সে তুমি যাই বল সনৎদা, আমরা একেবারে ইলফ করে বলতে পারি—কালো প্রমর ছাড়া এ ব্যাপারে অন্য কারণ হাত নেই। মনে পড়ে তোমার, সেই রেঙ্গনের বাড়িতে একদিন সন্ধ্যাবেলা বাজে করে সেই চিঠি ও ড্রাগন পাঠাবার কথা ? সে-সব কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি তুমি এত তাড়াতাড়ি ?

না ভুলিনি এত তাড়াতাড়ি। কিন্তু সেই ব্যাপারের সঙ্গে এর এমন কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে স্মৃত, সেটাই তাই যেন বুঝে উঠতে পারছি নে !

কেন ? সেই চিঠি ও ড্রাগন পাঠানোর পর অমরবাবুর এইরূপ শোচনীয় মত্ত্য, এর পরও কি তোমার বোঝাবার অসুবিধা হচ্ছে ?

অসুবিধাটা ঠিক কালো প্রমরের এই ব্যাপারে জড়িত থাকার সম্ভাবনাটাই নয়, অন্য কিছু !

কি ?

সময় হলে বলব, এখন ন্য। সনৎ যেন ইচ্ছা করেই চুপ করে যায়।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না সনৎদা, এই সোজা ব্যাপারটাকে তুমি ঘূরিয়েই বা দেখছ কেন ?

আপনার বৃক্ষ এ মত্ত্য-ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে সনৎবাবু ? সহসা বনমালী-বাবু প্রশ্ন করলেন।

ভৃত্য এসে ঘরের মধ্যে ঐ সময় প্রবেশ করল ; বললে, মা বললেন, খিচড়ি তৈরী হয়ে গেছে। দেরি করলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আপনাদের কি খাওয়ার জায়গা করা হবে ?

সনৎ জবাব দিল, হ্যাঁ, জায়গা করে দিতে বল গে...তা হলে বনমালীবাবু, আপনিও এই গরীবদের ঘরে দুটো খুদকুঁড়ো যা হয়,— আশা করি আপনিই নেই!...

বিলক্ষণ, একথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন ? আপনারা না বললেও আর্মি সেধে থেতাম। আমার আবার হোটেলের খাওয়াও তেমন সহ্য হয় না।

আহারের স্থান হলে সকলে গিয়ে একত্রে থেতে বসল। এবং বেশ ত্রুটি সহকারেই খাওয়া-দাওয়া শৈশ হল।

বাইরে তখন দ্যুষিধারায় বঁচিট নেমেছে। প্রমত্ত বায়ুর হাহাকারে দিগন্ত ঝঙ্কুত ও কম্পিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎঝলকে চোখ যেন বলসে যায়। সেই বাড়বাদলের রাশে স্মৃতই যেচে বনমালীবাবুকে সেখানে থাকতে অনুরোধ জানালে। তিনিও সম্মত হলেন। একতলার বৈঠকখানার পাশের ঘরে বনমালী-বাবুর শয়নের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল।

রাত যত বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে বাড় ও জলের প্রকোপও যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বনমালীবাবুকে এইভাবে যেচে বাড়তে স্থান দেওয়াটা গোড়া হতেই যেন সনৎ-এর মনঃপৃষ্ঠ হয়নি। তার পরায়ণ না নিরেই কেন যে স্মৃত বনমালী-বাবুকে গ্রহে স্থান দিল ! সনৎ-এর চোখে ঘূম আসছিল না। তাই সে এক সময় ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের ঢানা বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিশ্চীথ রাতের তান্ডব-লীলা দেখছিল। বাইরের রাত্রি তান্ডব কি তার মনের মধ্যেও তান্ডব শুরু করেছে ? পাশের ঘরেই স্মৃত ও রাজ্য অঞ্চলে নিদ্রা দিচ্ছে।

আর তার পাশের ঘরে শুয়ে বনমালীবাবু।

এলোমেলো চিন্তা করতে করতে একসময় বুরুবু সনৎ কেবল একটু অন্য-মনস্ক হয়ে গিয়েছিল, সহসা কে যেন নিঃশব্দে সনৎ-এর কাঁধের উপর হাত রাখলে !

কে ? চমকে উঠে সনৎ ফিরে তাকায়।

বারান্দায় সিলিংয়ে বোলানো ছি঱মাণ বৈদ্যুতিক আলোর খাঁনকটা তির্যগ্র্গতিতে এসে এদিকে পড়েছে।

আগভুক বললে, আমায় চিনতে পেরেছ, সনৎবাবু ?

সনৎ যেন আগভুকের কথায় এতটুকু ভয়ও পার্যান এমান ভাবে ঠেঁটের কোগে মৃদু একটুকরো হাসি টেনে এনে বিদ্রূপাত্মক কষ্টে বললে, তোমার কি মনে হয় বন্ধু ?

বন্ধু, বন্ধু ! চমৎকার ! কিন্তু তোমার নামে যে একটা পরোয়ানা আছে।

পরোয়ানা ? কিসের পরোয়ানা তা শুনতে পাই না ?

নিশ্চয়ই। কালো ভূমরের মতু-গৃহায় হার্জিরা দেওয়ার।

তাহলে বলব তুমি বা তোমার দলপাত এখনও সনৎ রায়কে ঠিক চিনতে পারানি !

চিন্নিনি তোমাকে ? কে বললে ? পাশ হতে চাপা কষ্টে অপর কেউ যেন বলে উঠল অকস্মাত।

অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় বারান্দাটা যেন আশু এক ভৌতিক সম্ভাবনায় থম্‌থম্‌ করে ওঠে সহসা।

আকাশ ভেঙে যেন আজ রাতে বৃংজি নেমেছে...বন্ধু...বন্ধু...বন্ধু...বন্ধু।

সেই অবিশ্রাম একটানা শব্দেও পার্শ্ব-বর্তী আগভুকের কণ্ঠস্বরটা শুনতে কষ্ট হয় না সনৎ-এর।

অর্তার্কর্তে সেই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে চমকে সনৎ ফিরে তাকায়। ইর্ত-মধ্যে ঠিক তার পশ্চাতে কখন যে আরও চারজন এসে নিঃশব্দে উপস্থিত হয়েছে তা সে টেরও পারিনি। প্রথমটা সে অর্তার্কর্তে এতগুলো লোকের আবির্ভাবে বিস্মিত ও বিমৃঢ় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিমেষে নিজেকে সামলে নেয়।

একটু বেচাল বা অস্তর্ক হলেই লোকগুলো যে তার ওপরে চোখের নিমেষে ঝাঁপড়ে পড়বে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সনৎ ভেবেই পায় না, কি উপায়ে সে নিজেকে এই মৃহূর্তে রক্ষা করতে পারে !

তোমাদের কি উদ্দেশ্য তা জানতে পারি কি ?

কেন বন্ধু ? এখনও কি তোমার সে কথা বুঝতে কঢ় হচ্ছে ? নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি যে, কালো ভূমরের প্রতিশ্রুতির টাকা বা কালো ভূমরের ন্যায় পাওনা এখনও শোধ করানি তুমি ?

কালো ভূমরের ন্যায় পাওনা ! হঁ, তা পাওনাই বটে !

এত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েও সনৎ-এর কণ্ঠস্বর অবিচলিত। বলে, বেশ, সে টাকা আমি কালই দিয়ে দেব।

অনেক দোরি করে ফেলেছ সনৎবাবু, সুন্দে-আসলে এখন সে টাকার অঙ্ক তোমার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। কি ভাবে যে এখন তোমাকে সেটা শোধ করতে হবে, সে কথা কালো ভূমরই তোমায় যথাসময়ে বাতলে দেবে—। রুচি বিদ্রূপাত্মক কষ্টে লোকটা বলে।

লোকটার শেষ কথাগুলি যেন মুখেই আটকে গেল। বিদ্যুৎগাতিতে সনৎ-
এর বজ্রঘণ্টি ভীমবেগে এসে লোকটার চায়ালে আঘাত করল।

সনৎ দ্বিতীয়বার মুঠিট উত্তোলনের আগেই দৃজন তাকে পশ্চাত দিক থেকে
চকিতে জাপটে ধরল।

আক্রমণ হয়ে সনৎ নিজেকে ঘৃষ্ণ করবার জন্য প্রথমেই সামনে যে ছিল
তাকে পা দিয়ে লাঠি বসাল।

ধর শয়তানটকে। শক্ত করে চেপে ধর। কে যেন বলে।

সনৎ ইতিমধ্যে নিজেকে তাদের হাত থেকে ছাঁড়িয়ে নিয়েছে এবং সঙ্গে
সঙ্গে ক্ষিপ্রগাতিতে সিংহবিশ্বে সম্মুখের লোকটির উপর ঝাঁপয়ে পড়ল।
মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোক দৃঢ়িও সনৎকে দ্বা পাশ হতে আক্রমণ
করল।

অন্ধকার জলে-ভেজা বারান্দায় ওদের হৃতোপদ্ধৃট চলতে লাগল। এমন
সময় কোথা থেকে ছায়ার মত আরও দৃজন লোক এসে সেখানে হাজির হল।
কাজেই সনৎকে শীঘ্ৰই বিপক্ষ দলের কাছে হার মানতে হল। এতগুলো
লোকের মিলিত আক্রমণে পৰাজিত সনৎ-এর মুখটা ততক্ষণে আকৃষণকারীদের
মধ্যে একজন ক্ষিপ্রহস্তে বেঁধে ফেলেছে, এবং দৃজনে মিলে তাকে কাঁধে তুলে
নিয়েছে। বংশ্টির মধ্যে দিয়ে ভিজতে ভিজতে সকলে সনৎকে বয়ে রাখতায় এসে
নাগল।

ওদের বাড়ির অংশ দ্বারেই রাখতার ওপর বংশ্টির মধ্যে একখানা মোটর-
গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। লোকগুলো তাড়াতাড়ি সনৎকে নিয়ে সেই গাড়ির মধ্যে
তুলল।

পরমুহূর্তে গাড়িটা ছেড়ে দিল।

* * *

পরদিন সকালে যখন রাজ্ঞির ঘূৰ্ম ভাঙল, সে দেখলে স্বৰ্ত্র তখনও
ঘূৰ্মোছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে স্বৰ্ত্রতকে ডেকে বললে, এই স্বৰ্ত্র, ওঠ ওঠ,
বেলা অনেক হয়েছে।

রাজ্ঞির ডাকে সবে স্বৰ্ত্র চোখের পাতা রঁগড়াতে রঁগড়াতে শয়ার ওপরে
উঠে বসেছে, ভূতা এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।—বড়দাদাবাবু উঠেছেন শিবু?
স্বৰ্ত্রতই প্রশ্ন করে।

তিনি তো তাঁর ঘরে নেই!

নেই? আর কালকের সেই বাবুটি?

না, তিনিও নেই।

সে আবার কি! এত সকালে গেল কোথায় তারা? বাইরে তখনও টিপ্প-
টিপ্প করে বংশ্টি পড়ছে, বৰ্ষাসন্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রাজ্ঞি বলে, এই
বংশ্টির মধ্যে কোথায় আবার গেল তারা?

মা এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, হ্যাঁ রে, সনৎ কোথায় গেছে জানিস?
তাকে দেখলাম না তার ঘরে?

না তো মা! রাজ্ঞি জবাব দেয়।

চল তো রাজ্ঞি, ওদের ঘর-দুটো একবার ঘূৰে দেখে আসি।

প্রথমেই রাজ্ঞি ও স্বৰ্ত্র এসে সনৎ-এর ঘরে প্রবেশ করল। নিভাঁজ শয়া

দেখে মনে হয় রাত্রে শহ্য স্পর্শ পর্যন্ত করা হয়নি।

হঠাতে সামনের টী-পয়ের ওপর সুরুতর নজর পড়ে, জলের প্লাস্টা চাপা দেওয়া একটা ভাঁজকরা হলুদবর্ণের তুলট কাগজ। সুরুত এগিয়ে এসে কাজগাটা তুলে ঢাখের সামনে মেলে ধরতেই, বিস্ময়ে আতঙ্কে যেন স্তৰ্য হয়ে যায় ও।

সেই প্রমর-আঁকা চিঠি!

নমস্কার। চিহ্ন দেখেই চিনবে। সনৎকে নিয়ে চললাম। ভোরের জাহাজেই বর্মা যাব। ইচ্ছা হলে সেখানে সাক্ষাৎ করতে পার।

—কালো প্রমর

কিরে ওটা? রাজ্য এগিয়ে আসে।

সুরুত চিঠিটা রাজ্যের হাতে তুলে দেয় নিঃশব্দে।

আবার সেই কালো প্রমর! মারিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী! উঃ, কি বোকাটাই সকলকে বানিয়ে গেল! শয়তান! ডিরুগড় থেকে আসীছ, অমর-বাবুর ভাইপো! ধাপ্পারাজ! সনৎদা কি তবে শয়তানটাকে চিনতে পেরেছিল?

গতরাত্রের আগাগোড়া ব্যাপারটার মধ্যে তার এতটুকু উৎসাহও ছিল না। সে যেন এড়াতেই চাইছিল। বলে রাজ্য।

রাগে দৃঃঃথে অনন্দশোচনায় সুরুতর নিজেরই চূল যেন নিজেরই টানতে ইচ্ছে করে।

উঃ, এত বড় আপসোস সে রাখবে কোথায়?

দেওয়ালে টাঙ্গানো ওয়াল-কুকটার দিকে তাকিয়ে সুরুত দেখল বেলা তখন আটটা বেজে পনেরো মিনিট। সাতটা ত্রিপুরে জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। বাইরের দিকে তাকায়। বৃষ্টি থেমেছে, মেঘ-ভাঙ্গা আকাশে সূর্যের আঘাতপ্রকাশ, সিন্ধু-সুন্দর।

এখন তাহলে কি করা যায় বল তো সৎ?

আর দৌরি করা নয়। চল, এখনই গিয়ে আগে তো থানায় একটা ডাইরি করিয়ে আসি!

তাতে কি সুবিধা হবে?

তাহলে অল্পত বেতারে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে একটা সংবাদ দেওয়া যেতে পারে, যদি আজকের জাহাজেই তারা গিয়ে থাকে!

তারপর?

তারপর সামনের শিনিবারে জাহাজে সীট পাই ভাল, না হয় পরের মঙ্গলবার আমাদের রেঞ্জনের জাহাজ ধরতেই হবে, তা যে উপায়েই হোক। শুধু রেঞ্জনে কেল, সনৎদার খেঁজে পৃথিবীর আর এক প্রাণে যেতে হলেও যাব। আমি খেঁজে বের করবই, আর একবার সেই শয়তান-শিরোমুর্ণির সঙ্গে মৃখোমৃখি দাঁড়াব। সে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে, স্কাউন্টেল!

মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন, তোদের চার্জড়িয়ে গেল। পরক্ষণেই ওদের মধ্যের দিকে তাকিয়ে জিজেস করলেন, কি হয়েছে রে?

সুরুত মার হাতে চিঠিটা তুলে দেয়।

চিঠিটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক অক্ষুণ্ট কাতরোক্তি মার কঢ় হতে নির্গত হয়ে আসে, সর্বনাশ! কালো প্রমর!

সুরুত দাঁতে দাঁত চেপে কঠিনস্বরে বললে, হ্যাঁ মা, আবার সেই কালো

প্রমর ! কিন্তু এবার সত্যসাত্যই তার পাপের ভূমি পৃণ্ণ হয়েছে ।

কথবার্তায় আর সময় নষ্ট না করে, কিছু জলখাবার ও চা খেয়ে, রাজ্ঞ ও সুন্দর তাড়াতাড়ি লালবাজারের দিকে ছুটল ।

লালবাজারে গিয়ে সোজা তারা একেবারে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে সব বললে ।

ওদের সমস্ত কথা ঘনোয়েগ সহকারে শুনে সাহেব আবশ্যকীয় সব কথা নেট করে নিলেন এবং বললেন, বাবা, তোমাদের কথা শুনে আমি আশ্চর্ষ ! এ একেবারে miracle (অত্যাশচর্ষ) ! যা হোক, আমি এখনই জাহাজের ক্যাটেনকে বেতারে সংবাদ প্রেরণের সব বন্দোবস্ত করাই ।

সুন্দর লালবাজার থেকে নিষ্কাল্প হয়ে পোষ্ট-অফিসে গিয়ে রেঞ্জনে সি. আই. ডি. ইল্সপেক্টর সিলিন সেনকে একটা ‘তার’ করে দিল—সনৎ সম্পর্কিত সকল ব্যাপার জানিয়ে ।

তারপরই দ্রুজনে গেল জাহাজের বৃক্কি অফিসের দিকে । জাহাজ ছাড়বে শনিবার—পরশুর পরের দিন, এবং সেই জাহাজে দ্রুখানা সীট্ রিজার্ভের সব বন্দোবস্ত করে যখন ওরা বাড়ির দিকে পা বাড়াল, তখন প্রথম রৌপ্যে সারা প্রথিবী যেন বলসে যাছে । কর্মচাল শহরের বৃক্কে অগাধিত নরনারী ও বাস-প্লাট্ফর্মের আনাগোনার শব্দ ।

ফিরতি-পথে ওরা যে রাস্তাটা দিয়ে আসছিল, তার দ্বা পাশে চীনা পাট্টি । সেই চীনা পাট্টি দিয়ে চলতে চলতে একসময় রাজ্ঞ চাপা, গলায় সুন্দরকে বললে: একটা লোক অনেকক্ষণ থেকে আমাদের পিছু নিয়েছে সুন্দর !

সুন্দর পিছনপানে না তাকিয়েই বললে, তাই নাকি ?

অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয় ।

লোকটা কি বাঙালী ?

না, বমী বলে মনে হয় ।

কি করে বুবলে যে লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছে ?

রাজ্ঞ প্রত্যুষের একটা হাসলে মাঝ, তারপর বললে—তুই ভুলে যাচ্ছস বে, একদিন এ দলে আমি বহু ঘোরাফেরা করেছি । শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই আমাদের চিনতে কষ্ট হয় না ।

আচ্ছা ওকে অনুসরণ করতে দে । দেখা যাক, লোকটার দোড় কতদুর পর্যন্ত !

একটা কাজ করলে হয় না ?

কি ?

আয়, শ্যামবাজারের একটা প্লাট্ফর্মে এখন উঠি ; খানিকটা ঘুরে-ফিরে পরে বাড়ি যাওয়া যাবে ।

মন্দ কিং, বেশ তো !

চট্ট করে তারা একটা শ্যামবাজারগামী প্লাট্ফর্মে চেপে বসল ।

* * *

আমহাট স্টৈটের যেখানটায় সুন্দর বাড়ি, তার পিছনে একটা খালি মাঠ । তারই ওপাশে বহুদিনকার একটা চারতলা বাড়ি ।

শোনা যায় এককালে নাকি বাড়িটা ছিল এক মস্ত ধনী ব্যবসায়ীর । ব্যবসায়ী মারা যাবার পর, তার ছেলে যখন সমস্ত অর্থের মালিক হয়ে বসল,

তখন বিপুল অর্থ হাতে পেয়ে তার মনে হল (বেশীর ভাগ লোকের যা হয়), দৰ্দনিয়া তো তারই। এখনকার রাজাই তো সে। স্ফূর্তির প্রোতে গা ভাসিয়ে সে চোখ বুজে আকাশকুসম স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে। আর হতভাগ্য পিতার অহং কষ্টার্জিত অর্থরাশি দৰ্দিনের জন্য তাকে নিয়ে পৃতুল-খেলা খেললে, পরে তাকে হাত ধরে পথের ধূলোয় বসিয়ে কোথায় যেন অদ্শ্য হয়ে গেল।

সন্ধিকের দিনে একদিন যারা ছিল দিবারাত্রি পাশাপাশি বন্ধুর মত, পরমাঞ্জীয়ের মত, সর্বনাশের নেশায় একদিন যারা ছিল তার মুখোশপুরা একনিষ্ঠ বন্ধু, তারাই আজ অচেনার ভান করে অলঙ্ক্ষে বিদায় নিয়ে গেল। কেউ বা যাবার বেলায় দিয়ে গেল শুক্র সহানুভূতির সোনালী হাসি।

যার মুখে একদিন সোনার বাটিতে জমাটবাঁধা দুধ উঠত, আজ তার মুখে ভাঙ্গা কাঁসার বাটিতে জলটুকুও ওঠে না।

সৌভাগ্যের শেলশঙ্গ হতে সে দুর্ভাগ্যের নরককুণ্ডে নেমে এল। এতকাল সে শুধু হেসে-গেরেই এসেছে, আজ তার দু চোখে জল উঠল ছলছলিয়ে।

তারপর অভাবের তাড়নায় অধীর হয়ে একদিন সে নিজের শয়নগহরেই কড়িকাঠের সঙ্গে পরনের কাপড় গলায় দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে এ দৰ্দনিয়া থেকে চিরবিদায় নিল। অভিভাবনে না দৃঃশ্যে কে জানে!

এদিকে একজন ধনী মারোড়াড়ী লোকটার জীবিতকালেই বাড়িখানা কুষ করে নিয়েছিল দেনার দায়ে, কিন্তু ঐ কেনা পর্যন্তই। কারণ বাড়িখানা সে কোন কাজে লাগাতে পারলে না। সমস্ত রাণি ধরে নাকি বৃক্ষুক্ষিত অশৱীরীর দল সারা বাড়িময় হাহাকার করে বেড়াত। লোক এসে একদিনের বেশী দুর্দিন ও বাড়িতে টিকতে পারে না। সারারাত্রি ধরে কানা নাকি সব সময়ে কেঁদে কেঁদে ফেরে। অসহ্য তাদের সেই বৃক্ষভাঙ্গ বিলাপ।

ক্রমে একদিন বাড়িটা জনহীন হয়ে ধীরে ধীরে শেষটায় পোড়ো বাড়ি বা ভূতের বাড়িতে পরিণত হল।

তারপর আজ প্রায় দশ বৎসর ধরে বাড়িটা পড়ে আছে। ভাড়াও কেউ নেয়নি, কুষ করতেও কেউ চায়নি।

সুরুত গভীর রাত্রে ঘৰে শুন্যে শুন্যত, রাতের বাতাসে নির্জন বাড়িটার খোলা আধভাঙ্গা কপাটগুলো বার বার শব্দ করে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। কখনও বা দেখত জ্যোৎস্নারাত্রে চাঁদের নির্মল আলো বাড়িটার সারা গায়ে ছাঁড়িস্তে পড়েছে দৃঃশ্যপোষের মত করণ বিষম্বনে।

সৌদিন গভীর রাত্রে ঘৰ্ম ভাঙ্গতেই সুরুত চমকে উঠল—সেই মাঠের ওপারে পোড়ো বাড়ির জানালার খোলা কপাটের ফাঁক দিয়ে যেন একটা আলোর শিখা দেখা যাচ্ছে। পোড়ো বাড়িতে আলোর শিখা! আশৰ্য কৌতুহলী চোখের পাতা দৃঢ়ো রংগড়ে নিল। তারপর আপন মনে বলল—না, ঐ তো মাঝে মাঝে হাওয়া পেয়ে আলোর শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠেছে!

সুরুত বিছানা থেকে উঠে খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। সহসা এমন নিশ্চীথ রাণির জমাট স্তৰ্যতা ভেদ করে জেগে উঠল একটা তীক্ষ্ণ বাঁশীর আওয়াজ। তারপর আর একটা, আরও একটা; পর পর তিনটে।

আকাশে মেটে-মেটে জ্যোৎস্না উঠেছে। স্বল্প আলো-অঁধারিতে পোড়ো বাড়িটা যেন একটা মৃত্যু-বিভীষিকা জাগিয়ে তুলেছে! চারিদিক নিষ্ঠত্ব। কোথা ও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই। জীব-জগৎ সুস্থির কোলে বিশ্রাম-

সুখ লাভ করছে। দিবাভাগের জনকোলাহল মুখ্যরিত জগৎ যেন এখানকার এই
সত্ত্ব ঘূর্ণত প্রথিবী থেকে দূরে—অনেক দূরে।

এমনি সময়ে হঠাতে পোড়ো বাড়ির দোতলার দক্ষণ দিককার একটা ঘরের
একটা জানালার কপাট খুলে গেল এবং সেই খোলা জানালার পথে একটা টর্চের
সূতৰ আলোর রশ্মি মাঠের ওপর এসে পড়ল।

সুরূতের দূর চোখের দ্রষ্টব্য এবারে তৈক্ষ্য হয়ে ওঠে। রহস্যমন পোড়ো
বাড়ির মধ্যে যেন হঠাতে প্রাণ-স্পন্দন!

ইতিমধ্যে কখন একসময়ে রাজ্ঞ এসে ওর পাশেই দাঁড়িয়েছে সুরূত তা
টেরও পায় নি। হঠাতে কাঁধের ওপর মৃদু স্পর্শ পেয়ে সে চমকে ফিরে তাকাল,
কে? ও রাজ্ঞ!

হ্যাঁ, কিন্তু কি অমন করে দেখছিল বল্তো?

চেয়ে দেখ না। মাঠের ওদিকে ঐ ভাঙা বাড়িটা!...

আলোটা ততক্ষণে নিবে গেছে,—নির্জন মাঠের মাঝে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে
সহসা যেন একটা বিভীষিকার আবছা ছায়া নেমে এসেছে।

তাই তো! নির্জন পোড়ো বাড়িতে হঠাতে কারা আবার এসে হাঁজির
হলেন?—একক্ষণে বললে রাজ্ঞ!

হ্যাঁ, তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক রাজ্ঞ
কি বলছিস?

শিকারী বিড়াল?

হ্যাঁ, তার গাঁওয়ে গম্বুজ পেয়েছি। তারপর হঠাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে
সুরূত বললে, চল, একবার ওদিককার পথটা ঘুরে দেখে আসা যাক।

এই রাতে?

ক্ষতি কি, চল না!

বেশ, চল।

তাড়াতাড়ি গাঁওয়ে একটা শাট চাপিয়ে দেওয়াল-আলমারি থেকে
সিল্ককর্ডের মইটা ও একটা টর্চ নিয়ে সুরূত ও রাজ্ঞ রাস্তায় এসে নামল।

মাথার ওপর রাত্রির কালো আকাশ তারায় ভরা। অস্তমিত চাঁদের আলো
তখন আরো শ্লান হয়ে এসেছে। চারিদিকে থমথমে জমাট রাঁধি, যেন এক
অতিকার বাদুড়ের সুবিশাল ডানার মত ছাড়িয়ে রয়েছে। বড় রাস্তাটা অতিক্রম
করে দৃঢ়নে এসে গাঁলির মাথার দাঁড়াল।

কিরীটী রায়কে মনে পড়ে? সুরূত সহসা একসময় প্রশ্ন করে।

কোন্ কিরীটী রায়?

ঐ সে আমাদের এখানে ফিরে আসার পর প্রীতিভোজের নিম্নলিখিতে
এসেছিলেন? সাড়ে ছয় ফুট লম্বা গৌর বর্ণ, পাতলা চেহারা, মাথাভৰ্তা
কেঁকড়ানো চুল, চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা!

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঐ যে শখের ডিটেক্টিভ, গোয়েন্দাগির করেন,
টালিগঞ্জে না কোথায় থাকেন? যিনি ড্রাগনটা তোর কাছ হতে চেয়ে নিয়ে
গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, নির্জন শখেরই গোয়েন্দাগির! কাকার প্রকাণ্ড কেঁকলে
ল্যাবোরেটোরী আছে। আর সে তাঁর একমাত্র ভাইপো।

ওর নামও তো খুব শৰ্ণিন।

আমাদের পাশের বাড়ির শান্তিবাবুর বিশেষ বন্ধু উনি। তিনিই আমাদের কিরীটীবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা শান্তিবাবুর সঙ্গে কিরীটী-বাবুকেও নিম্নণ করেছিলাম। মনে নেই, কিরীটীবাবু আমাদের সব কাহিনী শনে কি বলেছিলেন? আবার কোন আপদ-বিপদ ঘটলে তাঁকে যেন আগেই খবর দেওয়া হয়। ওর কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিল না। কাল সকালে উঠেই একবার তাঁর ওখানে যেতে হবে, মনে করো।

ইতিমধ্যে ওরা চলতে চলতে দুজনে গালিটার মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে। আর অল্প একটু এগোলেই পোড়ো বাড়িটার পেছনের দরজার কাছে এসে পড়ে। এমন সময় ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্ট শোনা যায়। পরক্ষণেই দুজনের দৃশ্টি পড়ল আবছা আলো-অঁধারে কে একজন তীব্র বেগে সাইকেল চালিয়ে গালির ভিতর দিয়ে ঐদিকেই এগিয়ে আসছে। সাইকেলের সামনের আলোটা টিম্বিম্ব করে জবলছে।

রাজু বা স্বরত সাবধান হয়ে সরে যাবার আগেই সাইকেল-আরোহী হৃদযন্ত করে এসে একেবারে অতর্কিতে রাজুর গায়ের ওপরই সাইকেল সমেত পড়ল।

সরি, আপনার লেগে গেল নাকি? দুঃখিত—

রাজুর পায়ে বেশ লেগেছিল। সে উরুস্বরে বললে, ঐ ভাঙ্গা আলো লাগিয়ে বাইক চালানো! চলুন আপনাকে hand over করে দেব।

আহা, আপনার কোথাও লেগেছে নাকি? কিন্তু আপনিই বা এত রাখে এই চোরাগালির মধ্যে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন কেন?

কেন হাওয়া খেতে বের হয়েছি শুনত চান? বলেই ক্রুশ্র রাজু লোকটার দিকে লাফিয়ে এসে সজোরে লোকটার নাকের ওপরে একটা লোহ-মুষ্ট্যাঘাত করে।

লোকটা অতর্কিত ঐ প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে প্রথমটা বেশ হকচিকয়েই গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে রাজুকে আক্রমণ করল।

কেউ শক্তিতে কম যায় না।

দুজনে জড়াজড়ি করে ঐ সরু গালির মধ্যেই লুটিয়ে পড়ে। স্বরত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ব্যাপারটা কতদুর গড়ায়।

ইঠাঁ এমন সময় তীব্র একটা অস্ফুট ঘন্টাগাকাতের শব্দ করে রাজু এক-পাশে ছিটকে পড়ল।

স্বরতও কম বিস্মিত হয়নি। এক কথায় সে সত্যই হতভন্দ্ব হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে আক্রমণকারী তাড়িৎ বেগে উঠে পড়ে, সাইকেলে আরোহণ করে চালাতে শুরু করেছে।

রাজু যখন উঠে দাঁড়াল, সাইকেল-আরোহী তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

স্বরত এগিয়ে এসে বলে, কি হল রাজু?—

কিরীটী রাম

রাজ্য বন্দগায় কাতর ক্লিট স্বরে জবাব দিল, হাতের পাতায় কি যেন ফুটল
স্বৃত।

স্বৃত পকেট থেকে টর্টো বের করে বেতাম টিপল। কিন্তু আশ্চর্য,
হাতের পাতায় কিছুই তো ফোর্টেন! কিছু বিশ্বেও নেই, এমন কি এক-
ফোটা রক্ত পর্যন্ত পড়েন। হাতটা ভালো করে টর্চের আলোয় ঘূরিয়ে দেখা
হল—কোন চিহ্নই নেই। অথচ রাজ্যের হাতের পাতা থেকে কনুই পর্যন্ত বিষ-
বিম্ব করছে অসহ্য বন্দগায়। যেন অবশ হয়ে আসছে হাতটা।

কই, কিছু তো তোমার হাতে ফুটেছে বলে মনে হচ্ছে না! কিছুই তো
দেখতে পাইছ না! স্বৃত বলে।

কিন্তু মনে হল হাতে যেন কি একটা ফুটল, ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মাথা
পর্যন্ত বিষ-বিম্ব করে উঠেছে, এখনও হাতটায় যেন কোন জোর পাইছ না।
বললে রাজ্য।

চল ফেরা যাক। স্বৃত আবার বলে।

কিন্তু ঐ বাড়িটা দেখবি না? যে জন্য এলাম!

না, কাল সকালের আলোয় ভাল করে একসময় এসে বাড়িটা না হয় খৌঙ্গ
করে দেখা যাবে। কিন্তু আমি ভাবছি ঐ সাইকেল-আরোহী লোকটা কে?
কেনই বা এ পথে এসেছিল? লোকটা আচমকা এ পথে এসেছে বলে তো
মনে হয় না। ও নিশ্চয়ই আমাদের ফলো করেই এসেছিল।

যা হোক দৃঢ়নে আপাতত বাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

রাতের আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। শেষ রাতের আঁধার তরল ও স্নান
হয়ে এসেছে। নিশ্চেষের ঠাণ্ডা হাওয়া বিরাসির করে বয়ে যাব। রাজ্য আর
স্বৃত বাড়ি ফিরে এসে নিজেদের ঘরে প্রবেশ করে শয্যায় আশ্রয় নিল এবং
শীঘ্ৰই দৃঢ়নের চোখের পাতায় ঘূৰ জড়িয়ে আসে।

স্বৃতের যথন ঘূৰ ভাঙল, রাজ্য তখনও ঘূৰিয়ে।

পূৰ্ব রাত্রের ব্যাপারটা স্বৃতের একে একে নতুন করে আবার মনে পড়ে।
আজই একবার কিরীটীবাবুর ওখানে যেতে হবে। চাকরকে ডেকে চা আনতে
বলে স্বৃত বাথৰুমের দিকে পা বাঢ়াল।

বাথৰুমে ঢুকে ঝর্ণা নলটা খুলে দিয়ে স্বৃত তার নীচে মাথা পেতে
দাঁড়াল। বাঁবিৱির অজস্র ছিদ্রপথে জলকণাগুলো বিৱিৰিৰ করে সারা গায়ে ও
মাথায় ছাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। স্বৃত সমস্ত শরীৰ দিয়ে স্নানটা উপভোগ
কৰল। অনেকক্ষণ ধৰে স্নান কৰার পৰি শৱীৱাটা বেশ ঠাণ্ডা হল। পূৰ্বৰাত্রে
জাগৱণ-ক্রান্তি যেন অনেক পৰিমাণে কমে গেছে।

ভিজে তোয়ালেট গায়ে জড়িয়ে সোজা রাজ্যের কক্ষে এসে স্বৃত দেখে
রাজ্য হাতের মুঠো মেলে কি যেন একটা একাগ দ্রষ্টিতে দেখছে।

স্বৃত বললে, কি দেখছ অত মনোৰোগ দিয়ে?

ରାଜ୍ୟ ସେ କଥାର କୋନ ଜବାବ ନା ଦିଯେ ନିଃଶବ୍ଦେ ଏକଟା କାର୍ଡ ସ୍ଵର୍ତ୍ତର ଦିକେ
ତୁଲେ ଧରେ ।

କାର୍ଡଟାର ଗାସେ କାଳି ଦିଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରେ ଲେଖା—

‘କାଳେ ଭ୍ରମରେ ହୂଲ, ଏମନ ମିଣ୍ଟ-ମଧ୍ୟର । କେମନ ଲାଗଲ ବନ୍ଦୁ !
କୋଥାର ପେଲେ ଏଟା ? ସ୍ଵର୍ତ୍ତ ଶୁଧ୍ୟାଳ !

ରାଜ୍ୟ ବଲଲ, ଜାମାର ପକେଟେ ଛିଲ ଏଟା ।

କାର୍ଡଟା ରାଜ୍ୟର ହାତ ଥିକେ ଟାନ ହେରେ ନିଯେ ରାସତାଯ ଫେଲେ ଦିତେ ଦିତେ
ସ୍ଵର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କିଲାଭରେ ବଲଲେ, ବଡ଼ ଆର ଦେରି ନେଇ, ହୂଲର ଥୋଁଚା ହଜର କରିବାର
ଦିନ ଏଗିଯେ ଏଲ । ଚଲ ଚଲ, ଏକବାର ଟାଲିଗଙ୍ଗେ କିରାଟୀବାବୁର ଓଥାନେ ଯାଓଯା
ଯାକ । ଏଇ ପର ଗେଲେ ହସତୋ ଆବାର ତାଙ୍କେ ବାଢ଼ିତେ ନାଓ ପାଓଯା ଯେତେ ପାରେ ।
କିନ୍ତୁ ଆମି ଭାବିଛି, ଓରା ଜାନଲେ କି କରେ ସେ ଅତ ରାତେ ଆମରା ଗଲିପଥେ
ଯାବ ?

ଚର ଆଛେ ସର୍ବତ୍ର, ସାରା ହସତୋ ସର୍ବଦା ଆମାଦେର ଓପର ନଜର ରେଖେଛେ—ଏ କି,
ତୁଇ ସେ ମ୍ନାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରେ ଫେଲେଇଛି ! ରାଜ୍ୟ ବଲେ ।

ହଁ, ଶରୀରଟା ବଡ଼ କ୍ଲାନ୍ଟ ମନେ ହଞ୍ଚିଲ ।

ତବେ ଦାଁଡ଼ା, ଆମିଓ ମ୍ନାନଟା ମେରେ ନିଇ ଚଟ୍ କରେ ।

* * *

ଟାଲିଗଙ୍ଗେ ସଂଦର ଏକଥାନା ଦୋତଳା ବାଢ଼ି । ମେଇ ବାଢ଼ିଖାନିଇ କିରାଟୀ
ରାଯେର ।

କିରାଟୀ ରାଯ

ରହମାନ୍ଦେବୀ

ଦ୍ଵିତିଲ ବାଢ଼ିଖାନ ବାଇରେ ଥିକେ ଦେଖିତେ ସତାଇ ଚମକାର, ଆଧ୍ୟନିକ
ପ୍ଯାଟାର୍ନେର ନନ୍ଦ, ପ୍ରାରମ୍ଭନ ସ୍ଟାଇଲେ ସବ୍ରଜ ରଙ୍ଗେର ବାଢ଼ିଖାନ ।

ବାଢ଼ିର ସାମନେ ଛୋଟ ଏକଟା ଫ୍ଲେଫ୍‌ଜ ତାରିତରକାରିର ବାଗଚା । ଓପରେ ଓ
ନାଚି ସବସମେତ ବାଢ଼ିତେ ଚାରିଖାନି ମାତ୍ର ଘର । ଓପରେର ଏକଖାନିତେ କିରାଟୀ ଶୟନ
କରେ, ଏକଟିତେ ତାର ରିସାର୍ ଲ୍ୟାବୋରେଟରୀ । ନାଚି ଏକଟାଯ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ଆର
ଏକଟାଯ ବୈଠକଥାନା ; ତିନଙ୍ଜନ ମାତ୍ର ଲୋକ ନିଯେ ସଂସାର—କିରାଟୀ ନିଜେ, ଏକଟା
ଆଧାବମସୀ ନେପାଲୀ ଚାକର—ନାମ ତାର ଜଂଲୀ ଓ ପାଞ୍ଜାବୀ ଶିଖ ଡ୍ରାଇଭାର ହୀରା
ସିୟ ।

ଭୃତ୍ୟ ଜଂଲୀର ସଥନ ମାତ୍ର ନ ବହର ବସ, ତଥନ ଏକବାର କାର୍ଶିଯାଂ ବେଡ଼ାତେ
ଗିରେ କିରାଟୀ ତାକେ ନିଯେ ଆମେ ।

ମା-ବାପ-ହାରା ଜଂଲୀ ଏକ ଦୂର-ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉସୀଯର କାହେ ଥାକତ । ମେବାରେ
କିରାଟୀ ସଥନ କାର୍ଶିଯାଂ ବେଡ଼ାତେ ଗେଲ, ତଥନ ସବ ସମରେ ତାର ଛୋଟଖାଟୋ ଫାଇ-
ଫରମାଶ ଖାଟିବାର ଜନ୍ୟ ଏକଟା ଅଳ୍ପ ବସରେ ଚାକରେର ଥୋଁଜ କରତେଇ ତାର ଏକ ବନ୍ଧୁ
ଜଂଲୀକେ ଏନେ ଦେଇ ।

ଦୀର୍ଘ ପାଇଁ ମାସ କାର୍ଶିଯାଂ-ଏ କାଟିଯେ କିରାଟୀ ସେଇଦିନ ଫିରେ ଆସିବେ,
ଜଂଲୀକେ ମାହିନା ଦିତେ ଗେଲେ ମେ ହାତ ଗୁଡ଼ିଟେ ଏକପାଶେ ସରେ ଦାଁଡ଼ିରେ ମାଥା
ନୀଚ୍ବ କରିଲେ । ତାକେ ଐ ଅବସ୍ଥାର ଦାଁଡ଼ାତେ ଦେଖେ କିରାଟୀ ସନ୍ଦେହେ ଶୁଧ୍ୟାଳ, କି
ରେ ? କିଛି ବଲାବ ଜଂଲୀ ?

ଜଂଲୀ କୋନ ଉତ୍ତର ନା ଦିଯେ ଚାପ କରେ ଦାଁଡ଼ିରେ ଥାକେ ।

କିରାଟୀ ବଲେ, ହଁ ରେ, କିଛି ବଲାବ ?

জংলীর মনে এবার বুঝি আশা জাগে, তাই ধীরে ধীরে মৃখটা তোলে।
তার চোখের কোল দৃষ্টি তখন জলে উব্রচুব্র।

কি হয়েছে রে জংলী?

বাবুজী! আর কি আপনার চাকরের দরকার হবে না?

ও এই কথা!

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা যেন কিরীটীর কাছে জলের মতই পরিষ্কার হয়ে
যায়। হাসতে হাসতে বলে, তোর দেশ, তোর আঘাতীয়স্বজন—এদের সবাইকে
ছেড়ে তুই আমার কাছে কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারিব?

চোখের কোলে অশ্রূমাখা হাসি নিয়ে খুশীর উচ্ছলতায় গদ্গদ হয়ে জংলী
জবাব দেয়, কেন পারব না বাবু, খুব পারব। আর এখানে থেকে আমি কি
করব। এখানে আমার কেই বা আছে। মা-বাপ তো আমার কর্তব্য হল মারা
গেছে। আমার তো কেউ নেই।...শেষের দিকটা বালকের কণ্ঠস্বর কেমন যেন
জড়িয়ে যায়।

তাই কাশ্র্যাং ছেড়ে আসবার সময় কিরীটী জংলীকে তার আঘাতীয়দের
কাছ হতে চেয়ে নিয়ে আসে। তারাও ঘাড়ের বোৰা নামল ভেবে স্বস্তির
নিঃশ্বাস ফেলল।

সে আজ দীর্ঘ সাত বছর আগের কথা। এখন জংলীর বয়স ঘোল বৎসর।
সে এখন বালিষ্ঠ শুধু; কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই ছায়ার মত ঘোরে সে।
অনেক সময় কিরীটীর সহকারী পর্যন্ত হয়। যেমনি বিশ্বাসী তেমনি
প্রভুত্ব।

পাহাড়ের দেশ থেকে কুড়িয়ে আনা অনাথ বালক, স্নেহের মধ্যস্পর্শ
পেয়ে আপনাকে নিঃস্ব করে বিলিয়ে দিয়েছে। মানুষ বুঝি অর্মানই স্নেহের
কাঙাল!

*

*

*

সৌদিন সকালবেলায় একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে কিরীটী সৌদিনকার
দৈনিনিকটার ওপর চোখ বুলোচ্ছল। এখন সময় পরিষ্কার চিবতীয় পাতায় বড়
বড় হেঁড়িয়ে ছাপা সনৎ-এর উধাও হওয়ার সংবাদটা তার চোখে পড়ল।

কিরীটী কাগজের লেখাগুলোর উপর সাগ্রহে ঝুকে পড়েছে, ঠিক এমনি
সময়ে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ তার কানে এসে বাজল। জুতোর শব্দ আরোও
ঝিয়ে একেবারে দরজার গোড়ায় এলে কাগজ হতে মুখ না তুলেই হাসিমুখে
সংবর্ধনার সুরে বললে, আসুন সুরতবাবু! আমি জনতাম আপনি আসবেন,
তবে এত শীঘ্ৰ—বলতে বলতে কিরীটী হাঁক দিলে, জংলী, বাবুদের চা
দিয়ে যা।

কিরীটী রায়ের কথা শুনে, সুরত ও রাজু যেন হতবাক হয়ে গেছে।
লোকটা কি সবজান্তা, তা না হলে না দেখেই জানতে পারে কি করে কে
এল!

প্রথমটায় যে কি বলবে তা ওরা যেন ভেবেই পেলে না! বিশ্বয়ের ভাবটা
কাটবার আগেই কিরীটী কাগজের ওপর হতে চোখ সরিয়ে নিয়ে ওদের দিকে
মুখ ফিরিয়ে বলল, নমস্কার সুরতবাবু, রাজেনবাবু, আরে দাঁড়িয়েই রাইলেন
যে! বসন্ত বসন্ত।

দৃঢ়নে এগিয়ে এসে দৃঢ়নানা সোফা অধিকার করে বসল।

তারপর হঠাৎ এই সকালেই কি খবর বলুন শৰ্দিন? কিরীটী রায় সাগহে শুধায়। সোফার ওপর বসতে বসতে সুরুতই বলে, বলছি, কিন্তু তার আগে বলুন তো, কেমন করে আমাদের না দেখেই ব্যবালোন যে আমরাই এসেছি! আপনি কি পায়ের শব্দেই লোক চিনতে পারেন নাকি?

কিরীটী মদ্দ হেসে বাল, কতকটা হ্যাঁও বটে, আবার নাও বটে। এইমাত্র খবরের কাগজ খুলতেই চোখে পড়ল সন্ধিবাবুর গায়ের ইওয়ার চাণগল্যকর সংবাদ। আর আপনাদের সঙ্গে তো আমার কথাই ছিল, আবার কোন রকম গোলমাল হলে আপনারা দয়া করে আমাকে একটু খবর দেবেন। সহজ নিয়মে দ্বিয়ে দ্বিয়ে চার কষে ফেলতে দেরী হয়নি। এত সকালে জাতোর শব্দ পেয়ে প্রথমেই তাই আমার আপনাদের কথাই মনে পড়ল, আর সেই আল্দাজের ওপরে নির্ভর করে আপনাদের অভার্থনা জানিয়েছি এবং আপনারাও ষথন আমার অভার্থনা শুনে চূপ করে রইলেন, তখন আমি স্থিরনির্ণিত হলাম, আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি।

চমৎকার তো—রাজু বললে।

না, এর মধ্যে চমৎকারের বা আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কতকটা সত্য, কিছুটা যিথে আর বাকিটা অনুমান—এই রীতির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের কাৰ্যপদ্ধতি। বলতে পারেন কমন্সেন্স-এর মারপ্যাঁচ মাত্র। একজন শয়তানকে তার দৃঢ়কর্মের স্তৰ ধরে খুঁজে বের করা এমন বিশেষ কিছু একটা কঠিন বা আজব ব্যাপার নয়। দৃঢ়কর্মের এমন একটি নির্খণ্ট স্তৰ সর্বদাই সে রেখে যায় যে, সে নিজেই আমাদের তার কাছে টেনে নিয়ে যায় সেই স্তৰপথে। এ সংসারে পাপ-পুণ্য পাশাপাশি আছে। পুণ্যের প্রস্কার ও পাপের তিরস্কার—এইটাই নিয়ম। আজ পর্যন্ত পাপ করে কেউই রেহাই পায়নি। দৈহিক শাস্তি বা দশ বছর জেল হওয়া অথবা স্বীপালত যাওয়াটাই একজন পাপীর শাস্তিভোগের একমাত্র নির্দশন নয়; ভগবানের মার এমন ভীষণ ষে যাবজ্জীবন স্বীপালতও তার কাছে একান্তই তুচ্ছ। বিবেকের তাড়নায় মানুসিক ঘন্টায় চোখের জলের ভিতর দিয়ে তিল তিল করে ষে পরিতাপের আঘাতান্বিত বারে পড়ে, তার দাঃসহ জুলায় সমস্ত বুকখানাই যে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। স্থুল চোখে আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই না বটে, কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্বটাই একেবারে অস্বীকার করে উড়িড়িয়ে দেবার ক্ষমতাই বা আমাদের কোথায় বলুন? গায়ের জোরে সব কিছুকে অস্বীকার করতে চাইলেই কি মন আমাদের সব সময় প্রবোধ মানে সুরুতবাবু?

হয়তো সব ময় মানে না।

হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। আচ্ছা যাক সে-কথা: তারপর আগে সব বাপারটা খুলে বলুন তো, শোনা যাক।

সুরুত তখন ধীরে ধীরে এক এক করে সমস্ত বাপারটাই খুলে বলল।

সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে কিরীটী কিছুক্ষণ পর্যন্ত চূপ করে বসে রইল, তারপর সোফা থেকে উঠে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারার করতে করতে বললে, হ্যাঁ, জাহাজে দৃঢ়টো সীটি তো রিজার্ভ করেছেন। আরও দৃঢ়টো সীটি রিজার্ভ করুন সুরুতবাবু। পরশু সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়ছে তা হলে, কি বলেন? কিন্তু আমি ভাবছি, লোকটা আপনাদের চোখে বেশ স্বচ্ছন্দেই ধূলো দিয়ে গেল; আপনারা টেরও পেলেন না?

সুরত বললে, বনমালী বসু তো ?

না, কালো ভূমি স্বয়ং ।

হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি, বনমালী বসুই স্বয়ং কালো ভূমি ।

না, বনমালী বসু কালো ভূমি নয় ।

সে নয় ! তবে ?

আপনাদের পোড়ো বাড়ির সামনে শিকারী বিড়ালই স্বয়ং কালো ভূমি ।
কি করে এ কথা আপনি বুঝলেন ?

পরে বলব, তবে বনমালী বসুও কালো ভূমিরের দলের লোকই বটে এবং
সে বিষয়েও কোন ভুল নেই । এতে করে এও প্রমাণিত হচ্ছে যে তারা আট-
ষাট বেঁধেই কাজে নেমেছে এবারে । অবশ্য বনমালী বসুর কথাবার্তাতেই
আপনাদের বোৰা উচিত ছিল, অনেক কিছু অসঙ্গতি তাঁর কথার মধ্যে আছে,
ভদ্রলোক ডিব্রুগড়ে বসেই সি. আই. ডি.-র ‘তার’ পেঁয়েছিলেন মাত্র দিন দশেক
আগে, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ডিব্রুগড়ে বসে ‘তার’ পেঁয়ে, গ্রানিকার
রেঞ্জানের সংবাদপত্রের কাটিংটা পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে !
সলেহ তো গ্রিখানেই ঘনীভূত হয়ে গুঠে ।

আশচর্য, এটা কিন্তু আমাদের আপদেই মনে হয়নি ! বলে সুরত ।

না হওয়াটাই স্বাভাবিক ।

এরপর সুরত ও রাজু কিরীটীর নিকট বিদায় নিয়ে রাস্তায় এসে নামল ।

॥ ৫ ॥

১৪ নম্বরের হানাবাড়ি

লিপিপ্রহরের প্রথর রোদ্বে সমস্ত শহরটা ঝাঁঝাঁ করছে । প্রচণ্ড তাপে রাস্তার
পিচ নরম হয়ে উঠেছে । একটা অস্বাভাবিক উষ্ণতা অনুভূত হয় । প্রায়-বাস-
গুলো খড়খাড়ি এঁটে যে যার গন্তব্যপথে ছুটেছে । রিঙ্গাগুলো ঠঁঠঁ ঠঁঠঁ আওয়াজ
করে লিপিপ্রহরের রোদনদফ্ন নিষ্ঠত্বতা ভঙ্গ করছে ।

সুরত দরজা-জানালা এঁটে মেঝেয় একটা মাদুর পেতে তার উপর রেঙ্গনের
একটা ম্যাপ প্রস্তাবিত করে ঝুঁকে পড়ে দেখেছিল, এমন সময় বাইরে কড়ানাড়ার
শব্দ পাওয়া গেল । রাজু পাশেই শূরে দীর্ঘ নাক ডাকছে । এত গ্রীষ্মেও
তার ঘূর্মের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না ।

সুরত চোখ ফিরিয়ে নিম্নভূত রাজুর দিকে একবার চাইল, তারপর
উঠে দরজা খুলবার জন্য ঘর হতে বেরুল ।

তখনও সদর দপ্তরে কড়ানাড়ার শব্দ হচ্ছে খট-খট-খট । দরজা খুলতেই
ও দেখলে সামনে দাঁড়য়ে একজন এদেশীয় উৎকলবাসী ।

কি চাই ? সুরত লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ।

দণ্ডবৎ । রাজেনবাবুড়ি গালি কেঁচিটি পাড়ির বাবু ? মতে নৃতন কটক
হইতে আইছিন্ত । কলকাতার শহর এমতি সে যদি কিম্বতি জানিব ? অঃ,
গোটা শহর কত ঘূরিল ; ঘূরিতে ঘূরিতে এক বাবু বলি দিলা, গুটে রাজেন-
বাবুর গলি এক রাস্তা অছি বটে ; আমহার স্টাইটের ধারে ।

সুরত একদলে শ্রীমান् উৎকলবাসীর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। লোকটা লম্বায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। চোখ দুটো উজ্জ্বল—বাক্-বাক্ করছে অসাধারণ বৃদ্ধির দীপ্তিতে, ছাট ছেট করে কদম্ব-ছাট চূল। জ্বলিপিটাকে খুর দিয়ে কার্মরে একেবারে রগ পর্যন্ত তোলা হয়েছে। একটা গোলাপী রংয়ের জাপানী সিঙ্কের জামা গায়ে, বহুদিনের ব্যবহারে তেলচিট্টচিটে হয়ে কেমনতর ঘেন হয়ে উঠেছে। পরনে একটা ন্যূন চওড়া লালপাড় কোরা ধূতি। গলায় একটা পাকানো চাদর গিঁট দেওয়া, কতকালের ময়লা যে তার ভাঁজে জমে উঠেছে, সঠিক নির্ণয় করাটা একান্তই দুষ্কর। মুখে একগাল পান; দুই কয়ের কোলে পানের রস ও সুর্পারির গুড়া আটকে রয়েছে। বগলে পুরাতন একখানি ছাতা ও বাঁহাতে বটুয়া।

তোর নাম কি? সুরত শ্বাস।

শ্রীল শ্রীমান্ জগন্মাথ।

এই বাঁধারের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলেই ডান দিকে যে সরু গাল সেটাই রাজেনবাবুর গাল।

দণ্ডবৎ! বলে জগন্মাথ চলে গেল।

সুরত লক্ষ্য করলে লোকটা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। লোকটাকে যতক্ষণ দেখা যায় সুরত বেশ ভাল করেই দেখল। তারপর যখন সে দ্রুতের বাইরে চলে গেল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে চলে গেল। মনে মনে কিন্তু জগন্মাথের কথাই ভাবছিল।

* * *

গত রাত্রের সরু গালিপথ ধরে সুরতর নির্দেশমত অবশেষে জগন্মাথ ১৮নং বাড়ির পিছন দিককার ভাঙা দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল। এইটাই সেই পোড়ো বাড়ি। দু-একবার শ্বেন দ্রুতিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বাঁড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ল চট্ট করে।

আগেই বলেছি বাঁড়িটা বহুদিনকার। দেওয়ালে দেওয়ালে চূম্বালি ঝরার সময়োহ। ইঁটগুলো দেওয়ালের গায়ে গায়ে বিশ্রিভাবে বেরিয়ে পড়েছে। জানালার কপাটগুলো খিলানের গায়ে কোথাও অর্ধ-ভগ্ন, কোথাও বা জর্জীরিত হয়ে ঝুলছে—মাঝে মাঝে বাতাসের ধাক্কায় এদিক-ওদিক নড়ে ওঠে। জগন্মাথ সামনের একটা দরদালান পার হয়ে একতলার উঠোনের সামনে এসে দাঁড়াল।

উঠোনের সিমেন্ট চটে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেছে, তার মাঝে মাঝে শ্যাওলা জাতীয় আগাছাগুলো গাজিয়ে উঠেছে। উঠোনের ওধারে একই ধরনের গোটা পাঁচ-ছয় ঘর সারিবন্ধ ভাবে আছে। কোনিটির কপাট বন্ধ, কোনিটির কপাট হাত্তা করছে—একেবারেই খোলা। জগন্মাথ এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। বারান্দায় দক্ষিণের কোণ ঘেঁষে দোতলায় ওঠবার সির্পড়। সহসা দোতলার বারান্দায় কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা ঝমে জোরাই শোনা যাচ্ছে। কে যেন দুর্ম দুর্ম করে সির্পড়পথেই নেমে আসছে।

জগন্মাথ চট্ট করে সির্পড়ির পাশের একটা বড় থামের পেছনে সরে দাঁড়াল। কে যেন সির্পড় দিয়ে নামছে, তারই শব্দ। জগন্মাথ কান পেতে রইল। থামের আড়ালে থেকে সে দেখলে, আধাৰয়সী একজন বেঁটেমত লোক নেমে আসছে সির্পড় বেয়ে। লোকটার গায়ে একটা সাধারণ বার্মিজ কোট। মাথায় একটা ফেজ। লোকটির একটা পা কাঠের ক্লাচ। সে

সিঁড়ি বেয়ে নেমে কাঠের পায়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে করতে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলল এবং ধীরে ধাঁড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

আকাশে বোধ হয় মেঘ করেছে। মেঘের আড়ালে সূর্য গেছে দেকে, তাই অবেলাতই নেমে এসেছে অন্ধকারের একটা ধূসর ছায়া সর্বত্ত। বাঁড়ির ভিতরটা হয়ে উঠেছে আরো অস্পষ্ট।

জগমাথ পা টিপে টিপে ওপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। সিঁড়ির ধাপগুলো প্রশস্ত হলেও ভেঙে ক্ষয়ে গিয়ে একেবারে ইঁট সব বের হয়ে পড়েছে। জগমাথ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। সামনেই একটা প্রশস্ত টানা বারান্দা। এখানটাও আবছা মেঘে ঢাকা আলোয় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেঘের আকাশে বোধ হয় বিদ্যুৎ চমকে গেল, মৃহূর্তের জন্য আবছা অন্ধকারের বুকে একটা হঠাতে আলোর তেড় তুলে। জনহীন এই বাঁড়িটার সর্বাঙ্গে যেন একটা পুরু ধূলোর আস্তরণ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধূলোবালির কেমন একটা তীব্র কটু গন্ধ নামারন্ধকে পৰ্যাপ্ত করে তোলে।

দোতলায় বারান্দার জমাট ধূলোর ওপরে ইতস্তত ছাঁড়িয়ে আছে বহু পদচিহ্ন। পদচিহ্নগুলো অল্পদিনের বলেই মনে হয়। বর্তমানে যে এই জনহীন পোড়ো বাঁড়িতে অনেকের নিয়মিত আনাগোনা শুনুন হয়েছে, সেটা বুঝতে কারূরই বিশেষ তেমন কষ্ট হবে না। জগমাথ তার তৈক্ষ্য অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে—একটু আগে কাঠের ফাচের সাহায্যে যে লোকটা নীচে নেমে গেল, কে ও? কি জনহীন ব্য এখানে এসেছিল?

লোকটা নিন্মশ্রেণীর—তার বেশভূতা চালচলন থেকেই বোৰা যায়।

বাইরে বোধ হয় টিপ টিপ করে বৃষ্টি নামল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে-মুখে এসে ঝাপটা দেয়।

সহসা একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ জগমাথের কানে এসে প্রবেশ করে।

অতি সতর্ক জগমাথের শ্রবণেন্দ্রিয় মৃহূর্তে সজাগ হয়ে ওঠে।

মৃদু গোঙানির শব্দ না? হ্যাঁ, এ তো অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে!

বৃষ্টিটা কি এবারে জোরেই নামল এ সময়!

আবছা আলোছায়ার মধ্যে সেই গোঙানির শব্দটা যেন আরও সুস্পষ্ট হয়ে হানাবাঁড়ির রক্ষে-রক্ষে বৃক্ষ অশৱীরীর বুক-ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাসের মতই মনে হয়। সহসা এমন সময় পাশ থেকেই ফিস-ফিস করে একটা অস্পষ্ট চাপা কষ্টস্বর জগমাথের কানে এল। চট্ট করে সিঁড়ির কপাটের আড়ালে সরে এল সে এবং সেখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পেল কে যেন বলছেঃ না, কর্তার হকুম। আগামী শনিবারের পরের শনিবারের মধ্যে যেমন করেই হোক ও তিন বেটকেই ওখানে হাজির করাতে হবে। শির জামিন দিয়ে এসেছি।

আরে বাবা, এ তো তোমার মগের মূলক নয় যে যা খুঁশ তাই করবে। এদিকে এক বেটা 'ফেড' জুটেছে কিরীটী রায়। বাছাধন শৰ্ণিন নাকি আবার শখের টিকটাক।

কিরীটী রায়? লোকটা কিন্তু খুব সুবিধের নয় বলেই শুনেছি। তা সে কথা থাক্। দেখ একটা সন্দেহ আমার মনে জাগছে, কর্তা ও যেন এখানে অসেছেন। তবে এ আমার অনুযান মাত্র।

ଅନୁମାନ କେନ ? ସତ୍ୟଓ ତୋ ହତେ ପାରେ !

ଅସମ୍ଭବ କିଛୁଇ ନେଇ । ଉଠିଲେ କୋଥାଯି କି ଭାବେ ଯାନ ତୋ ବୋର୍ବାଇ ଦାଯା । ଉଃ, ସେବାର ପାଶାପାଶ ଏକ ହୋଟେଲେ ସାରାରାତ କାଟିଯେବେ ଟେର ପାଇନି ଯେ କର୍ତ୍ତା ଆମାର ପାଶେଇ ଆଛେ । ନିଜେଇ ସଥନ ଧରା ଦିଲେନ, ଚମକେ ଉଠିଲାଗ । ସେ କଥା ଧାକ, ପରଶୁର ଜାହାଜେଇ ତୋ ଯାଓୟା ଠିକ୍ ?

ଏଥନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ତାଇ ଠିକ୍ ଆଛେ, ତବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଥାକାର ଜଳ କୋଥାଯି ଗିଯେ ଦାଁଡାଁଯ, କେ ବଲତେ ପାରେ ବଳ୍ ?

ଏମନ ସମୟ ଆବାର ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋର୍ଣ୍ଣିନିର ଶବ୍ଦଟା ଶୋନା ଗେଲ ।

ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ବଲଲେ, ନାଃ, ବେଟୋ ଜବଲାଲେ ଦେଖିଛି ! ଆର ଛାଇ ବର୍ମା-ମୂଳକେଇ ବା ଟେନେ ନିଯେ ଲାଭ କି ? ଏଥାନେ ଶେଷ କରେ ଦିଲେଇ ତୋ ହୟ, ସତ ସବ ଝାମେଲା ! କଞ୍ଚେ ବେଶ ବିରକ୍ତିର ବାଁଜ ।

ଜୀବିନ୍ ତୋ, କର୍ତ୍ତା ଖୁନୋଥୁନିର ବ୍ୟାପାରଟା ତେମନ ପଛନ୍ଦ କରେନ ନା ! ଜୀବିନ୍ ତୋ !

କିନ୍ତୁ ପରେ ଠେଲା ସାମଲାବେ କେ ? ଆଜ ରାତ୍ରି ଆଟଟାଯ ଆମାଦେର ଆଙ୍ଗାରୀ ଯାବାର କଥା । ସେଥାନେ କାଜେର ଫିରିରିଷ୍ଟ ସବ ଠିକ୍ ହବେ । ଏଥନ ଚଳ୍ ସେଦିକେଇ ଯାଓୟା ଯାକ ।

ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବାବେ ବଲଲେ, ତୁଇ ଏଗିଯେ ଯା । ସେଇ ଚୀନାପାର୍ଟିର—ନଂ ବାଡ଼ି-ଟାତେଇ ତୋ ? ଆମି ଏକଟୁ ପରେ ଯାଇଛ ।

ହ୍ୟା, ହ୍ୟା ।

କଥା ଶେଷ ହତେଇ ଲୋକଟା ଏଗିଯେ ଆସେ । ଜଗନ୍ନାଥ ସେଥାନେ ଦାଁଡିରେଛିଲ ଲୋକଟା ସେଦିକେଇ ଆସଛେ ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକବାରେ ଦେଯାଲ ସେଂଧେ ନିଃବାସ ବନ୍ଧ କରେ ଦାଁଡାଳ । ପୋଡ଼ୋ ବାଢ଼ିତେ ସାଁବେର ଅଂଧାରଟା ଯେନ ଥରେ ଥରେ ଚାପ ବେଂଧେ ଉଠେଇ ତଥନ ଚାରିଦିକେ ।

ବହୁଦିନକାର ବନ୍ଧ ଆବହାୟାର ବିଶ୍ରୀ ଏକଟା ଭ୍ୟାପସା ଦ୍ଵାରା ନିଃବାସ ଯେନ ଦର ବନ୍ଧ ହେଁ ଆସତେ ଚାଯ ।

ଜନହୀନ ହାନାବାଡ଼ିର କଟିନ ମୌନତା ଯେନ ସେଇ ସମ୍ବ୍ୟାର ଅଂଧାରେ ଏକ ଅଶରୀରୀ ବିଭାୟିକାର ମାୟାଜାଲ ରଚନା କରେଇ ଚାରିଦିକେ । କାଦେର ଅଶ୍ରୁତ ଚାପା ଖ୍ୟାସ-ପ୍ରଶ୍ବାସେର ଶବ୍ଦ ଯେନ ଅଂଧାରେର ଗାୟେ ଗାୟେ ବେଂଧେ ଉଠେଇ । ବାତାସ ନେଇ । ଏମନ କି ଚତୁଃସିମ୍ବୟାର ନେଇ ଏକବନ୍ଦୁ ଆଲୋ । ଅଭିଶପ୍ତ ପୂର୍ବୀ... ।

ଲୋକଟା ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋନ ପଥେ ଗେଲ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝାତେ ପାରଲେ ନା । ଆରା କିଛିକଣ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇକିମ୍ବଳେ ଦେଖିବାର ଆଓୟାଜ ଆସାଇଲ, ନିଃଶବ୍ଦେ ପା ଟିପେ ଟିପେ ସେହିଦିକେଇ ଏଗିଯେ ଚଲିଲ । ଖାନିକ ଦର ଏଗୋତେଇ ଦେଖା ଗେଲ, ଅଦ୍ବରେ ଏକଟା ଘରେର ଭେଜାନେ କପାଟେର ଫାଁକ ଦିଯେ ଏକଟୁ-ଖାନି ଅକ୍ଷପଣ୍ଟ ଆଲୋର ଆଭାସ ପାଓୟା ଯାଇଁ । ସଂତପଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଗିଯେ ଗିଯେ କପାଟେର ଫାଁକେ ଚୋଥ ଦିଯେ ଦାଁଡାଳ । ଆଶେପାଶେ କେଟେ ନେଇ । କପାଟେର ଫାଁକ ଦିଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିତେ ପେଲ ଛୋଟ ଏକଖାନି ସର । ଭିତରେ ଏକଟା ମୋହବାତିର ସାମନେ କେ ଏକଟା ଲୋକ ଯେନ ବନ୍ଧକେ ପଡ଼େ ମୋହବାତିର ଆଲୋଯ କି ଏକଟା ପଡ଼ିଛେ ।

ଲୋକଟାର ଚୋଥ-ମୁଖେର ରେଖାଯ ରେଖାଯ ଗତୀର ଏକାଗ୍ରତା ଫୁଟେ ଉଠେଇ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଧୀରେ ଅତି ଧୀରେ ଡାନ ହାତେର ଏକଟା ଆଙ୍ଗୁଲ ଦରଜାର ଭେଜାନେ କପାଟେର ଗାୟେ ଛେଇଲେ, ତାରପର ଈୟଂ ଏକଟୁ ଚାପ ଦିତେଇ ଆପନିଇ କପାଟ୍ଟା ଏକଟୁ ସରେ ଗେଲ । କିନ୍ତୁ ଲୋକଟାର ସେଦିକେ ଖେଲୁ ନେଇ ; ସେ ଆପନ ମନେ

কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়ে সেটা পড়ছে তখন।

আরও একটু—ঠেলা দিতেই দরজার কপাট দৃঢ়তো বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। আরও একটু—ব্যস। এবার ধীরে অতি ধীরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে জগমাথ বিড়ালের মতই যেন নিঃশব্দে সেই ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। লোকটা তখনও একমনে সেই কাগজখানির ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে। সে কিছুই টের পেল না।

নিঃশব্দে পা টিপে অতি সল্পর্ণে জগমাথ এগোতে লাগল। যখন আর মাত্র হাতখানেকের ব্যবধান উভয়ের মধ্যে, সহসা জগমাথ ঝুঁপ করে একলাফে লোকটার পিঠের ওপর পড়ে দু হাতে তাকে দৃঢ়ভাবে জাপটে ধরল।...

॥ ৬ ॥

সাক্ষেত্রিক লেখা

লোকটা এত গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাগজখানি দেখছিল যে অর্তাকর্ত ভাবে পশ্চাং দিক থেকে সহসা আক্রান্ত হওয়ায় প্রথমটা হকচাকয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্যই, পরক্ষণে সে শরীরের সমস্ত বলটুকু প্রয়োগ করে আক্রমণকারীর কবল থেকে আপনাকে ঝুঁক করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু আক্রমণকারীর স্বর্কর্ত্তন আলিঙ্গন তখন লৌহদানবের মতই লোকটাকে নিষেগীষ্যত করছে।

সেই স্বল্প আলো-অঁধারে ঘরের ধূলিমালিন মেঝের ওপরেই আরম্ভ হল দৃঢ়নের তখন প্রবল হৃতোপ্তৃতি। শক্তির দিক দিয়ে উভয়ের কেউ কম যায় না। ধস্তাধস্তিতে পায়ের ধাকায় মোমবাটিটা উল্লেট নিতে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চন্দ্র অঁধারে সমস্ত ঘরখানি জমাট বেঁধে উঠল। শীঘ্ৰই জগমাথের আস্তুরিক শক্তির কাছে লোকটাকে পরাভু স্বীকৃত করতে হল ও ক্ষেত্ৰে সে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। জোরে জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ হতে লাগল। ধীরে অতি ধীরে লোকটা একসময় শেষ গৰ্য্যত জগমাথের শক্তির কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হল।

ক্লান্ত অবসন্ন পরাভূত লোকটাকে মাটির ওপর ফেলে বুকের ওপরে চেপে বসে জগমাথ পকেট থেকে একটা সিঙ্ক কর্ড বের করে ক্ষিপ্তহস্তে লোকটার হাত-পা বেঁধে ফেলল।

গভীর শ্রান্তিতে জগমাথের সমগ্র শরীর তখন অবসন্ন ও ক্লান্ত। ঘামে জামাকাপড় সব ভিজে উঠেছে। সে হাত দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিল। পকেট থেকে অতঃপর টর্চটা বের করে টিপতেই উজ্জবল একটা আলোর ইশারায় ঘরের জমাট অঁধারের খানিকটা যেন জট পাকিয়ে সরে গেল।

এতক্ষণে টর্চের আলোয় লোকটাকে বেশ ভাল করে দেখা গেল। দোহারা বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ে একটা পাটোকিলে-রংয়ের মের্জাই। মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখটা গোল। নাকটা চ্যাপটা। চোখ দৃঢ়তো ছোট ছোট। লোকটা পিট পিট করে জগমাথের দিকে তাকাচ্ছিল।

অদুরে একটা কাগজ পড়ে আছে। জগমাথ বুঁকে হাত বাড়িয়ে কাগজ-
টাকে তুলে নিল, তারপর টচের আলোয় কাগজটাকে মেলে ধরল।

কাগজটা সাধারণ কাগজ নয়। নীল রংয়ের একটা অয়েল-পেপার।
কাগজটার গায়ে একটা মার্নাচ্চ আঁকা এবং তার নীচে কতকগুলো সাঙ্কেতিক
চিহ্ন পর পর সাজানো রয়েছে। কাগজটার এক কোণে একটা ড্রাগনের মৃত্তি—
মৃত্তিটি রঙের মত টক্টকে লাল কালিতে আঁকা।

ড্রাগনের মৃত্তির নীচে ছোট ছোট অক্ষরে লাল কালি দিয়ে ইংরাজী-বাংলা
মিশনে কিং একটা লেখা আছে। লেখাটা অনেকটা কবিতার মত করে সাজানো।
ষদিও কবিতাটার মাথামুড়তে খেমন কোন কিছু মিল নেই, তেমনি সমস্তটা
একেবারে দুর্বোধ্য।

মিয়াং-ভাঙা বুন্ধনেবের মৃত্তি। প্যাগোডার দক্ষিণে তার ডার্নাদিকে
চল্দন গাছ—মৃত্তির গায়ে গোল চিহ্ন—স্মর আঁকা।

—সেই গাছের

৯০ সোপা পিঠের পরে

দুই DK ০০০ হাত

পারা সস্তা আছে

চিহ্ন ষত বাদ গেছে

তার BAMT ধরে

হাত ০০০০ ষাও ষদি মাত।

ড্রাগন দেখ বসে আছে

ধনাগারের চাবি কাছে

ঘুঁথে তার লোহার বালা

দুলছে তাতে চিকন শলা ;

দুইয়ের পিঠে শূন্য নাও

তিশ দিয়ে গুণ দাও,

শূন্য ষাদি ধায় বাদ

সেই কবারে প্ৰবে সাধ॥

জগমাথ বার দুই-তিন কাগজটা আগাগোড়া পড়ে ফেলল। কিন্তু মাথা-
মুড় কিছুই বুঝতে পারে না।

অথচ এটা বুঝতে তার কষ্ট হয় না যে জিনিসটা একটা সাঙ্কেতিক লিপি,
একটা-না-একটা কিছু এর অর্থ আছেই।

আরও ভাল করে চিন্তা করলে হয়তো তখন অর্থ ধরা যেতে পারে।

কিন্তু এইভাবে এখানে আর দেরী করাও সমীচীন হবে না।

একটু আগে যে অফুট কাতরোন্তি শোনা গিয়েছিল, সে ব্যাপারটার একটা
খোঁজ নেওয়া একালত প্রয়োজন। এবং ক্ষণপূর্বে অলঙ্ক্ষ্য দাঁড়িয়ে যে কথাবার্তা
ও শূন্যেছিল তা থেকে স্পষ্টই মনে হয়, এখান এই পোড়ো বাড়ির কোন কক্ষে
নিশ্চয়ই কাউকে এরা ধরে নিয়ে এসে বৃদ্ধি করে রেখেছে।

জগমাথ ভূপতিত রঞ্জন-বন্ধু লোকটার দিকে একবার তাকাল।

লোকটা যেন একেবারে নির্বিকার, যেন ভালমন্দ কিছুই জানে না, মেহাং
একেবারে গোবেচারী গোছের।

জগমাথ তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করে জামার ভিতর দিককার পকেটে

ରେଖେ ଲୋକଟାର ସାମନେ ଏଗିଯେ ଏଳ ।

ଲୋକଟାର ମୁଖେର ଓପରେ ଟର୍ଚେର ଆଲୋ ଫେଲେ କଠିନ ଆଦେଶେର ସବରେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ହିନ୍ଦୁ-ସ୍ଥାନାମୀତେ ପ୍ରମନ କରିଲେ, ଏହି, ସେ ଲୋକଟାକେ ତୋରା ଏଥାନେ ଧରେ ଏଣେ ଆଟକ କରେ ରେଖେଛିସ, ସେ କୋନ୍ ସବରେ ଶୀଘ୍ର ବଲ୍, ନା ହଲେ ଗଲା ଟିପେଇ ତୋକେ ଏଥାନେ ଶେସ କରେ ରେଖେ ବାବ ।

ଲୋକଟା ସେ ଜଗନ୍ନାଥେର କଥାର ବିଶ୍ଵାସର୍ଗରେ ବୁଝିତେ ପାରେନ ତା ଚପଣ୍ଟାଇ ବୋଧା ଗେଲ ; ସେ ଓର କଥାର କୋନ ଜବାବାଇ ଦିଲ ନା, କେବଳ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୟେ ପଡ଼େ ଥେକେ ଶୁଧି ଜଗନ୍ନାଥେର ମୁଖେର ଦିକେ ଫ୍ଯାଲ-ଫ୍ଯାଲ କରେ ବୋକାର ମତାଇ ତାକାତେ ଲାଗଲ ।

ଏବାରେ ଲୋକଟାକେ ପା ଦିଯେ ଏକଟା ଠେଲା ଦିଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲିଲେ, ଏହି, ଚଂପ କରେ ଆଛିସ କେନ ? ଜବାବ ଦେ ନା ବେଟା !

ଏ ସମୟ ଆବାର ସହସା ପୂର୍ବେର ମେହି ଗୋଙ୍ଗାନିର ଶବ୍ଦଟା ଶୋନା ଗେଲ । ଜଗନ୍ନାଥ ଏବାରେ ଅଭ୍ୟାନ୍ତ ଅସହିତ୍ବ ହୟେ ବଲିଲେ, ଏହି, ବଲ୍ !

ଲୋକଟା ତଥାପି ନୀରବ । ସେ ଆଗେର ମତାଇ ବୋକା-ଚାଉନି ନିଯେ ଚେଯେ ଆଛେ ।

ନା, ଏଇ କାହି ହତେ ଜବାବ ପାଓଯା ଯାବେ ନା ଦେଖାଇ । ଜଗନ୍ନାଥ ମନେ ମନେ ବଲିଲେ । ତାରପର ସେ ଏକଟା ରୂପାଲ ବେର କରେ ଲୋକଟାର ମୁଖ ଚେପେ ବୈଧେ ଦିଲ, ଯାତେ କରେ ଲୋକଟା ଚିଂକାର ବା କୋନ ଶବ୍ଦ କରିଲେବେ କେଉ ଶବ୍ଦରେ ନା ପାଇ ।

ଥାକ୍ ବେଟା, ସେଇନ କୁକୁର ତାର ତେରନ ମୁଗ୍ଗର । ବଲତେ ବଲତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସର ଥେକେ ନିଷ୍କାନ୍ତ ହୟେ ବାହିରେ ଥେକେ ସରେର ଶିକଳଟା ତୁଲେ ଦିଲ ।

ଅନ୍ଧକାର ବେଶ ଜମାଟ ହୟେ ଉଠେଛେ । ଦେଉସାଲେର କୋନ ଫାଟିଲେ ବର୍ଦ୍ଧି ଏକଟା ବିଂ-ବିଂ ପୋକା ବିଂ-ବିଂ କରେ ଏକଟାନା ବିଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦେ ଡେକେ ଚଲେଛେ ତୋ ଚଲେଛେ ।

॥ ୭ ॥

ଥୋଡା ଭିଜ୍ଞକ

ବାହିରେ ଅନ୍ଧକାର ବାରାନ୍ଦାୟ ଏସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତେର ଟର୍ଚଟା ଟିପାତେଇ ଦେଖିଲେ, ଉପରେବେ ନୀଚେର ତଲାର ମତାଇ ବାରାନ୍ଦାର ଗାୟେ ପର ପର ଚାର-ପାଁଚଟି ସର । ଉଃ, କି ନିଷ୍ଟର୍ଥ ! ସାରା ବାଡ଼ିଟା ମୁହଁର ମତାଇ ବିଭିନ୍ନକାମର ସେବନ । ମନଟା ସାତ୍ୟ କେମନ ସେବନ ସିରମିସର କରେ ଓଠେ । ଆଶକାଯ ଥମଥମ କରେ । ବାରାନ୍ଦାୟ କତକାଲେର ଧୂଲୋ ସେ ପଡ଼ିତେ ପଡ଼ିତେ ଜମେ ଉଠେଛେ ତାର ଠିକ ନେଇ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଟର୍ଚ ହାତେ ଏକେ ଏକେ ଉପରେର ସବ ସରଗୁଲୋଇ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋନ ସରେଇ ଜନପ୍ରାଣୀର ସାଡାଶବ୍ଦ ବା ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ । ସ୍ଵଗ ସ୍ଵଗ ସରେ ସେବନ ଏଥାନେ କେଉ ବାସ କରେନି । କାରାଓ ପାରେର ସପର୍ଗର୍ଗ ସେବନ ପଡ଼େନି ।

କହି, କେଉ ତୋ ଏଥାନେ ନେଇ ! ତବେ କାର ଅନ୍ଧକାର ଶବ୍ଦ କାମେ ଆସିଲ ? କେ ଅମନ କରଣ ସବରେ ଗୋଙ୍ଗାଛିଲ ? ମନେ ମନେ ବଲତେ ବଲତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋତଲାର ସିର୍ପିଲ ସେବେ ଏକମର ଛାଦେ ଗିରେ ଉଠିଲ । ଛାଦେ ନିର୍ଜନ ଜମାଟ ଆଁଧାରେ ଥମଥମ କରଇଛେ ।

উপরে তারায় ভরা কালো আকাশ। সামনেই চোখে পড়ে সেই পোড়ো মাঠটা। সেটাও রাতের অধিকারে অস্পষ্ট আবছা হয়ে উঠেছে। ওদিকটার তাল-গাছটার পাতায় পাতায় নিশ্চীথের হাওয়া কেমন একরকম সিপ্‌ সিপ্‌ শব্দ তুলেছে।

ছান্দে মাত্র চিলে-কোঠা। সে ঘরের দুটো কপাটই খোলা, হাওয়ায় মাঝে মাঝে চপ্‌ চপ্‌ করে বন্ধ হচ্ছে আর খুলেছে। আর কেউ নেই।

জগমাথ নীচে নেমে এল আবার। নীচের তলার ঘরগুলো আর একবার ভাল করে দেখল। কিন্তু ব্যথা। সেখানেও কিছু পাওয়া গেল না। আর তো দোরি করা সংগত নয়, যদি দলের কেউ আবার এসে পড়ে! অভিঃপর জগমাথ বাঁড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল।

গালিটা এর মধ্যে বেশ নির্জন হয়ে উঠেছে। জগমাথ সন্ধানী দ্রষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে গালিপথ ধরে এগোতে লাগল।

গালিটা ঘেরানে এসে বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে গ্যাস-পোস্টের নীচে মৃদু আলোয় একজন খোঁড়া ভিক্ষুক-শ্রেণীর লোক লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে করুণ স্বরে পথিকের করুণা ভিক্ষা করছে: বাবু, গো, দয়া করে এই খোঁড়াকে একটি পয়সা দিয়ে থান। কত দিকে কত পয়সা আপনাদের যায়, মাজননী গো!

জগমাথ তীক্ষ্ণ দ্রষ্টিতে ভিক্ষুককে দেখতে লাগল। তার ঘনে সহস্র জাগে, কে—কে এই ভিক্ষুক? কোথায় যেন ওকে দেখেছে! কোথায়?

জগমাথ চিন্তা করতে লাগল এবং চিন্তা করতে করতেই একসময় তার ঘনে হয়, লোকটাকে সে সেদিনই দেখেছে। ঐ পোড়ো বাঁড়িতে লোকটাকে দেখেছে সে। বগলে ছাঁচ ছিল লোকটার; জগমাথ এবার দ্রষ্ট আরও প্রথর ও অনুসন্ধিৎসন্ত করে ভিক্ষুকটাকে দ্রু থেকে দেখতে লাগল।

তারপর একসময় জগমাথ ধীরে ধীরে গা-চাকা দিয়ে ওপাশের ফুটপাত দিয়ে পা চালিয়ে র্ণাগয়ে গেল। এবং সোজা এসে সে স্বরতদের বাঁড়ির দরজায় কড়া ধরে নাড়া দিল: খট-খট-খটা-খট।

কে? স্বরত গলা শোনা গেল ভিতর থেকে।

আমি। দরজাটা খুলুন।

দাঁড়ান, খুলুচি।

দরজাটা খুলতেই জগমাথ-বেশী কিরীটী রায় হাসতে মাথায় বসানো রবারের পরচুলাটা খুলতে খুলতে বললে, মতে জগমাথ সাহু। কন্ত ঘূরির ঘূরি কটক জিলা কো মতে কলকাতার—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, স্বরত হা হা করে হেসে বললে, উঃ, কি বিভীষণ লোক আপনি মশাই!

না মশাই, বিভীষণের মত আমি স্বজ্ঞাতদ্বোহী নই।

বিভীষণ স্বজ্ঞাতদ্বোহী? কি বলেন আপনি?

তা বৈকি। যে নিজের মাঝের পেটের ভাইয়ের মতুবাণ ও তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির স্বাধীনতা মানসম্মত অপরের হাতে তুলে দিতে পারে, তাকে শ্রীরামচন্দ্র ষতই পৃত আশীর্বাদ দিয়ে গরীয়ান করে তুলুন না কেন, তথাপি আমি বলব সে নাচি; সে কলঙ্ক—সে সমাজদ্বোহী—স্বজ্ঞাতদ্বোহী—বিশ্বাস-ধাতক। উন্দেজনায় ও ভাবের দোলায় কিরীটীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল;

କିଳ୍ଟୁ ମେ କଥା ଥାକୁ, ତାର ଚାଇତେଓ ବଡ଼ କାଜ ଆମାଦେର ସାମନେ । ଖୋଶଗଜ୍ଜପ
କରେ ଆସର ଜମାବାର ମତ ଅବକାଶ ଆମାଦେର ଏଥିନ ଏଟାକୁଓ ନେଇ ।—ବଲତେ ବଲତେ
କ୍ଷିପ୍ତହୃଦୟେ କିରାଟୀଟି ରାଯ ଗାୟେର ଛଞ୍ଚବେଶଗୁଲୋ ଖୁଲେ ଫେଲତେ ଲାଗଲ ।

ବ୍ୟାପାର କି ବଲୁନ ତୋ ମିଃ ରାଯ ? କାଠମ୍ବରେ ସ୍ଵରତର ଖାନିକଟା ଉମ୍ବେଗ ଓ
କୋତୁଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ।

ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଏକଟା ଚାଦର ଆର ଏକଟା ଲାଠି ଆନତେ ପାରେନ ?

କି ହବେ ? କାଉକେ ଲାଠୋୟଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଛେନ ନାକି ?

ରହମ୍ବାହୁଲେ ଜବାବ ଦିଲ କିରାଟୀଟି :

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରେ ବର୍ର !

ଦେରି ଯଦି କର, ବିପଦ ହବେ ବଡ଼ ।

ଶୀଘ୍ର ଆନ ଲାଠି ଓ ଚାଦର ।

ସ୍ଵରତ ହାସତେ ହାସତେ ଲାଠି ଓ ଚାଦର ସଂଗ୍ରହ କରତେ ଉପରେ ଚଲେ ଗେଲ
ଏବଂ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣେର ମଧ୍ୟେଇ ଏକଟା ବାଁଶେର ଲାଠି ଓ ସାଦା ଚାଦର ଏମେ କିରାଟୀର ହାତେ
ଦିଲ ।

ଏବାରେ ପକେଟ ଥେକେ ଏକଟା ଟିକିଓୟାଲା ପରଚାଲା ବେର କରେ କିରାଟୀ
ମାଥାଯ ବେଶ କରେ ବସିଯେ ନିଲ, ତାରପର ଚାଦରଟା ଗାୟେ ଝାଡ଼ିଯେ ଲାଠିଟା ହାତେ ନିଯ୍ୟେ
ଦାଢ଼ାଳ ସୋଜା ହେଁ, ସ୍ଵରତର ମୁଖେ ଦିକେ ତାକିରେ । କାର ସାଧ୍ୟ ଏଥିନ ତାକେ
ଏକଟୁ ଆଗେର କିରାଟୀଟି ରାଯ ବଲେ ଚିନତେ ପାରେ ! ଏଥିନ ମେ ଅତି ନିରାହ-
ଗୋଛେର ଏକଟି ପ୍ରଜାର ଶ୍ରାଦ୍ଧାରୀ ।

ମ୍ଦ୍ର ହେଁସେ ରାଙ୍ଗଗୋଚିତ ଗାନ୍ଧିର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣ୍ଣ ବ୍ୟରେ କିରାଟୀଟି ରାଯ ବଲଲ, ବନ୍ଦ,
ତୋମର କଲ୍ୟାଣ ହୋକ । କ୍ଷଣେକ ଅପେକ୍ଷା କର । ତାରପର କି ମନେ କରେ ବଲଲେ,
ହାଁ ଭାଲ କଥା, ଆପନାଦେର ପା-ଗାଡ଼ି ଆହେ ?

ହ୍ୟାଁ ଆହେ, କେନ ବଲୁନ ତୋ ?

ଆପନି ବାଇକଟା ନିଯେ, ବଡ଼ ରାଷ୍ଟାଟା ଯେଥାନେ ପ୍ରାମ ରାଷ୍ଟାର ଗାୟେ ଗିଯେ
ମିଶେହେ ସେଥାନେ ଅପେକ୍ଷା କରବେନ । ଆମି ଆଧ ଘନ୍ଟାର ମଧ୍ୟେଇ ସେଥାନେ ଥାବ ।
ବଲତେ ବଲତେ କିରାଟୀଟି ରାଯ ସର ଥେକେ ନିଷ୍କାଳ ହେଁ ପଥେ ଦୈର୍ଘ୍ୟେ ପଡ଼ଲ ।

ରାଷ୍ଟାଯ ନେମେ କିରାଟୀଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଠି ହାତେ ଗଲିର ପଥ ଦିଯେ ଏଗୋତେ
ଥାକେ ।

ରାତି ତଥିନ ସାତଟାର ବେଶୀ ହବେ ନା । ମାରେ ମାରେ ଦ୍ର-ଏକଟା ମୋଟରଗାଡ଼ି
ରାଷ୍ଟା ଦିଯେ ହ୍ସ-ହ୍ସ ଶବ୍ଦେ ଛଟେ ଥାଇଁ । ଦ୍ର-ଏକଟା ରିକଶାର ମ୍ଦ୍ର ଠ୍ୟ-ଠ୍ୟ
ଆୟାଜ ଶୋନା ଥାଯ । ସାମନେଇ ଏକଟା ମହିବଡ଼ ଫୁଟକଓୟାଲା ବାଡ଼ିତେ କୋନ
ଉରସ ହଚ୍ଛେ ବୋଧ ହୁଏ । ରକମାରୀ ଆଲୋତେ ଆର ଲୋକଜନେର ଗୋଲମାଲେ ବାଡ଼ିଟା
ସରଗରମ । ରାଷ୍ଟାର ଦ୍ର-ପାଶେ ସାରି ସାରି ନାନା ରଙ୍ଗେର ଓ ନାନା ଆକାରେର ମୋଟର-
ଗାଡ଼ି ଦାଢ଼ିଯେ ।

କିରାଟୀଟି ଏଗେ ଚଲେ ।

ଥୈଡା ଭିକ୍ଷୁକଟା ତଥନ୍ତେ ଚେତ୍ତାହେ—ବାବା ଗୋ ! ଏଇ ଥୈଡା ଭିଧାରୀକେ
ଏକଟି ଆଧିଲା ଦାଓ ବାବା । କତ ଦିକେ, କତ ଭାବେ, କତ ପରସା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବାବା ଗୋ ।
ଦୟା କର ଯାଗୋ ଜନନୀ—

କିରାଟୀଟି ଏକଟା ପରସା ହାତେ ନିଯେ ଭିକ୍ଷୁକେର ଦିକେ ଏଗେ ବଲଲ, ଏଇ ନେ,
ପରସା ନେ ।

ଭିକ୍ଷୁକ ବୀ ହାତଟା ବାଡ଼ିଯେ ଦିଲ । ଆର ଏକବାର ତୀକ୍ଷ୍ୟ ଦର୍ଶିତେ କିରାଟୀଟି

ভিক্ষুকটাকে দেখে নিয়ে পয়সাটা ভিক্ষুকের হাতে ফেলে দিল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

ভিক্ষুক তখনও একই ভাবে চেঁচিয়ে চলেছে। হঠাৎ কিরীটী দেখলে আর একজন ভিক্ষুক ঘেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে উল্টো দিক থেকে ওদিকেই আসছে।

কিরীটী চলার গাঁতটা একটু শ্লথ করে দিল এবং আড়চোখে ভিক্ষুকটাকে শক্ষ করতে লাগল দ্রু থেকেই।

শ্বিতীয় ভিক্ষুকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে আগের ভিক্ষুকটার কাছাকাছি আসতেই দৃঢ়নে ফিস্ ফিস্ করে কি ঘেন বলাবালি করতে লাগল পরম্পরের মধ্যে।

কিরীটী আর অপেক্ষা না করে পা চালিয়ে চলল বড় রাস্তার মোড়ের দিকে এবারে।

মোড়ের পানের দোকানটার কাছে এক হাতে বাইক ধরে সুরুত একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে চেঁচ্টা করছিল। কিন্তু অনভ্যাসের দরূণ মাঝে মাঝে কাশতে তার দম আটকে আসতে চায়।

কিরীটী সুরুতের কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর সুরুতের হাত থেকে বাইকটা নিয়ে বাগিয়ে ধরতে তাড়াতাড়ি বললে, প্রায়ে চেপে লালবাজারের মোড়ে চলে যান সোজা। সামনেই যে রাস্তাটা বরাবর নয়া রাস্তায় মিশেছে, তার দৃশ্যাশে চীনাদের জুতোর দোকান আছে, ঐখানেই আঘ যাচ্ছ। একটা ছুরি, সিলক কর্ড ও একটা টর্চ নিতে ভুলবেন না যেন।

কথাগুলো বলেই কিরীটী একলাফে বাইকে চেপে সজোরে প্যাডেল করে অদ্ভ্য হয়ে গেল।

কিরীটীর নির্দেশমত তখনই সুরুত ক্ষিপ্রপদে বাড়ির দিকে চলে গেল।

কিছুদ্বার এগিয়ে কিরীটী রাস্তার মোড়ে বাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সহসা একসময় তার নজরে পড়ল শ্বিতীয় খোঁড়া ভিক্ষুকটা এদিকেই আসছে।

মহাপ্রভু নিশ্চয়ই এতক্ষণ যাত্ব করেছেন! কিরীটী বাইকে চেপে গলির দিকে চলল এবারে। কাছাকাছি আসতেই ক্লিং ক্লিং আওয়াজ পাওয়া গেল এবং পরক্ষণেই গলির মুখ দিয়ে একজন সাইকেল-আরোহী দ্রুত বেরিয়ে এল।

লোকটার পরনে ডিলা পায়জামা, গায়ে ঢোলা কাবুলী জামা, ঘাথায় কালো টুপি-কপাল পর্যন্ত টেনে দেওয়া হয়েছে; চোখে কালো কাচের গগল্স।

গলিপথ হতে নিষ্কান্ত হয়ে লোকটা প্রায় রাস্তার দিকে সাইকেল চালাতে লাগল। কিরীটীও তার পিছু পিছু সাইকেল নিয়ে অনুসরণ করলে।

লোকটা সোজা আমহাস্ট স্ট্রীট দিয়ে বৌবাজার স্ট্রীটে পড়ে বরাবর গিয়ে চিংড়ুরে পড়ল।

দৃশ্যাশে যত সব ছবি আর আরনার দোকান। কাচের গায়ে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হয়ে বিচ্চির রঙের রামধনু জাগিয়েছে।

রাণি কতই বা হবে! বড় জোর আটটা, তার বেশী নয়। কলকাতা শহরে

সন্ধ্যা বললেই চলে। দোকানে লোকের ভিড়। পথে প্রামে ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ আর রিকশাওয়ালদের ঠুঠুঠুঠু শব্দ ও মোটরের হর্ন।

লোকটা যে একজন পাকা সাইকেল-চালিয়ে, তা ওর গাতি দেখেই বোৱা যায়। লোকটা অতি দ্রুত ভিড় বাঁচিয়ে লালবাজার ডাইনে ফেলে সোজা চীনাপট্টির মধ্যে ঢুকল।

রাস্তার দ্বিপাশে সারি সারি চীনাদের জুতার দোকান। মোড়ের একটা লাইটপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ স্বীকৃতকে দেখতে পেল কিরীটী।

সাইকেল চালিয়ে কিরীটী স্বীকৃত পাশে এসে নামল।—যে লোকটিকে অতক্ষণে কিরীটী অনুসরণ করছিল, সে তখন খানিকটা দূরে সাইকেল থেকে নেমে সাইকেল হাতে করে এগোচ্ছিল।

এটা নিয়ে এখনে অপেক্ষা করোন। এই বলে কিরীটী বাইকটা স্বীকৃতর হাতে দিয়ে লোকটিকে অনুসরণ করল তাড়াতাড়ি। লোকটি বাইক নিয়েই সামনের অন্ধকার গালিটার মধ্যে গিয়ে পড়ল। কিরীটীও অংধারে গা-চাকা দিয়ে শিকারী বিড়ালের মত লোকটাকে অনুসরণ করল।

গালিটা বেশ প্রশস্ত। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করা যায় না। দ্বিপাশে বাড়ির খাড়া দেওয়াল উঠে গেছে। হাত দশেক উঁচুতে একটা জানালার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো এসে গালির অন্ধকারে ছিটকে পড়েছে ঘেন। অন্ধকার এত বেশী যে পাশের লোক পর্যন্ত নজরে আসে না। পচা মাছ ও চামড়ার বিশ্রী গাঁথে দম বৰ্ধ হবার যোগাড়।

কিরীটী অতি সন্তুর্পণে দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চলল। আগের লোকটাকে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। সম্মুখে পঞ্চতে ডাইনে বামে সব দিকেই অন্ধকার। অন্ধকার ঘেন স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে উঠেছে। নিঃশ্বাস বৰ্ধ হয়ে আসে। অন্ধকার গালির মধ্যে বুঝি বাতসম আসতে ভয় পায়। কিরীটী বুঝল, আর এগিয়ে চলা বৃথা, তাই দাঁড়িয়ে রুক্ষনিঃশ্বাসে কান পেতে রইল। হঠাৎ একসময়ে একটা আওয়াজ কানে এল খট-খট-খট।

তারপরই খানিকক্ষণ চুপচাপ, আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। আবার শব্দ হল—খট-খট-খট।

এবার ঘেন কাছেই কোথায় একটা দরজা খোলার শব্দ হল। অন্ধকার গালিপথে একটা শ্লান আলোর শিখা দেখা গেল। তার পরেই দ্বিদ্বৃক্ষে একটা দরজাপথে একটা কুৎসিত চীনা বুড়ীর চেপ্টা মুখ দেখা গেল। হাতে তার কেরোসিনের বাতি। বাতিটা ঘেন আলোর চাইতে ধ্রুমদ্বিগ্রহই বেশী করছে।

বুড়ী বাতিটি লোকটির মুখের উপর তুলে ধরল। অর্ধনি লোকটা বাঁহাতের দুটো আঙ্গুল কোণাকুনি করে দেখালো। সেই বিশ্রী বুড়ীটার কুৎসিত মুখে ততোধিক কুৎসিত এক টুকরো হাসি জেগে উঠল। বুড়ী রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াল।

লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা আবার বৰ্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তে কিরীটী নিজের ভাবিষ্যৎ কর্মপথা স্থির করে নেয়, এবং স্বরিংপদে গালির ভিতর থেকে বের হয়ে গিয়ে স্বীকৃত যেখানে অপেক্ষা করছিল সেখানে এসে বললে, এখনই আপনি বাড়ি যান স্বীকৃতবাবু এবং যত শীঘ্র পারেন রাজেন-

বাবুকে নিয়ে এখানে চলে আসবেন। ঐ যে দেখছেন, হংকং সু ফ্যাক্টরীর পাশ
দিয়ে একটা গালি দেখা যাচ্ছে, ওরই আশে-পাশে কোথাও অন্যের সন্দেহ বাঁচিয়ে
আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। একেবারে শুন্য হাতে আসবেন না।

কি হার্ডিয়ার সঙ্গে আনি বলুন তো? স্বত্ত্বত প্রশ্ন করে।

একটা ছুটির বা একটা অন্ততঃ লোহার রড় হলেও চলবে। ব্রিটিশ রাজহে
তো আর পিচ্চল বা রিভলবার চট করে পাওয়া যাবে না। কাজে কাজেই
আমাদের ভগবানপ্রদত্ত বৃদ্ধিকেই কাজে লাগাতে হবে।

স্বত্ত্বত হেসে ফেলে।

হাসছেন স্বত্ত্বতবাবু! প্রায় পেঁনে দুই শত বৎসরের পরাধীনতায় আমরা
যে একেবারে পঙ্গু ও অথবা হয়ে আছি। কিন্তু থাক্ সে-সব কথা, পরাধীন
দেশের দুঃখের শেষ কোথায়! হাঁ শুনুন, আপনি আর রাজেনবাবু এসে ঐ
হংকং সু ফ্যাক্টরীর কাছে অপেক্ষা করবেন, পর পর দুটো বাঁশীর আওয়াজ
পেলেই ঐ গালির মধ্যে ছুটে যাবেন। বাঁশীর আওয়াজ না পাওয়া পর্যন্ত
কোথাও যাবেন না। আচ্ছা আমি চললাম।

কিরীটী কথাগুলো বলে দ্রুতপদে গালির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল
অধিকারে।

স্বত্ত্বত আর ক্ষণমাত্র দেরি না করে, সামনেই একটা চলন্ত ট্যাঙ্ককে হাতের
ইশারায় থামিয়ে ট্যাঙ্কিতে উঠে বসে বললে, আমহাস্ট স্ট্রীট!

ট্যাঙ্ক নির্দিষ্ট পথে ছুটে চলল।

এদিকে গালির মধ্যে ঢুকে কিরীটী কিছুক্ষণ যেন কি ভাবলে, তারপর
অঁধারে আল্দাজ করে ক্ষণপূর্বের দেখা সেই দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।
মৃহৃত্মাত্র চিন্তা করে টুক্-টুক্-টুক্ করে দরজার গায়ে তিনটে টোকা
দিল।

কিন্তু কোন সাড়া নেই। অল্পক্ষণ পরে আবার টোকা দিল—টুক্-টুক্-
টুক্।

এবারে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল এবং পরক্ষণেই দরজাটা খুলে গেল।
আগের সেই চীনা বুড়ী বাতি হাতে বৈরিয়ে এল।

কিরীটী আঙ্গুল দিয়ে পূর্বের লোকটির মত ইশারা করতেই বুড়ী পথ
ছেড়ে সরে দাঁড়াল। সে বুড়ীর পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল তখন।

সরু একটা অত্যল্প স্বল্পপর্মাসির অধিকার গালিপথ—বরাবর থীনিকটা
চলে গেছে। তার মধ্যে দিয়ে বুড়ী আলো নিয়ে এগিয়ে চলে আর কিরীটী
পিছন পিছন চলে।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই আচমকা কিরীটী হঠাৎ দুই হাত দিয়ে পিছন
থেকে বুড়ীর মুখটি চেপে ধরল এবং ক্ষিপ্রস্থে পকেট থেকে একটা রুম্বল
বের করে বুড়ীর মুখে গুঁজে দিল; তারপর সিল্ক কর্ড দিয়ে বুড়ীকে বেঁধে
ফেললে।

চীনা আন্তর্জাল

বৃক্ষীকে বাঁধতে কিরীটীর দ্রুমিনিটও সময় লাগে না।

বৃক্ষীকে বেঁধে ফেলে কিরীটী উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। জাপটে ধরবার সময় বৃক্ষীর হাতের বাতিটা ছিটকে পড়ে নিতে গিয়েছিল। কিরীটী পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা জবলাল; তারপর সেই অর্থকার গলিপথ দিয়ে খানিকটা অগ্সর হতেই দেখা গেল, অদূরে একটা ঘরের দরজার পাশে টুলে বসে একটা চীনা খুবক্ খিমুচে। দেওয়ালে একটা ওয়াল-ল্যাম্প পিট-পিট করে জবলছে। তারই স্লান আলো তম্বুচ্ছ চীনাটির মুখের উপর এসে পড়েছে। লোকটা কিছুই টের পায়নি তাহলে। সামনের ঘরের দরজাটা ভেজানো। ঘরের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কথাবার্তার দ্র-একটা টুকরো আওয়াজ শোনা যায়। কিরীটী একেবারে দেওয়ালের গায়ে গালাগয়ে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। তারপর চীনা লোকটির কাছাকাছি এসে হঠাৎ পিছন দিক থেকে দ্রহাত দিয়ে খুব জোরে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

আধো ঘুমস্ত অবস্থায় অর্তার্কত আঙ্গুল হয়ে লোকটি যেমন চমকে উঠেছিল তেমনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল এবং সেই অবস্থাতেই লোকটিকে জাপটে ধরে মাটিতেই গাড়িয়ে খানিকটা পিছন দিকে চলে এল কিরীটী।

অর্তার্কত আঙ্গুলে চীনা লোকটা প্রথমটা বিশেষ হকচাকয়ে গিয়েছিল সাতাই, কিন্তু একটু পরেই নিজেকে সে কিরীটীর বাহুবেষ্টন থেকে ছাড়াবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু কিরীটীর দৈহিক শক্তির কাছে পেরে ওঠে না এবং প্রাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

প্রথম থেকে কিরীটী লোকটা যাতে কোনরূপ শক্ত না করতে পারে, সেজন্য সতর্ক হয়ে লোকটার মুখে হাত চাপা দিয়েছিল, পরে একটা রূমাল টেলে ধরল মুখের মধ্যে। তারপর পকেট থেকে একটা সিঙ্ক কর্ড বের করে লোকটার হাত-পা বেঁধে ফেলল। তার পর কিপ্পগাতিতে লোকটার জামা ও মাথার টুপি খুলে নিয়ে নিজে সেগলো পরে নিল।

পরাজিত রঞ্জুবধ লোকটা তার ছেঁট কুৎসিত চোখ দুটো মেলে অর্থকারে হয়তো কিরীটীকে দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেদিকে কিরীটীর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। মাথার কালো চীনা টুপিটা কপালের নীচে ভূরু পর্যব্রত কিরীটী টেনে দেয়। এই সমস্ত কাজ করতে কিরীটীর দশ-পনেরো মিনিটের বেশী সময় লাগেনি। আর দেরি না করে কিরীটী ঘরের ভেজানো দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। অতি ধীরে দ্র-আঙ্গুলে চাপ দিয়ে এবারে দরজাটায় একটু টেলা দিল। দুটো কপাট সরে গিয়ে সামান্য একটু ফাঁক হয়ে গেল। দেখা গেল, একটা ভাঙা টেবিলের পাশে তিনজন লোক গভীর মনোযোগ সহকারে বসে বসে কি সব কথাবার্তা বলছে। মুখের হাবভাবে ঘনে হয় ঘেন অত্যন্ত জরুরী

কিছুর গোপন পরামর্শ চলেছে ঘরের লোকগুলোর মধ্যে।

দ্বিজনের মৃত্যু দেখা যায় না, তারা দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছে। যার মৃত্যু দেখা যায়, সেরকম বীভৎস মৃত্যু কিরীটী জীবনে দেখেছে কিনা সন্দেহ। ইষ্টাং দেখলে মনে হয় বৃষ্টি কোন শ্রশানচারী প্রেতলোকবাসী! প্রেতলোকের বিভীষিকায় মৃত্যুবান বীভৎস! কি একটা ভয়াবহ দ্বংসপ্ত ঘেন ওর মৃত্যের প্রতি রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে।

লোকটার ডান দিকটার কপাল ও গাল বোধ হয় কবে পুড়ে গিয়েছিল। সর্বগ্রাসী হ্রতাশন ঘেন তার নির্মম চিহ্ন রেখে গেছে ডান দিককার কপাল ও গালটাকে টেনে ঝুঁকড়ে বীভৎস করে দিয়ে। সেই সঙ্গে ডান দিককার চোখটাও ঘেন ঠেলে কোটির থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সেই বীভৎস কৃৎসত মৃত্যের উপরে আলোর স্লান শিখা পড়ে আরও ভয়াবহ ঘনে হয়।

লোকটার হাতে একটা তীক্ষ্ণ বাঁকানো ছুরি। সে সেটিকে দ্বা আঙুলে দোলাতে দোলাতে কাকে ঘেন লক্ষ্য করে বললে, সনৎবাবু, আবার ভেবে দেখ। এখনও সময় আছে।

সনৎবাবু, নাম শনেই কিরীটী চাকে উঠল।

লোকটি আবার বললে, হ্যাঁ, এখনও সময় আছে। আমাদের এইভাবে কলকাতায় আসতে বাধা করার জন্য খেসারত দশ হাজার না হোক—আল্টতও আমার দার্দির দশ হাজার এবং কথার খেলাপের জন্য দশ হাজার টাকা—সর্বসমেত কুড়ি হাজার দিলেই ঘৰ্ষণ পাবে।

আমি তো তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলুন—টাকা তুমি পাবে না। তোমার যা খুঁশি আবাকে নিয়ে করতে পার।

সনৎবাবু, তোমার দ্বংসাহস দেখে সীতাই অবাক হয়ে যাচ্ছি। নিশ্চিত মৃত্যুর মৃত্যুমূর্দ্য দাঁড়িয়েও কেমন করে যে তুমি নিশ্চিন্ত থাকার ভাব করছ তা তুমই জান। একটি থেমে আবার বলল, সেবারে বড় ফাঁকিটা দিয়েছিলে। রেঙ্গনে তোমার বাঢ়িতে সেই অপমান, শব্দ, তাই নয়, এত দ্বংসাহস তোমার, আমার প্রেরিত মৃত্যুদ্বৃত্ত প্রাগনকে ঘৃণারে মাটিতে আছড়ে ফেলেছিলে। কিন্তু দেখছি তার চেয়ে তের বেশী দ্বংসাহস ঐ টিকটিকি কিরীটী রায়ের। বলতে বলতে সহসা সে কথার মোড় ফিরিয়ে হাতের তীক্ষ্ণ ছুরিখানা একবার ঘূরিয়েই বৌঁ করে চোখের নিমেষে দরজার দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। সৌ করে ছুরির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগটা এসে কপাটের গায়ে বিঁধে থর-থর করে কাঁপতে লাগল।

ব্যাপারটা এত চাকিতে ঘটে গেল যে, কিরীটী ক্ষণপ্রবেশ স্বপ্নেও তা ভেবে উঠতে পারেন।

কত বড় খরসম্মানী দৃষ্টি চারিদিকে সজাগ রেখে লোকটা সদাসতক থাকে, সে কথা ভাবলেও বৃষ্টি সৰ্ত্ত শ্রদ্ধার ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থেতে হয়। কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছ থেকে সরে পড়বার পূর্বেই—ক্ষুধিত নেকড়ের মত দ্বাই হাত দিয়ে টেবিলের ওপর তর দিয়ে, সামনে উপবিষ্ট লোক দ্বিতোর ঘাড়ের ওপর দিয়েই, সেই কৃৎসত-দর্শন লোকটি দরজার গোড়ায় এসে পড়ল মৃহূর্তে এবং এক বাট্কা মেরে দরজাটা খুলেই সে কিরীটীর কাঁধে একটা হাত দিয়ে চীনা ভাষায় কঠোর স্বরে বললে, কি শুনছিলি হতভাগা!

তারপর বিরাট এক ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড় ধরে তাকে সামনের টুলাটির ওপর

বসাতে থেতেই ঘরের আলোয় অদ্বৰ্য দৃষ্টি সহিংস চীনা ঘুরকটার দিকে তার নজর পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে দু পা পিছিয়ে গেল।

ଆର ଦୋର କରା ସଂଗ୍ରହ ନାୟ, ଶୁଦ୍ଧ ବୋକାମ୍ବି—ଭେବେଇ କିରାଟୀ ମୁହଁର୍ତ୍ତେ
ଜୋରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ମେରେ ଲୋକଟାକେ ଏକ ପାଶେ ସରିଯେ ଦିଯେ ଚାକିତେ ଘରେର ମଧ୍ୟେ
ପ୍ରବେଶ କରେ ଭିତର ଥିକେ ଖିଲ ତୁଳେ ଦିଲ ।

অদ্বৰে ঘেৰেয় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে সনৎ। ওঁদিকে ঘৰের মধ্যে উপৰিষ্ঠ লোক দুটো কিৱাটীৰ খিল বন্ধ কৰাৰ শব্দে চমকে ফিরে তাকাল। ততক্ষণে কিৱাটী দৱজাৰ গা থেকে সেই ছু্যাইটা এক টান ঘেৰে ভুলে নিয়ে সনৎ-এৰ কাছে গিয়ে পটাপট কৰে তাৰ বাঁধন কাটিতে শৰু কৰে দিয়েছে।

ଲୋକ ଦୁଟୋ ସତ୍ୟାଇ ବିଶ୍ୱରେ ଏକବାରେ ହତଭ୍ୟ ହେଁ ଗେଛେ । କିନ୍ତୁ ମୁହଁତେର ଜନ୍ୟ, ପରକ୍ଷଣେଇ ତାରା ଦ୍ୱାଜନେଇ ଏକମ୍ବଣେ ଛୁଟେ ଏଲ କିରୀଟୀର ଦିକେ । କିରୀଟୀ ଫିରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ପ୍ରଥମ ଲୋକଟିର ହାତେ ଛାର ଦିଯେ ଭୀଷଣଭାବେ ଏକ ଆସାତ କରିଲେ । ଲୋକଟା ସଙ୍ଗେ ଚିକାର କରେ ପିଛିଯେ ଗେଲ ।

এবং একে দরজার গায়ে মৃত্যুর ধাক্কা পড়ছে। আর বাঁধন কেটে দিতেই
বাকী বাঁধনগুলো পট-পট করে ছিঁড়ে ফেলে সনৎ এসে উঠে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে সেই লোক দুটো ছুটে এসে আবার ওদের আক্রমণ করল। কিরীটী আর সনৎ কায়দা করে লোক দুটোর কবল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল।

ওঁদিকে বাইরে থেকে তখন মৃহূর্মৃহূ ধাক্কায় দরজাটা প্রায় ভেঙে পড়বার ঘোগাড়, আর লোক দুটো তখন ওদের ধরবার জন্য প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছে। তাদের চোখ-মুখে সে কি ব্যাকুল আগ্রহ!

କିମ୍ବାଟିଥି ସ୍ପଷ୍ଟତା ବୁଝିଲେ, ଏହିଭାବେ ବେଶିକଣ ଆସାରକ୍ଷା କରା
ମୋଟେଇ ଚଲିବେ ନା । ବାଇରେ ଥିଲେ ଦରଜା ଭେଦେ ଫେଲିବେଇ, ତାହାଡା ଏଦେର ଦଲେ
କଜନ ଆଛେ, ତାଇ ବା କେ ଜାନେ ! ଏଥାନ ଥିଲେ ବାଣିଶ ହାଜାର ଜୋରେ ବାଜାଲେବେ
ବାଇରେ ଅପେକ୍ଷମାଣ ସ୍ଵର୍ଗ ବା ରାଜେନବାବୁ କେଉଁଠି ଶୁଣିଲେ ପାବେନ ନା ।

সহসা এমন সময় মডুলত করে প্রচণ্ড শব্দে দরজাটোর খিলটা ভেঙে গেল
এবং ভাঙা দরজাপথে অঙ্গ আয়াসেই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল একটি
আগেই আক্রমণকারী কৃৎসন্ত-দর্শন সেই লোকটা পুষ্ট-বৰ্দিত ঝুঁক শাদৃলের
প্রচণ্ড জিঘাসায়।

କିରୀଟୀ ମଥର ହେଲେ ଦାଁଡ଼ାଳ ।

11 8 11

সংক্ষিপ্ত

କେବଳ କିରୀଟୀଇ ନାଁ ।

ଭୀଷମ-ଦର୍ଶନ ଲୋକଟା ଦରଜାର କପାଟ ଭେଣେ ସରେ ପ୍ରବେଶ କରାର ସଂଗେ ସଙ୍ଗେଇ ସ୍ଵରେର ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାଜନାନ୍ତ ଏକେବାରେ ଚୁପ କରେ ଦାଁଡ଼ିରେ ଗିରେଛିଲ ମୁହଁତେର ଜନ୍ୟ ।

যেন মন্ত্রপূর্ত বারি ছিটিয়ে সকলকে মোহাছছন করা হয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড ত্রুটি দ্রষ্টিতে কিরীটীর দিকে পলকহারা দ্রষ্টিতে তাকিয়ে শোকটা আচমকা একটা বাজের মত তৈর্ক্ষ্য হাসি হেসে ওঠে। বীভৎস হাসিতে ঘরটা যেন ঝর্ন ঝর্ন করে ওঠে। সেই ভীষণ-দর্শন লোকটি হাসছে হা হা করে। হাসির ধমকে যেন ভেঙে গুড়িয়ে পড়ছে। পরক্ষণেই সহসা ঝন্ট ঝন্ট করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে জমাট অন্ধকারে সমস্ত ঘরটা ভেঙে গেল। কিরীটী পকেট হতে পিতলের ভারী সিগারকেস্টা নিক্ষেপ করে ঘরের বাতি ভেঙে দিয়েছে বলেই কাঁচ-ভাঙার শব্দ উঠেছে।

আচমকা অন্ধকারে যেন মৃহূর্তের জন্য সব নিস্তর্থ হয়ে গেছে আবার। কিন্তু সেও অতি অল্পক্ষণের জন্মাই।

ততক্ষণে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা বিত্রী হৃষ্টোপ্তৃত বেধে গিয়েছে। কিরীটী বাঁ হাত দিয়ে সনৎ-এর একটা হাত আগে থেকে ধরে রেখেছিল, এখন গোলমালের মধ্যে সনৎকে নিয়ে ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টা করল এবং চাপা গলায় সনৎকে বঙ্গলে, সনৎবাবু, চেষ্টা করুন পালাবার।

কিন্তু সহসা কে যেন এমন সময় পিছন থেকে তাকে দৃ হাতে জাপটে ধরল।

অন্ধকারেই কিরীটী একটা প্রবল ঝটকা দিয়ে আততায়ীর আক্রমণ থেকে আপনাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতেই ব্ৰহ্মতে পারে আততায়ীর দৈহিক শক্তি অপরিসীমী। কাজেই সনৎ-এর হাতটা ছেড়ে দিয়ে দৃ হাতে সবলে আপনাকে মুক্ত করে নেবার জন্য সচেষ্ট হল।

দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে কেউ কম যায় না। উভয়েই প্রাণপণে যুক্ত চলেছে।

কিরীটী যত যুদ্ধসূর প্যাঁচ প্রয়োগ করে, আততায়ী ঠিক তার উল্টোটি দিয়ে আপনাকে অক্রেশ মুক্ত করে নেয়। ওদিকে ঘরের মধ্যে ত্রয়ে আরও গোলমাল বেড়ে উঠেছে। সহসা ঐ সময় অন্ধকারে একটা ক্ষীণ ঘন্টণা-কাতর চিংকার শোনা গেল।

সেই চিংকারের শব্দে সকলেই চমকে উঠল। সেই ঘন্টণা-কাতর শব্দে মৃহূর্তের জন্য কিরীটী ও তার আক্রমণকারীর শক্ত মুক্তি ও বোধ হয় শিরখন্থ হয়ে গিয়েছিল।

কিরীটী ঐ স্মৃযোগ হেলায় হারালে না। আততায়ীকে জোরে এক ধার্কা দিয়ে সামনের দিকে হুমকি খেয়ে পড়তেই, খোলা দরজাপথে বাইরের সরু গালপথের মধ্যে এসে ছিটকে পড়ল। সেই চীনা যুবকটি তখনও তের্মান হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল সেইখানেই।

এক লাফ দিয়ে সেই লোকটিকে ডিঙিয়ে কিরীটী দরজার দিকে ছুটল। ছুটতে ছুটতে সদর দরজার কাছাকাছি এসে দেখতে পেল চেপ্টা-মুখ বুড়ীটা তখনও দরজার কাছে তের্মান ভাবে পড়ে আছে।

কিরীটী যেমন দরজার খিলটায় হাত দিতে যাবে, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে শুনতে পেল খুট-খুট-খুট, একটা শব্দ।

দরজা খোলবার সাংকেতিক শব্দ। খিল খুলতে উদ্যত হাতধার্ম যেন সহসা অর্ধপথেই থেঁমে যায়। কিরীটী অল্পক্ষণের জন্য রুক্ষনিঃশ্বাসে স্থির আচ্ছল হয়ে দাঁড়িয়ে রাইল। তার মনে হল—এক-একটি মৃহূর্ত যেন এক-

একটি যুগ।

କି ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ! ପ୍ରତି ଲୋଗକୁ—ପ୍ରତି ରକ୍ତକଣ—ଦେହର ଓ ମନେର ସମୟ ବୋଧଶକ୍ତି ଯେନ ଏକ ଅସୀମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଯାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଉଠେଛେ । ଏମନ ସମୟ ଅନ୍ଦରେ ଏକଇ ସଂଖେ ଅନେକଗୁଲୋ ଦୃଢ଼ ପାରେଇ ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଗେଲ । ଶବ୍ଦ ଶୁଣେ ମନେ ହେଲ, କାରା ଯେନ ଶଶ୍ଵାସରେ ଏଇଦିକେଇ ଛଟେ ଆସିଛେ ।

କିରୀଟୀ ଚଣ୍ଠଳ ହେଲେ ଓଠେ । ଆବାର ବାଇରେ ଥେବେ ଶବ୍ଦ ହଲ—ଥୁଟ୍-ଥୁଟ୍-
ଥୁଟ୍ ଏ ମସଗ୍ରେ ।

ওঁদিকে পায়ের শব্দ তখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে। আর অপেক্ষা করা বিপজ্জনক, সন্তোষ এল না। এক বটকায় খিলটা থুলেই সামনের দিকে ঝাঁপয়ে পড়ল কীর্তী।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঐ আন্দোলন হইতে বোধ হয় একজন লোক কপাটে সংকেত-
খবনি করছিল। দরজা খুলে কিরণটী আধাৰে আচমকা তার উপর ঝাঁপিয়ে
পড়তেই লোকটা হড়মুড় করে ধৰাশায়ী হল। কিরণটীও মাটিতে পড়ে গিয়ে-
ছিল, কিন্তু তাঁড়বেগে উঠে দাঁড়িয়েই পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত্মাত্ব না করে
গলিপথে বড় রাজ্ঞার দিকে দোড় দিল। ততক্ষণে আন্দোলন সকলে দরজার
কাছে এসে জড়ে হয়েছে।

କିରୀଟୀ ଗଲିଟାର ପ୍ରାୟ ଶୈଶାଶ୍ଵି ଏସେ ପଡ଼େଛେ, ଠିକ ଏମନ ସମୟ ଏକଟା ତୌକ୍ୟ ଛରିବାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଏସେ ତାର ବାଁ ହାତେର ମାଂସପେଶୀର ଉପର ବିଁଧି ଗେଲା । ବିଷ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଚ୍ଛପଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ କରେ ଦାର୍ଢିଯେ ପଡେ ମୁହଁରେ ଜନ୍ୟ କିରୀଟୀ ।

କିନ୍ତୁ ଏହିଭାବେ ଅନ୍ଧକାର ଗଲିପଥେ ଶପ୍ଦର ସୀମାନାର ମଧ୍ୟେ ଆର ବେଶୀକଣ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକାଓ ନିରାପଦ ନୟ ଭେବେ କିରାଟୀ ଅତି କଟେ ଡାନ ହାତ ଦିରେ ଛୁରିଟାକେ ଟାନ୍ ଦିରେ ଖୁଲେ, ଡାନ ହାତେର ପାତା ଦିରେ କ୍ଷତିଥାନ୍ତା ସଜୋରେ ଚେପେ ଧରେ ଟଳିତେ ଟଳିତ ଏଗିଯେ ଚଲିବ ବ୍ୟାମ୍ଭାତାର ଦିକେ ।

সুরত ও রাজ্য নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছিল বটে, কিন্তু কিরীটী
তাদের খোঁজ করলে না। সম্ভবতঃ নিদারণ পরিশ্রমে এবং বারংবার আক্রান্ত
হয়ে সে-সব কথা চিন্তা করবারও ব্যর্থ তার দেহের বা মনের অবস্থা
ছিল না।

বড় রাস্তার ওপরে এসেই প্রথমে সে রূমাল দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরল।
চেচুর রক্তকরণ হচ্ছে, ঘাথাটাও গুরু পরিশয়ে বিমর্শ করছে তখন।

11 50 11

अनुसंधान

ଜ୍ଞାନ ତଥନ ପ୍ରାୟ ସାଡ଼େ ଏଗାରୋଟା ।

ବୈଣିଙ୍କ ସ୍ଟ୍ରୀଟ ପ୍ରାୟ ଜନଶୂଳ୍ୟ ହରେ ଏସେଛେ । ମାଝେ ମାଝେ ଶୁଧି ଦ୍ୱାରା ଏକଟା ମୋଟରଗାଡ଼ିର ହର୍ନ୍ କିବା ରିକଶାର ଠୁୱୁ ଠୁୱୁ ଆଓଯାଜ ପାଉଯା ଯାଏ ।

জনহীন শহরে যেন ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন।

দোকানপাট প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। দ্ৰ-একটা জুতোৱ দোকান তখন
অবিশ্য খোলা। কোন দোকানে খণ্ডের নেই, কেবল দোকানে ক্যাশিয়ার খাতার

ওপৰ বুঁকে পড়ে সাবা দিনের বেচাকেনার জমাখরচ ঠিক কৰছে। এক দোকানের পাশে কৱেকটি চীনা জটলা পাকিয়ে নিজেদের মধ্যে তক্বিতক কৰছে।

একটা তেলা বাড়ির নাচে বাঁধানো রোয়াকে কতকগুলো ভিখারী জড়ে হয়ে নিজেদের স্থ-দৃশ্যের কথা বলছে। তাদের কেউ কেউ আবার দেয়াল থেকে প্ল্যাকার্ড ছিঁড়ে নিয়ে শোবার ব্যবস্থা কৰছে।

কিরীটী সে-সব দিকে লক্ষ্য না কৰে এগিয়ে চলল। লালবাজার থানাটা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে এসেই কিরীটী কি ভেবে দাঁড়াল।

একখানা ট্যাঙ্ক সেদিকে আসছে। ট্যাঙ্কটাকে হাত-ইশারায় দাঢ়ি কৰিয়ে ট্যাঙ্কতে উঠে বললে, টালিগঞ্জ—

ক্লান্ত অবসন্ন কিরীটী চলমান ট্যাঙ্কের নরম গাদিতে গা এলিয়ে দেয়।

ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে-মুখে এসে যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়। ট্যাঙ্ক ছুটে চলেছে টালিগঞ্জের দিকে।

নিস্তব্ধ নিশ্চীথ রাত্রি।

মাথার ওপৰে সীমাহীন কালো আকাশ ঘেন সর্বাঙ্গে তারার রঞ্জিতিত ওড়না জড়িয়ে তল্পাচ্ছান্ন।

চৌরঙ্গীর দীপমালা-শোভিত পিচচালা রাস্তার ওপৰ দিয়ে গাড়ি বেগে ছুটে চলেছে। গাড়ির সীটে দেহভার এলিয়ে দিয়ে কিরীটী চোখ বুজে পড়ে থাকে।

বাড়িতে পোঁছে কড়া নাড়তেই জংলী এসে দুরজা খুলে দেয়।

ট্যাঙ্কের ভাড়াটা দিয়ে দেয় জংলী।

ভাড়া মিটিয়ে ওপৰে এসে জংলী দেখে কিরীটী একটা সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে। জংলী ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কিরীটীর জামায় রক্ত দেখে সর্বিস্ময়ে বলে, ও কি বাবুজি, এমন কৰে জথম হল কি কৰে বাবুজি!

পিছন হতে অশ্বকারে ছুরি মেরেছে রে! তুই এক কাজ কর—ইলেক্ট্রিক স্টেভে খানিকটা জল গরম কৰে নিয়ে আয়। আর ঐ পাশের ঘরের সেলফে আইডিন আৰ তুলো আছে, নিয়ে আয়।

জথম থুব গুৱাতৰ হয়নি। ক্ষতস্থান বেশ ভাল কৰে চেপে বেঁধে দিয়ে জংলী কিরীটীকে হাত ধৰে এনে শয্যায় শুইয়ে দিল। ফাস্ট এইড দেওয়া কিরীটীর নিকটেই জংলীর শিক্ষা।

পৱের দিন সকালে যখন কিরীটীর ঘুম ভাঙল তখন ভোরের সোনালী রোদে সূন্নলীল আকাশ ঘেন বক্বক্ব কৰছে। খোলা জানালা দিয়ে খানিকটা প্রভাতী রোদ পায়ের ওপৰ এসে পড়েছে। বারান্দায় থাঁচায় পোষা ক্যানারী পার্থিটা থেকে থেকে শিস দিচ্ছে। বাগানে বোধ হয় রজনীগন্ধা তার মধ্যে মিস্টি গন্ধ বাতাসে ভাসিয়ে আনে।

কিরীটীর গা-হাত-পায়ে অল্প অল্প বেদনা আছে, মাথাটাও ঘেন একটু ভারী-ভারী মনে হয়। শয্যায় উপৰ চোখ বুজে শুয়েই কিরীটী গত-রাত্রের সমস্ত কথা আগাগোড়া একবার ভাববাব চেষ্টা কৰে। গতরাত্রে দৃশ্যসাহসিক অভিযানের ব্যাপারটা এখনও মনের উপৰ ছায়াবাজির মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

নিঃশব্দে জংলী এসে ঘরে প্রবেশ করে। বললে, বাবুজি! তাৰিছত আচ্ছ হ্যায় তো?

হ্যাঁ, বহুৎ তন দুরস্তি মালুম হোতা, এক কাপ চা নিয়ে আয় তো বাবা! শয়া ত্যাগ কৱে কিৱীটী বাথৰুমে গিয়ে প্রবেশ কৱল।

মুখ হাত ধূয়ে মাথাটা বেশ কৱে জলে ভিজিয়ে, স্নানেৰ ঘৰ থেকে নিষ্কৃত হয়ে শিস দিতে দিতে কিৱীটী বসবাৰ ঘৰে এসে ঢুকতেই সুৱত ও রাজুকে সেখানে বসে থাকতে দেখল। অভ্যৰ্থনাৰ পৱে হাসতে হাসতে বলে ওঠে, সুপ্ৰভাত—সুপ্ৰভাত! কতক্ষণ এলেন?

অলপক্ষণ। তাৱপৰ কেমন আছেন? শুনলাম কাল রাত্ৰে নাকি হাতে জথম হয়েছেন। প্ৰশ্ন কৱে সুৱৰ্তন।

হ্যাঁ, ও কিছু নয়। চলুন চা-পৰ্টা শেষ কৱে একবাৰ কালকেৱ আস্তাটাৱ হানা দিয়ে আসা যাক, যদি কিছুৰ সন্ধান মেলে।

তাতে কি কোন ফল হবে, আপৰ্নি মনে কৱেন?

বলা যায় না, তাছাড়া যদি—

সুৱত ও রাজু কিৱীটীৰ কথায় হো হো কৱে হেসে উঠল। সুৱত বলল, —যদি কি? যদি একপাটি ছেঁড়া জুতো বা একটা ভাঙা ছৰ্ণৱ বাঁট—নিদেন-পক্ষে দেওয়ালেৰ গায়ে একটা হাতেৰ ছাপ পাওয়া যায়?

কিৱীটী ওদেৱ কথার ভঙিগতে মৃদু, মৃদু হাসতে লাগল। বললে, হ্যাঁ, ডিটেক্টিভৱা নাকি ঐ সব সত্ৰ ধৰেই অনেক সময় বড় বড় পাপানুষ্ঠানেৰও কিনারা কৱে ফেলেন শুনতে পাওয়া যায়।

জংলী এসে চায়েৰ ট্ৰে হাতে ঘৰেৰ মধ্যে প্রবেশ কৱল। এবং সামনেৰ তিপয়েৰ ওপৰ ট্ৰেটা মাঝিয়ে রাখল।

চা-পানেৰ পৱ তিনজন রাস্তায় এসে নামল।

এৱ মধ্যেই বাইৱে রোদ্বেৱ তাপ বেশ প্ৰথৰ হয়ে উঠেছে। একটা ট্যাঙ্কি ভাড়া কৱে তিনজনে উঠে বসল।

একসময় কিৱীটী বললে, আমৱা তো কালই রওনা হৰ্ছি! কি বলেন, সুৱতবাৰু?

হঁ। কিন্তু সন্দৰ্ভ কোন একটা কিনারা তো হল না এখনও! বললে সুৱত।

সন্দৰ্ভবাৰু আপাততঃ কলকাতাতেই আছেন।

কিৱীটীৰ কথায় রাজু ও সুৱত চমকে উঠে বিস্ময়-ভৱা কণ্ঠে শুধাল, সে কি!

হ্যাঁ। কাল রাত্ৰে সামান্য একটু ভুলেৰ জন্য তাঁকে সেই শয়তানেৰ আস্তায় ছেড়ে আসতে বাধা হয়েছি, কিন্তু একটা বিষয়ে নিৰ্শিত আছি।

কি?

তাঁকে তাৱা প্রাণে মাৰবে না।

তাৰেৰ আপৰ্নি চেনেন না মিঃ রায়। এ সংসাৱে তাৰেৰ অসাধ্য কিছুই নেই। এমন কোন পাপ কাজ বা দুঃক্ষম নেই যা ওদেৱ বিবেকে বাধে। ওৱা নেকড়েৰ চেয়েও হিংস, সাপেৰ চেয়েও খল।

কিৱীটী মৃদু, মৃদু হাসতে লাগল। পৱে গম্ভীৰভাৱে বললে, কিন্তু এক্ষেত্ৰে মেৰে ফেললে যে ওদেৱ কাজ হাসিল হবে না সুৱতবাৰু। যে ফাঁদ

ওরা পাততে চায় সে বড় বিষম ফাঁদ। কিন্তু ওদের হিসাবেই সামান্য একটু ভুল হয়ে গেছে এবং সেইটুকু শুধুরে নেওয়ার জন্য ওরা বোধ হয় সন্দেশকে নিয়েই কালকের জাহাজে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রেঞ্জেন রওনা হবে, এই পর্যন্ত বলে কিরীটী একে একে গতরাত্রের সমস্ত ঘটনাই আগগোড়া খুলে ওদের বলে গেল।

স্বীকৃত কিরীটীর মুখে গতরাত্রের আনন্দপূর্বক কাহিনী শুনে বললে, তা হলে দেখাই সত্যসতাই আপনি ভাগ্যবান! প্রথম ঘণ্টাতেই মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ মিলে গেল!

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, না, এবারেই প্রথম সাক্ষাৎ নয়। ইতিপূর্বে আরও একবার দর্শন মিলেছিল।

সে কি! দৃজনেই একসঙ্গেই প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, খোঁড়া ভিক্ষুকই স্বয়ং মহাপ্রভু। বলে আবার কিরীটী খোঁড়া ভিক্ষুকের কাহিনীটাও ওদের বললে।

ট্যাঙ্ক ছুটে চলেছে চীনাপিটির উল্লেশে। রাজপথে অসংখ্য লোক। পিপৌলিকার সারার মত যে যার গৃহত্বপথে চলেছে। অফিস টাইম। বাস-ট্রামগুলো যাহাতে যেন একেবারে ঠেসা।

কিরীটী বললে, একটা কথা ভাবছি, চীনাপিটিতে হৃট করে গিয়ে আগেই ওঠা বৃদ্ধিমানের কাজ হবে না। আটবাট বেঁধে কাজে নামতে হবে।

কি করবেন তাহলে? স্বীকৃত প্রশ্ন করে।

আমরা প্রথমে লালবাজারে যাব, সেখানে চৌধুরী বলে একজন সি. আই.ডি. ইন্সপেকটারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় আছে। তাকে সব কথা খুলে বলে লালপাগড়ির সাহায্য নিতে হবে।

লালপাগড়ি!

হ্যাঁ, জানেন না তো, চোর-ডাকাত-গুল্ড মহলে লালপাগড়ির মহিমা অপরিসীম।

লালবাজারের কাছাকাছি এসে ওরা ট্যাঙ্কিটা বিদায় করে দিল ভাড়া মিটিয়ে।

চৌধুরী অফিসেই ছিল। কিরীটী তাকে সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবার পর চৌধুরী সানন্দে কিরীটীকে সাহায্য করতে রাজী হয়ে গেল। এবং চৌধুরীর নির্দেশমত তখনই থানা থেকে দৃজন কনস্টেবল কিরীটী তার সাহায্যের জন্য পেল।

থানা থেকে বের হয়ে কিরীটী সদলবলে যখন হংকং স্ব. ফ্যাক্টরীর সামনে এসে হাজির হল, বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশশটা বাজে।

দোকানের ঠিক সামনে একজন প্রোটোবয়সী চীনা একটা কাঠের টুলের ওপরে বসে একটা লম্বা পাইপ মুখে গুঁজে বিমোচিল। ওদের জুতোর শব্দে লোকটা হঠাত চমকে মুখ তুলে তাকাল এবং পরক্ষণেই সাদরে আহবান জানাল, জুর্তি সাব! আচ্ছা জুর্তি!

দোকানের ভিতরে একটি অল্পবয়সী চীনা যুবতী কাঁচ দিয়ে চামড়া কার্টছিল আর মেসিনে বসে একজন আধাবয়সী চীনা যুবক কি যেন সেলাই করছিল।

কিরীটীদের সকলকে দোকানে প্রবেশ করতে দেখে ওরা দৃজনেই মুখ

তুলে একবার মাত্র চেয়ে আবার যে যার কাজে মন দিল। দোকানটি ষে খুব
বড়গোছের তা নয়—

নাতিপ্রশস্ত একখানা হলঘর। ওপরে প্ল্যাটফরমের মত কাঠের রেলিং
দিয়ে যেরা। একপাশে পূর্ণানো চামড়ার টুকরো স্তুপাকার করে রাখা হয়েছে।
অন্য একপাশে দেখা যায় ওপরে ওঠবার জন্য একটা কাঠের সিঁড়ি। কিরীটী
তার খরসম্বানী দ্রষ্ট্ব বুলিয়ে চারিদিকে ভাল করে দেখতে লাগল।

কনস্টেবল দুজন কিরীটীর নির্দেশেই দোকানের ভিতর ঢেকেন। তারা
ওদিককার ফ্লুটপাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

কি জুতি চাই বাবু?—প্রশ্ন করলে চীনা ষ্টুবকাটি আধো আধো বাংলায়।

কিরীটী গম্ভীর হয়ে বলল, আমরা তোমাদের দোকানঘরটা একবার সার্ট
করব বলে এসেছি।

কথাটা শোনামাত্র চীনা ষ্টুবকাটি মেশিন ছেড়ে উঠে এল এবং বেশ পরিষ্কার
ইংরাজীতে শুধুল, কেন, কি কারণে জানতে পারি কি?

কিরীটী দোকানের ভিতর চারিদিকে ইত্যত দ্রষ্ট্বপাত করতে করতে
উদাস স্বরে জবাব দেয়, সরকারের হৃকুম।

চীনা ষ্টুবক রাঙ্ক স্বরে জবাব দিল, তোমার ও হৃকুম আমি মানি না
বাবু। এখনই তুমি আমার দোকান থেকে বেরিয়ে যাও, তা না হলে বিপদে
পড়বে।

কিরীটী গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, বিপদে আমি পড়ব না, আমায় না
দেখতে দিলে তুমই বিপদে পড়বে সাহেব।

ইতিমধ্যে ওদের কথা-কাটাকাটির আওয়াজ পেয়ে পাশের একটা দরজা
থলে আরও দুজন হোমরাচোমরা গোছের চীনা বেরিয়ে এল। তারা বললে,
কি হল বাবু?

কিরীটী ওদের দিকে একান্ত তাছিল্যভরে চেয়ে জবাব দিল, এই দোকানটা
একবার আমরা ভাল করে দেখতে চাই।

কেন? রাঙ্ক স্বরে একজন প্রশ্ন করে।

কিরীটী যেন ওদের ভ্রান্তিপমাত্রও না করে স্বত্তর দিকে তাকিয়ে বললে,
চলুন স্বত্তবাবু, আমরা আমাদের কাজ করি।

কিরীটীর মুখের কথা শেষ হল না, চোখের পলকে ওদের একজন স্বত্তর
সামনে এসে দাঁড়াল এবং মৃহূর্তে সেই পরিষ্কার দিবালোকেই একখানা সূতীক্ষ্ণ
বাঁকানো ছুরি ওদের গর্তপথ রোধ করে।

॥ ১১ ॥

কালো ছাগরের ইচ্ছা

চেখের পলক ফেলার আগেই কিরীটী চীনা লোকটির ছুরিসমেত হাতখানা
ধরে এক হেঁচকা টানে নিজের দিকে টেনে নিয়ে কনুইটা চেপে ধরে লোকটার
হাতটা মুছড়ে দিল।

একটা অঙ্গুষ্ঠ চীৎকার করে চীনাটা ছুরিখানা ফেলে দিল। আর ঠিক সেই

ମୁହଁତେ କିରୀଟୀ ବାମ ହାତ ଦିଯେ ଛୋଟ୍ ଏକଟା ବାଁଶ ବେର କରେ ତାତେ ସଜୋରେ ଫୁଲ ଦିଲ ।

ବାଁଶର ଆଓୟାଜ ପେଯେ ଦୂରପଦେ ଅପେକ୍ଷମାନ କନ୍ସ୍ଟେବଲ ଦୂଜନ ଏସେ ଦୌକାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ । ‘ଲାଲପାର୍ଗଡ଼’ର ଶ୍ରୀଭାଗମନ ଦେଖେ ଚିନାଦେର ମୁଖେର ଭାବ ସେଇ ନିମ୍ନେସେ ବଦଳେ ଯାଇ । ତାରା ଏକାଳ୍ପି ନିରୀହ ପୋଷା ଜୀବାଟିର ଘର ଏକ-ପାଶେ ସରେ ଦାଢ଼ାଲ ଯାଥା ନୀଚ୍ବୁ କରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ।

କିରୀଟୀ ଏକଜନ କନ୍ସ୍ଟେବଲକେ ଚୋଥେର ଇଶାରାଯ୍ୟ ଡେକେ ନିଯେ, ଦରଜାଟା ଥିଲେ ଏକଟୁ ଆଗେ ସେଇ ଚିନା ଲୋକ ଦୂଟୋ ଚାକେଛିଲ ସେଇ ଦରଜାର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଗେଲ ନିର୍ଭୀକ ପର୍ଦାବିକ୍ଷେପେ ।

ଦରଜା ଥିଲେ କିରୀଟୀ, ସ୍ଵର୍ଗତ ଓ ଏକଜନ କନ୍ସ୍ଟେବଲ ଗିଯେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ । ସାମନେଇ ଏକଟା ମାଧ୍ୟାରିଗୋହେର ଘର । ସରଟା ଦିନରେ ବେଳାତେବେ ବେଶ ଅଳ୍ପକାର । ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୂଟୋ ସ୍କାଇଲାଇଟ ବସାନୋ ଆହେ ବଟେ ଏବଂ ଓଦିକେ ଆର ଏକଟା ଦରଜାଓ ଆହେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାର କପାଟ ଭେଜାନୋ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ସରଟା ଅଳ୍ପକାର ।

ବାଇରେ ଆଲୋ ଆସବାର କୋନ ପଥ ତୋ ନେଇ-ଇ, କୃତ୍ୟ ଆଲୋରାଓ ତେବେନ କୋନ ବନ୍ଦୋବସତ ନେଇ ସରଟାର ମଧ୍ୟେ । ସ୍କାଇଲାଇଟେର ଫାଁକ ଦିଯେ ସାମାନ୍ୟ ସେ ଆଲୋ-ଟକୁ ଘରେ ଆସେ ତାତେଇ ସାମାନ୍ୟ ସେଇ ଏକ ମୁଦ୍ର ଆଲୋ-ଆର୍ଥିରର ସୃଣିଟ ହରେଇ ।

କିରୀଟୀ ଖରସନ୍ଧାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଯେ ଚାରିଦିକେ ଦେଖିତେ ଲାଗିଲ । ଘରେର ଏକ କୋଣେ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରା ଏକଗାଦା କାଗଜେର ତୈରୀ ଜୁତୋର ବାକ୍ଷ । ଆର ଏକ କୋଣେ ଏକଟା ଜୁତୋ ସେଲାଇୟର କଲ । ଦେଉଯାଲେ ଏକଟା ଓୟାଲ-ଲ୍ୟାମ୍ପ । ଲ୍ୟାମ୍ପଟାର ଚିରନ୍ତିର ଗାରେ ଏକରାଶ କାଲ ଜମେଇଛେ । କତକଳ ପରିଷ୍କାର କରା ହସିନ କେ ଜାନେ !

ଓରା ଏଗିଯେ ଏସେ ପ୍ରଥମେହି ଓଦିକାର ଦରଜାଟା ଥିଲେ ଫେଲିଲ । ସାମନେଇ ଏକଫାଲ ବାରାନ୍ଦା । ସେଥାନେ ତବୁ ଯା ହୋକ ଖାନିକଟା ଆଲୋ ଏସେ ପଡ଼େଇ ବାଇରେ ।

ବାରାନ୍ଦାର ସଂଲଗ୍ନ ପର ପର ଦୁଃଖାନା ଘର । ପ୍ରଥମ ସରଟା ନେହାଏ ଛୋଟ ନାହିଁ । ସେଥାନେ କତକଗ୍ଲୋ ଚେଯାର-ଟେବିଲ ଓଲଟ-ପାଲଟ ହରେ ଇତ୍ତମ୍ଭତ ବିକ୍ଷିପ୍ତଭାବେ ପଡ଼େ ଆହେ । ମନେ ହେବ କାରା ବୁଝି ସରଟାର ମଧ୍ୟେ ଏସେ ହୁଟୋପ୍ଲଟ୍ କରେ ଗେଛେ । ଘରେର ମେବେର ଏକଟା ଟେବିଲ ଲାମ୍ପ ଉଲ୍ଟେ ପଡ଼େ ଆହେ, ଖାନିକଟା ଜାଯଗାର କେରୋସିନ ତେଲେର ଦାଗ । ଭାଙ୍ଗ ଚିରନ୍ତିର ଟୁକରୋଗ୍ଲୋ ସରମର ଇତ୍ତମ୍ଭତ ଛଡ଼ାନୋ । କିରୀଟୀ ଭାଲ କରେ ସବ ଦେଖିତେ ଦେଖିତେ ବୁଝାତେ ପାରେ, ଏହି ସରଟିଇ ଗତରାତ୍ରେ ସେଇ ଘଟନାମ୍ବଲ । ଏହି ଘରେଇ ଗତରାତ୍ରେ ଖଣ୍ଡପ୍ରଳୟ ସଟେ ଗେଛେ । ଶାନ୍ତ ସରଖାନି ସେଇ ପ୍ରଲୟକାଣ୍ଡର ମୌନ ସାକ୍ଷୀ ହେବ ରାଯେଇ ଏଥନ୍ତି ।

ଘରେର ବାତାସଟା ସେଇ କେରୋସିନେର ତେଲେର ଉଗ୍ର ଗନ୍ଧେ ଭରେ ଆହେ । ନାକ ଜବଲା କରେ । କିରୀଟୀ ଆରଓ ଏକବାର ଭାଲ କରେ ସରେର ଚତୁର୍ପାଇସ୍ଟା ଦେଖେ ନିଲ । ଭାଙ୍ଗ ଚେଯାର-ଟେବିଲଗ୍ଲୋ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛିଇ ନେଇ । କିରୀଟୀ ଅତଃପର ଘର ଥିଲେ ନିଷ୍କର୍ଷାତ ହେବ ପାଶେର ସରେ ଏସେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ ।

ଏ ସରଟା ଅବଶ୍ୟ ଆଗେର ଚାଇତେ ଅନେକ ଛୋଟ ଏବଂ ଆଗେର ସରଟାର ଚାଇତେ ଏହି ସରଟା ସେଇ ଆଗେର ଏକଟୁ ବେଶୀ ଅଳ୍ପକାର । ମୁକ୍ତ ଦରଜାପଥେ ସାମାନ୍ୟ ସେ ଆଲୋ ଏସେ ସରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଛେ, ତାତେ ଦେଖା ଗେଲ ଏକଟା ଭାଙ୍ଗ ଖାଟିଆର ଓପରେ

আপাদমস্তক একটা মিলন দৃগ্রন্থ চাদর ঘূড়ি দিয়ে কে একজন পড়ে
আছে।

কিরীটীই এগিয়ে এসে চাদরটা টেনে তোলে।

একটা অস্ফুট কাতর শব্দ শোনা গেল।

কিরীটী দেখলে একটা চীনা বৃড়ী।

ভাল করে শায়িত বৃড়ীটার মুখের দিকে দ্রষ্টিপাত করতেই কিরীটী যেন
চমকে ওঠে।

চিনতে এতটুকুও কষ্ট হয় না।

বৃড়ীটার বোধ হয় সুখনদ্বায় ব্যাঘাত ঘটাইল, সে তার অসহিষ্ণু ক্রুক্ক
দ্রষ্ট মেলে পিটাপিট করে কিরীটীর দিকে চেঁরে থাকে।

বৃড়ীর জীবনে এ ধরনের উৎপাত হয়তো খুব কম দেখা দিয়েছে।

কিরীটী চমকে উঠেছিল বৃড়ীটাকে চিনতে পেরেই। এই তো সেই চাপ্টা-
মখ বৃড়ী যাকে সে গতরাতে দাঢ়ি দিয়ে বেঁধেছিল।

হঠাৎ বৃড়ী কিংচির-মিচির করে যেন কি বলতে বলতে উঠে বসল।
কিরীটী ওর মুখের দিকে একবার চেঁরে সুরতকে বললে, চলুন সুরতবাবু,
দেখা যাক আর কোন ঘরটির আছে কিনা!

বারান্দাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা টিনের বেড়া। বেড়ার গায়ে
একটা দরজা; সেই দরজায় একটা দুর্গন্ধি পুরনো চট্টের পর্দা ঝুলছে।

কিরীটী এগিয়ে এসে হাত দিয়ে পর্দাটি তুলে ধরল। ঘরের ভিতর দেখা
গেল তিনিটি চীনা ঘেঁয়ে। তাদের একজন উন্মনে হাঁড়ি চাপায়ে কি যেন
রাঁধছে, একজন একটা ছুরির দিয়ে তরকারি কেটে কেটে একটা ভাঙা সান্ধিকতে
রাঁধছে। অন্যজন একটা ভাঙা মোড়ার উপরে বসে একটা জামা সেলাই করছে।
কিরীটীদের এমনি অর্তাক্ষর ভাবে প্রবেশ করতে দেখে তিনজনেই বিস্মিত
ও চমকিত হয়ে একই সময়ে যে ধার হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়াল।

কিরীটী আফসোসের সুরে বললে, না, কোন ফল হল না। চলুন।

কিরীটীর কষ্টে রীতিমত একটা হতাশার সূর যেন ফুটে ওঠে।

সকলে আবার দোকান থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় নেমে সুরত
কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কিছুই পাওয়া গেল না, এখন কি
করবেন ঠিক করলেন, মিঃ রায়?

কনস্টেবল দুজনকে বিদায় দিয়ে কিরীটী অনায়নস্ক ভাবে এদিক-ওদিক
তাকাতে তাকাতে বললে, কালকের জাহাজে আমাদের রওনা হতেই হবে সুরত-
বাবু। সেভাবেই আমরা যেন প্রস্তুত হই।

সুরত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, সেখানে যাওয়ার কি
কোন প্রয়োজন আছে, মিঃ রায়? সন্দেশকে যখন ওরা এখানেই রেখেছে,
তখন শব্দ শব্দ অত দূর দৌড়ে কি হবে?

সন্দেশবাবুকে অক্ষত দেহে ফিরে পেতে হলে আমাদের কালকের জাহাজে
যেতেই হবে। কেননা একটু আগেই আপনাদের বলেছি, ওরা কালকের
জাহাজেই রওনা হবে।

কিন্তু—

এর মধ্যে আর কোন কিন্তুই নেই সুরতবাবু। পাশার দান উল্টে গেছে,
এ কথা খুবই সঁজি। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠানীর পাশার ঘণ্টি আবার ন্তুন

করে সাজাবার মত বৃন্দি বা ক্ষমতা বেশ আছে। এবং এবারে তার প্রথম ও প্রধান চেষ্টাই হবে, যাতে গতিবারের মত ভুলের জের আর তাকে না টানতে হয়। সে যে একজন দস্তুরহত শয়তান সে বিষয়ে কোন মতবৈধই নেই। সেই সঙ্গে এ কথাটাও যেন আমরা মৃহূর্তের জন্য না ভুল যে, বৃন্দি তার অসম্ভব রুক্ম তীক্ষ্ণ। কাজেই বৃন্দির কৌশলে তাকে পরামর্শ করতে হলে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের একান্তই প্রয়োজন। বলতে বলতে হঠাতে চমকে উঠে উৎকণ্ঠা-মিশ্রিত কণ্ঠে কিরীটী বলে উঠল, সরে যান সরে যান!

কিন্তু সরে যাওয়ার আগেই সাইকেল-সমেত একজন আরোহী এসে হৃড়-মৃড় করে একেবারে সুরুত ঘাড়ের ওপর পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরুত 'উঁ' করে একটা অশ্ফুট চিংকার করে একদিকে ছিটকে পড়ল।

সকলে মিলে ভূপর্তিত সুরুতকে সামলাবার আগেই সাইকেল-আরোহী সাইকেল ফেলে একছুটে সামনের একটা সরু গালিপথে অদ্যশ্য হয়ে গেল।

কিরীটী এগিয়ে এসে সুরুতকে তুলতে তুলতে স্নেহ ও উদ্বেগপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করল, লেগেছে কি? কোথায় লাগল?

সুরুত ডান হাত দিয়ে বাম দিককার কোমরটা চেপে ধরে উঠতে উঠতে কাতর-স্বরে বললে, কোমরে একটু লেগেছে।

ততক্ষণে রাস্তায় কোত্তলী পর্যাকদের মধ্যে অনেকেই সেখানে এসে জুটেছে। নানারকম প্রশ্ন ও অন্তর্বে স্থানটি বেশ মুখর হয়ে উঠেছে। ভিড় ও অবান্তর প্রশ্নেন্তর এড়াবার জন্য কিরীটী হাতের ইশারায় একখানা চলন্ত ট্যাঙ্ক ডাকল এবং সকলে টাঁক্কাতে উঠে বসে বললে, আগহাস্ট স্ট্রীট।

ট্যাঙ্ক ছুটে চলল।

কোত্তলী হৃজ-গাপ্তায় পর্যাকদেরা এমন একটা সরল ব্যাপার সহসা বিনা গোলমালে থেমে যেতে বেশ একটু মনঃক্ষণ হল এবং অগত্যা যে যার গুরুত্ব-পথে চলে গেল।

চলমান ট্যাঙ্কাতে বসে গম্ভীরভাবে বললে কিরীটী, চারিদিকে চেঞ্চে পথ চলতে হয় সুরুতবাবু!

সুরুত সে কথায় কান দিল না। সে ততক্ষণে বাঁ হাত দিয়ে একটা মোটা পিন্সমেত একখানি গোল কার্ড কাপড় থেকে টেনে বের করে হাতের পাতার উপর মেলে দেখাচ্ছিল। এ সেই রকমের একখানি কার্ড, যেমনটি রাজুর গায়ে পরশু রাতে বিধৈছিল। তাতে খুব ছোট ছোট অঙ্করে কি যেন লেখা। কার্ড-খানা চোখের কাছে নিয়ে সুরুত পড়লে—

বৃন্দি, কালো ভ্রমরের হুল শুধু হুলই নয়, এতে বিষের জবালাও আছে। সেই বিষ একবার শরীরে ঢুকলে আর নামে না। সাবধান!

॥ ১২ ॥

আবার ধান্তা শুরু,

পিনটা কালো রংয়ের—দেখতে একটা মোটা বেলের কাঁটার মতই। তার এক দিক সুরুতের আগার মত তীক্ষ্ণ ও ধারালো, অন্য দিকটা ভেঁতা। পিন্টা থেখানে বিধৈছিল, সেখানে হাত বুলোতে বুলোতে সুরুত কাতর স্বরে বললো-

উঁঁ, এখনও জবলা করছে !

ট্যাঙ্গিটা তখনও হ্যারিসন রোড ধরে পূর্বদিকে ছুটে চলেছে। ট্যাঙ্গিচালক মুখ ফিরিয়ে শুধাল, আমহাস্ট স্ট্রীট যে কিধার বাবুসাব ?

তৃতীয় চল। আৰ্মি বলব থন। কিৱীটী ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল।

হ্যারিসন রোড ও আমহাস্ট স্ট্রীটের সংযোগস্থলে এসে কিৱীটী ড্রাইভারকে বললে, গাড়িৰ মোড় ফিরিয়ে আমহাস্ট স্ট্রীট ধরে এগিয়ে যেতে।

সুব্রতদের আমহাস্ট স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছে কিৱীটী সেখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম কৰল। তারপৰ বিকেলের দিকে আবার আসবে বলে প্রতিশ্রূতি দিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামল।

বেলা প্রায় তখন দেড়টা হবে। আবার যাত্রার উদ্যোগে সুব্রত একটা একটা কৰে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র রাজ্ঞ দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, আৱ রাজ্ঞ সেগুলো একটা চামড়াৰ সুটকেসের মধ্যে সাঁজিয়ে-গুছিয়ে ভৱে রাখছে।

একটা বড় তোয়ালে ভাঁজ কৰে সুটকেসের মধ্যে রাখতে রাখতে একসময় রাজ্ঞ বললে, কিন্তু তোমাৰ যতই বল ভাই, ঘনেৰ মধ্যে থেকে কিছুতেই যেন আৰ্মি সাড়া পাচ্ছ না সুব্রত। সনৎদা এখানে পড়ে রইল, আমৱা চলেছি রেঙ্গুনেৰ দিকে। এমনি ভাবে বৃথা অন্দৰ ছুটে গিয়ে যে কি লাভ হবে, তা মিঃ রায়ই জানেন।

সুব্রতও মন থেকে সায় পাচ্ছিল না। সে বললে, মিঃ রায়েৰ মত তো শৰ্কুন্দলে।

শৰ্কুন্দলাঘ তো, যা ভাল বোঝ কৰ।

তিনি নিশ্চয়ই ভাল বুঝেই রেঙ্গুনে চলেছেন।

এমন সময় মা এসে ঘৰে ঢুকলেন, বললেন, হাঁ রে, তা হলে সত্তিই কাল ভোৱেৰ জাহাজেই আবার তোৱা সেই মগেৰ মুক্তুকে চললি ?

এখন পৰ্যন্ত তো তাই ঠিক মা, তবে জাহাজে চাপবাৰ প্ৰৰ্মুছত পৰ্যন্ত বলা যায় না।

কিন্তু সনৎ-এৰ তো কোন খৈঞ্জখবৰ মিলল না !

খৈঞ্জ পাওয়া গেছে মা। সনৎদা প্রাণে বেঁচে আছে, এই পৰ্যন্ত জেনে রাখ।

আহা, বেঁচে আছে তো ? ঠিক খবৰ পেয়েছিস তো ?

হাঁ, মা। মিঃ রায় খবৰ এনেছেন।

আহা, ভগবান তাৰ ভাল কৰন। বলতে বলতে ঘাৱ চোখেৰ কোণ দৃঢ়ি অগ্ৰসজল হয়ে উঠল। তিনি আবার বললেন, কোথায় তিনি তাৰ দেখা পেলৈন ?

তা তো জানি নে মা, জিজ্ঞাসা কৰিনি সে কথা।

তা বাছাকে আমাৰ নিয়ে এল না কেন ?

সুব্রত মাৰ কথায় মদ্দ হেসে বলল, তাৱা ছেড়ে দেবে বলে তো আৱ কৰ্ত কষ্ট কৰে চৰি কৰে নিয়ে যাবিনি মা ?

তা সে এইখানে পড়ে রইল, আৱ তোৱা চললি রেঙ্গুনে ?

ভয় নেই মা, এখানে থেকে তাকে উঞ্জাৰ কৰা যাবে না, তাই আমৱা রেঙ্গুন বাছি কাল।

ইঠাং সকলে ঘরের মধ্যে অন্য একজনের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ফিরে তাকায়। দেখলে দরজার কপাটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে কিরীটী রায়।

রাজ্ৰ বললে, মিঃ রায়, কতক্ষণ এসেছেন?

কিরীটী ঘরের মধ্যে ঢুকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, আপনাদের সকলেরই মনে একটা সংশয় জেগেছে যে, সনৎবাবু এখানে পড়ে রইলেন, অথচ আমরা বর্মা চলেছি। আমার কথা যদি বিশ্বাস করতে না পারেন, তবে এই-টুকুই এখন শুধু জেনে রাখুন যে, সনৎবাবুকে যেমন করেই হোক ওরা কালকে রেঙ্গনগামী জাহাজে তুলবেই। আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এখনও বলাই কালো ভূমির যেমনি শয়তান তার চাইতেও তের বেশী তীক্ষ্ণাধী। তার ওপর আরও একটা কথা হচ্ছে এই যে, সনৎবাবুকে ওরা প্রাণে মারবে না। তাই সনৎবাবু যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের দৰ্ভুৰ্বনার আপাততঃ তেমন কিছু নেই। কালো ভূমির দৰ্ভুৰ্ব হলেও তার শৱের অভাব নেই, এমনি দৰ্বনিয়ার নিয়ম। এই দেখুন—বলতে বলতে কিরীটী জাহার পকেট থেকে সেই সকলের ১৮নং বাঁড়িতে পাওয়া সাংকেতিক কাগজখানা বের করে সকলের চোখের সামনে ধরলু।

স্বত্রত ও রাজ্ৰ উভয়েই একান্ত কৌতুহলে দৈখ দৈখ বলে কাগজটার ওপরে বাঁকে পড়লু।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, সম্ভত জীবনভৱে কালো ভূমির হয়তো প্রভৃতি অৰ্থ সংগ্ৰহ কৱেছে; কিন্তু তা থেকে তার ভোগে একটি পাইপয়সাও বোধ হয় লাগাতে পাৰেনি। আজ পৰ্বল্লত যতদিন সে বেঁচে আছে এবং ভৰিষাতে আৱও যতদিন সে বেঁচে থাকবে, সে শুধু সেই সংগ্ৰহীত অৰ্থ যথের মত আগলৈই থাকবে। এ জীবনের অৰ্থপিপাসা মতুয়া পৱণ হয়তো তাকে এই প্ৰতিবীৰ মাটিৰ বৰুকে ঢেনে আনবে। যে হাহাকার নিয়ে সে সারাজীবন কাটিয়ে গেল, সেই হাহাকারই থেকে যাবে তার বায়ুভূত দেহে!

কিরীটীৰ কথাগুলো যেমনি দৰদতৰা তেমনি সতেজ। সকলেই বিস্ময়-বিগুঞ্জ হয়ে কথাগুলো শুনৰাহিল, উত্তৱে কেউ একটি কথাও বলতে পাৱে না।

রাজ্ৰ বললে, আমি কটা দিনই বা ওদেৱ দলে ছিলাম, কিন্তু যে দলেৱ সৰ্দাৱ, তার দেখা মাত্ৰ একবাৱেৱ বেশী দ্বাৰা মেলোনি, তাঙু ছশ্বৰবেশে ঘূঁঝোশেৱ অল্তৱালে অধ্যকার ঘৱে। শুনোছ ওদেৱ দলেৱ কেউ নাকি আজ পৰ্বল্লত সৰ্দাৱকে স্বাভাৱিক বেশে একদিনও দেখোনি। সে হয়েক রকমেৱ ঝূঁপ ধৰে সকলেৱ মাঝে ঘূৰে ঘূৰে বেড়ায়, পাশে থেকেই তার হ্ৰস্ব চালায় সকলেৱ ওপৱে, অথচ তাকে দেখলৈও চেলা যায় না। একটা কথা ওদেৱ ঘূঁঝে আমি বৱাবৰ শুনোছি, সৰ্দাৱকে নাকি রাণি ছাড়া দিনেৱ আলোয় আজ পৰ্বল্লত কেউই দেখোনি এবং তাৰ ছশ্বৰবেশে। যে মহুত্তে দিনেৱ আলো নিভে গিয়ে রাতেৱ অধ্যকার চাৰিদিকে নেমে আসে, ঠিক সেই মহুত্তে সৰ্দাৱও তাদেৱ পাশে এসে দাঁড়ায়। আবার যেমনি প্ৰতি আকাশে ভোৱেৱ আলো প্ৰকাশ পায়, সৰ্দাৱ যে কোন্ ফাঁকে কোথা দিয়ে আপনাকে লুকিয়ে ছেলে, শত চেষ্টা কৱেও আজ পৰ্বল্লত কেউ তা ধৰতে পাৱেনি।

*

*

*

ৱাণি দশটা হবে।

আকাশ বেশ পৰিষ্কাৱ। কালো আকাশেৱ কোলে—দূৱে, অনেক দূৱে

ମେଘପୁରୀର ବାତାଯନେ ସେନ ତାରାର ପ୍ରଦୀପ ଜଗାଲିଯେଛେ । ତାରଇ ଆଲୋ ସ୍କଣ୍ଡଟ କରେଛେ ପ୍ରଥିବୀ ଓ ଆକାଶେର ମାଝେ ଏକ ଅପ୍ରବୁ' ଆଲୋ-ଛାଯା-ଘେରା ପଥ । ଓପରେ ଏକଥାନା ମାଦ୍ରାର ପେତେ ମାର ପାଶେ ବସେ ସ୍କୁରତ ଓ ରାଜ୍‌ ଆସନ୍ ବିଦେଶ୍ୟାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧେ ନାନା ଗଲ୍ପ କରେଛେ ।

ମନନ୍ଦାର ବାଡ଼ିର ସେଇ ସଂଧ୍ୟାର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛେ, ରାଜ୍‌ ? ସେଇ ଡ୍ରାଗନ— କାଲୋ କ୍ଷମରେ ମୃତ୍ୟୁଦ୍ଵାତ ! ଏକସମୟ ବଲଲେ ସ୍କୁରତ ।

ରାଜ୍‌ ହାସତେ ହାସତେ ବଲଲେ, ମନେ ନେଇ ଆବାର ? କିନ୍ତୁ ଯାଇ ବଲ, ଡ୍ରାଗନେର ମତ୍ୟସତ୍ୟାଇ କ୍ଷମତା ଆଛେ ବଲତେ ହବେ । ଅନ୍ୟ କୋନ କ୍ଷମତା ନା ଥାକଲେଓ ଆକର୍ଷଣୀ କ୍ଷମତା ଯେ ଆଛେ—ସେ ବିଷୟେ ଏକେବାରେ ନିଃସନ୍ଦେହ !

ହୁଁ, କ୍ଷମତା ଆଛେ ବୈକି । କିନ୍ତୁ ଏକଜନେର କଥା ଆମାର ବାରବାରଇ ମନେ ହଚ୍ଛେ ରାଜ୍‌ । ମେବାର ଆମାଦେର ବିଦେଶ୍ୟାତ୍ମାର ସମୟ ଏମନ ଏକଜନ ବନ୍ଧୁ ଛିଲେନ ଆମାଦେର ପାଶେ ପାଶେ ସର୍ବଦା, ଯାର ସଦ୍ସତକ ସେନହଦ୍ୱାଣ୍ଟ ସାରାକଣ ଆମାଦେର ନିରାପଦେ ରେଖେଛିଲ । ତିନି ନା ଥାକଲେ ସେଇ ମଗେର ମୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଥେକେ ଫିରେ ଏସେ ବାଂଳାର ମାଟିତେ ପା ଦେଉୟା ହୟତ ଏ ଜୀବନେ ଆର ଆମାଦେର କାରୋରଇ ଘଟେ ଉଠିତ କିଳା ସନ୍ଦେହ । ଆବାର ସେଇ ବିଦେଶେ ପଥେ ଚଲୀଛି । ମେବାରେ ସେଇ ଅଚେନା ଛିଲ, ଏବାରେଓ ଠିକ ତାଇ । ସେଦିନକାର ସେଇ ପରମ ବନ୍ଧୁଟି ଆଜ ଆର ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ନେଇ । ଏ ପ୍ରଥିବୀ ହତେ ତିନି ଚିରବିଦ୍ୟା ନିଯେ ଗେଛେନ । ଆର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା ବଲତେ ଗେଲେ ସେଜନ୍ ଦୀର୍ଘ ତୋ ଆମରାଇ । . . .

ଶୈଖେର ଦିକେ ସ୍କୁରତର କଞ୍ଚକର ସେନ ବୁଜେ ଏଲ ଅଶ୍ରୁତେ ।

ସତ୍ୟ, ଅମରବାବୁର ଖଣ ଆମରା ଆର ଏ ଜୀବନେ ଶୋଧ କରାର ସ୍ବଯୋଗ ପେଲାମ ନା । ରାଜ୍‌ ବଲଲେ ।

*

*

*

ତଥନ୍ତି ରାତେର ଆକାଶ ଥେକେ ଭାଲ କରେ ଆଁଧାରେର ଘୋର କେଟେ ଘାର୍ଯ୍ୟନି । ମେବାନ୍ତ ପ୍ରବୃଦ୍ଧିକ ଲାଲଚେ ଆଭାୟ ରାଣ୍ଗନ ହୟେ ଉଠିତେ ଶୁଭ୍ର କରେଛେ ।

ସ୍କୁରତର ଘରମଟା ଭେଙେ ଗେଲ ରାଜ୍‌ର ଡାକେ । ରାଜ୍‌ ଡାକିଛିଲ, ଏହି ସ୍କୁରତ, ଓଟ୍ ଓଟ୍ । କତ ରାବି ଜରଲେ ରେ, କେ ବା ଆଁଖି ଘେଲେ ରେ ! ଏରପର ବ୍ୟାଯାମ କରାବିହି ବା କଥନ, ଆର ଘାର୍ଯ୍ୟବିହି ବା କଥନ ? ଜାହାଜେର ସମୟ ତୋ ହୟେ ଏଲ ।

ସ୍କୁରତ ଚୋଖ ରଗଡ଼ାତେ ରଗଡ଼ାତେ ଉଠିତେ ବସଲ । ପାଶେର ସର ଥେକେ ଷ୍ଟୋରେ ଗର୍ଜନ କାନେ ଆସେ ।

ଆସନ୍ ଘାର୍ଯ୍ୟାର ଜନ୍ୟ ମା ନିଶ୍ଚଯିଇ ଥାବାର ତୈରୀ କରଛେନ ।

ସ୍କୁରତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଶୟା ଛେଡ଼େ ଉଠିବେଳେଟା ନିଯେ ବ୍ୟାଯାମ କରତେ ଶୁଭ୍ର କରେ ଦିଲ । ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବ୍ୟାଯାମ ଶେଷ କରେ ସ୍ଲାନ୍ଟଟାଓ ସେରେ ନିଲ । ସନାନ ଶେଷ କରେ ଜାମାକାପଡ଼ ପରେ ନୀଚେର ଘରେ ଏସେ ଦେଖେ, ଇତିମଧ୍ୟେ କିରୀଟୀ ଓଦେର ବାଡ଼ିତେ ପେଂଛେ ଗେଛେ ।

କିରୀଟୀବାବୁ, ଏସେ ଗେଛେନ ଦେଖିଛି !

ଆଗେର ଦିନ କଥା ହରେଛିଲ ଯେ ସକଳେ ମିଳେ ସ୍କୁରତଦେର ବାଡ଼ି ଥେକେ ରାତନା ହୁବେ ।

କିରୀଟୀ ବଲେ, ହାଁ, ଜାହାଜେର ଆର ବେଶୀ ଦେଇ ନେଇ, ଏକଟ୍ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କରନୁଣ ।

ଅଦ୍ରମେ ଏକଟା ମୋଡ଼ା ପେତେ ରାଜ୍‌ ବସେଛିଲ । ସେ ଇତିମଧ୍ୟେଇ ପ୍ରମୃତ ହୟେ

নিয়েছিল।

মা গরম গরম লুটি ভেজে একটা পাত্রে রাখিছিলেন। সকলে মিলে সে-গুলোর সংকার করতে লেগে গেল।

মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকলে এসে গাড়িতে চেপে জাহাজঘাটে এসে পৌঁছে দেখলে, জাহাজ ছাড়তে তখন আর বেশী দোর নেই। জাহাজের ঘন ঘন ইঁইসেল চারিদিক প্রকস্পত করে তুলছে। যাত্রী এবং তাদের আঞ্চলীয়-স্বজনে জাহাজঘাটে বেশ ভিড়।

একটা সেকেন্ড ক্লাস কৈবিন রিজার্ভ করা হয়েছিল। স্বৰূপ, কিরীটী, রাজু, ও ঢাকর জংলী সির্পড় বেয়ে জাহাজে গিয়ে উঠল।

নির্দিষ্ট সময়েই জাহাজ ভোঁ দিতে দিতে জৰ্জিট ছেড়ে এগিয়ে চলল।

নবোদিত স্বর্যের রঙিন আলোয় গঙ্গার ছোট ছোট টেঙ্গুলি ঘেন গলিত রংপোর মতই বাকবাক করে জবুলছে।

গঙ্গাবক্ষ থেকে বরে আসছে প্রথম ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ম্দু, ম্দু, ঘেন স্নেহের স্নিফ করপ্লেপ কারও।

নির্মৈ নীলাকাশ স্বর্ণলোকে ঘেন ঝল্মল করছে।

বর্ষার গঙ্গার গৈরিক জলরাশি ভেদ করে ধীরে মন্থরণ্গিততে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। গঙ্গার দ্ব্যাপাশে সদ্য ঘূর্ম ভাঙার সাড়া পড়ে গেছে। এদিক-ওদিকে বড় জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট স্টৈমলগুলো এদিক-ওদিক ঘাতাঘাত করে। ছোট বড় নানা আকারের নৌকো অনেক দেখা যায়। মাঝে মাঝে শোনা যায় জাহাজের ইঞ্জিনঘরের ঘণ্টা।

রাতের রহস্যজনক অধিকার কেটে গিয়ে আবার নতুন দিনের যাত্রা হয় শুরু। দিনের শেষে ঘূর্মের দেশের পথের বাঁকে সাঁবোর আঁধার আবার বিদায় নেয় শেষদিনের আলোর কাছে। রাত্রি আবার ফিরে আসে তার রহস্য নিয়ে।

এই তো নিয়ম।

আকাশের প্রতি গ্রহতারাও এগিয়ে চলেছে অনন্ত যাত্রাপথে। মানুষও তেমনি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাদের নব নব যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে।

কালো প্রমর ওদের ডাক দিয়েছে।

স্বৰূপ ভাবেঃ কালো প্রমর!

কিরীটী ভাবেঃ কালো প্রমর!

রাজুও ভাবেঃ কালো প্রমর!

ডেকের উপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কিরীটী, স্বৰূপ ও রাজু, ক্রমাবিলীয়মান ক্লের দিকে চেয়ে।

কিরীটী বললে একসময়, মাটি আর জলের মধ্যে ঘেন একটা স্নেহের বাঁধন আছে স্বৰূপবাবু। দেখলুন ক্লের মাটি ঘেন বুক পেতে দিয়েছে জলের স্পর্শটুকু পেতে।

জাহাজ ক্ল ছেড়ে অনেকখানি এগিয়ে চলে। ক্রমে বজবজ উলুবেড়িয়া পশ্চাতে পড়ে গেল।

হঠাৎ একসময় স্বৰূপ রাজুর দিকে ফিরে বললে, গেলবার নীতীশটা আমাদের সঙ্গে ছিল।

এবাবেও নীতিশক্তি চিঠি দিয়ে নিয়ে এলে হত !

এখন তো সে হোস্টেল থাকে না, রাধানগরে তার মামার ওখানে থাকে।
ওদের রাধানগরের বাসার ঠিকানাও আমার জানা নেই। সুরক্ষিত জবাব দেয়।

॥ ১৩ ॥

ডঃ সাময়ল

পরের দিন।

সম্ম্যাহতে তখন আর খুব বেশী দোরি নেই। সাগরের কালো জলে
সাঁবের ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে পড়ছে। মেঘপুরীর বাতায়নে
বাতায়নে সবেমাত্র দিগাঙ্গনারা দৃঢ়-একটি করে তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে গেল
বৰ্ণিব।

বঙ্গোপসাগরের উন্তাল জলরাশির ওপর দিয়ে চেউয়ের তালে তালে নেচে
চলেছে বিরাট অর্গ-বপোত কত যাত্রী বৃক্তে নিয়ে।

সাগরের বৃক্ত থেকে কেমন একটা বেন ঠাণ্ডা হাওয়া আসে, শীত-শীত
করলেও তা বেশ আরম্ভায়ক।

ডেকে সেই বিকেল চারটে হতে এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক যাত্রীই সাগরের
সান্ধ্যশোভা উপভোগ করছিল। সবাই এখন কোরিনে চলে গেছে; শুধু
যাইনি কিরীটী সুরক্ষিত রাজ্য ও একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের চেহারা যেমন প্রশালত, তের্মান ধীর ও গুভীর, দার্শনিকের
মত এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল, চোখে একজোড়া সোনার ফ্রেমের চেমা।
পরনে একটা ঢোলা জাপানী সিল্কের পায়জামা। গায়ে স্টাইপ-দেওয়া
কিমনো। সেলুন ডেকের উপর পাতা একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে
ভদ্রলোক এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা কি মোটা ইংরাজী বই পড়-
ছিলেন। ডেকের ওপর সমবেত বহু লোকজনের নানা জাতীয় কণ্ঠস্বরে
একটিবারের জন্মও তাঁর মনযোগ নষ্ট হয়নি।

সাঁবের আঁধার গাঢ় হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সুরে ভদ্রলোক হাতের বইখানি
মুড়ে সামনের অক্ষপঞ্চ আলো-ছায়া-ঘেরা সাগরের দিকে একদ্রষ্টে তাকিয়ে
রইলেন।

কিরীটী আপনমে গন্ধন করে গাইছিল—

বনের ছায়ায়, জল ছল ছল সুরে
হৃদয় আমার, কানায় কানায় পুরে
ক্ষণে ক্ষণে ঐ গুরু-গুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে
আমার দিন ফুরাল !

সহসা কিরীটী চমকে উঠল। ঠিক পাশ থেকে কে ষেন বললে, চমৎকার
গলাটি তো আপনার! যেমন মিষ্টি, তের্মান দরদভরা। আহা, থামলেন কেন?
শেষ করুন না গানটা?

কিরীটী মুখ ফিরিয়ে দেখে—কথা বলছেন সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি, যিনি

এতক্ষণ নির্বিষ্ট মনে বই পড়াছিলেন।

আপোত র্যাদি না থাকে, তাহলে শেষ করুন গানটা। ভদ্রলোক পুনরাবৃত্তি করলেন।

কিরীটী মৃদু হাসলেন, তারপর ধীরে ধীরে আবার শুরু করেঃ

কোন দ্বৰের ঘননৃ এল আজ কছে

মনের আড়ালে নীরিবে দাঁড়ায়ে আছে!

সত্য, কিরীটীর গলাটি ভারী গিঁষ্টি!

কিরীটী তিন-চারবার সমগ্র গানটা ঘূরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে থামল।

ভদ্রলোক বললেন, সত্য বড় ভাল লাগল আপনার গান। বসেছিলাম ওখানটায়, হঠাত গানের সুর কানে যেতেই উঠে এসেছি।

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক যেন কেমন একটু আনন্দ হয়ে যান। তারপর আবার ধীরে ধীরে বলে চললেন, সংসারের কোলাহল, জীবনের নানা ঘৃট-বিচ্ছৃতি, প্রতিহিংসা, কর্তব্য-অকর্তব্য—সব যেন মহৃত্তে ভুলিয়ে দেয় এই গানের সুর। গানের সুরে আরো ভুলে যাই আমার নিজেকে!...কেউ বোঝে না, কেউ জানে না, কত দৃঢ়খ্য আমার সমস্ত বৃক্খানায় জ্ঞাট বেঁধে আছে।

আরী কাঁদতে চাই; কিন্তু কই, কাঁদতে যে পারি না!...শেষের কথাগুলো যেন অনেকটা স্বগতোষ্ঠির মতই শোনায় এবং শেষদিকে ভদ্রলোকের গলার আওয়াজও ক্ষমে যেন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে জড়িয়ে যায়।

সহসা ভদ্রলোক আরও কি বলতে বলতে যেন চমকে উঠে থেমে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর একটুকরা মৃদু হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না যেন; আমার কেমন একটা স্বভাব যে কথা বলতে বলতে হঠাত এমান অন্যমনস্ক হয়ে পার্ডি...আপনারাও বুঝি বর্ণাতেই চলেছেন?

হাঁ। সুব্রত ও কিরীটী একসঙ্গেই জবাব দিল।

বেড়াতে? না অন্য কোন কাজে? ভদ্রলোক ফিরে প্রশ্ন করলেন।

না, ঠিক বিশেষ কোন কাজেও নয়—আবার কাজেও বটে। আমাদের এক ছেলেবেলার বন্ধু ওখানে থাকে। অনেকদিন থেকে সে আমাদের তার ওখানে যাওয়ার জন্য লিখিছিল, কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। সময়ের অভাব। এখন পরীক্ষা হয়ে গেছে, সামনে লম্বা ছুটি। ভাবলাম বিদেশ বেড়াবার এই তো সুযোগ। তাই রওনা হয়ে পড়া গেল।

বেশ বেশ। পাশ্চাত্য দেশের ছেলেমেয়েরা ছুটির সময় কখনও আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মত দিনদ্বিপূরে পাড়ে পাড়ে শব্দু ঘুমিয়ে অথবা আস্তা দিয়ে দিনগুলো কাটায় না—দেশে দেশে ঘূরে বেড়ায়।...মন ওদের বহুমুখী। দিবারাত্রি অজানা ও অচেনার হাতছানি ওদের দেহ ও মনকে আকুল করে। নিত্য নৃতনকে জানবার জন্য ওদের দেহ ও মনে ইচ্ছার অন্ত নেই। ঘরের চাইতে ওরা পথকেই ভালবাসে, তাই তো ওরা ঘরের বাধন ছিঁড়ে সাতসম্মুদ্র তেরো নদী ডিঙিয়ে দিকে দিকে ছোটে। কখনও আকাশপোতে চেপে সুদূরের পথে পার্ডি জ্ঞায়, কখনও বা সাঁতার কেটে দুর্বল সাগর পার হয়, কিংবা সুউচ্চ পর্বত-শঁশের উদ্দেশে অভিযান চালায়। ওরা এমান দুর্বল, এমান দুর্বর, এমান সদা-চশ্চল। জীবন আর মরণ তো ওদের কাছে ছেলেখেলা। আর আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা দেখুন, সবতনে জীবনীশক্তিকে বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে প্রতি

মুহূর্তে জীবনকে ক্ষয় করে ফেলে। ছোটবেলার কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। স্কুলের ছুটি হলেই বাবা আমাকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। থুব : ছাট বরসেই মাকে হারাই, সংসারে আমরা দুর্টি ভাই-বোন, বাবাকেই শুধু জানতাম ও চিনতাম। বলতে বলতে ভদ্রলোক আবার অন্যন্যস্ক হয়ে পড়লেন।

আপনিও রেঙ্গুনে চলেছেন বৰ্ষা ? সহসা কিরীটী প্রশ্ন করে।

রেঙ্গুনে আমি প্র্যাকটিস করি। আমার নাম সৌরেন্দ্র সান্যাল। সকলে আমায় 'ডাক্তার সান্যাল' বলে ডাকেন। জন্ম হতেই আমি রেঙ্গুনে, বাবার মস্ত বড় ব্যবসা ছিল রেঙ্গুনে।

বাড়িতে আপনার আর কে কে আছেন ?

কেউ না। আমি নিজে ও আমাদের এক পুরনো চাকর ভোলা। একটি-মাত্র বোন ছিল, আমার চাইতে বয়সে প্রায় দশ বৎসরের বড়, তা তিনিও অনেকদিন হল আমার মাঝে কাটিয়ে চলে গেছেন। আর কোন বন্ধনেরই বালাই নেই—একা। ছোটবেলায় মা মরে যাবার পর দিদিই আমায় বৃক্তে-পঠে করে ঘানুষ করেছিলেন মাঝের ঘত করে।

আচ্ছা, রেঙ্গুন শহরটা আপনার কেমন লাগে ডাক্তার সান্যাল ? প্রশ্ন করল কিরীটী।

জন্ম হতেই ওখানে আছি। দীর্ঘদিনের পরিচয় ঐ শহরের প্রতি ধৰ্ম-কণার সঙ্গে, কেমন যেন একটা মাঝার বাঁধন গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে কি কোনও দিন আর ফিরবেন না ?

ফিরব নিশ্চয়ই, অন্ততঃ মনে মনে সেই আশাই তো রাখি। চির শস্য-শ্যামল, দোরেল শ্যামার কলকাকলী-মুখ্যারিত আমার বাংলাদেশ। ওরই শীতল মাটির বৃক্তে যেন আমার শেষ শয়া রচনা করতে পারি—এটাই আমার জীবনের শেষ সাধ। কিন্তু মৃত্যু তো কারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যদি বর্মার মাটির কোলেই আমার জীবনের শেষের দিনটি ঘনিয়ে আসে, তবে কি আর করব বলুন ?...কিন্তু দেখেছেন, নিজের কথাতে মশগুল হয়ে আছি। আপনাদের পরিচয়টি পর্যন্ত নেবার কথা মনে নেই।

কিরীটী মৃদু হেসে বলল, আমার নাম ধূজ্জিটি রায়, এর নাম সত্যরত সেন, আর ওর নাম জীবেন্দ্রপ্রসাদ রায়। আমরা সকলেই স্ট্রেডেণ্ট।

ইচ্ছা করেই কিরীটী নিজেদের নাম ও পরিচয়ের মধ্যে খানিকটা গোপনতার আশ্রয় নিল।

বেশ বেশ, আপনারা যখন বন্ধুর ডাকে চলেছেন, তখন ওখানে গিয়ে সেই বন্ধুর বাড়িতেই তো উঠবেন। যাবেন আমার ওখানে, ভুলবেন না তো ! কর্মশনার রোডেই আমার বাড়ি, তাছাড়া যাকে জিজেস করবেন, সে-ই ডাঃ সান্যালের বাড়ি দেখিয়ে দেবে। ডাক্তার থামলেন।

নিশ্চয়ই যাব, বিশেষ করে যখন পরিচয় হয়ে গেল। কিরীটী জবাব দেয়।

রাণি বোধ করি আট্টা হবে।

কুকুপক্ষের রাণি। বিশ্বচারাচরে কালো আঁধার ছাঁড়য়ে পড়েছে।

জাহাজের সার্চলাইট সমন্বের কালো জলে বহুদ্র পর্যন্ত ছাঁড়য়ে গেছে। মাঝে মাঝে সেই আলো সমন্বক্ষে চারিদিকে ঘোরানো হচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে থেকেই কিরীটী লক্ষ্য করছিল, ডাঙ্গার সান্যাল কেমন যেন একটু চগ্গল হয়ে উঠেছেন।

সুব্রত প্রশ্ন করলে, আপনার শরীরটা কি অসুস্থ ডাঃ সান্যাল ?

ডাঙ্গার জবাব দিলেন, হ্যাঁ, না—মানে, বছরখানেক থেকে রাত্তির দিকে শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করি। মনে আবার মনে হয় যেন কারা আমার চারিপাশে ঘূরে ঘূরে বেড়ায়, আপন মনে কত কি বলে—আবার সবয় সবয় আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাদের গরম শ্বাস-প্রশ্বাসে আমার সমস্ত শরীর জবলতে থাকে। কত চেষ্টা করি তাদের ভুলতে, কিন্তু পারি না !...উঃ, আমি যাই—আমি যাই ! বলতে বলতে ডাঙ্গার সান্যাল অনেকটা মাতালের মতই একরকম টলতে টলতে যেন ডেক থেকে কেবিনের দিকে চলে গেলেন দ্রুত চগ্গল পদ্বিক্ষেপে।

সুব্রতো আশচর্য হয়ে ডাঙ্গারের গমনপথের দিকে একদ্রষ্ট তাকিয়ে রইল।

॥ ১৪ ॥

সঙ্গজ সমাধি

গভীর রাত্তি।

সুব্রত আর রাজু অঘোরে ঘূর্মিয়ে।

অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ঘূর্ম এল না বলে কিরীটী শয্যা হতে উঠে বসল। সিলিপং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে কেবিনের দরজাটা খুলে সে বেরিয়ে এল এবং আস্তে আস্তে সেলুন ডেকের দিকে চলল।

ডেকের কাছাকাছি আস্তেই হাওয়াইন গিটারের একটা মধুর বাজনার শব্দ কানে এল।

কিরীটী ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়াল।

ডেকের ওপর যে আলোটা রয়েছে সেটা খুব শক্তিশালী নয়। সেই ঘূর্যমাণ আলোয় ডেকের ওপর এক অপূর্ব আলো-ছায়ার সমন্বয় হয়েছে।

সেই আলো-ছায়া-ঘেরা ডেকের ওধার থেকেই বাজনার অপূর্ব আওয়াজটা ভেসে আসে।

কিরীটী পায়ে পায়ে ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল।

নিশ্চীথের নিবৃত্তি আঁধারে সাগরবক্ষ থেকে অপূর্ব এক গুমগুম শব্দ ভেসে আসে।

মাথার ওপর তারায় ভরা আকাশের ছায়া সম্মের বৃক্কে ঢেউয়ের মাথায় কেঁপে কেঁপে ওঠে যেন।

বিচ্ছিন্ন ! অপূর্ব !

চারিদিকে ঘূর্মের ছেঁয়ায় সব বুর্বুর নিবৃত্তি হয়ে গেছে। সেই অতল মৌনতার মাঝে গিটারে মধুর বাজনা স্বপ্নালোক থেকে যেন ভেসে আসছে বলেই মনে হয়। এ বুর্বুর কোন ব্যথিতের বৃক্ষছারা কান্না নিশ্চীথ রাতের মৌনতার বৃক্কে হাহাকার জাঁগিয়ে তুলছে।

রেলিংয়ের কোল ঘোঁষে যে চেয়ারখানা রয়েছে, কে যেন তার ওপর বসে

আপন মনে গিটার বাজাচ্ছে ।

কিরীটী পায়ে পায়ে চেয়ারের ঠিক পিছনাটিতে এগিয়ে এসে দেখে—এ কি, এ যে ডাঙ্কার সান্যাল ?

কিরীটী সঁবসময়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। শূন্তে লাগল বাজনা ।

অনেকক্ষণ বাজিয়ে বাজিয়ে ডাঙ্কার একসময় বাজনাটা কোলের ওপর নামিলৈ রাখলেন ।

আর একটু পরে কিরীটী আস্তে আস্তে ডাকলে, ডাঙ্কার সান্যাল ! কে ?—বলে ডাঙ্কার ফিরে তাকালেন ।

ধূঁজ্ঞাটিবাবু ! ঘুমোনানি ?

না । বলে কিরীটী একটু মদ্দ হাসল, তারপর বললে, আপনিও তো দেখছি ঘুমোনানি !

না । অন্ধকার আমার বড় ভাল লাগে । অন্ধকার রাতে একা একা চুপটি করে বসে থাকলে মনটা যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে । যেন নিজেকে খুঁজে পাই ।

আপনার বাজনার হাত বড় চমৎকার । কতক্ষণ থেকে যে আপনার বাজনা শূন্ত নিছি !

ডাঙ্কার কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে মদ্দ মদ্দ হাসতে লাগলেন, কিছু বললেন না ।

ডাঙ্কারের কেবিনটা একেবারে জাহাজের ঐ ধারে । একসময় ডাঙ্কার বিদায় নিয়ে কেবিনের দিকে চলে গেলেন ।

কিরীটী কিন্তু তার পরেও অনেকক্ষণ ডেকের ওপর ঘুরে ঘুরে বেড়াল । রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের বুকে ডেউগুলো ভেঙে ভেঙে গাঢ়িয়ে পড়ছে । ডেউরের বুকে সাদা সাদা ফেনা ফুস্ফুরাসের আলোয় যেন শূভ্র রজনীগন্ধার শ্লিষ্টকের মতই মনে হয় । হাতের ঘাড়ির দিকে চেয়ে কিরীটী দেখল রাত্রি তখন দেড়টা । আর বেশীক্ষণ জাগলে শরীর খারাপ হবে ভেবে কিরীটী কেবিনের দিকে পা বাড়াল ।

কেবিনের দরজার কাছাকাছি আসতেই একটা অস্পষ্ট শিস্ত শোনা গেল ।

কিরীটী থমকে দাঁড়াল ।

আবার একটা শিস্ত শোনা গেল । এবারের শিস্ত আগের চাইতেও অনেক অপেক্ষা করে দাঁড়াল ।

আবার একটা শিস্ত !

পর পর তিনটে শিস্ত শোনা গেল । কিরীটীর আর কেবিনে ঢোকা হল না । আন্দাজে ভর করে শিসের আওয়াজটা যেদিক হতে আসছে, প্রথমে সেই-দিকেই সে এগিয়ে গেল । তারপর আবার যেন কি ভেবে ফিরে গিয়ে কেবিনে প্রবেশ করে স্ট্রাকচেস থেকে টাচটা নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ।

দোতলার ডেকের সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কতকগুলো প্যার্কিং-করা কাঠের বাঞ্চ স্টুপাকারে সাজানো রয়েছে । তারই ওধার থেকে কাদের যেন তক্কিবিতর্কের চাপা স্বর শোনা গেল ।

কিরীটী বিস্ময় ও কৌতুহলে প্যার্কিং-করা বাঞ্চগুলোর আড়ালে এগোতে এগোতে কথাগুলো শূন্তে পেল—

এখনও বল, সেই নোট-বইটা কি করেছিস ? বঙ্কার কঠে কঠিন আদেশের

সুর।

জানি না—আমি জানি না। কার যেন কাতরোক্তি শোনা গেল।

হ্যাঁ জানিস। আমার কালো ঢোলা জামাটার পকেটে ছিল। সেদিন রাতে সু ফ্যাক্টরীর মধ্যে জামাট একটা লোহার গায়ে ঝুলিয়ে রেখে ঘূরিয়েছিলাম, সে কথা তো তুই ছাড়া আর কেউ জানত না।...ভোরবেলা উঠে পকেটে আর নেটবইটা পাইনি। পরের দিন নানা গোলমালে ছিলাম, সেজন্য ওদিকে নজর দিতে পারিনি। তুই ভেবিছিল খুব আমার চোখে ধূলো দিলি, না?

অন্য পক্ষ বোধ হয় চৃপ করে রইল, কোনো জবাব শোনা গেল না।

গুর্ডভ! তুই আমার চোখে ধূলো দিবি? সেই লোকটা যেন কাটকে আদেশ দিল—এই, বুকে হলু ফোটা!

পরম্বৃতেই একটা অস্পষ্ট ঘন্টাগু-কাতর শব্দ নিশ্চীথের অধিকারে জেগে উঠল।

উঃ, লোকটা কি পিশাচ!

উঃ! থাম্, থাম্, ফোটাসনি, বলছি বলছি।

বল্।

লোকটা বোধ হয় গভীর ঘন্টাগুয়ায় হাঁপাতে থাকে।

* * *

কিরীটী বাঙাগুলোর গায়ে গায়ে পা দিয়ে উঠতে লাগল। ওপাশের একটা আলোর থানিকটা রাশি তির্বকভাবে এদিকে এসে পড়েছে। সেই মণ্ড আলোয় কিরীটী দেখলে—সেখানে তিনজন লোক।

একজনের হাত-পা বেঁধে একপাশে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর দুজন এক পাশে দাঁড়িয়ে।

হাত-পা-বাঁধা লোকটা বললে, আমার কাছে নেট-বইটা আছে বটে, কিন্তু তার ভিতরে যে একটা ছক আঁকা কাগজ ছিল, সেটা নেই।

কি করেছিস সে কাগজটা?

লোকটা তখন ভয়ে ভয়ে—সেদিন কেমন করে তার হাত থেকে ১৮নং বাঁড়তে সেই সাংকেতিক কাগজটা চৰি হয়ে গিয়েছিল, সে-সব কথা একে একে খুলে বললে।

কেন তুই আমার নেট-বক চৰি করেছিল?

তুমি কে—আজ ছ বছর তোমার পাশে আছি, তোমার সমস্ত আদেশ নীরবে বিনা বিচরে সবর্দা মাথা পেতে নিয়েছি, পালন করছি, তোমারই আদেশে কর্তব্য নিশ্চিত মণ্ডুর মধ্যে বিনা নিষ্পত্তি রাঁপ দিয়ে পড়েছি, কিন্তু ঘার জন্য দিবারাত্রি এমনি করে জীবন-মণ্ডু নিয়ে ছিন্নমুণ্ণি খেলে চলেছি সে যে কে—আজ পৰ্বত হাজার চেষ্টাতেও তা জানতে পারিনি। তোমার ধন-সম্পত্তির ওপরে আমার এতটুকুও লোভ নেই, কেননা তুমি তো না চাইতেই যথেষ্ট দাও। আমি জানতে চাই—তুমি কে—তুমি কে? লোকটা বলতে বলতে গভীর উজ্জেবন্য হাঁপাতে লাগল।

যে দুজন দাঁড়িয়েছিল, তাদের একজন চাপা গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল, তারপর সহসা গম্ভীর হয়ে বললে, আমি কে? আঁ! আমি কে?... তোর দুরাকাঙ্ক্ষাই শেষ পৰ্বত তোর মণ্ডুর কারণ হল। সেই সাংকেতিক ছক আঁকা কাগজটা কে নিয়েছে তাও আমি জানি, সেটা আমি উন্ধার করবই।

ইতভাগা কিরীটী রায় আজও বুবতে পারেন যে, হিংস্র কেউটে সাপ নিয়ে সে খেলতে শুরু করেছে!... তোর আগেও দলের আর দণ্ডন আমায় জানবার চেষ্টা করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাদের সেই ইচ্ছা বুকে নিয়েই মতুকে বরণ করতে হয়েছে।

তারপর সহসা সে পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে ফিরে কঠিন নির্ম আদেশের স্থানে বললে, ফেলে দে হতভাগাটাকে এখনই সমন্দের জলে! জলের অন্ধকারে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে থখন ও তিল তিল করে মতুর মুখে এগিয়ে যাবে, হতভাগা তখন জানতে পারবে, কে আমি! কি আমার পরিচয়!

না না, আমায় এমনি করে জলের মধ্যে ডুবিয়ে মেরো না। এবারের মত আমায় ক্ষমা কর, প্রতিজ্ঞা করাছ, এ জীবনে আর তোমার পরিচয় জানবার চেষ্টা করব না।

আবার সেই নিষ্ঠুর হাসি।

হিংস্র হাঙরে থখন তোর দেহ ধারালো দাঁতে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে যাবে, তখন জানিব আমি কে!

ক্ষমা কর আমায়! ক্ষমা কর!

ফেলে দে! দে!

পাশে দণ্ডায়মান লোকটি বিনা বাকাব্যে নীচু হয়ে লোকটাকে অবলীলা-ক্রমে তুলে উঁচু করে তখনই রেলিং টপকে নৌচের গর্জমান অতল পারাপারহীন সম্মুদ্রগভো নিক্ষেপ করল।

একটা বৃক্ষ-ভাঙা আকুল চিংকার নিশ্চীথ রাণির গভীর স্তন্ধতাকে ঘূর্হর্তের জন্য যেন আলোড়িত করে তোলে। ঝপাং করে একটা শব্দ শোনা যায় মাত্র।

সমগ্র ব্যাপারটা এত চাকিত ও এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে, কিরীটী বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। একটা টুকু শব্দ পর্যন্ত তার মুখ ফুটে বের হল না। স্থানুর মতই কিরীটী প্যার্কিং বাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে রাইল। পা দুটো যেন পাথরের মত ভারী ও অনড় হয়ে গেছে।

কেউ জানলে না, কেউ শুনলে না, রাণির নিস্তন্ধ অন্ধকারে একজনের জীবন্ত সর্লিল সমাধি হয়ে গেল। সাগরের কালো জলের তলে চিরানন্দায় সে অভিভূত হল। কিরীটীর যেন দয় আটকে আসে।...

হতভাগা ভেবেছিল, আমার চোখে ধূলো দেবে। কিন্তু কি করব, এ ছাড়া উপায় ছিল না। বলতে বলতে লোকটার কণ্ঠস্বর কেমন যেন জড়িয়ে আসে। তারপর যেন কতকটা জোর করেই আপনাকে সামলে নিয়ে নিষ্ঠিয় লোকটির দিকে ফিরে বললে, ওই লোকটাকে বরাবর 'মতুগদ্বায়' নিয়ে যাবে। জাহাজে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। বলেই লোকটা ফিরে দাঁড়াল।

ফিরে দাঁড়াতেই সামনের একটা আলোর খানিকটা বাঁকা হয়ে এসে তার মুখের উপর পড়ল।

কিরীটী বিস্ময়ে আতঙ্কে চমকে উঠল। অন্ধকারে চলতে চলতে সামনে বিকটাকার ভূত দেখলেও বৃক্ষ মানুষ এতটা চমকে ওঠে না।

নিশাচর ভূত

চিনতে কষ্ট হয় না কিরীটীর ঐ মহুর্তের দেখাতেই। লোকটা আবে কেউ নয়, সেই চীনা আভায় দেখা ভীষণ-দশ্মন লোকটীই এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানের হোতা।

কিরীটী ভাবলে, তবে আমার হিসাব ভুল হয়নি। দলের নেতা ইনিই! স্বনামধন্য দস্যুরাজ ‘কালো দ্রুম’! হ্যাঁ, লোকটার শর্ষ আছে বটে। তাহলে দস্যুরাজ আমাদেরই সহযোগী!

প্যাকিং-করা বাক্সগুলোর আড়ালে কিরীটী স্তর্ণিত ভাবে কতঙ্গ দাঁড়িয়ে-ছিল তা নিজেই ব্যবতে পারোনি। যখন খেয়াল হল তখন সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এল।

রাতও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চোখ দৃঢ়ো জোলা করছে। বেশ ঘৃণ্মও পেয়েছে।

কিরীটী ধীরে ধীরে এসে কেবিনে প্রবেশ করল এবং দরজাটা বন্ধ করে শয়ার ওপরে এসে গা এলিয়ে দিল। সাগরের দোলায় দোলায় অল্পক্ষণের মধ্যেই কিরীটী ঘৃণ্ময়ে পড়ল একসময়।

পরের দিন যখন কিরীটীর ঘৃণ্ম ভাঙল, বেলা তখন প্রায় সাড়ে আটটা হবে, প্রভাতী চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সূর্যত ও রাজ্য তখন কেবিনে ছিল না—সম্ভবত ডেকে বেড়াতে গেছে।

একটু পরেই জংলী কেবিনে ঢুকে বলল, চা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বাবুজি!

হ্যাঁ, তাই তো দেখ্বাছ। আমি একেবারে স্নানটা সেরে আসি। বলে কিরীটী তোয়ালে ও একটা চোলা পায়জামা নিয়ে স্নানযারের দিকে পা বাড়াল।

স্নান সমাপ্ত করে আসতে আসতেই ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা শোনা গেল। ব্রেকফাস্ট সেরে আবার ওরা সকলে যখন ডেকের ওপর এল, তখন একে একে অনেক ঘাঁষাঁই ডেকের ওপর এসে জড় হতে শুরু করেছে।

একটি বছর সাতকের মেয়ে ডেকের ওপর চিকিৎসণ করছিল।

ডাঃ সান্যালও ডেকেই ছিলেন। সূর্যত ও রাজ্য ডাঃ সান্যালের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে কিরীটী যখন ওদের দলে এসে ঝিশল, ডাঃ সান্যাল, সূর্যত ও রাজ্য তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। কিরীটী ওদের একপাশে এসে দাঁড়াল।

সুপ্রভাত! কিরীটী জবাব দিল।

একবার তৌক্যদণ্ডিতে কিরীটীর ঘুর্খের দিকে চেয়ে একটু ঘূর্দ হেসে ডাক্তার বললেন, কাল বৰ্দ্ধি রাতটুকু আপনার না ঘৃণ্ময়েই কেটে গেছে, মিঃ রায়?

কিরীটী আনন্দনা ভাবে জবাব দিল, না, বেশ ঘৃণ্ম হয়েছিল তো!

ଆର ବିଶେଷ କୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତ ହଲ ନା ।

ସବାଇ ଏକମନେ ସମୁଦ୍ରର ଦିକେ ତାକିଯେ ରାଇଲ ।

ଚାରିଦିକେ କେବଳ ଜଳ । ଜଳ ଆର ଜଳ । ନୀଳ ଜଲରାଶି ଗଭୀର ଉଚ୍ଛବାସେ
ଢେଉଁରେ ତାଳେ ତାଳେ ନେଚେ ଫିରଇଛେ । ଢେଉଁରେ ଢେଉଁରେ ଯେଣ ଅକ୍ଷୁଟ ସୂରେ କି ସବ
ବଲାବଲି କରଇ ।

ସୁନୀଳ ଆକାଶ ରୂପାଲୀ ରୋଦେର ଆଭାର ବିଲାମିଲ କରଇଛେ ।

* * *

ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ଡାଃ ସାନ୍ୟାଲେର କେବିନେ ସ୍ଵର୍ଗତ, ରାଜ୍ୟ ଓ କିରୀଟୀ ଚା-ପାନ କରତେ
କରତେ ଡାଙ୍କାରେର ସଙ୍ଗେ ଗଲ୍ପ କରାଇଲ । କେବିନେର ଘରେ ସେଠେ ଚା ତୈରୀ
ହେଯେଛେ ।

ଡାଙ୍କାର ବଲାହିଲେନ, ବିଶ୍ଵାସ ଜିରିନ୍‌ଟା ମାନ୍ୟରେ ମନେର ସହଜ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ଘ୍ରାଣ୍ତି
ଦିରେ ତାକେ ଖାଡ଼ା କରା ଥାଯି ନା । ଏହି ଦେଖନ ନା, ଆମି ସକଳକେଇ ବିଶ୍ଵାସ କରି,
ଆବାର କାଉକେଇ ବିଶ୍ଵାସ କରି ନା । ଏକ-ଏକ ସମୟ ଆମାଦେର ଏକ-ଏକଟା ବ୍ୟାପାରେ
ବିଶ୍ଵାସ ନା କରା ଛାଡ଼ା ଆର ଉପାରେଇ ଥାକେ ନା । ମନ ନା ମାନଲେଓ ଆମରା ତାକେ
ମେନେ ନିତେ ବାଧ୍ୟ ହିଁ । ତେର୍ମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନ୍ୟରେ ଘରେଇ ଦୂରକମେର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଘ୍ରାଣ୍ତି
ଥାକେ । ଅତି ବଡ଼ ଶୟାତମନ ଯେ, ତାର ବୁକେତେ ଭାଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଛେ । ଆବାର
ସତ୍ୟସତ୍ୟଇ ସେ ଅତି ନିରୀହ ଓ ଏକାନ୍ତ ଧୀରଞ୍ଜିତର, ତାରଓ ବୁକେ ହରତୋ ଶୟାତମନ-
ପ୍ରବୃତ୍ତି ଘ୍ରାଣ୍ତି ଥାକେ । ଗାଛେର ଗୋଡ଼ାଯ ଜଳ ଢାଳତେ ଢାଳତେ ଯେମନ ସେଠେ କ୍ରମଶଃ
ବଡ଼ ହତେ ହତେ ଶେଷଟାର ଶାଖା-ପ୍ରାଣ୍ଥା ବିଚତାର କରେ ଚାରିଦିକେ ଜୁଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ,
ଆମାଦେର ଘରେର ଭିତରେଓ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ନିଯେ ଆମରା ବେଶୀ ନାଡ଼ାଚାଡ଼ା କରି—
ଯେଟାକେ ଆମରା ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଇ, ସେଇଟାଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାଦେର ଚାରିହଙ୍ଗତ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଁ ଦାଂଡାୟ । ସେ ଚୋର, ସେ ଡାକାତ, ତାର ଅନ୍ତରେଓ ହରତୋ ଏକଟା
ନିରୀହ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଘ୍ରାଣ୍ତି ଆଛେ ।

କିରୀଟୀ ହାସତେ ହାସତେ ବଲଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକରତେ କରତେ ଦୂର୍ଜନେର
ଏମନ ଏକଟା ସବଭାବ ହେଁ ଦାଂଡାୟ ଯେ, କିଛିତେଇ ସେ ଆର ଭାଲ ପଥେ ଚଲାତେ ଚାଇ
ନା । ପେଟା ଯେମନ ଆଲୋ ପରିହାର କରେ ଚଲେ, ଦୂର୍ଜନେରାଓ ତେର୍ମାନ ଭାଲ ଯା
କିଛି ତା ଏଡିଯେ ଚଲେ ।

ଆଗେର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘର ସେଦିନଓ ଡାଃ ସାନ୍ୟାଲ କ୍ରମଶ ଯେଣ କେମନ ଏକଟା
ଚଞ୍ଚଲ ହେଁ ଉଠିଛିଲେ । ସେଠେ ଲକ୍ଷ କରେ ସ୍ଵର୍ଗତ ଶୁଦ୍ଧାଳ, ଆପନାର କି ଶରୀର
ଖାରାପ ହେଯେଛେ, ଡାଃ ସାନ୍ୟାଲ ?

ଡାଙ୍କାର କେମନ ଏକପକାର ଅନ୍ୟମନକେର ଘର ଯେଣ ଜୁଡ଼ିଯେ ଜୁଡ଼ିଯେ ବଲାହିଲେ,
ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦିକେ ‘ମରିଫିଆ’ ଇନଜେକ୍ଶନ ନେବୋରା ଆମାର ଏକଟା ବଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଆପନାରା
ଧୀଦ କିଛି ମନେ ନା କରେନ ତବେ..., ବଲେ ଡାଙ୍କାର ଉଠେ ଗିଯେ ସ୍ଟୁଟକେସ ଥେକେ ସିରିଙ୍ଗ
ବେର କରେ ଇନଜେକ୍ଶନ ନେବୋର ଜନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହତେ ଲାଗଲେ ।

ସିରିଙ୍ଗଟା ସଥାପନାନେ ରେଖେ ଡାଙ୍କାର ଯେଣ ଅନେକଟା ହର୍ତ୍ତାଚିତ୍ତେଇ ନିଜେର ଆସନେ
ଏସେ ଉପବେଶନ କରଲେ ।

ଡାଙ୍କାରେର ସେଇ ଅନ୍ୟଥା-ଅନ୍ୟଥା ଭାବଟା କ୍ରମଶ ଠିକ ହେଁ ପ୍ରବେର ପ୍ରଫଳତା
ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିରେ ଆସନ୍ତେ ଲାଗଲ ।

ଏହି ଦେଖନ । ବଲାତେ ଡାଙ୍କାର ବାଁ ହାତେର ଆମିନଟା ଗୁଟିଯେ ସେଠେ

আলোর নীচে সকলের চোখের সামনে প্রসারিত করে ধরলেন—হাতে অসংখ্য কালো কালো দাগ। একটু পরে তিনি আবার বলতে লাগলেন, দেখুন, মরফিয়া নিয়ে নিয়ে হাতটা একেবারে ভরে গেছে। কিন্তু কি করব বলুন, শরীরের মধ্যে অসহ্য ঘন্টণা অনুভব করি সম্ভ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, আর সেই ঘন্টণায় আমার সমগ্র শরীরটা যেন বিষের মত জলতে থাকে। তাই মরফিয়া নিতে হয়।

স্মরণ প্রশ্ন করল, আছো এতে কি শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, ডাঃ সান্যাল ?

ডাঙ্কার হেসে বললেন, ক্ষতি হয় বৈক। আমাদের মস্তিষ্কে ঘন্টণাবোধের যে স্নায়ুকেন্দ্র আছে, সেখানকার স্নায়ুকোষে ‘ঘন্টণা-বোধ-বাহী’ স্নায়ু ঘন্টণা-বোধকে বহন করে নিয়ে যায় এবং তাতেই আমরা দেহের কোন না কোন স্থানে ঘন্টণা হচ্ছে বুঝতে পারি। এ মরফিয়া সেই ঘন্টণা-বোধ-বাহী স্নায়ুকে অবশ করে দেয়। তার ফলে ঘন্টণা-বোধ-স্নায়ু দিয়ে ঘন্টণাটা প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে আর উপর্যুক্ত হতে পারে না বলেই ঘন্টণার উপশম হয়।

কিন্তু এইভাবে মরফিয়া নেওয়াটা কি একটা নেশা নয় ?

ডাঙ্কার একটু হাসলেন, তারপর বললেন, নিচয়ই নেশা বৈক ! নেশা...বদ অভ্যাস। বুঝতে কি আমি পারি না, পারি বুঝতে পারি সব, কেননা আমি একজন ডাঙ্কার। তবু নিজেকে সংখত করতে পারি না। কোন এক অদ্ব্য শক্ত যেন আমার সমস্ত দেহমনকে অধিকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সিরিজ ও মরফিয়ার দিকে চেলতে থাকে। আমি পারি না, কিছুতেই নিজেকে রোধ করে রাখতে পারি না।

ডাঙ্কারের মধ্যে একটা করুণ অসহায় ভাব ফুটে ওঠে।

রাণি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে কিরীটীর দেহ ও মন কি জানি কেন সেই প্যার্কিং-করা বাঞ্ছগুলোর দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আকর্ষণ্টা কিছুতেই বোধ করতে পারে না কিরীটী, তাই গায়ে একটা ধূসর বর্ণের নিদৃব্বল চাঁপয়ে, মাথায় একটা নাইট-ক্যাপ এঁটে সেটাকে টেনে একেবারে কপালের নীচ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে, কিরীটী কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ল। রেডিয়াম দেওয়া হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাণি তখন দেড়টা।

অতি সন্তপ্তে নীচে দোতলায় ডেকের দিকে চলল কিরীটী।

প্যার্কিং-করা বাঞ্ছগুলো যেখানে একটার ওপর একটা সাজানো আছে, তার আড়ালে এসে কিরীটী থমকে দাঁড়াল। আর ঠিক ঐ সময়ে কতকগুলো ফিস ফিস আওয়াজ তার কানে এল। মনে হল, দুজন লোক যেন নিম্নকণ্ঠে কথা-বার্তা বলছে :

কেউ কিছু টের পেয়েছে ?

না।

ঠিক জান ?

হ্যাঁ।

এই ঔষধটা আজও আবার শেষরাত্রে লোকটার শরীরে ইনজেকশন করে দেবে। আর যেমন বলে রেখেছি ঠিক তের্বান ব্যবস্থা করবে। কোন গন্ডগোল হবে না ; ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে বাধা দেবে না।

এর পরে আর কোন কথা শোনা গেল না। লোক দুটো তখন চলে গেছে

বোধ হয়। মাঝে মাঝে শুধু সাগরের একটা গর্জন আঁধারের বৃক্কে ভেসে আসে।

তারপর সহসা একসময় একটা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ শুনে কিরীটী চৰকে উঠল। ঐ পাখে সিঁড়ির নিচে থেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেদিক থেকে আওয়াজটা আসছে বলে মনে হল। কিরীটী দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। সিঁড়ির নীচে সে জায়গাটায় তত আলো নেই। সিঁড়ির গায়ে যে বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বলছে, তার ক্ষমতাও খুব বেশী নয়। সেই অস্পষ্ট আলোতে দেখা গেল সিঁড়ির নীচে একটা লোক পড়ে গোঁ গোঁ করছে।

কিরীটী লোকটার মুখের ওপর বুকে পড়ে দেখল, লোকটা কোন কারণে অঙ্গান হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ধারে যে কালিং বেল ছিল, সেটা টিপে দিলে।

দেখতে দেখতে জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে আরম্ভ করে খালাসীরা পর্যন্ত অনেকেই এসে হাজির হল।

সকলের মুখেই শঁড়িকত ভাব।

একজন খালাসী ক্যাপ্টেনের আদেশে লোকটির চোখ-মুখে জল দিতে শুরু করলে। জাহাজের ডাঙ্গার খবর পেয়ে ছুটে এলেন এবং নাড়ি দেখে বললেন, ও কিছু নয়, কোন কারণে হয়তো অঙ্গান হয়ে গেছে।

লোকটি অল্পক্ষণ পরেই জ্বান ফিরে পেয়ে উঠে বসল। চোখ-মুখে তার তখনও একটা ভয়াত্ত ভাব। চারিদিক চাকিত দৃষ্টিতে দেখে লোকটা অস্ফুট স্বরে কেবল বললে, ভূত ভূত!

জাহাজের মেট শুধায়, ভূত! কি বলছিস রে?

হাঁ কর্তা, ভূত! আমি দেখেছি, স্বচক্ষে দেখেছি। এই দেখনে আমার গলা টিপে ধরেছিল। উঃ, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!—বলে লোকটি আবার হাঁপাতে লাগল।

লোকটার কথা শুনেই সকলে যেন একটু ভয় পেয়ে গেছে। বুড়োগোছের একজন খালাসী এগিয়ে এসে বলল, আমিও কাল রাতে এমানি সময় ওই বাল-গুলোর পিছনে কি একটা দেখেছিলাম। উঃ, কী ভীষণ মৃত্যু তার! এই পর্যন্ত বলেই বুড়ো ভয়ে চোখ বুজল।

সমবেত সমস্ত লোকের মনেই কেমন একটা অস্পষ্ট আতঙ্কের সংশ্টি হয়েছে। সকলেই একটা শঁড়িকত চাউলি নিয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ক্যাপ্টেনের মুখটাও গম্ভীর হয়ে গেল।

রাত্রি আর বেশী নেই। একটা দুঃটি করে আকাশের তারাগুলো নিষ্পত্তি শুরু করেছে।

॥ ১৬ ॥

আবার ঘণ্টের অল্পাকে

রেঙ্গন শহর।

জাহাজ তখনও জেটিতে লাগেনি।

সূরত, কিরীটী, রাজু ও ডাঃ সান্যাল জাহাজের রেঙ্গিয়ের কাছে দাঁড়িয়ে

জেটির দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকজন, কুলী, কর্মচারী প্রভৃতির সমাগমে স্থানটি একেবারে সরগরম।

প্রভাতী সূর্যের সোনালি আলো দিকে দিকে ছাড়িয়ে পড়েছে। জাহাজে
বসে রেঙ্গুন নদীর পারে ভাসমান অবস্থায় শহরটিকে যেন একটি ছবির মতই
দেখায়।

ডাঙ্কার বলছিলেন, কাল দৃশ্যে আমার ওখানে আপনাদের মাধ্যাহ্নিক
নিমন্ত্রণ রইল। এই নিন আমার কার্ড। বলতে বলতে ডাঙ্কার কোটের পকেট
থেকে একটা ছোট কার্ড বের করে সুরূত হাতে দিলেন। তাতে লেখা আছেঃ

ডাঃ এস. সান্যাল

এম. বি. এম. সি. পি (লেন্ডন)

৩০, কমিশনার রোড, রেঙ্গুন।

স্বীকৃত কার্ডটা পকেটে রেখে দিল।

জাহাজ ততক্ষণে জেটিতে লেগেছে। ক্রমে যাত্রী একে একে নামতে শুরু
করে।

কিরাইটীর পরামর্শমত ঠিক হয়েছিল সর্বশেষে ওরা নামবে। তাড়াতাড়ি
কিছু নেই।

স্বীকৃত আনন্দনে রেলিংয়ে ভর দিয়ে যাত্রীদের অবতরণ দেখছিল।

একটা স্ট্রিচারে করে বোধ হয় একজন রোগীকে নামানো হচ্ছিল। দুটো
খালাসী স্ট্রিচারটা ধরে নামাচ্ছল। স্ট্রিচারে শারীরিক ব্যাক্তির কপাল পর্যন্ত
কাপড়ে ঢাক।

সহসা একজন যাত্রীর হাত লেগে লোকটার মুখের কাপড় সরে ঘেতেই
স্বীকৃত চমকে উঠল, সেদিকে হাত বাড়িয়ে কি বলতে ঘেতেই তার মুখ দিয়ে
একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল যেন, কে? কে?

কিরাইটীর চোখেও সে দৃশ্য এড়ায়নি। কিন্তু ততক্ষণে আর একটা লোক,
যে স্ট্রিচারের সঙ্গে সঙ্গে চলাচ্ছল, ক্ষিপ্তহাতে মুখের কাপড়টা আবার টেনে
দিয়েছে স্ট্রিচারে শারীরিক লোকটার।

সহসা স্বীকৃত অদৃশ্যে নিজের হাতের ওপরে একটা চাপ অন্তর্ভব করে
পাশের দিকে তাকাতেই কিরাইটীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। কিরাইটীর
চোখে অদৃশ্য কিসের যেন সঙ্গেকে।

স্বীকৃত নিজেকে সামলে নেয় গৃহ্ণতে।

কিরাইটীর মুখে কোন কিছু চিন্তার ছায়া পর্যন্ত যেন নেই, একান্ত
নির্বিকার সে মুখ।

পাশেই দণ্ডায়মান ডাঙ্কারও স্বীকৃতর সেই অস্ফুট শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন।
জিঞ্জাস্ত দ্রষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কি হল মিঃ রায়?

কিরাইটী ততক্ষণে নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। রাজ,

কিরাইটীর মুখের দিকে তাকায়নি, তাই সে হঠাত বলে ওঠে, সনৎ।

সনৎ! ডাঙ্কার প্রশ্ন করেন।

কিন্তু ততক্ষণে রাজ, স্বীকৃত চোখের দিকে দ্রষ্ট পড়ায়, নিজেকে সামলে
নিয়ে একটু মৃদু হেসে বললে, না কিছু না, আমাদের একজন চেনা লোককে
যেন জেটিতে দেখলাম।

চেনা লোক! ডাঙ্কার বিস্মিত ভাবে তাকান।

হ্যাঁ। মানে, খবর পেয়েছিলাম, তিনি যেন, এই—

তিনি যেন কি? ক্ষমা করুন, যদি বিশেষ কোন গোপনীয় কিছু থাকে, তবে অবিশ্ব, আমি শুনতে চাই না।

সুন্দরত হেসে বললে, না, এমন বিশেষ কিছু গোপনীয় নয়, আচ্ছা বলব'খন আপনাকে। চলুন এবাবে নামা ঘাক।

জাহাজ-ঘাটের বাইরে কিরীটী একটা লাইট-পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল অনুসন্ধানী দণ্ড ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

সুন্দরত এসে পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকল, মিঃ রায়!

দোর হয়ে গেছে। পেলাম না সুন্দরতবাবু।

পেলেন না?

না, চলুন।

ডাঙ্কারের প্রকাণ্ড কালো রংয়ের সুন্দর্শ্য হাস্বার গাঁড়টা তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ডাঙ্কার সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাঁড়তে চেপে বসলেন। গাঁড় ছেড়ে দিল।

একটা গাঁড়তে সমস্ত মালপত্র চাঁপয়ে ওরা চালককে মিঃ চৌধুরীর বাড়ির ঠিকানা বলে দিয়ে গাঁড়তে চেপে বসল।

চলমান গাঁড়ির মধ্যে বসে একসময় সুন্দরত বলে, ডাঙ্কার সান্যাল চর্কার লোক, কি বলেন মিঃ রায়?

কিরীটী চলন্ত গাঁড়ির খেলা জানালা দিয়ে রাঙ্কার দৃশ্যের নানা-জাতীয় অর্গানিত লোকজনের দিকে খরদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

সুন্দরত কথায় চমকে উঠে বললে, আঁ! কিছু বলছিলেন সুন্দরতবাবু?

কি ভাবছেন মিঃ রায়?

না, কিছু না।

একসময় গাঁড় ডাঃ চৌধুরীর বাড়ির সামনে এসে থামল। চৌধুরীর প্রবন্ধনো চাকর দাশ্ৰ দৱজাৰ গোড়াতে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল, কারণ তাকে আগেই তার করা হয়েছিল।

ওদের সকলকে গাঁড় থেকে নামতে দেখে ব্যাকুল কষ্টে দাশ্ৰ প্ৰশ্ন করে, আমাৰ দাদাৰাবু—সনৎবাবু আসেননি বাবু?

সুন্দরত আমতা আমতা কৰে বললে, না দাশ্ৰ, সনৎবাবু আসেননি তো এ জাহাজে, পৱেৰ জাহাজে আসছেন।

খাওয়া-দাওয়াৰ পৱ কিরীটী একসময় বললে, আজকেৰ দিনটা একেবাৰে প্ৰণ বিশ্রাম। পাদমেকং ন গচ্ছামি।

কথা শেষ কৰেই সে কলহাস্যে গান ধৰল...

আজ আমাদেৱ ছুটি রে ভাই,

আজ আমাদেৱ ছুটি।

সুন্দরত কিরীটীৰ হঠাতে হাস্যখীনীৰ কাৰণ বুৰতে পাৱল না, তবু হাসতে হাসতে বললে, ছুটি নয়, বৱং এই তো সবে শুৱৰু!

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, না। তাৰপৱেই আবাৰ আগেৱ মত গান গেয়ে চলল।

গান থামিয়ে কিরীটী আবাৰ একসময় বললে, এখন একটা লম্বা ঘৰ্ম-

তারপর আগরণ। চা-পান ও জলখাবার ভক্ষণ, মোটরে চেপে রেঙ্গুন শহরটা
প্রমণ, প্রত্যাগমন, স্নান-আহার, অতঃপর সারাটি রজনী ঘূর্ম—এই হল আমার
কর্মতালিকা অদ্য।

কিরীটী যেন দ্বিতীয়ের শিশু। আনন্দে আর কলহাস্যে সে যেন মশগুল
হল্লে উঠেছে।

সুব্রত হাসতে হাসতে বলে, ব্যাপার কি বলুন তো মিঃ রায়?

ব্যাপার কিসিমত!

বলেন কি?—রাজু ও সুব্রত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কিরীটী ডান হাতের একটা আঙুল ওষ্ঠের উপর রেখে গম্ভীর ভাবে
মাথাটা দোলাতে দোলাতে বললে, চূপ করুন, চূপ করুন। সর্বদা মনে রাখবেন
এটা কলকাতা শহর নয়, এটা কালো প্রমরের নিজের এলাকা। কিন্তু দেখলেন
তো শেষ পর্যন্ত, আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি! সনৎবাবুকে ওরা নিয়ে এল।
যাক, তাঁর পক্ষে এ একপ্রকার ভালই হল, কি বলেন? বিনা খরচায় সাগর-
শাঘাটা হয়ে গেল তাঁর।

কিন্তু তার উধারের কি করা যায়?

মা তৈ ... হবে হবে, সব হবে। জানেন তো সবুরে মেওয়া ফলে!

কিরীটী ম্দু ম্দু হাসতে থাকে।

॥ ১৭ ॥

কিরীটীর ব্যক্তি

সমস্ত প্রিপ্রহর একটা টানা দিবানিদ্বা দিয়ে সকলেই যেন শরীরটা বেশ সুস্থ
বোধ করে।

করোক দিন ধরে জাহাজে অবিশ্রাম চেউয়ের দোলায়, মনে হয় এখনও যেন
দেহটা দ্বলছে।

বৈকালিক চা-পানের পর রাজু শহর দেখতে বের হয়েছিল, কিরীটী আর
সুব্রত দোতলার ব্যালক্ফনিতে পাশাপাশি দ্বৰ্ধানা চেয়ার পেতে বসে গচ্ছ
করছিল।

সুব্রত বলছিল, যদিও আমি মৃহূর্তের জন্য স্টেচারে শায়িত সনৎদাকে
দেখেছি, তব—

কিরীটী বাধা দেয়, যদিও বলছেন কেন এখনও? আপনার মনে কি কোন
সন্দেহ আছে সুব্রতবাবু? আপনি আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন তা হলে
জানবেন, সকালবেলার সেই স্টেচারে শায়িত ব্যক্তি আর কেউ নন, আমাদের
সনৎবাবুই।

কিন্তু কেন যে আপনি ভাবছেন কালো ভুমর সনৎদাকে প্রাণে মারবে না,
এটা আমি ঠিক যেন এখনও ব্যবে উঠতে পারছি না।

প্রাণে যে মারবেই না বা প্রাণে মারা একেবারেই অসম্ভব, সে কথা তো
আমি বলিনি সুব্রতবাবু। আপনারা আমার কথার ঠিক অর্থ ধরতে পারেননি।
আমি বলাত চেয়েছি, বর্তমানে তারা সনৎবাবুর প্রাণহানি করবে না, করতে

পারে না।

কেন?

আচ্ছা আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই সুরতবাবু!

বলুন?

আচ্ছা আপনার অমরবাবুর মতু সম্পর্কে কি ধারণা? আপনি কি মনে করেন সত্যাই কোন আততায়ীর হাতেই অমরবাবুর মতু ঘটেছে?

না।

না কেন?

কারণ তাই যদি হবে, তা হলে অন্ততঃ কালো ভ্রম নিশ্চয়ই মতদেহের মুখ্যটা ওভাবে বিকৃত করে রেখে যেত না।

তা হলে আপনি ধরেই নিচ্ছেন যে, এই হত্যা-ব্যাপারের সঙ্গে কালো ভ্রম সন্মিশ্রিত ভাবেই জড়িত আছে?

হ্যাঁ।

ঠিক তাই সুরতবাবু। সেইজন্যই সনৎবাবুকে বর্তমানে কালো ভ্রম প্রাণে মারতে পারে না। কালো ভ্রমের বিষ্঵েষ শুধু সনৎবাবুর ওপরেই নয়, আপনার ওপরে অমরবাবুর ওপরও। তবে সেই সঙ্গে আরও একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, সনৎবাবুর ওপরে কালো ভ্রমের রাগ বা বিষ্঵েষ থাকাটা স্বাভাবিক এবং তার কারণও আমাদের চোখের সামনে আছে। কিন্তু আপনার ওপরে তার বিষ্঵েষের কারণ যে কেবলমাত্র গতবারের লজ্জাকর পরাজয়ের ব্যাপারটাই, এটা মানতে যেন কিছুতেই আমার মন চায় না সুরতবাবু!

কেন? এ কথা বলছেন কেন কিরীটীবাবু?

তাই যদি বুঝতে পারতাম, তা হলে কালো ভ্রমের এবারের অভিযানের অর্থটাও আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে যেত। এই ঘটনা ঘটবার কিছুদিন আগে থেকেই কালো ভ্রমের সম্পর্কে আমি যথসাধ্য খোঁজ নিরেছি। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, কালো ভ্রমের আর যাই হোক ছিঁচকে চোর-ডাকাত নয়। কারণ বিশেষ করে তাহলে ধৰ্মিক সম্পদায়ের প্রতিটী তার যত কিছু বিষ্঵েষ, যত বিভূতি থাকত না এবং বিশেষ বিশেষ করকগুলি কুকীর্তি ছাড়া সাধারণ আরও পাঁচটা দুর্ধর্ষ ডাকাত বা চোরের মতই হাঙগামা, ডাকাতি ও খুন-খারাপি করে করে বেড়াত।

কিরীটীর শেষের কথায় কান না দিয়েই সুরত বলে, কিন্তু একটা কথা এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না কিরীটীবাবু, এই এত বড় রেঞ্জেন শহরে কোন পথে আপনি সনৎদার সন্ধান করবেন?

সুরতের কথায় কিরীটী মন্দ হেসে বলে, তার জন্যও চিঢ়া নেই সুরত বাবু। কালো ভ্রমকে আমাদের গ্রহেই আসতে হবে।

এ আপনি কি বলছেন?

ঠিকই বলছি, এমন একটি বহুমূল্য সম্পদ হতে সে বর্ণিত হয়েছে এবং বর্তমানে যা সম্পূর্ণ আমার অধিকারে, তারই আকর্ষণে সে আসবে। হ্যাঁ, কালো ভ্রমের আসবে। আসতে তাকে হবেই।

কিরীটীর কথাগুলো সুরতের নিকট যেন কেমন রহস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। যেন পূর্ণ হেঁরালি।

আমি আপনার কথা কিছু ব্যবতে পারলাম না কিরীটীবাবু।

ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই সুব্রতবাবু। সময় এলেই সব ব্যবতে পারবেন।

এমন সময় সির্ডিতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। কিরীটী যেন হঠাতে উদ্গীব হয়ে ওঠে, এই রাজেনবাবু আসছেন, আর তাঁর সঙ্গে বোধ হয় সালিলবাবুও আসছেন—যদি আমার অনুমান মিথ্যা না হয়ে থাকে।

সর্তাই কিরীটীর কথা শেষ না হতে হতেই প্রথমে রাজু এবং তার পশ্চাতে সালিলবাবু এসে ব্যালকনিতে প্রবেশ করলেন।

আস্দুন মিঃ সেন। কিরীটী আহবান জানায়, আপনাকে ডাকতে রাজেনবাবুকে পাঠিয়েছিলাম বটে, তবে ভাবিন এখনই আপনি আসবেন।

জানেন তো বিদেশে স্বজাতি—, সালিলবাবু হাসতে হাসতে চেয়ারে উপবেশন করলেন। তারপর প্রাথমিক পরিচয়-পৰ্ব শেষ করে সালিলবাবু বললেন, রাজেনবাবুর মৃত্যেই সব শুনলাম মিঃ রায়।

এখন আপনি আমাদের সম্পর্গ ভরসা মিঃ সেন, কিরীটী বলে, আচ্ছা অমরবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে আপনার ঘতাঘত কি জানতে পারি কি?

ন্যূনে হত্যা সন্দেহ নেই। বরং এ যে সেই আগের ঘটনারই জের, তাও আমাদের ধারণা।

তারপর আবার একসময় কিরীটী কথায় কথায় সালিল সেনকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা মিঃ সেন, অমরবাবু যে কক্ষে শয়ন করতেন, সেখান থেকে চিকার করলে বা কোন গোলমাল হলে, নৌচের ভূতদের ঘরে কি শোনা যায়?

না। আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখেছি, শোনা যায় না।

ভূত্য তাহলে কোন চিক্কার বা গোলমালই শুনতে পার্য্যন সে-রাতে? না।

আচ্ছা লোকটা এদেশীয় কি?

হ্যাঁ।

লোকটা এখন কোথায়, নিশ্চয়ই হাজতে? ভাল কথা, করোনারের ভারতিক্ট কি?

কেউ বা কারও দ্বারা অমরবাবু নিষ্ঠার ছবিরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন।

আচ্ছা আপনাদের ডি, আই, জি, লোকটা ইউরোপীয়ান নিশ্চয়ই?

অ্যাংলো-বার্মিংজ।

আপনাদের ডিপার্টমেন্টে কালো ভ্রমণের একটা full details নিশ্চয়ই আছে?

আছে।

সেটা আমি একবার দেখতে পারি কি?

নিশ্চয়ই, কাল আমার ডিপার্টমেন্টে আসবেন, দেখাব। তাছাড়া আমাদের স্মৃতি আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক।

রাণি প্রায় নটার সময় ইন্সপেক্টর সালিল সেন ওদের নিকট হতে বিদায় নিলেন।

ভূত্য এই সময় সংবাদ দিল আহাৰ্প্রস্তুত।

আহাৱাদিৰ পৰ সকলে এসে যে যাব শব্দ্যায় আশ্রয় নিল।

সুব্রত ভাৰছিল কিরীটীর কথাগুলিই। কিরীটীর অভুত বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তি সতাই তাকে মৃক্ষ করেছে। কিন্তু তবু কিছুতেই সে যেন

বুঝে উঠতে পারছিল না, কেন কিরীটীর ধারণা কালো শ্রমর সনৎকামে এখনই
প্রাণে আরবে না !

কি জানি, স্বৰত আবার ঐ সঙ্গে ভাবে, সব কথা যে কিরীটীবাবু খোলসা
করে খুলো বলতে চান না !

উনি কি স্বৰতকে বিশ্বাস করেন না ?

রাজ্ঞকে যে সলিলবাবুর সন্ধানে পাঠিয়েছেন, সে কথা পর্যন্ত উনি তার
নিকট গোপন করে রেখেছিলেন, কিন্তু কেন ?

আর কিরীটী ভাবিছিল সম্পূর্ণ অন্য কথা ।

কালো শ্রমর নিজে থেকে ধরা না দিলে কোনমতেই তাকে ধরা যাবে না ।

সনৎ-এর উধাও হওয়ার দিন থেকে পর পর এই কানিনের ঘটনাবলী
বিশ্লেষণ করলে যেন তাই মনে হচ্ছে ।

আবিবেচকের মত কোন কাজই কালো শ্রমর করতে পারে না । প্রতিটি
পর্দাবক্ষেপ সে হিসাব করে ফেলে ।

এত বড় দলের যে দলপাতি, অথচ কেউ আজ পর্যন্ত তার আসল পরিচয়টা
পর্যন্ত জানে না এবং জানাতেও কালো শ্রমর শুধু ইচ্ছুকই নয় তাই নয়, যাতে
অন্য কেউ তার সত্যকারের পরিচয়টা না জানতে পারে, তার জন্য সে অত্যন্ত
সচেষ্ট ও যত্নবান । কিন্তু কেন ?

॥ ১৪ ॥

রাতের আধারে অন্ধসরণ

রাত্রি কত হবে কে জানে ? স্বৰত আর কিরীটী পাশাপাশি এক শব্দ্যায় শুন্নে ।
স্বৰত বোধ হয় অনেকক্ষণ ঘুর্ময়ে পড়েছে । তার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ বেশ
স্পষ্ট শোনা যায় ।

ও-পাশের একটা খাটে ঘুর্ময়ে আছে রাজ্ঞি । সেও গভীর নিদ্রায় আচ্ছম ।

গত দণ্ড রাত্রি কিরীটীর ভাল করে ঘুম হয়নি । কাজেই দণ্ড চোখের পাতা
এবারে ঘুমে ভারী হয়ে আস্তে আস্তে ঘুজে আসে ।

কিন্তু সহসা মাঝরাত্রে অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় কিরীটীর ঘুম ভেঙে
গেল ।

রাত্রি কত হয়েছে ঠিক নেই । কিসের যেন একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা
যাচ্ছে । মনে হল যেন পাশের অধ্যকার ঘর থেকে শব্দটা আসছে ।

কিরীটী উৎকর্ণ হয়ে উঠে । পাশেই স্বৰত গভীর নিদ্রায় আচ্ছম, তার
নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয়েছে বলে তো মনে হয় না ।

হ্যাঁ, কার যেন সাবধানী পায়ের নিঃশব্দে চলাচলের অস্পষ্ট মণ্ড আওয়াজ ।
এত রাত্রে পাশের ঘরে কে ?

খানিক পরে সে শব্দটা আর শোনা গেল না ।

কিন্তু আবার ! হ্যাঁ, ঐ তো আওয়াজটা আবার পাওয়া যাচ্ছে । কেউ
নিশ্চয়ই নিঃশব্দে ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে ! না, দেখতে হল ।

কিরীটী উঠে বসে । শয্যা ত্যাগ করে দণ্ড ঘরের মধ্যবর্তী যে দরজাটা

আছে তার সামনে গিয়ে সে কান পেতে দাঁড়াল। তারপর দরজাটার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে গিয়ে দেখল দরজাটা ওদিক হতে বন্ধ। আশ্চর্য, শোয়ার সময়ও তো দরজাটা খোলাই ছিল! তবে? কিরীটী আরও একটু জোরে দরজাটা ঠেলা দিল। কিন্তু দরজা খুলল না। কিরীটী বিস্মিত, বিমৃঢ়।

সহসা মনে পড়ে ওদিককার বারান্দার দিকেও ঘরটার দুটো জানালা আছে। সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী এ ঘরের দরজা দিয়ে ওদিককার বারান্দায় গেল।

অন্ধকার বারান্দা।

নীচের বাগান থেকে বিশ্বিং পোকার একথেয়ে বিশ্বিং শব্দ ভেসে আসে। রাতের হাওয়া নিঃশব্দে চোরের মতই আনাগোনা করে ফেরে। নাম-না-জানা একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

কিরীটী পায়ে পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দেখে জানালাটি খোলা! দেওয়ালের গা ঘেঁষে চোরের মত চুপ চুপ এসে সে জানালাটার আড়ালে দাঁড়াল।

অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা সরু আলোর রশ্মি এদিক-ওদিক ঘূরছে। চোখের দ্রষ্টিই হতটা সম্ভব প্রথর করে কিরীটী ঘরের ভিতরের সব কিছু দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

যেখানে ওদের সুটকেস ও বাঞ্ছগুলো সাজানো আছে, সেখানে একটা ছায়ামুর্তি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেলে কি ঘেন দেখছে। লোকটা কে? কিই বা দেখছে?

কিরীটী উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

থট করে একটা শব্দ হল—হাঁ, বাস্তৱ ডালা খোলবার শব্দ বটে! বাস্তৱ মধ্যে আঁতিপাঁতি করে লোকটা কি থুঁজছে অমন করে?

কিরীটী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব ব্যাপার দেখতে লাগল।

ওপরের বাঞ্ছটা নামিয়ে রেখে লোকটা আর একটা বাঞ্ছ খোলবার জন্য তার হাতের চাবির গোছার এক-একটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল। আবার থট করে একটা শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে বাস্তৱ ডালাটাও খুলে গেল।

এবাবে অল্পক্ষণ হাতড়াতে কি একটা কাগজ পেয়ে লোকটা টর্চের আলোয় সেটা মেলে ধরে দেখলে এবং সেটা পকেটে পুরে টর্চ নিবিয়ে ওদিককার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর জানালা টপকে ওদিককে চলে গেল।

কিরীটীও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে জানালা টপকে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। জানালাটার কাছে ছুটে এসে সে দেখে জানালার গায়ে একটা দাঁড়ির মই ঝুলছে, আর লোকটা নিঃশব্দে সেই দাঁড়ির মই বেরে নীচের বাগানে নেমে যাচ্ছে দ্রুত।

আর দেরি না করে কিরীটী একপ্রকার ছুটেই বাঁড়ির সিঁড়ি দিয়ে বাগানের দিকে চলে যায়।

রাতের অন্ধকারে বাগানটি অস্পষ্ট। ভাল করে কিছু দেখাও যায় না—বোঝাও যায় না।

বাগানের পিছন দিক দিয়ে একটা স্বচ্ছপরিসর রাস্তা ঘূরে এসে এদিক-কার বড় রাস্তায় মিশেছে। যেতে হলে লোকটিকে বাগানের প্রাচীর টপকে ওই রাস্তা দিয়ে এই বড় রাস্তায় আসতেই হবে। কিরীটী মনে মনে এই চিন্তা করে দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে চলল, তারপর দরজা খুলে রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়াল।

সহস্র তার নজরে পড়ে রাস্তার ঠিক ওপরেই ছোট একটা ‘ট্ৰু-সীটাৱ’ মোটোরগাড়ি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পরে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শব্দটা বাগানের পিছনের সরু রাস্তার দিক থেকেই যেন আসছে মনে হয়। শব্দটা ক্রমে স্পষ্ট হতে চল্পত্তের মনে হয়।

কিৱীটী দৰজার কপাটের আড়ালে একটু সরে দাঁড়িয়ে দেখল, সরু রাস্তা দিয়ে একটা লোক বড় রাস্তার দিকে আসছে। লোকটাৰ গায়ে একটা কলো ঝংয়েৰ কিমনো চাপানো, মাথায় একটা ‘নাইট’ ক্যাপ। লোকটা আস্তে আস্তে মোটোরটিৰ কাছে এসে দৰজা খুলে গাড়িৰ ভিতৰ গিয়ে বসল।

কিৱীটী দ্রুতপদে এগিয়ে এসে গাড়িৰ পিছনে যে চাকার ক্যারিয়ারটা ছিল, সেটাৰ ওপৰ চট কৰে উঠে বসে কোনমতে, তাৰপৰ গাড়িৰ হৃড় আটকাবাৰ জন্য পিছনে যে দৃঢ়টো লোহার হৃড় ছিল, দৃঢ় হাতে সে দৃঢ়টোকে বেশ শক্ত কৰে চেপে ধৰল।

গাড়ি ততক্ষণে স্টার্ট দিয়ে চলতে শুৱু কৰেছে। গাড়িৰ বেগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সামান্য একটা চাকার ওপৰ ঠিক হয়ে বসে থাকা সঁত্য বড় কষ্টকৰ। গাড়ি রাধিৰ অন্ধকারে রেঞ্জন শহৱেৰ বিভিন্ন পথ ধৰে ছুটে চলেছে।

সামান্য জায়গায় একই ভাবে বসে থেকে কিৱীটীৰ হাত-পা সব টন্টন কৰেছে। অনেকক্ষণ পৰে গাড়িটা এসে একটা বাগানেৰ মধ্যে প্ৰবেশ কৰল। গাড়িৰ গতি ধীৰে ধীৰে কমে আসতেই কিৱীটী লাফ দিয়ে গাড়িৰ পিছন থেকে নেমে পড়ল। গাড়িটা আৱও একটু গিয়ে ছেট গাড়িৰবাবাল্দাৰ নীচে দাঁড়াল।

কিৱীটী অন্ধকারে খালিকটা দূৰে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। খালিক পৱেই গাড়িৰবাবাল্দাৰ আলোটা জলে উঠল। সেই আলোয় কিৱীটী দেখতে পেল, মোটোৰ থেকে সেই কিমনো পৰিহিত লোকটি বৌৰায়ে দেওয়ালোৱা গায়ে একটি বোতাম টিপতেই সামনেৰ একটি দৰজা ফাঁক হয়ে রাস্তা কৰে দিল। লোকটি দৰজা দিয়ে ভিতৰে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই প্ৰায় দৰজাটা আবাৰ বন্ধ হয়ে গেল। আলোটাও নিভে গেল।

কিৱীটী উঠে গাড়িৰবাবাল্দাৰ এল, কিন্তু অন্ধকারে গাড়িৰবাবাল্দাৰটা ভাল কৰে দেখা যায় না। কোনমতে দেওয়াল ধৰে ধৰে আলাজে ভৱ কৰে কিৱীটী সেই বোতামটি খুঁজতে লাগল, কিন্তু কিছুই ঠাওৰ কৰে উঠতে পাৱলে না। একটি দৰজা ঘনিষ্ঠ বা হাতেৰ কাছে পাওয়া গেল, কিন্তু হাত দিয়ে ভাল কৰে দেখতে গিয়ে কিৱীটী বুঝল, একই রকমেৰ দৰজা পৰ পৰ আৱও দৃঢ়টো আছে। তাৰ সব কিছু যেন গুলিয়ে যায়। কোন্দৰজাটা দিয়ে এক মুহূৰ্ত আগে যে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল তা সে কিছুতেই বুৰে উঠতে পাৱে না। কিৱীটী ভাবল বস্ত ভুল হয়ে গেছে, আসবাৰ সময় ঘনিষ্ঠ চৰ্টটাও অন্তত নিয়ে আসতাম!

ৱাগে দৃঢ়খে কিৱীটীৰ নিজেৰ হাত নিজেৰই কামড়াতে ইচ্ছা কৰে। কিন্তু উপায় কি? কি এখন কৱা যেতে পাৱে? এতদৰ এসে সে কি বিফল হয়ে ফিৰে থাবে শেষটায়?

এমন সময় সামনেই কোথাও একটা ওয়াল-ক্ৰক ঢং ঢং ঢং কৰে রাতি চাৰটে ঘোষণা কৱলৈ। কিৱীটী চেয়ে দেখল প্ৰবেৰ আকাশে রাতিৰেখেৰে লালচে আভা জেগে উঠেছে। রাতি শেষ হয়ে আসছে। আৱ এভাবে এখনে

দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয়। কিরীটী নিঃশব্দে গেট পার হয়ে রাস্তায় চলে আসে।

॥ ১৯ ॥

ডাঃ সান্যালের গৃহে

রাস্তায় নেমে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ কিরীটী যেন কি ভাবে, তারপর আবার সে বাঁড়ির গেটের ঘধো গিয়ে প্রবেশ করে, স্বল্পে আলো-অঁধারে সে গাঁড়ির ন্যূনতা দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল যে গাঁড়ির নাম্বার-প্লেটই নেই—সেটা খুলে রাখা হয়েছে। গাঁড়িবারান্দায় যেখানে গাঁড়িটা দাঁড়ি করানো ছিল সেখানে কাঁকর বিছানো। কিরীটী একটা কাঁকর তুলে নিয়ে গাঁড়ির বাড়ির উপর ঘষে ঘষে ইংরাজীতে লিখল ‘K’। তারপর আবার বের হয়ে রাস্তায় এসে নামল।

রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। চারিদিকে অল্প অল্প আলো ফুটে উঠেছে। সবেমাত্র দ্বৃ-একজন করে লোক রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছে।

কিরীটী নিশ্চিন্ত মনে হাঁটতে শুরু করল। আনন্দনা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে ভুলপথে এসে পড়েছে তা সে নিজেও টের পয়নি। যখন খেয়াল হল তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। লোকজন গাঁড়িঘোড়া চলতে শুরু করেছে।

কিরীটী সামনেই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে কিছু জলখাবার ও চা খেয়ে নিল। তারপর রাস্তায় এসে নামতেই হঠাৎ ওর কানে এসে বাজল, মিঃ রায়!

কিরীটী চমকে উঠে ফিরে দেখলে সামনেই দাঁড়িয়ে ডাঃ সান্যাল ও মিঃ সালিল সেন।

স্মৃত্বাত ! কোথায় চলেছেন ? ডাঙ্কারই প্রথমে প্রশ্ন করলেন।

এই...মানে সকালবেলা বেড়াতে বেড়াতে...। কিরীটী আমতা আমতা করে জবাব দিল।

ডাঙ্কার ম্দু, ম্দু হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন, একেবারে রাঁচিবাস চাপিয়েই বেড়াতে বেরিয়েছেন দেখছি যে !

কিরীটী নিজের বেশভূষার দিকে সুহসা এতক্ষণে তাকিয়ে লঙ্ঘিত হল, একটু অপ্রস্তুতও হল। সত্যি, এ খেয়াল তো তার মোটেই হয়নি। তাড়াতাড়ি সে কথাটা ঢাকবার জন্য কিরীটী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলে, আপানও মার্নিং-ওয়াকে বুঝি ?

হ্যাঁ, না মানে, ভোরবেলা গেছলাম আমার এই বন্ধুর বাঁড়ি। এ'র পাশে হেঁটে বেড়ানোর শখ। তাই বেড়াতে বেরিয়েছি। আমার এ বন্ধুটিকে বোধ হয় চিনতে পারছেন না ! ইনি সি. আই. ডি ইনসিপেক্টার মিঃ সালিল সেন।

বিলক্ষণ ! আগেই এ'র সঙ্গে পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়েছে, স্মৃত্বাত মিঃ সেন। বলে কিরীটী হাত তুলে নমস্কার জানাল।

মিঃ সেনও প্রতি-নমস্কার দিলেন ম্দু, হেসে।

ডাঃ সান্যাল সৰ্লিল সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও তাই নাকি, বেশ বেশ।...কিন্তু মিঃ সেন, ধূজ্জি টিবাবুর আসল পরিচয়টুকু পেয়েছেন তো? ভদ্রলোক চমৎকার গান গাইতে পারেন। আসছেন তো আজ আগাম ওখানে, শুনবেন এঁর গান...এবার জাহাজে উঁর সঙ্গে আলাপ হল।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, শুনবেন না মিঃ সেন ডাঙ্গার সান্যালের কথা, বিনয় করে বড় বেশী বাড়িয়ে বলছেন। বরং উঁরই বাজনার সুর এখনও আগাম দৃঢ় কান ভরে আছে।

যা বলেছেন মিঃ রায়। সৰ্ত্য অতি অস্ত্রুত উঁর বাজনার হাত—যেন সুধা-বর্ষণ করে। মিঃ সেন বললেন।

মিঃ সেন, আপনি তো এদিকেই চলেছেন, চলুন আপনার সঙ্গে গচ্ছ করতে করতে থাব। বলে যেন একপ্রকার জোর করেই কিরীটী মিঃ সেনকে সঙ্গে করে এগিয়ে যাব।

পথে ঘেতে ঘেতে কিরীটী সংক্ষেপে ডাঃ সান্যালের কাছে যে কেন পরিচয়টা তার গোপন করেছে সবই বলে।

*

*

*

স্বিপ্রহরে ডাঃ সান্যালের গৃহে সকলেই এসে হাঁজির হয়েছে—কিরীটী, সুত্রত, রাজু ও মিঃ সৰ্লিল সেন।

কামিশনার রোডে ডাঙ্গার সান্যালের বাড়ি। অস্ত বড় দোতলা বাড়ি, বাড়ির পিছনে ফুলের বাগান ও গ্যারেজ। দোতলায় একটি ল্যাবরেটরী। তার পাশেই লাইব্রেরি ঘর। দশ-বারোটা আলমারিতে ঠাসা ইংরাজী, বাংলা, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ভাষার সব ডাঙ্গারীর বই। শয়নখরে একটা ছোট ক্যাম্পখাটে সামান্য একটা কম্বল বিছানো। তার ওপরে একটা কাশ্মীরী চাদর পাতা। ঝালর-দেওয়া পরিষ্কার দুর্টি মাথার বালিশ। মাথার কাছে টী-পয়ের ওপরে একটা টেবিল-ল্যাম্প ও তার পাশে ধ্যানস্থ বৃক্ষের ছোট্ট একটি পিতল-মূর্তি।...

ঘরে তিনটি ফটো—একটি ডাঙ্গারের মার এবং অন্য দুটি তাঁর বাবার ও বোনের। ডাঙ্গার ঘৰিরয়ে ঘৰিরয়ে ওদের সবাইকে সব বাড়ি-ঘর দেখালেন।

খেতে বসে নানা গচ্ছ করতে করতে ডাঃ সান্যাল একসময়ে প্রশ্ন করলেন, মিঃ অমর বস্তুর মতুর কোন কিনারা হল মিঃ সেন?

না, এখনও তো কোন সম্মান পাইনি।

ডাঙ্গার গম্ভীরভাবে বললেন, কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তো খবে বলছিল যে, এর মধ্যে কালো প্রমরেরও নাকি হাত আছে!

কালো প্রমরের নাম শুনেই মিঃ সেন সহসা অতাল্ট উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, চাপা কষ্টে বলতে লাগলেন, কালো প্রমর! উঃ, একটিবার যদি সেই শয়তানকে—সেই দুশ্মনকে হাতের কাছে পেতাম, তবে তার কাঁচা মাথাটাই চিরিয়ে খেতাম বোধ হয়!

মিঃ সেনের ভাব দেখে ডাঙ্গার সান্যাল হেসে বললেন, কালো প্রমরের ওপরে আপনার যে ভয়ানক রাগ দেখছি মিঃ সেন!

রাগ কি আর সাধে হয় ডাঙ্গার! সভ্য সমাজের মধ্যে সে একটা গলিত কুঠি। সর্বত্র এমন বিভীষিকা সে জাঁগয়ে তুলেছে যে আঁতকে শিউরে উঠতে হয়।...শয়তান!

ডাঙ্গার এবারে যেন একটু গম্ভীর হলেন, বললেন, সৰ্ত্য সে বেটো বড়

বাড়িয়ে তুলেছে। আর আশ্চর্য লোকটার ক্ষমতা! ভয়ডর বলে কি কিছু ওর
শরীরে নেই? আপনাদের ডিপার্টমেন্টাই বা কেমন? সামান্য একটা
ডাকাতের দলের আজ পর্যন্ত কিনারা করে উঠতে পারল না! দিনের পর দিন
সে তার অতোচার চালিয়ে চলেছে!

পাপের ভরা তার পূর্ণ হয়েছে। এবার তার সকল কিছুর হিসাবনিকাশ
হবে দেখ্ন না, বললে রাজ্ঞি।

এ কথাই হতে পারে না। একটা ডাকাতের দলকে খুঁজে বের করা যায়
না! আপনাদেরও সে রকম চেষ্টা নেই মিঃ সেন। নইলে—, বললেন ডাক্তার
মদ্দ মদ্দ হাসতে হাসতে।

আহারাদির পর সালিল সেন বললেন, আমি এখন ঘণ্টা-দুয়েকের জন্য বিদায়
নেব। আবার চারটে সাড়ে চারটার মধ্যে ফিরব, জরুরী একটা কাজ আছে।

মিঃ সেন উঠে পড়লেন।

কিরীটী বললে, আমারও একটু কাজ আছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব।
সুন্দরত, তোমরা এখানেই থেকো।

কিরীটীও মিঃ সেনের সঙ্গে উঠে গেল।

ছোট ট্ৰ-সীটার গাড়িখানি মিঃ সেনের। একজন ভূত্য গাড়ির মধ্যে
বসেছিল। সে গিয়ে ভিতরের সীটে বসল, মিঃ সেন গিয়ে স্টিয়ারিংয়ে
বসলেন।

মিঃ সেন কিরীটীর দিকে ফিরে গুড়বাই বলে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।
গাড়ি চলতে শুরু করল। এমন সময় গাড়ির বাড়ির পিছনদিকটার নজর
পড়তেই কিরীটী চাকে উঠল। কারণ সে দেখলে গাড়ির গায়ে ঘৰে ঘৰে 'K'
অক্ষরাটি তখনও স্পষ্ট রয়েছে!

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কটা কাটবার আগেই গাড়িটা সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে
খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে স্থানটা ধূমায়িত ও পেষ্টলের গন্ধে ভারিয়ে দিয়ে গেটের
বাইরে চলে গেছে।

সহসা কিরীটীর চক ভাঙল ডাক্তারের কঠিন্যে। ইতিমধ্যে কখন যে
একসময় ডাঃ সান্যাল নীচে নেমে একেবারে ওর পাশটিতে দাঁড়িয়েছেন সে
টেরই পায়নি। ডাক্তার বললেন, মিঃ রায়, আপনি বাবেন না বলছিলেন?

কিরীটী ততক্ষণে আপনাকে সামলে নিয়েছে, বললে, হ্যাঁ, এই যে যাই!
বলে সে গিয়ে রাস্তায় নামল।

*

*

*

সন্ধ্যার তখন আর খুব বেশী দেরি নেই।

দিনের আলোর বিলীয়মান রশ্মিগুলো আকাশের মেঘের গায়ে গায়ে
ইন্দুধনু রচনা করছে।

ঘরের মাঝখানে একটা গোল টেবিলের চারপাশে হেলানো বেতের চেয়ারে
বসে সুন্দর, কিরীটী, ডাক্তার সান্যাল, রাজ্ঞি ও মিঃ সালিল সেন।

কিরীটী গাইছিল—

“দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া

ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।

ওপারের ঐ সোনার ক্লে আঁধার মূলে কোন মায়া

গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান!...”

କିରାଟୀର ଉଦାନ୍ତ କଞ୍ଚକର ସାମ୍ବା-ପ୍ରକଳ୍ପିତର ଗାୟେ ସେଣ ଆୟାଜାଲ ରଚନା କରେ
ଚଲେଛେ । ମୁଖ୍ୟ ବିଷମଯେ ସକଳେ ଶୁଣନ୍ତେ ।

କିରାଟୀ ତଥନ ଗାଇଛେ—

ଫୁଲେର ସାହାର ନେଇକୋ ସାହାର
ଫୁଲ ସାହାର ଫୁଲ ନା,
ଅଶ୍ରୁ ସାହାର ଫେଲତେ ହାସି ପାଯ ।

ଦିନେର ଆଲୋ ସାର ଫୁଲାଳେ
ସାଁବେର ଆଲୋ ଜୁଲାଳେ ନା
ଦେଇ ବସେଛେ ଘାଟେର କିନାରାୟ—
ଓରେ ଆୟ । ଆମାଯ ନିଯେ ସାବ କେ ରେ
ଦିନେର ଶେଷ ଶେଷ ଦେଖାୟ—

ଧୀରେ ଧୀରେ କିରାଟୀ ଗାନ୍ଟା ଶେଷ କରଲ ।

ଇତିମଧ୍ୟେ ଡାଙ୍କାରେ ଭୃତ୍ୟ ଭୋଲା ଏସେ ସରେର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଲୋ ଜୁଲାଳେ
ଦିଯେ ଗେଛେ ।

ଓରା ସର୍ବମଧ୍ୟେ ଦେଖଲ, ଡାଙ୍କାରେ ଦୂରୋଥେର କୋଲେ ଦୂର ଫେଁଟା ଜଳ ଟଲମଳ
କରଛେ ।

ଡାଙ୍କାର ମୃଦୁମଧ୍ୟରେ ସେଣ କି ବଲଛେନ ଆସ୍ତଗତଭାବେ । ତାର ମନେର ମାଝେ ସେଣ
ବିଷମ ଝଡ଼ ଉଠେଛେ ।

ହଠାତ୍ ଏକମଧ୍ୟ ଡାଙ୍କାର ଚୋଯାର ଛେଢ଼େ ଉଠେ ଅଶାନ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧିତର ପଦେ ସରେର ମଧ୍ୟେ
ପାରାଚାରି ଶର୍କୁ କରେନ ।

॥ ୨୦ ॥

ଡାଙ୍କାରୀ କାର ?

ଡାଙ୍କାର ! ଡାଙ୍କାର !

ସହସା ସେଣ ସିଲିଲ ସେନେର ଡାକେ ଡାଙ୍କାରେର ସର୍ବିଂ ଫିରେ ଏଲ ।

ତିନି ବଲଲେନ, ନା, କିଛି ନା । ମାଝେ ମାଝେ ମନ୍ତା ଆମାର କେନ ସେ ଉତ୍ତଳା
ହେଁ ଓଠେ ବୁଝି ନା । ଏକଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଆପନାରା, ଏଥନାହିଁ ଆସାଇ । ବଲେ
ଦ୍ଵାତ୍ର ପଦାବିକ୍ଷେପେ ଡାଙ୍କାର ସର ଥେକେ ନିଷ୍କଳାନ୍ତ ହେଁ ଗେଲେନ ।

ବୋଯା ଗେଲ ଡାଙ୍କାର ତାର ଲ୍ୟାବରେଟାରୀ ସରେ ଗିଯେ ଟ୍ରକଲେନ, କାରଗ ସେ ସରେର
ଦରଜାଟା ଦଢ଼ାଇ କରେ ବନ୍ଧ ହେଁ ଗେଲ ।

ଲୋକଟା ଏଦିକେ ଏକେବାରେ ଚମତ୍କାର । କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ହୁଯାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ
କି ସେଣ ଖାର ଘାଡ଼େ ଚାପେ—ପାଗଲେର ମତ ସା-ତା ବକେନ । ଅର୍ଦ୍ଧିତର ଚଣ୍ଡଲ ହେଁ
ଓଠେନ । ..ଆଶ୍ରୟ ! ମିଃ ସେନ ବଲଲେନ ।

ରାଜ୍ଜ ବଲଲେ, ମାଥାଯ କୋନ ଗନ୍ଧଗୋଲ ଆଛେ ବୋଧ ହୟ । ଅନ୍ତତଃ ଆମାର
ତୋ ତାଇ ମନେ ହୟ ।

କି ଜାନି ! ଏତ ବଡ଼ ଭାନୀ ଡାଙ୍କାର ଏ ଶହରେ ଆର ଦୂଜନ ନେଇ । କିନ୍ତୁ
ଲୋକଟା ଏମନ ଖାମେଖୋଲୀ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରେ ଲକ୍ଷ ଟାକା ଦିଯେଓ ଡେକେ ପାଓଯା
ଥାଯ ନା ! ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଁଛେ କି ସଦର ଦରଜା ଏକେବାରେ ପରେର ଦିନ ସକାଳେର ମତ

বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে শুধু গভীর রাতে গিটারের করুণ সুর-মুর্ছনা শোনা যায়। আমার মনে হয় মাথা খারাপ-টারাপ কিছু নয়, হয়তো জীবনে বড় রকমের কোন আঘাত পেয়ে থাকবেন, তারই জন্য এইরকম মানবিক অবস্থা হয়েছে।

রাতে কি সত্যি সত্যি ডাঙ্কার কোথাও বের হন না মিঃ সেন? কিরীটী
শুধুল।

না। আমার সঙ্গে শুরু আজ সাত বছরের আলাপ। এই সুদীর্ঘ সময়ের
মধ্যে একটি দিনের জন্যও শৰ্নিন যে রাতে বাড়ির বাইরে গেছেন। তবে এক-
দিন জিজ্ঞাসা করায় উইনি বলোছিলেন, রাতে উইনি নিরিবিলতে ল্যাবরেটরী ঘরে
বসে নার্ক ডাঙ্কারী সম্বন্ধে রিসার্চ করেন।

হ্যাঁ, সত্যি রিসার্চ করি।

কথাটা শুনে সকলে চমকে ফিরে দেখল খোলা দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে
সহস্যমুখে ডাঙ্কার সান্যাল।

ডাঙ্কার বলতে লাগলেন, আপনারা হয়ত জানেন ‘টিউবারকল ব্যাসিল’ বলে
একরকম জীবাণু আছে, প্রাতি বছর এই ভীষণ জীবাণুর প্রকোপে হাজার হাজার
মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শুধু সভ্য সমাজই নয়, সমগ্র মানবজাতির
এত বড় শত্রু আর দ্বিতীয়টি নেই। আপনাদের ঐ কালো ভ্রমরের হাতে পড়লে
তবুও অনেক সময় নিস্তার পাওয়া যায় শুনেছি, কিন্তু এই ভীষণ দুর্শমনের
কবল থেকে রক্ষা পাওয়া সত্যই বড় দুর্ভু ব্যাপার। কালো ভ্রমর আসে রাতের
অঁধারে লুকিয়ে চাঁপচাঁপি, কিন্তু এ শয়তান দিন-রাত্রি কিছু মানে না—এ
তিল তিল করে গান্ধুরের জীবন-শক্তি শূষ্কে নেয়। আমি আজ দীর্ঘ এগারো
বছর এই অদৃশ্য শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার
জীবনের সমস্ত শক্তি তিল তিল করে এর পায়ে ঢেলে দিতে প্রস্তুত আছি।
দৈখ এ আমার কাছে হার মানে কিনা!

ডাঙ্কারের স্বরে উত্তেজনা ও দ্রুত্বাত্মকার আভাস ঝরে পড়ল যেন।
ভাবাতিশয়ে মাঝে মাঝে তাঁর সমস্ত দেহ ঘেন কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

একটু থেমে ডাঙ্কার আবার বললেন, কিন্তু আর নয়, আজকের মত
আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় চাই।

সকলে উঠে পড়লেন।

ঘরের ওয়াল-কুকটা ঢঁ ঢঁ করে রাণ্টি সাতটা ঘোষণা করলে।

পথে নেমে কিছুদূর এগিয়ে একসময় সালিল সেনের মুখের কাছে মুখ
এনে দ্বিষৎ চাপা গলায় কিরীটী ডাক দিল, মিঃ সেন!

সালিল সেন ফিরে বললেন, আঁ, আমায় ডাকলেন?

হ্যাঁ মির্যাং এখান থেকে কত দূর হবে?

মির্যাং! বলে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে মিঃ সেন কিরীটীর মুখের দিকে
তাকালেন।

হ্যাঁ, মির্যাং। কিরীটী জবাব দিল।

সে তো অনেক দূর হবে। টোয়াশ্টে খাল ধরে কুড়ি মাইল উজানে গেলে
পথে পড়ে মৌবিন, আরও এগুলে ইয়ান্ডুন; তারপর পড়বে ডোনাবিয়া—তারপর
হেনজাদা শহর। হেনজাদার পরেই ইরাবতী নদী। যেখানে টোয়াশ্টে খাল
ইরাবতীর সঙ্গে মিশেছে সেইখানেই মির্যাং শহর।...কিন্তু হঠাত মির্যাং সম্বন্ধে

প্রশ্ন কেন মিঃ রায় ?

আপনি কালো ভৱরকে ধরতে চান ?

কালো ভৱর ! শুনেই একরাশ বিস্ময় যেন মিঃ সেনের কণ্ঠ দিয়ে বরে পড়ল। তিনি যেন বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। প্রথম দু-চার মিনিট মিঃ সেনের কণ্ঠ দিয়ে কোন কথা বেরল না।

কিরীটী চাপা উদ্বেজিত কষ্টে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বললে, রায়ি এখন সাতটা কুড়ি, হাতে আর মাঝ সাড়ে চার ষষ্ঠা সময় আছে। যেমন করেই হোক আজ রায়ি সাড়ে এগারোটাৰ মধ্যে মিরাং পৌঁছতে হবে আমাদের !

কিন্তু—, মিঃ সেন কি যেন বলতে গেলেন। কিন্তু কিরীটী তাঁকে এক-রকম বাধা দিয়েই থামিয়ে বললে, আজকের রাত যদি হারান, তবে এ জীবনে আর কালো ভৱরকে ধরতে পারবেন না। সে চিরদিনের মত মৃঠোর বাইরে চলে যাবে। তাকে হাতেনাতে যদি ধরতে চান তো আজকের রাত পোহাতে দেবেন না !

আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না কিরীটীবাবু !

বুঝবেন, সময় হলেই সব বুঝতে পারবেন। আপনাদের দ্রুতগামী পুলিস-লঙ্গ আছে না ?

হ্যাঁ আছে।

এখন সেটা পাওয়া যাবে ?

যাবে।

তবে চলুন, আর একটি মুহূর্তও দেরি নয়।

* * *

অন্ধকারে সার্চলাইট জ্বলে পুলিস-লঙ্গখানা টোয়াশে খালের মধ্য দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

লঙ্গে আরোহী আছে ছজন—সুব্রত, রাজু, কিরীটী, মিঃ সলিল সেন ও দুজন আর্দ্ধ বয়ী পুলিস।

কিরীটী একটা লেদার বাঁধানো ডায়েরী হাতে করে নাড়তে নাড়তে বললে, মিঃ সেন, আপনি হয়তো সমগ্র ব্যাপারটাৰ আকস্মকভায় আশ্চর্য হয়ে গেছেন ! এই ডায়েরী পড়লেই ব্যাপারটা সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। শুনুন পড়াছি—

লঙ্গের কেবিনের আলোয় ডায়েরীখানা মেলে ধরে কিরীটী বললে, আমি অর্বশ্য ডায়েরী সব কথা এখন আপনাদের পড়ে শোনাব না, কয়েকটা পাতা মাত্র পড়ব। শুনুন।

কিরীটী ছোট একখানা ডায়েরী খুলে পড়তে শুরু করল—

বাবা !—আমাৰ ক্ষেত্ৰময় বাবা আৰ ইহজগতে নেই ! বিলাত থেকে শেষ পৱীক্ষা দিয়ে দেশে পা দেওয়াৰ সঙ্গে সঙ্গেই এ সংবাদে আমাৰ বুকখানা একে-বাবে ভেঙে গুড়িয়ে দিলৈ।

তাৰপৰ বাবাৰ ডায়েরী পড়ে বুঝতে পাৱলাম, বাবাৰ অকালমত্তুৰ জন্য দায়ী তিনিটি লোক। দুজনেৰ নাম তাৰ ডায়েরীতেই পেলাম। তাৰা দুজনেই বৰ্যায় এখন বিপুল সম্পত্তিৰ অধিকাৰী—একজন মিঃ চৌধুৱী, আৰ একজন বিখ্যাত তামাক ব্যবসায়ী বিপন দস্ত। তৃতীয়জনেৰ নাম কোথাও খুঁজে পাৰিব না। বাবা, বিপন দস্ত, মিঃ চৌধুৱী ও আৰ একজন মিলে কাঠেৰ ব্যবসা

করেন। বিপিন দত্তের দুই ছেলে ও বোঝি ছিল, মিঃ চৌধুরী অবিবাহিত। আমরা দুই ভাই-বোন ছাড়া বাবার আর কেউ ছিল না। বাবার ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার আগেই মা মারা যান। বাবা ছিলেন যেমন সরল, তেরুন নিরীহ-প্রকৃতির। এ জগতে কাউকেই তিনি অবিশ্বাস করতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাসই তাঁর কাল হল।

মা মারা যাবার পর থেকে বাবা কেমন যেন উদাস প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। এ দুনিয়ার কোন কিছুর ওপরই তাঁর আর তেমন কোন আকর্ষণই যেন ছিল না। ব্যবসা সংক্রান্ত সকল কিছুই দন্ত ও চৌধুরী তাঁর ব্যবসার অন্য দুই অংশীদার দেখাশুনা করতেন। বাবার কাছে কোন কিছুর সম্বন্ধে মত নিতে গেলে বলতেন, ওর মধ্যে আর আমায় টেনো না তোমরা, যা ভাল বোঝ তাই করগে।

আমি ছিলাম তখন বিলেতে।

দন্ত আর চৌধুরী বাবার এই উদাসীন ভাব ও একান্ত নিরপেক্ষতার ও সরল বিশ্বাসের সূযোগ নিয়ে ভিতরে ভিতরে একটা প্রকাণ্ড ঘড়যন্ত্র করলেন।

হঠাতে একদিন শোনা গেল, ব্যবসার অবস্থা নাকি খুব খারাপ। বাবা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। অডিটর এল, কর্মটি বসল, শেষ পর্যন্ত সঁতাই দেখা গেল ব্যবসাতে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর ডিফিস্ট পড়েছে। যে ব্যবসার মূলধন মাঝে সাড়ে তিনি লক্ষ টাকা, সে ব্যবসায় এত বড় ডিফিস্ট দিয়ে আর চলা একেবারেই অসম্ভব। অতএব ব্যবসা লালবার্তি জুলতে বাধ্য হল।

ভিতরে ভিতরে গভীর ঘড়যন্ত্র করে দন্ত ও চৌধুরী নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়ে বাবাকে একেবারে পথে বসাল।

সরল-প্রাণ বাবা আমার। তাদের বন্ধু বলে আপনার জন বলে বিশ্বাস করেছিলেন। তাই তারা তাঁকে বন্ধুত্বের ও বিশ্বাসের চরম প্রস্তাব দিয়ে গেল। এ আঘাত ও অপমান বাবা সহ্য করতে পারলেন না—অসুখে পড়লেন এবং আমি ফিরে আসবার আগেই চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন। যাবার সময় তিনি আমার নামে একটা চিঠি রেখে যান।

‘সুরো বাবা আমার,

এ জীবনের শেষক্ষণে তোমায় দেখে যেতে পারলাম না, এ যে আমার কত বড় দুঃখ তা একমাত্র ভগবানই জানেন। মনে মনে তোমার জন্য আমার শেষ আশীর্বাদ ভগবানের শ্রীচরণে দিয়ে গেলাম। যাবার আগে তোমায় দেবার মত আর আমার বিশেষ কিছুই অবিশ্বাস নেই, তোমার মাঝে জগনো হাজার পাঁচক টাকা আর আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সশ্রয় করা দ্রষ্টি কথা রেখে যাচ্ছ।

প্রথম কথা—এ দুনিয়ায় সরল বিশ্বাসের কোন দাম নেই।

শ্বিতীয় কথা—যে বিশ্বাসহন্তা, তার একমাত্র ব্যবস্থা কঠোর মৃত্যুদণ্ড।...

যারা তোমার বাবাকে এমান করে পথে বাসিয়ে গেল, তাদের তুমি ক্ষমা করো না।

চোখের জলের মধ্যে দিয়ে বাবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করেই হোক, যারা বাবাকে আমার এমান করে লাঞ্ছিত করেছে

তাদের আমি উপযুক্ত দণ্ড দেব।

ভাল করে খেঁজ নিয়ে শুনলাম, দন্ত আর চৌধুরী এখন দুজনেই শহরের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান লোক। একজন কাঠের ব্যবসা ফেঁদে লক্ষ্যপাতি, অন্যজন তামাকের ব্যবসায়ে প্রায় তাই।

এই পর্যন্ত পড়ে কিরীটী থামল। তারপর আবার পাতা ওল্টাতে লাগল।

তারপর শুন্দন। বলে কিরীটী আবার পড়তে শুরু করেঃ দন্ত চরম শাস্তি মিলেছে, প্রাণে ঘারিন। সমস্ত ব্যবসা তছনছ করে দিয়েছি। আজ লক্ষ্যপাতি তামাকের ব্যবসায়ী বিপিন দন্ত পথের ভিক্ষারী। পয়সার শোকে আজ সে পাগল, রাস্তায় রাস্তায় ঘূরে বেড়ায়।

এক নম্বর হল। এবার চৌধুরী তোমার পালা।

চৌধুরীর ভাগ্নে সনৎকে লোক দিয়ে দলে ভিড়িয়েছি। ভাগ্নে বৃত্তোর খ্ৰান্ত আদরের। উঃ, বৃত্তো একেবারে জৰুলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। দিনের পৰ দিন সনৎ অধঃপাতের পথে নেমে চলেছে। অর্থাৎ সে জানে না, এর মধ্যে আছে এক ইতভাগ্যের প্রতিহিংসার চক্রান্ত। কিন্তু দিনকে-দিন এ কি হচ্ছে আমার? দুর্ধিন্তা সর্বদা যেন আমায় ভূতের মত পিছু পিছু তাড়া করে চলেছে। এ কি হল?

ডায়েরীর আর এক জায়গায় লেখা আছে—

আরও কিছু দিন থাক। সনৎকে একেবারে পথের ধূলোয় টেনে এনে বসাই, তারপর বৃত্তো চৌধুরীকে ধূরব। ওকে শেষ করতে তো আমার এক মাসও লাগবে না। কিন্তু আর একজন কে? কি তার নাম, কে আমাকে বলে দেবে?

কিন্তু আমার এ কি হল? এ কি ঘন্টণা? রাণি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শয়তানটা যেন আমায় শত বাহু মেলে শয়তানির পথে টেনে নিয়ে চলে, কোনঘতেই যেন আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি না।

আর এক জায়গায় লেখা—

ডঃ চৌধুরী হঠাত মরে আমায় বড় ফাঁকটাই দিয়ে গেল। আমার স্বপ্ন ধূলোয় মিশে গেল। কি করি? এখন কি করি?...কিন্তু এ কি! দুর্জ্যম কি আমার জীবনের সাথী হয়ে দাঁড়াল নাকি? আমি কি পাগল হয়ে যাব?

ডায়েরীর আর এক পাতায় লেখা—

হ্যাঁ, সেই ঠিক হবে; যেমন করে হোক বৃত্তো চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে দিতে হবে। ওর ভাগ্নেদের পথে বসাতে হবে।

মিলেছে, সুযোগ মিলেছে। সনৎ লোক পাঠিয়েছিল আমার কাছে, উইলের অন্যতম উত্তরাধিকারীকে যদি কোনমতে প্রতিরোধ করতে পারি, তবে সে আমায় দশ হাজার টাকা দেবে।...

আরও এক পাতায় লেখা—

অমর বস্তু সব ভেস্তে দিল! শেষ পর্যন্ত কলে এসে তৰী ডোবাল, কিন্তু আমার যে সব গোলমাল হয়ে যায়! জেবেছিলাম সনৎকে মুঠোর মধ্যে এনে ধীরে ধীরে তাকে পথের ভিখারী করে পিংপড়ের মত পিষে মেরে ফেলে দেব একদিন। তা তো হল না। সব ভেস্তে গেল! এখন উপায়? মিলেছে—উপায় মিলেছে। আজ রাতেই সনৎকে শেষ করব।

উঃ, কী সর্বনাশ! সংবাদ পেলাম অমর বস্তুই নাকি বাবার ব্যবসায় ষড়ষল্পকারীদের মধ্যে ততীয় বাস্তু ছিল, চৌধুরীর সহকারী হিসাবে। দাঁড়াও

বসন্ত, এবারে তোমার পালা।

তারপর অনেক পাতার পরে লেখা আছে—

দলের লোকেরা আমায় জানবার জন্য কৌ ব্যাকুল—কৌ ইচ্ছুক ! অমর
বসন্ত মণ্ডুর ঘটনা থেব চাগল্য জাঁগয়েছে যাহোক !

কলকাতায় ঘেতে হবে।

সনৎ আর সূর্যত ওদের মধ্যে যে কোন একজনকেও যদি কোনমতে এখানে
এনে ফেলতে পারি তবেই কিস্তিমাত ! একজন ধরা পড়লেই ওরা সব কজনই
হৃষ্টে আসবে। ধরে সব কটকে রেংগনেই আনতে হবে—আমার মণ্ডোর মধ্যে।

আর এক জায়গায় লেখা—

নাঃ, কিরীটী বড় বাড়িয়ে তুলেছে ! কিশ্তু ভদ্রলোকের দেখাছ বৃদ্ধি আছে।
হ্যাঁ, বলতেই হবে বৃদ্ধি আছে। ঠিক আঁচ করেছে তো !

বৃদ্ধির লড়াই আমার বড় ভাল লাগে। দৰ্দি না এক চাল খেলে !

আবার এক জায়গায় লেখা—

দেখাছ ধনাগারের চাটটা চৰি গেছে !...তা যাক, তাতে আমার কিছু এসে
ধায় না। ও তো আমি জানিই। ওটা আবার কিরীটীটাই হাত করেছে। ওটা
চৰি করে আনতে হবে। রেংগনে গিয়ে চৰি করলেই হবে। ব্যস্ততার কিছু
নেই।

ডায়েরীর শেষ পাতায় লেখা আছে—

টাকার্কড়ি সঞ্চয় করে আমার আর কি হবে ?...আমি আমার ধনাগারের
সমস্ত অর্থ তাকে দিয়ে যাব—মরবার আগে যে আমার কাছে সবচাইতে বিশ্বসী
বলে মনে হবে। ও তো পাপের অর্থ, পাপের নেশায় অর্জন করা অর্থ। আমার
চাই না।

ডায়েরীর সব শেষ পাতায় লেখা—

মণ্ডুগুহায় সনৎ ও অমরকে আটকে রেখেছি। কাল যাব মণ্ডুগুহায় রাত্রি
বারোটায়। তপ্ত শলা দিয়ে অমরের চোখ কানা করব। আর সনৎকে চিরজীবনের
জন্য আমার ধনাগারে বন্দী করে রেখে আসব। অর্থ—পিশাচ ! দৈখ আমার
আজীবনের সংশ্লিষ্ট অর্থে ওর সাধ মেটে কিনা ! যে সামান্য অর্থের জন্য ভাইকে
মেরে ফেলতে পর্যন্ত কুশিংত নয়, তার প্রায়শিকভাবে হওয়া দরকার। তাছাড়া আমার
সঙ্গে বিশ্বাসযাতকতা করেছে, তারও শাস্তি হোক। থাকুক ও ওই রূপ্য
ধনাগারে—ঘৃণ ঘৃণ ধরে অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে বন্দী হয়ে যথের মত।

এই পর্যন্ত পড়ে কিরীটী ডায়েরী বল্ধ করল এবং সকলের মুখের দিকে
চেয়ে বলল, আজ সেই ভীষণ রাত্রি অর্থাৎ এগারোই, এবং আজ বারোটায় হবে
সেই ভীষণ পাপান্তর্ভান।

সকলে এতক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে কিরীটীর পড়া শুনছিল, এবার বলে
উঠল, উঃ, কৌ ভয়ঙ্কর !

কিরীটী ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা !...এখনও দেড়
ঘণ্টা বাকি।

শ্বরতালের কারখানা

মিয়াংমে এসে যখন লগ্ন পেঁচাল রাতি তখন প্রায় এগারোটা। কৃষ্ণপঞ্চমীর চাঁদ আকাশের কোণে উৎক দিছে।

ইরাবতীর উচ্ছবিস্ত জলধারা অক্রান্ত কঞ্জালে বরে যাচ্ছে।

স্বল্প চন্দ্রালোক নদীর বৰকে ঢেউয়ের চৰ্ডায় চৰ্ডায় যেন কি এক মায়া-স্বপ্নের সংগ্রাম করেছে। অদ্বৰে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ইরাবতীর স্নোত-বিধোত বিশাল গৌতম পর্বত প্যাগোড়া মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্ৰিকৰণ-স্নাত হয়ে।

সকলে লগ্ন হতে নামল একে একে তীরে।

কিৱীটী পকেট থেকে একটা ছোট কাগজ বেৰ কৰল। তাতে আলো ফেলতে দেখা গেল তাৰ ওপৰ সাঙ্কেতিক ভাবে কি কতকগুলো লেখা আছে।

কিৱীটী সেই কাগজ দেখতে দেখতে বললে, ঈ দেখা যাচ্ছে গোতম পৰ্বত। বোধ হয় প্যাগোড়াৰ দক্ষিণ কোণ দিয়ে এগিয়ে যেতে একটা চন্দনগাছ পাওয়া যাবে। চলুন, আৱ দৌৰি নয়, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলুন।

সকলে দ্রুতপদে এগিয়ে চলু।

কাৰও মূখে একটি কথা নেই ; উৎকণ্ঠিত আগ্রহে রূক্ষনিঃশ্বাসে এক রহস্যময় বিভীষিকার দ্বাৰোদ্ধৰ্বটন কৰতে সব এগিয়ে চলেছে যেন নিঃশঙ্খে।

এই সেই প্যাগোড়া...চল দক্ষিণ কোণ ধৰে। চলতে চলতে একসময় থেমে কিৱীটী বললে।

সকলে আবাৰ কিছুদৰ এগিয়ে চলল। কিন্তু কোথায় ভাঙা বৃক্ষদেৱেৰ ঘূর্ণ্যত !

স্বৰত ও রাজু বললে, মিঃ রায়, আমৱা বোধ হয় ভূলপথে এসোছি।

কিৱীটী জোৱগলায় বললে, না, ঠিকই চলেছি। ঈ দেখুন ভাঙা বৃক্ষ-দেৱেৰ ঘূর্ণ্যত দেখা যাচ্ছে সামনেই আমাদেৱ।

সতাই অদ্বৰে ভাঙা একটা বৃক্ষদেৱেৰ ঘূর্ণ্যত দেখা গেল, একখণ্ড বড় পাথৰেৰ ওপৰ বসানো।

বৃক্ষমূর্তিৰ ডানাদিকে এগোতেই দেখা গেল সেই চন্দনগাছও।

কিৱীটী উল্লিখিত কষ্টে বললে, সব ঠিক ঠিক মিলছে।

তাৰপৰ কাগজটা মেলে ধৰে বলতে লাগল, এই সেখাগুলোৱ তলায় যেসব চিহ্ন আছে সেগুলো বাদ দিতে হবে, কেননা বলেছে—চিহ্ন যত বাদ গৈছে। তাহলে দাঁড়াছে—দশ পা পৱে দৰই DK...অৰ্থাৎ দৰই দিকে তিন শুন্য বা ৩০ হাত রাস্তা আছে। হ্যাঁ। এই তো দৰদিকে দৰটো রাস্তা গৈছে দেখিছি, একটা ডাইনে, একটা বাঁয়ে। এখন...এই দৰ রাস্তার BAMT অৰ্থাৎ বাঁয়েৰ রাস্তাটি ধৰে, হাতী ০০০০ যাও। হাতী মানে গজ। চাৰ শুন্য হল চাঁঞ্চল, সব মিলে হল চাঁঞ্চল গজ অৰ্থাৎ বাঁয়েৰ রাস্তাটি ধৰে চাঁঞ্চল গজ হেতে হবে। চল এগিয়ে। মন্দগুৰুৰ মতই অন্য সকলে কিৱীটীৰ পিছু পিছু এগিয়ে চলে। প্রিশ হাত যাওয়াৰ পৰ দেখা গেল সতাই দৰই দিকে দৰটো রাস্তা চলে গৈছে। বাঁয়েৰ

ରାଜ୍ମତୀଟି ଧରେ ଚଞ୍ଚଳ ଗଜ ଏଗୋବାର ପର ଦେଖା ଗେଲ ଏକଟା ପ୍ରକାନ୍ତ ପାଥରେର ଓପର
ଏକ ଛୋଟ ଲୋହାର ଡ୍ରାଗନ ବସାନୋ । ତାର ମୁଖେ ଏକଟା ଲୋହାର ବାଲା ପରାନୋ ।
କିରୀଟୀ ଆବାର କାଗଜ ଦେଖେ ପଡ଼ତେ ଲାଗଲ—

ଡ୍ରାଗନ ଦେଖ ବସେ ଆହେ
ଧନାଗାରେର ଚାବି କାହେ ।
ମୁଖେ ତାର ଲୋହାର ବାଲା
ଦୂଲହେ ତାତେ ଚିକନ ଶଳା ।

ହଁ, ଏହି ତୋ ଡ୍ରାଗନେର ମୁଖେ ଲୋହାର ବାଲା । ଦେଖ ଦେଖ, ଏକଟା ଲୋହାର ଶଳା ଓ
ଆହେ !

ଆନନ୍ଦେ ଉତ୍ୱେଜନାୟ କିରୀଟୀର ସର୍ବଶରୀର ଥରଥର କରେ କାଂପଛେ ତଥନ । ସେ
ପୂନରାୟ ଚାପା ସ୍ତରେ ବଲତେ ଲାଗଲ—

ଦୂଇଯେର ପିଠେ ଶଳା ନାଓ
ତ୍ରିଶ ଦିର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଦାଓ,
ଅର୍ଥାଏ ତାହଲେ ହଲ $20 \times 30 = 600$
ଶଳା ସାଦି ସାଯ ବାଦ
ମେଇ କବାରେ ପୂରବେ ସାଥ ।

ଉତ୍ୱେଜନାୟ ଓ ଅଧୀର ଆବେଗେ କିରୀଟୀର ସମସ୍ତ ଦେହଥାନି କେପେ କେପେ
ଓଠେ; ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଚିପ ଚିପ କରେ ।

ଛବାର ଡ୍ରାଗନେର ମୁଖେ ଦୋଲାନୋ ଲୋହାର ବାଲାଟା ଘୋରାତେଇ ଡ୍ରାଗନଟି ସେ
ପାଥରେର ଓପର ବସାନୋ ଛିଲ, ମେଇ ପାଥରଥାନି ଡ୍ରାଗନ ସମେତ ସର ସର କରେ ବାଁରେ
ମରେ ଗିଯେ ଦୂର ହାତ ପରିମାଣ ଏକଟା ଗର୍ତ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପେଲ ।

ପେରେଛି, ପେରେଛି ! ଇଉରେକା, ଇଉରେକା ! କିରୀଟୀ ଚାପା କଷେଟେ ବଲେ ଉଠିଲ,
ମତି ଏ କି ଭୋଜବାଜି—ନା ସ୍ଵପ୍ନ !

ମେଇ ମେଇ ଯେନ ବିକ୍ରମେ ଏକେବାରେ ଅଭିଭୂତ ହେଁ ପଡ଼େଛେ ।
ମେଇ ଗର୍ତ୍ତମୁଖେ ଆଲୋ ଫେଲତେ ଦେଖା ଗେଲ, ଧାପେ ଧାପେ ସ୍ତରମୁକ୍ତ ନୀଚେ
ନେମେ ଗେଛେ । ପ୍ରଥମେ କିରୀଟୀ, ତାରପର ମିଃ ସେନ, ସ୍ମରତ ଓ ରାଜ୍କ ପର ପର
ସିର୍ଫିଡ଼ିର ପଥେ ପା ବାଡ଼ାଳ । ପ୍ଲାନ୍‌ଟ ଦର୍ଜନ ବାହିରେ ଦାଢ଼ିଯେ ରଇଲ କିରୀଟୀର
ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅପେକ୍ଷାର ।

ଗୋଟା ପଲେରୋ ସିର୍ଫିଡ଼ ଡିଙ୍ଗିଯେ ସାବାର ପରଇ ସମତଳ ଭୂମି ପାରେ ଟେକଳ ।
ଅନ୍ଧକାରାଛ୍ଵର ଏକଟା ସର୍ବ ପଥ । ମେଇ ଅପରିସର ପଥେ ଅତି କଷେଟେ ଦୂରଜନ ଲୋକ
ପାଶାପାଶ ସେତେ ପାରେ ।

କିରୀଟୀକେ ମାଥା ନୀଚ୍ବ କରେଇ ଏଗୋତେ ହଲ । କିଛିଦର ଏଗୋତେଇ ଅଦ୍ଦରେ
ଏକଟା ଆଲୋର କ୍ଷୀଣ ରକ୍ଷଣ ଅନ୍ଧକାରେ ଘିଟିମିଟି କରିଛେ ଦେଖା ଗେଲ ।

ଏହନ ସମୟ ମାଟିର ନୀଚେ ଅନ୍ଧକାର ଗୁହାର ଭିତର ଥେକେ ଏକଟା ବୁକ୍-ଭାଙ୍ଗ
କରୁଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଜେଗେ ଉଠିଲ । ମେଇ ଥମକେ ଦାଢ଼ାଳ ।

ମନେ ହଲ ଏ ବୁକ୍ କୋନ ଅଶ୍ରୀରୀର କରୁଣ ହାହାକାର ସ୍ଵର ସ୍ଵର ଧରେ ଏହି
ମାଟିର ନୀଚେ କେବେଦେ କେବେଦେ ଫିରିଛେ ଆଜିଓ !

ଅଭିଷକ୍ଷଣ ବାଦେ ଆବାର ତାରା ଏଗୀଗେ ଚଲିଲ । ମେଇ ଏସେ ଏକଟା ବିସ୍ତର୍ତ୍ତ
ଉଠିନେର ମତ ଜାଗାଗାଯ ଦାଢ଼ାଳ । ମାଥାର ଓପରେ ଛାଦେର ଖିଲାନ ଥିବ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ
ନାହିଁ ।

ମହିମା ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟେ ଝନ୍କନ୍କ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦରେ ମେଇ ଦାଢ଼ିଯେ ଦେଖିଲ,

একটা ছোট গোলাকার ছিদ্রপথ দিয়ে সরু, একটা আলোর রশ্মি অন্ধকারে ছিটকে এসে পড়েছে।

কিরীটী এগয়ে গিয়ে সেই ছিদ্রপথে ঢোখ রেখে চমকে ওঠে, এ কি স্বপ্ন না শক্তি ! এ ষে সেই গপের আলাদানীনের আশ্চর্য ‘ প্রদীপকেও হার মানিয়ে দেয় ! ’ সহসা সহস্র আরব্য রজনীর বিশ্বাসক একখানা পাতা যেন এই পাতাল-পুরীর আধারকক্ষে সত্য হয়ে এসে ধরা দিয়েছে ।

আলোতে দেখা গেল ছোট একখানি ঘৰ । সেই ঘরের ছাদের উপর হতে শিকলের মাথায় একটা কাঁচের প্রদীপদান ঝুলছে । সেই প্রদীপের স্বপ্নপালোকে দেখা যায় ঘরের চারপাশে ছোট ছোট বেতের বাঁপিতে ভর্তি ‘ অসংখ্য চকচকে গিনি । কে একজন আগাগোড়া কালো পোশাক-পরা লোক নীচু হয়ে এক-একটা বাঁপির কাছে আসছে, আর দু হাত দিয়ে সেই বাঁপি হতে মুঠো করে গিনি তুলে নিয়ে পরক্ষণেই মুঠো আল-গা করে ধরছে—অর্মানি সুমধুর বন্ধন শব্দ করে সেই সব গিনি কক্ষের রঞ্জে রঞ্জে ছাড়িয়ে পড়ছে ।

কিরীটী ছিদ্রপথ দিয়ে সকলকেই তা দেখাল । তারা সর্বিশ্বরে দেখল—এ যে সতাই অতুল ঐশ্বর্য !

কিছুক্ষণ বাদে লোকটা পাশের একটা দরজা দিয়ে ঐ ঘর থেকে চলে গেল । অক্ষয়কণ পরেই আবার জেগে উঠল সেই বৃক্ত-ভাঙা চিংকার ।

কোথা হতে চিংকার আসছে তা জানবার জন্য সকলে ফিরে দাঁড়াল ।

চিংকারের শব্দটা ডানাদিক হতে আসছে বলে মনে হচ্ছে না ? হ্যাঁ, তাই ।

সহসা সেই বেদনাত “ চিংকারকে ডুবিয়ে দিয়ে বাজের মতই একটা তীক্ষ্ণ হাসির খলখল শব্দ যেন সেই গুরুত্বাগ্রহীতলে শব্দায়মান হয়ে উঠল—হাঃ হাঃ হাঃ !

দয়া কর ! দয়া কর ! কার করণে আবেদন শোনা যায় ।

দয়া ! হাঃ হাঃ, মনে পড়ে অমর বস্তু, দিবোদ্ধু-সান্যালোর সৌন্দর্যকার সে হতমানের কথা ? মানুষের বৃক্তে ছুরি মেরে তাকে তোমরা শয়তান সাজিয়েছ ! দয়া, মায়া, ভালবাসা কিছু সেখানে নেই, সেখানে পড়ে আছে শুধু—জিঘাসা আর প্রতিশোধ !...এবাবে সনৎবাবদ ? এবাবে তোমাকে কে রক্ষা করবে বন্ধু ? কালো ভুমরের প্রতিহিংসা—সে বড় ভীষণ জিনিস ! চোধুরীর ভাগ্নে তোমরা ! চোধুরী ফাঁকি দিলেও তোমরা ঘাবে কোথায় ? লক্ষপতি নিরীহ সরল-বিশ্বাসী বাবাকে আমার একদিন তোমার মাঝাই রাজসিংহাসন থেকে পথের ধূলোয় নামিয়ে এনেছিল, এর্মানি ছিল তার অর্থপিপাসা ! তুমি অর্থপিপাসা ! এমন কি একদিন তুমি তোমার ভাইয়ের বৃক্তেও ছুরি বসাতে পশ্চাত্পদ হওণি । তারপর সকলে মিলে আমাকে সৈন্দিন যে অপমান করেছ, সে অপমানের জবালায় এখনও আমার সর্বাঙ্গ জলে-পুড়ে ছাই হয়ে থাচ্ছে । আমি সেই দৃঃসহ পরাজয়ের গ্রানি কিছুতেই ভুলতে পারিছ না ।

আমি আমার এই সুদীর্ঘ এগারো বছরের পাপ-দস্তুজীবনে পাপান্ত্যানের মারা প্রভৃতি অর্থ উপার্জন করেছি । ভেবেছিলাম আমার দলে সবচাইতে বিশ্বাসী দেখব যাকে তাকেই সব দিয়ে থাব, কিন্তু দেখলাম সাত্যকারের বিশ্ব সীমেলা এ দুনিয়ার একান্তই দুর্বল ব্যাপার । আমার কাজ শেষ হয়েছে । স্বর্গত পিতার আমার প্রতিশোধ নেওয়া হয়তো হয়েছে ।...এখন আমার এই পাপ-ঐশ্বর্যের মধ্যে তোমাকে বল্দী করে রেখে থাব । তুমি তোমার বাকী জীবনের

ଦିନଗୁଲୋର ପ୍ରତି ମୃହତ୍ତାଟିତେ ଅର୍ଥଗ୍ରହ୍ୟତାର ତୌର ଅନୁଶୋଚନାୟ ତିଲେ ତିଲେ ମୃତ୍ୟୁର କବଳେ ଏଗିଯେ ସାବେ । ମୃତ୍ୟୁର ସେଇ କରାଲ ଭୟାବହ ବିଭୀଷିକାର ମୁଖୋମୁଖ୍ୟ ଦାଁଡ଼ିଲେ ତୁମ ଦେଖିବେ ବନ୍ଦୁ, ସେ ଅର୍ଥେର ଜନ୍ୟ ଏକଦିନ ତୁମ ତୋମାର ଭାଇଙ୍କେ ଛନ୍ଦିର ବସାତେ ଚେଯେଛିଲେ, ସେ ଅର୍ଥ ତୋମାର କେଉଁ ନୟ ! ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲେଇ ଲୋକଟା ଥାଏଲ ।

ତାରପର ଆବାର ସେ ବଲତେ ଶୁଣି କରଲେ, ଏହି ଦେଖିଛ ତଥ ଶଲା ! ଏଠା ଦିରେ ତୋମାର ଚକ୍ର ଦର୍ଢାଟି ଚିରଜୀବନେର ମତ ନାଟ କରେ ଦିଯେ ସାବ । ଅନ୍ଧ ହେଁ ତୁମ ତୋମାର ପାପେର ପ୍ରାୟାଶକ୍ତ କର ଅମର ବନ୍ଦୁ ଏହି ଗିରିଗୁହାୟ ।

ଦର୍ଯ୍ୟ କର । ଦର୍ଯ୍ୟ କର । ତୋମାର ପାଯେ ପଡ଼ି ।

ଦର୍ଯ୍ୟ ! ଚକ୍ର ଶ୍ରଯତାନ !

ଅନ୍ୟ କୋନ କଥା ଶୋନା ଗେଲ ନା । କେବଳ ଏକଟା ହଦୟଦ୍ଵାବୀ କରଣ ଗୋଟିନ ଅଂଧାର-ମଧ୍ୟେ କରଣ ବିଭୀଷିକାର ଜେଗେ ଉଠିଲ ଯେନ । ଏମନ ସମୟ କିରାଟୀ ସବଲେ ସାମନେର ଦରଜାଟିର ଓପରେ ଏକଟା ଲାର୍ଥି ମାରଲ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ଞୀ ଆର ସୁରତ୍ୱ ତାର ଇଞ୍ଜିଗେତେ ସଜୋରେ ଧାକ୍କା ଦିତେ ଲାଗଲ । ତିନଙ୍କନେର ମିଲିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରାତିରୋଧ କରିବାର ମତ କ୍ଷମତା ସାମାନ୍ୟ କାଠେର ଦରଜାଟିର ଛିଲ ନା—ଦରଜା ଭେଙେ ଗେଲ । ହୃଦୟବୁଝ କରେ ସକଳେ ସରେର ମଧ୍ୟେ ଗିଯେ ଛିଟକେ ପଡ଼ିଲ ।

ଶ୍ରୟତାନ ! କିରାଟୀ ଗର୍ଜନ କରେ ଉଠିଲ ।

ଛୋଟୁ ସରଖାନିର ଏକପାଶେ ହାତେ-ପାଯେ ଶିକଳ ଦିଯେ ବାଁଧା ଅମର ବନ୍ଦୁ । ତାର ଚୋଥ ଦିଯେ ଦର-ଦର ଧାରେ ତାଜା ରକ୍ତ ଗାଁଡିଯେ ପଡ଼ିଛେ ତଥନ । ବେଚାରୀ ସଞ୍ଚାରାୟ ଅଞ୍ଜନ ହେଁ ପଡ଼େଛେନ । ଅନ୍ୟଦିକେ ଏକଟା ଶିକଳେ ବାଁଧା ସନ୍ତ ।

ଆର ଏକଜନ ମାତ୍ର ଲୋକ ସରେ ଛିଲ, ଏକଟୁ ଆଗେକାର ସେଇ ବକ୍ତା । ସେ ତଥନ ଓଦେର ଦିକେ ଫିରେ ତାକିଯେଛେ । ଉଃ, କୀ କୁଣ୍ଠିତ ତାର ମୁଖ ! ଏ ବନ୍ଦୀ କୋନ ମାଟିର ନୀଚେକାର କବରଖାନ ଥେକେ ଏଇମାତ୍ର ଉଠେ ଏସେଛେ । ସ୍ଵ-ଗୟୁଗାନ୍ତରେ ବିଭୀଷିକା ଯେନ ଘୃତ୍-ମାନ ହେଁ ସଚଳ ହେଁଥେ ।

ଏଥାନେଓ ଏସେଛ ? ତବେ ଘର ! ବଲେ ମୃହତ୍ତେ ସେଇ ଭୀଷଣଦର୍ଶନ ଲୋକଟା କୋମର ଥେକେ ଛୋରା ବେର କରେ କିରାଟୀର ଦିକେ ଛଁଦୁଙ୍ଗେ ମାରଲ ।

କିରାଟୀଟୀ ଚିକିତ୍ତେ ସରେ ଗେଲ, ଛୋରାଟା ଏସେ ସିଲିଲ ସେନେର ପାଂଜରାୟ ବିନ୍ଧେ ଗେଲ ।

ଶ୍ରୟତାନ ! ସୁରତ ଗର୍ଜେ ଉଠିଲ ।

ହାଃ ହାଃ ହାଃ କରେ ହେସେ ଓଠେ କାଲୋ ଭ୍ରମର । ଜାମାର ପକେଟ ଥେକେ ଛୋଟ ଏକଟା ଅୟମ୍ପଲୁଲେର ମତ ଜିରିନିମ ବେର କରେ ସେଠା ପଟ କରେ ଶରୀରେର ଚାମଡ଼ାର ମଧ୍ୟେ ବିନ୍ଧିଯେ ଦିଲ ।

ସୁରତ ଲାକ୍ଷିଯେ ଗିଯେ କାଲୋ ଭ୍ରମରେ ଏକଥାନ ହାତ ତତକ୍ଷଣେ ଚେପେ ଧରେଛେ ।

ମୁଖ୍ୟ ! ପିପାଲିକାର ଓଡ଼ିବାର ସାଧ ! ବଲେ ଅକ୍ଲଶେ ଏକ ହେଚକା ଟାନ ଦିଯେ ସୁରତର ଦୃଢ଼ମ୍ଭୁଟିର କବଳ ଥେକେ ଆପନାକେ ଛାଡ଼ିଯେ ନିଯେ ବଲଲେ, କାଜ ଆମାର ଶେଷ ! ତାରପର ହଠାତେ ଯେନ ତୌର ସଞ୍ଚାରାୟ ସେ ଆରନାଦ କରେ ଉଠିଲ, ଉଃ, ଜୁଲେ ଗେଲ ! ତୌର ବିଷ ! ବିଷଧର କାଳନାଗିନୀର ଉପ୍ରା ବିଷ ! ..ହୀଁ, ପ୍ରାୟାଶକ୍ତ —ସାରାଜୀବନ ସେ ସହସ୍ର ପାପ କରେଛି ତାର ପ୍ରାୟାଶକ୍ତ ଆମ ନିଜହାତେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାର କରେ ଗେଲାମ । ତା ନାହଲେ ଆମାର ଅନୁତ୍ପତ୍ତ ବାୟୁଭୂତ ଆୟା ଏହି ମାଟିର ପ୍ରଥିବୀର ଶତ ସହସ୍ର ପାପାନୁଷ୍ଠାନେର ସମ୍ଭାବନାର ଦଂଶନେ ହାହାକାର କରେ ଫିରତ ।

କାଲୋ ଭ୍ରମର ଆର କିଛି ବଲତେ ପାରଲ ନା—ଟାଲତେ ଟାଲତେ ବସେ ପଡ଼ିଲ ।

কণ্ঠস্বর তার ক্ষীণ হয়ে আসছে।

কম্পিত হচ্ছে সে নিজের মুখের মুখোস্টা টেনে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

কিরীটী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ক্ষিপ্রহচ্ছে কালো শ্রমরের গায়ের জামাগুলো থেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সফল হল না, পাতলা রবারের মত জামাটা যেন গায়ে এঁটে বসে আছে এবং তার ভিতর থেকেও দেহসৌষ্ঠব যেন ফুটে বের হচ্ছে লোকটার। সত্যি, কি অস্তুত তার দেহের প্রতিটি মাংসপেশী! নিয়মিত ব্যায়ামে সংগোল ও সৃষ্টি। কিন্তু কি আশ্চর্য, ভীষণ-দর্শন কৃৎসিত অল্পরের সঙ্গে দেহের তো কোন সাদৃশই নেই! সকলে বিস্মিত হয়ে তার দেহসৌষ্ঠব দেখতে লাগল।

অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে কালো শ্রমর বলতে লাগল, এই বন্ধ ঘরের বন্ধ হাওয়া ছেড়ে আমি বাইরে যাব।

তখন সকলে ধৰার্থৰ করে তাকে বাইরে নিয়ে এল।

অমর বস্তি, সন্তি ও আহত সালিল সেনকেও একে একে বাইরের মুক্তি আকাশের তলায় নিয়ে আসা হল।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। প্রভাতী পাখীর কল-কাকলীতে স্থানটি মুখ্যরিত হয়ে উঠেছে। সকলে এসে কালো শ্রমরের চারিপাশে ঘিরে দাঁড়াল।

অমরবাবুর জ্ঞান তখনও ফেরেনি।

আঃ, আলো-বাতাস! কিন্তু আমার ঘৃত্যুর পর আমার এ দেহটা নিয়ে আর টানাটানি করো না। ঐ ইরাবতীর শাল্ত শীতল জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেও। বলতে বলতে কালো শ্রমর শ্লথ কম্পিত হচ্ছে নিজ মুখের মুখোশ্টা টেনে নিল।

তার মুখ দেখে সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতবাক্ত হয়ে পড়ল। তারা সকলে ঘৰ্ময়ে স্বপ্ন দেখছে না তো!

সালিল সেন যশ্যণা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, ডাঙ্গার সান্যাল? এ কি!

হ্যাঁ, আমিই ডাঙ্গার সান্যাল! কালো শ্রমর কোনমতে অস্পষ্ট ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা কঢ়া বললে।

তখন প্রভাতের রাঙা সূর্য মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উর্ধ্ব দিয়ে উঠেছে।

॥ ২২ ॥

বেদনার অশ্রু,

ধীরে ধীরে হতভাগ্যের প্রাণবায়ু বোধ করি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

সকলের চোখের কোলেই অশ্রু। এত বড় শয়তান, তবু সকলের বুকেই যেন আজ দোলা দিয়ে গেছে।

অত বড় একটা পাপীর এমনি করুণ পরিসমাপ্তি! তীব্র বিষের ক্রিয়ায় সমস্ত দেহ একেবারে নীল হয়ে গেছে। কিরীটী অশ্রুসজল চোখে ডাঙ্গারের বা কালো শ্রমরের মাথায় হাত রেখে বললে, ভগবান তোমার আমার মঙ্গল করবেন।

কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী যেই কালো শ্রমরের মাথায় হাত বোলাতে যাবে, অমনি তার কাঁচাপাকা চুলের পরচুলাটাও কিরীটীর আঙুলের সঙ্গে

থসে এল।

একমাথা বৰ্তি' সুন্দর টেট-খেলানো কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চৰু। এতক্ষণে যেন মাথার চৰু থেকে দেহের প্রতি অণু-পরমাণু পৰ্যন্ত অপৰূপ সৌন্দৰ্য বিকশিত হয়ে উঠল। এত সন্ধৰ্মী যে কেউ হতে পারে এ যেন ধাৰণারও অতীত। এমন সুন্দর দেহের অন্তৱালৈ জয়ন্ত এক শয়তান লুকিয়ে ছিল! আজ শয়তান দেহ ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেহ আবার আপন সৌন্দৰ্য ফিরে পেল।

* * *

কিৱীটী বলতে লাগল, ডাঙ্কাৰ প্ৰথম পৱশু রাতে আমাদেৱ গ্ৰহে গিয়েছিল এই নকল সাঙ্কেতিক লেখাটাৰ আসল কাগজটা চৰিৰ কৰতে। কিন্তু সে জানত না যে তাৰ মতলব আৰ্ম জাহাজেই ধৰে ফেলি। বলে সে একে একে জাহাজেৰ দৃ-ৱাঘিৰ সমস্ত ঘটনা খুলে বললে।

তাৰপৰ একটু থেমে কিৱীটী আবার বলতে লাগল, কিন্তু তখনও আমাৰ সন্দেহটা ভাল কৰে দানা বেঁধে ওঠোৰি। সেদিন রাতে যখন কাগজটা চৰিৰ কৰে গাড়িতে কৰে পালাই, তখন তাৰ গাড়িৰ পিছনে চেপে তাৰ বাড়ি পৰ্যন্ত যাই। শুধু তাই নয়—কাঁকৰ দিয়ে তাৰ গাড়িৰ গায়ে 'K' অক্ষৰও লিখে রেখে আসি। কাল দৃপৰে ডাঙ্কাৰেৰ ওখানে নিম্নলগ্ন খেতে গিয়ে ওৱা শোবাৰ ঘৰে পিতলেৰ মুর্তি'টাৰ পাশে ওৱা ডায়েৱীটা পেয়ে তখনই সকলৈৰ চোখেৰ আড়ালে সেটা লুকিয়ে ফেলি। তাৰপৰ মিঃ সেনকে নৈচে বিদায় দিতে এসে তাঁৰ গাড়িৰ গায়ে 'K' অক্ষৰটা দেখে ভীষণ আশ্চৰ্য হয়ে গেলাম। যা হোক তখনই বৈৱৰয়ে গিয়ে ডাঙ্কাৰেৰ বাড়িৰ পিছনে গেলাম। চিনতে পাৱলাম, সেখানেই গতৱাতে গাড়িৰ পিছনে কৰে এসেছিলাম। তখন আৱ কোন সন্দেহ রইল না। হ্যাঁ, ডাঙ্কাৰ সান্যালই যে 'কালো ভ্ৰমৰ' ততে আৱ কোন সন্দেহই আমাৰ রইল না। তাৰপৰ ডায়েৱীটা খুলে পড়তে পড়তে একেবাৰে সকল সন্দেহেৰ অবসান হল। কিন্তু একটা কথা তখনও বুৱতে পাৰিনি। মিঃ সেনেৰ গাড়িতে 'K' লেখা হল কেৱল কৰে? সেটাৰ পৰে একটু ভাবতেই পৰিষ্কাৰ হয়ে গেল, ভাৱলাম হয়তো সে-ৱাতে মিঃ সেনেৰ গাড়িটাই ডাঙ্কাৰ নিয়ে এসেছিল।

এমন সময় মিঃ সলিল সেন বললেন, হ্যাঁ, ডাঙ্কাৰ তাঁৰ গাড়িটা কাৱখানায় দেওয়া হয়েছে বলে বিকেলেৰ জন্য আমাৰ টু-সীটাৰটা চেয়ে নিয়েছিলোন।

কিৱীটী অৱিন সহায়ে বলে উঠল, তবে তো সব কিছুই ঠিক ঠিক মিলে গেছে। আৱ একটা কথা, সনৎবাৰুকে যে রেঞ্জনে আনবে এ কথায় স্থিৰনিৰ্ণিত কেমন কৰে হয়েছিলাম, আপনাৰা এখন হয়তো বুৱতে পেৱে থাকবেন। কালো ভ্ৰমৱেৰ আগাগোড়াই ইচ্ছা ছিল সে সকলকে নিজেৰ এলাকাৰ মধ্যে টেনে নিয়ে আসে। সে ভেবেছিল দলেৰ একজনকে ষাদি টেনে নিয়ে আসা যায়, তবে সকলেই তাৰ উত্থাৱেৰ জন্য বৰ্মা পৰ্যন্ত ছুটে আসবে। তাৰ অনুমানেৰ বিষয় সে ডায়েৱীতেও লিখে রেখেছে। বলা বাহুল্য, তাৰ অনুমান ভুল হয়নি। এবং এও জানতাম, ঐ সাঙ্কেতিক লেখাটা উত্থাৱ কৰতে কালো ভ্ৰমৰ আমাৰ গ্ৰহে আসবেই এবং এসেছিলও।

তবে তাৰ ব্যথাৰ দিকটা, অৰ্থাৎ কি কাৱণে অমৰবাৰু ও সনৎবাৰুৰ ওপৰ তাৰ এতটা প্ৰতিহিংসাৰ ভাৱ জেগে উঠেছে, সেটা আমাৰ তাঁৰ ডায়েৱী পড়াৰ আগে পৰ্যন্ত টেৱ পাইনি। এবং ঐখানেই ছিল আমাৰ যত সন্দেহ।

এই পর্ণত বলে কিরীটী তার কথা শেষ করল।
সব কথা শুনে তারা সবাই বিস্ময়ে বিমৃদ্ধ হয়ে গেল।

* * *

প্রভাতী সূর্যের সোনালী আলোয় ইরাবতী হেসে ঘেন গাড়িয়ে পড়ছে।
সূরত, রাজ, আর কিরীটী ডাঙ্গারের মৃতদেহ ধৌরে ধৌরে ইরাবতীর বুকে
ভাসিয়ে দিল। ঢেউয়ের তালে তালে দেহটা ভেসে চলল।

সকলের চোখই অশ্রুভারে ঝলমল করে উঠল।

ইরাবতীর শান্তশৈল জলের তলে কালো হ্রদের ঘূর্ময়ে রাইল। স্নোত-
বিধোত গৌতম পর্বতোপরি প্যাগোড়া ও পর্বতগাছে খোদিত অসংখ্য বৃক্ষদেবের
মৃত্তি সূর্যের আলোয় অতি সন্দৰ দেখাচ্ছিল।

কালো হ্রদের কি সত্তাই মৃত্যু হল ?

এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে ?

কে ও ? কে ?

ବହୁମ୍ୟାତ୍ମକୀ

www.boiRboi.blogspot.com

କିରୀଟୀ ତଥନ ପଣ୍ଡମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର । ପୟସାର ପ୍ରାଚ୍ୟର ଥାଳେଓ ବିଲାସିତାକେ କୋନ ଦିନଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇନାଂ । ଶିଯାଳଦିନେର ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଗଲିତେ ଅଖ୍ୟାତନାମୀ ଏକ ଛାତ୍ରବାସ ‘ବାଣୀଭବନ’—ଶାସିକ ସାତ ଟାକା ଥାଓୟା-ଥାକା ଦିଲେ ତାରଇ ତେତଳାର ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଖ୍ର୍ପାରିର ମଧ୍ୟେ ଥାକତ ।

କଲେଜେର ବନ୍ଧୁର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନଇ ଛିଲ ତାର ବିଶେଷ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ—ସଲିଲ ସରକାର । ସଲିଲ ସରକାରେର ବାବା ମଧ୍ୟୁଦ୍ଧନ ସରକାର ଛିଲେନ କଲକାତାର ଏକଜନ ବିଖ୍ୟାତ ଧନୀ । ପାଟ ଓ ଧାନଚାଲେର କାରବାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟାକା ଖାଟିଟ । ସଲିଲ ତାଁର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନୀ ପିତାର ପ୍ରତି ହେଁ ସଲିଲେର ମନେ ଏତଟକୁ ଅହୁକାର ଛିଲ ନା । ବାଡିତେ ଚାର-ପାଁଚଥାନା ଗାଡି ଥାକା ସହ୍ରେଓ ସେ ପ୍ରାମେ-ବାସେ ଛାଡ଼ା କୋନଦିନଓ କଲେଜେ ଆସେନି ।

ସେଦିନ ରାବିବାର, କିରୀଟୀ ସାରାଦିନ କୋଥାଓ ବେର ହୟାନି ।

ଶୀତକାଳ । ଏହି ମଧ୍ୟେଇ କୁରାଶାର ତର୍ମାନ କଲିକାତା ମହାନଗରୀର ବୁକ୍କେ ଘନ ହେଁ ଏସେଛେ । ଘରେର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାର ଚାପ ବେଂଧେ ଉଠେଛେ ଏକଟ୍ଟ ଏକଟ୍ଟ କରେ । ସିଂଢିତେ କାର ପାରେର ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଗେଲ ।

ଆଗମ୍ବୁକ ଦରଜାର କାହେ ଆସତେଇ କିରୀଟୀ ଆହବାନ ଜାନାଲ, ଏସ ସଲିଲ, କି ଥବର ?

ଆଲୋ ଜବାଲାର୍ମି ଏଥନ୍ତେ ?

ନା, କୁଣ୍ଡେମିତେ ଧରେଛେ, ବୋସ୍ । ତାରପର, ଆଜ ତୋ ଆସବାର କଥା ଛିଲ ନା ସଲିଲ !

ମନଟା ଭାଲ ନେଇ—ତାଇ ଭାବଲାମ ତୋର କାହେ ଏକଟ୍ଟ ଘରେ ଥାଇ ।

କି ହେଁବେଳେ ?

ଆଶ୍ରୟ ଘଟନା ! ବାବାର ଘରେର ସିନ୍ଦ୍ରକେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଦଲିଲ ଛିଲ । କରେକ-ଦିନ ଧରେ ହାଇକୋଟେ ଏକଟା ମାମଲା ଚଲିଛେ । ଦଲିଲଟା ସେଇ ମାମଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତ । ପରଶ୍ରୁତ ବାବା ସମ୍ବ୍ୟାର ଦିକେ ଦଲିଲଟା ସିନ୍ଦ୍ରକେଇ ଦେଖେଛେନ । ଆଜ ସକାଳବେଳା ସିନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୁଲେ ଦଲିଲଟା ଉକିଲକେ ଦିତେ ଗିଯେ ବାବା ଦେଖେନ, ଦଲିଲଟା ନେଇ ! ସିନ୍ଦ୍ରକେର ଟାକାକିଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଜନ୍ନୀୟ ବସ୍ତୁ ସବହି ଠିକ ଆଛେ, କେବଳ ଦଲିଲଟା ନେଇ ସିନ୍ଦ୍ରକେ ।

ସିନ୍ଦ୍ରକେର ଚାବି କାହେ ଥାକେ ?

ବାବାର କୋମରେଇ ସର୍ବଦା ଥାକେ । ଚାବିର ବିଷୟେ ବାବା ବିଶେଷ ସାବଧାନ ଚିରାଦିନଇ ।

ଭୃତ୍ୟ ଏସେ ଘରେ ହ୍ୟାରିକେନ ବାତିଟା ଜାଲିରେ ଦିଲ ।

ଦ୍ୱା କାପ ଚା ଦିଲେ ଯେଣ ନନ୍ଦ । କିରୀଟୀ ବଲଲେ । ନନ୍ଦ ଚଲେ ଗେଲ ।

ହଠାତ୍ ଏକସମୟ କିରୀଟୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ସଲିଲକେ, ତୋର ବାବାର ଠିକ ମନେ ଆଛେ, ଗତ ପରଶ୍ରୁତ ସମ୍ବ୍ୟାଯ ଦଲିଲଟା ସିନ୍ଦ୍ରକେଇ ତିନି ଦେଖେଛିଲେନ ?

ହୀଁ, ତାଇ ତୋ ବାବା ବଲଲେନ ।

ଏ ବ୍ୟାପାରେ କାଉକେ ତିନି ସଞ୍ଚେତ କରେନ ବଲେ ଜାନିସ କିଛି ?

ବାଡିର ଲୋକଜନେର ମଧ୍ୟେ ବାବା, ଆମାର ଏକ କାକା, ଆମାର ତିନାଟି ବୋନ, ମା, ପିସିମା, ମ୍ୟାନେଜାର ବର୍ଣ୍ଣିବାରୀବାବୁ, ଆର ଚାକରବାକର ।

চাকরবাকরগুলো নিশ্চয় সবাই বিশ্বাসী?

হ্যাঁ। সকলেই অনেকদিন ধরে আমাদের কাজ করছে।

মামলাটা কার সঙ্গে হচ্ছে?

মামলাটার একটি ইতিহাস আছে কিরীটী।—মদ্দ স্বরে সলিল বলে।

ইতিহাস! সীবসময়ে কিরীটী বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়।

এমন সময় নল্দু দু হাতে দু কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

কিরীটী বলল, নল্দু, ঠাকুরকে বলে দিস সলিলবাবু আজ এখানেই থাবেন।

যে আজ্ঞে—নল্দু মাথা হেলিয়ে সম্ভাতি জানিয়ে চায়ের কাপ দুটো রেখে ঢেলে গেল।

সলিল বলতে লাগল, সে আজ প্রায় ২৪/২৫ বছর আগেকার কথা। আমি তখন বোধ হয় সবে হয়েছি। চৰিশ-পৱগণার সোনারপুরে একটা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে যায়। বাগানবাড়িটা ছিল রাজা প্রিদিবেশ্বর রায়ের। এককালে রাজা প্রিদিবেশ্বর রায়ের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। রাজা প্রিদিবেশ্বর ছিলেন যেমন শিক্ষিত উদারচেতা, তেমনি প্রচণ্ড খেয়ালী। ব্যবসার দিকে তাঁর একটা প্রবল ঝোঁক ছিল। প্রিদিবেশ্বরের পিতামহ যজ্ঞেশ্বর রায় তাঁর নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে ব্যবসা করে মস্ত জৰিমদারি গড়ে তোলেন এবং গৰ্ভনমেন্টের কাছ থেকে রাজা থেতাব পান। যজ্ঞেশ্বরের ছেলে রাজেশ্বর পিতার উপার্জিত জৰিমদারি বাড়াতে না পারলেও টর্টিকয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তার ছেলে প্রিদিবেশ্বর পিতার মত চৰ্পটি করে প্ৰবৃত্ত্যুষের উপার্জিত অর্থ কেবলমাত্র আঁকড়ে না থেকে সেটা আরো বাড়িয়ে কি করে নিবগুণ তিনগুণ করা যায় সেই চেষ্টায় উঠে-পড়ে লাগলেন। কিন্তু চণ্ডলা লক্ষ্মীর সংহাসন উঠল টলে। নানা দিক দিয়ে ঘরের অর্থ জলের মত বেরিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু মদের নেশার মতই প্রিদিবেশ্বরকে তখন ব্যবসার নেশায় পেয়ে বসেছে। সংসারে তাঁর আপনার বলতে এক স্তৰী ছাড়া আর কেউ ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। আস্তীয় বন্ধুবান্ধবের অবিশ্য সংখ্যা কম ছিল না। স্তৰীর নিষেধ, আস্তীয় বন্ধুবান্ধবদের সতর্কবাণী কিছুই তাঁকে টলাতে পারল না। চোদ্দ-পনের বছরের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের জৰিমদারী নিঃশেষে কোথায় মহাশূন্যে মিলিয়ে গেলো। অবশেষে দেনার দায়ে একদিন তাঁর শেষ বসতবাটি সোনারপুরের বাগানবাড়িটা ও বিক্রি করতে হল। বাবা সাত হাজার টাকায় সেই বাগানবাড়িটা কিনেছিলেন। বাগানবাড়িটা বাবা কতকটা ঝোঁকের মাথায়ই কিনেছিলেন এবং তার কোন সংস্কারও করেননি। হঠাত বছরখানেক আগে অনিল চৌধুরী নামে একজন ভদ্রলোক বাবার কাছে এসে অনুরোধ জানান, বাগানবাড়িটা তিনি কিনতে চান। বাবা ও রাজী হয়ে যান। অনিল চৌধুরী বলেছিলেন, বাগানবাড়িটা কিনে সেখানে তিনি একটা স্কুল স্থাপন করবেন। উল্লেখ্য খুবই ভালো। লেখাপড়া হবে, সব ঠিকঠাক, এমন সময় হঠাত বাবা একটা বেনামী চিঠি পেলেন, চিঠিতে লেখা ছিলঃ

প্রয় মধ্যসূদনবাবু, লোকপৱন্পৱায় শুনলাম, রাজা প্রিদিবেশ্বরের বাড়িটা নাকি আপনি বিক্রী করছেন। আপনি জানেন না কিন্তু আমি জানি, ঐ বাড়ির কোন এক স্থানে প্রিদিবেশ্বরের পিতামহ যজ্ঞেশ্বর রায়ের গোটা

দশ-বারো দায়ী হীরা পৌঁতা আছে। সে হীরার দাম সাত-আট লক্ষ টাকা তো হবেই, আরো বেশী হতে পারে। যার কাছে আপনি রাজা প্রিদিবেশের বাড়ীটা বিক্রী করছেন সে সেকথা কোন স্তুতে জানতে পেরেছে বলেই বাড়িটা কেনবার জন্য বাস্ত হয়েছে। তা না হলে এর্তাদিনকার ভাণ্ডা বাড়ি, তাও কলকাতার বাইরে কেউ কিনতে চায়? আপনাই ভেবে দেখন। রাজা প্রিদিবেশের বা তাঁর পিতা রাজেশ্বরও সেকথা জানতেন না। হীরার কথা একমাত্র রাজা যজ্ঞেশ্বর ও তাঁর নায়েব কলৈস চৌধুরীই জানতেন। কিন্তু হীরাগুলো যে ঠিক কোথায় পৌঁতা আছে, সেকথা একমাত্র যজ্ঞেশ্বর ভিন্ন চির্তীয় প্রাণী কেউ জানতেন না। রাজা যজ্ঞেশ্বর হঠাৎ সন্ধ্যাস রোগে মারা যান। কাজেই মৃত্যুর সময় তাঁর লুকানো হীরাগুলোর কথা কাউকে বলে যেতে পারেননি। আপনাকে সব কথাই খুলে বললাম। ইর্ত—

আপনার জনেক ‘শুভাকাঙ্ক্ষী’।

চিঠিখানা পড়ে, কি জানি কেন বাবার মন বদলে গেল। বাবা বাড়িটা বিক্রী করবেন না বলে সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেললেন। পরের দিন লেখাপড়া হবে, অনিলবাবু এলেন। বাবা তাঁকে সংপর্ক বললেন, বাড়ি তিনি বিক্রী করবেন না। অনিলবাবু তো শুনে অবাক। শেষে অনিলবাবু বিশ হাজার পর্যন্ত বাড়িটার দাম দিতে চাইলেন। কিন্তু বাবা তখন একপ্রকার স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছেন যে বাড়িটা বিক্রী করবেন না। তা ছাড়া অনিলবাবুর জেদ দেখে বাবার মনের সম্প্রেক্ষণ ঘোষণা করেন আরো বন্ধমূল হয়েছে। অবশেষে এক প্রকার বাধ্য হয়েই অনিলবাবু ফিরে গেলেন। এর পরে মাসখানেক কেটে গেল।

আচ্ছা, তোমার বাবা তারপর খোঁজ করেছিলেন কি সত্য ঐ বাড়ির কোথাও কোন হীরা লুকানো আছে কিনা—was there any truth in it?

কিরীটী প্রশ্ন করে।

না। মনের মধ্যে বাবার কোন সন্দেহ থাকলেও বাইরে তার কোন কিছুই প্রকাশ করেননি। অর্থাৎ সত্য সত্য হীরাগুলো সে-বাড়ির কোনখানে লুকানো আছে কিনা সে সম্পর্কে কোন সন্ধানই বাবা করেননি। যাহোক এমন সময় এক অভিযোগ ঘটনা ঘটল। বাবার কাছে এক উর্কিলের চিঠি এল ; তার মর্ম এই যে রাজা প্রিদিবেশের সোনারপুরের যে বাড়ি বাবা কিনেছেন সে ক্রয় আইনত অসম্ভব। কেননা প্রথমত সে বাড়িটা আগেই রাজা প্রিদিবেশের ভুবন চৌধুরীর কাছে দেনার দায়ে বন্ধক রেখেছিলেন। বন্ধকী জিনিস কখনো আইনত বিক্রী করা যায় না। তা ছাড়া বাবাকে দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, বাড়িটা সত্যিই তিনি রাজা প্রিদিবেশের কাছ থেকে কিনেছিলেন। উর্কিলের চিঠি পেয়ে বাবা হাসলেন, কোন জবাবই দিলেন না। কেননা বাবার সিন্দুকে যে দলিল আছে, সেটাই তার প্রমাণ। অবশেষে কোটে মামলা উঠল।...গতকাল ছিল দলিল কোটে পেশ করবার দিন। এমন সময় অকস্মাত দলিলটা গেল চুরি।

কিরীটী বললে, এ যে একটা রহস্য উপন্যাস সলিল!

হ্যাঁ, রহস্য উপন্যাসই বটে।

পূর্ণলিমে সংবাদ দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, বাবা পূর্ণলিমে সংবাদ দিয়েছেন। আজ বিকালের দিকে তাদের আসবার কথা ; কিন্তু পূর্ণলিমের লোক আসবার আগেই বাড়ি থেকে চলে এসেছি

আমি।

আমি কি ভাবছি জানিস সলিল? ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। একটু চেষ্টা করলেই ব্যাপারটাৰ সুব্রহ্মা কৰা যেতে পাৰে।

সলিল উৎসাহে একবাৰে উঠে বসে, পাৰিব দলিলটা খুজে বেৰ কৰে দিতে কিৱীটী?

কিৱীটী সলিলেৰ কথাৰ কোন জবাবই দিল না, একটু হাসলে শব্দ।

নল্দু এসে জানাল রাঠিৰ আহাৰ্য প্ৰস্তুত।

কিৱীটী নল্দুকে দৃঢ়নৈৰ থাবাৰ ওপৰে দিয়ে যেতে বলল।

* * *

যখনকাৰ কথা বলছি, ঢাকুৱিয়া অশ্বলে তখনো আধুনিকতাৰ হাওয়া লাগেনি, লেক তো দূৰেৰ কথা। সেখানে তখন ছিল ঘন বনজগল ও ধানক্ষেত। রেল লাইনেৰ ধাৰ দিয়ে দৃঢ়-একটা পাকা বাড়ি দেখা যেত মাঝ।

ঢাকুৱিয়া স্টেশনেৰ কাছেই মধুসূন্ধন সৱকাৱেৰ প্ৰকাণ্ড চাৱমহলা বাড়ি। বাড়িৰ সামনেৰ দিকে একটি চৰৎকাৰ ফুলেৰ বাগান। নানা জাতীয় ফুলগাছ সংগ্ৰহ কৰে বাগানটিকে তিনি সাজিবলৈছেন। বাগানটি তাৰ অতি প্ৰিয়! কাজকৰ্মেৰ অবকাশে সকাল-সম্ম্যায় যে সময়টুকু তিনি অবসৱ পান, ওই বাগানেই ঘৰে ঘৰে বেড়ান।

বাগানটা যেন তাৰ কাছে একটা নেশাৰ বস্তুৰ মতই হয়ে উঠেছিল; চিৱদিনই তিনি অতি প্ৰভূষে শ্যায়াত্যাগ কৰেন, বাগানেৰ মধ্যে খালি গায়ে চঁটপায়ে পায়চাৰি কৰেন সূৰ্য ভাল কৰে না ওঠা পৰ্যন্ত। সেদিন সকালেৰ দিকে খৈতটা যেন বেশ একটু চেপেই পড়েছে। ভোৱেলা একটা হালকা কমলালৈবু রংয়েৰ দায়ী শাল গায়ে জড়িয়ে মধুসূন্ধন বাগানেৰ মধ্যে এককী পায়চাৰি কৰছেন, এমন সময় সলিলেৰ সঙ্গে কিৱীটী এসে বাগানেৰ মধ্যে প্ৰবেশ কৰল।

কিৱীটী এৱ আগেও দশ-বাৰোৱাৰ সলিলদেৱ বাড়িতে বেড়াতে এসেছে এবং মধুসূন্ধনবাবুৰ সঙ্গে যথেষ্ট পৰিচয়ও আছে। কিৱীটী মধুসূন্ধনবাবুকে কাকাবাবু বলে ডাকে।

ওদেৱ দেখে মধুসূন্ধনবাবু বললেন, এই যে! তোমোৱা এত সকালে কোথা থেকে?

কিৱীটী জবাব দিল, সলিল কাল আমাৰ ওখানে ছিল কাকাবাবু, সলিলকে আসতে দীৰ্ঘি, আজ সকালে একসঙ্গে আসব বলে। আপনাৱ শৱীৰ ভাল তো কাকাবাবু?

হ্যাঁ বাবা, বুড়ো হাড় কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে যে কটা দিন চালানো ধায়। তাৰপৰ তোমাৱ শৱীৰ ভাল তো?

হ্যাঁ কাকাবাবু।

তোমাদেৱ পৱীক্ষাও তো এসে গেল, না?

হ্যাঁ, আৱ মাস তিনেক বাকী আছে।

বাবা, কিৱীটী বলাছিল তোমাৱ হারানো দলিলটা ও খুজে বেৰ কৰে দেবে। বললে সলিল।

মধুসূন্ধন পৃষ্ঠেৰ কথায় চকিতে ঘৰে দাঁড়িৱে তীক্ষ্ণদণ্ডিতে কিৱীটীৰ দিকে তাকালেন।

কিরীটী ধীরভাবে বললে, খণ্ডে বের করে দেবো এমন কথা আমি
বলিনি, তবে চেষ্টা করব, অর্বিশ্য কাকাবাবু, আপনার যদি তাতে কোন আপত্তি
না থাকে।

কিরীটীর কথা শুনে মধুসূদন খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন, তারপর
মধুস্বরে বললেন, বেশ তো, চেষ্টা করে দেখ।

কিন্তু চেষ্টা করতে হলে যে আপনার সাহায্যই সর্পথম আমার প্রয়োজন
কাকাবাবু!

সাহায্য?

হ্যাঁ।

কি ভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি বল?

আমি যে দলিলটা খৈঁজবার ভাবে নির্যাপ্তি, সে কথা আপনি ও সলিল
ছাড়া ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারবে না। আর আমি যা বলব আপনাকে
তা করতে হবে।

মধুসূদন আবার খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন, মনে মনে বেশ কৌতুহলীই
হয়ে উঠেছিলেন তিনি কিরীটীর কথাবার্তায়। মধুস্বরে বললেন, বেশ,
তাই হবে।

বাইরে ততক্ষণে রোদ উঠে গেছে।

কিরীটী বললে, চলুন কাকাবাবু, ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে কয়েকটা
কথা আছে।

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

আগেই বলেছি, বাড়িটা চারমহলা, দোতলা। প্রথম মহলে মধুসূদনের
ব্যবসা সংক্রান্ত দশ-বারোজন কর্মচারী ও ম্যানেজার বনাবহাবীবাবু, থাকেন।
শ্বিতীয় মহল ব্যবসায়ের জিনিসপত্রের গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
তৃতীয় মহলে দাস-দাসীরা থাকে ও বাইরের লোকেরা আহারাদি করে। চতুর্থ
মহলই প্রকৃতপক্ষে অন্দরমহল।

অন্দরমহলে ওপরের দক্ষিণের দৃটো ঘরে মধুসূদনবাবু থাকেন—একটা
তাঁর বসবার ঘর, অন্যটা শয়নকক্ষ। অন্য দৃটির একটিতে থাকে সলিল, আর
একটি পঞ্জার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নীচের একটি ঘরে খাওয়াদাওয়া হয়, একটিতে পিসীমা সলিলের তিনটি
বোনকে নিয়ে থাকেন, একটিতে থাকেন সলিলের কাকা বিংশিনবাবু, অন্যটিতে
অতিথি-অভ্যাগত এলে থাকে।

কিরীটী বললে, যে ঘরে সিল্দুকটা ছিল সেই ঘরটা সর্পথমে দেখতে
চাই।

মধুসূদন বললেন, তুমি সলিলের সঙ্গে গিয়ে ঘরটা দেখ, ততক্ষণে আমি
ম্যানেজারের সঙ্গে কয়েকটা কথা সেরে আসি। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

সলিলের সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী মধুসূদনের শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করল।
ঘর খালি, যা অনেকক্ষণ উঠে গেছেন, এতক্ষণে হয়তো পঞ্জার ঘরে বাস্ত।

বেশ বড় আকারের ঘরখানি, দক্ষিণ-পূর্ব খোলা। কিরীটী তীক্ষ্ণবৃদ্ধিতে
চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ব্যালকনির ঠিক পাশ দিয়েই একটা নারিকেল
গাছ উঠে গেছে। ব্যালকনির থেকে হাত বাড়িয়ে অনায়াসেই নারিকেল গাছটা
ধরা যায়। তবে তাতে বিপদের সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয়। হাত ফসকে

যাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। ঘরটা একেবারে বারান্দার শেষপ্রান্তে। তা ছাড়া ঐ ঘরের সংলগ্নই ছাদে যাওয়ার দরজা। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের তেমন বাইল্য নেই। দ্বিটি সিংগল বেড পাশাপাশি, নিভাজ শয়া বিছানো। মধ্যস্থান যে খাটে শয়ন করেন তার এক পাশে একটি শ্বেতপাথরের গোল টেবিলের ওপরে রাঙ্কিত ফোন। এক পাশে একটা আয়না বসানো কাপড়ের আলমারির এবং আলমারির ঠিক পাশেই মানুষ-প্রাণ উচ্চ মজবৃত লোহার সিল্ডুক। সিল্ডুকের গায়ে বেশ বড় একখানি জার্মান তালা ঝুলছে। সিল্ডুকের ঠিক পাশেই একটি টুলের ওপরে জলের কুঁজো; তার মাথায় বসানো একটি কারুকার্য-খচিত শ্বেতপাথরের ফ্লাস।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মুখোমুখি পুর-পুর্ণমে দ্রুখানি বড় অয়েল-পেনিটিং-মধ্যস্থানের মা ও বাবার। ফটোটি ঠিক সিল্ডুকের ওপরেই টাঙানো।

ছেলেবেলায় কিরীটীর ছবি আঁকার দিকে খুব বোঁক ছিল। সে তীক্ষ্ণ দণ্ডিতে ছবি দ্বিটিকে খুঁটিয়ে শিল্পীর মন নিয়ে দেখতে লাগল। ফটো দ্বিটির গায়ে ঝুল পড়েছে সামান্য। বেশ কিছুদিন যে ঝাড়াপোঁছা হয়নি তা বুঝতে কঢ় হয় না।

সলিল প্রশ্ন করলে, অমন করে কি দেখছিস কিরীটী?

বিলিতী ফ্রেঞ্চ বলেই মনে হয়। তোর ঠাকুর্দার ফটোটা ঠিক দেওয়ালের সঙ্গে সেট করা হয়নি—একটু যেন বাঁয়ে হেলে আছে। কিরীটী জবাব দেয়।

এমন সময় মধ্যস্থান এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

কি দেখছ? প্রশ্ন করলেন মধ্যস্থানবাবু।

আপনার বাবার অয়েলপেনিটিংটা দেখছিলাম। বেশ সুন্দর। শিল্পীর হাত চমৎকার, যেন একটা প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তুলির প্রতিটি টানে।

হ্যাঁ, একজন ইটালীয়ান শিল্পীর আঁকা। তোমাদের চা-পৰ্ব এখনও হয়নি নিশ্চয়ই। চল আমার বসবার ঘরে; ওখানে বসে চা-পান করতে করতে তোমার যা আলোচ্য আছে তা আলোচনা করা যাবে।

চলুন।

সকলে এসে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন।

সুন্দর্য ট্রেতে করে ভৃত্য চারের সরঞ্জাম নিয়ে এল। একটি ছোট গোল টেবিলে চারের সরঞ্জাম নামিয়ে দিয়ে সে ঘর হতে নিষ্কান্ত হয়ে গেল।

সলিল উঠে চা ঢালতে লাগল।

কিরীটী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল; সে ভাবছিল অয়েলপেনিটিংটার কথা। কোথায় কোন্ মাটির তলায় একটা সন্দেহের বীজ যেন অঙ্কুরোদ্ধরণের সম্ভাবনায় ওপরের দিকে ঠেলে উঠতে চাইছে।

* * *

চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে নানা আলোপ আলোচনা চলছিল।

হঠাতে একসময় মধ্যস্থান বললেন, তুমি বোধ হয় জান না কিরীটী, এই দলিলটার একটা পূর্ব ইতিহাস আছে।

কিরীটী মুদ্র হেসে বললে, সলিলের মুখে গতকাল অনেকটা শুনেছি কাকাবাবু এবং সে ইতিহাস শোনবার পর থেকেই আমার মনে একটা অদ্যম জ্ঞান জেগেছে দলিলটা খুঁজে বের করবার। আচ্ছা দলিলটা চৰির যাওয়ার আগের দিন থেকে এবং আপনি যখন জানতে পারলেন দলিলটা সিল্ডুকে নেই,

ঐ সময়কার সমস্ত ঘটনা ঘটটা আপনি জানেন, একটু বাদ না দিয়ে আমাকে সব বলতে পারেন কাকাবাবু?

ঘর্ষণ সূচন কী যেন একটু ভাবলেন, তারপর ঘৃদৃশ্বরে বললেন, দালিলটাৰ প্ৰ' ইতিহাস যখন তুম্ম সলিলেৱ মুখে শুনেছই, তখন সেটাৰ আৱ পুনৰা-বৃত্তি কৰতে চাই না। দালিলটা যে সিদ্ধান্ত থেকে কি কৰে চৰিৰ ষেতে পারে, এখনো তাৱ মাথামুণ্ডু আৰু কিছুই ভেবে কিঞ্চিৎ কৰতে পাৰিছ না। তবে স্থূল চক্ষে দেখতে পাৰিছ, দালিলটা চৰিৰ গেছে এবং এখন সেইটাই সবচাইতে বড় কথা। বাড়তে নলোকজনেৱ মধ্যে আৰু, বিপিন, দিদি, সলিলেৱ মা আৱ সলিলেৱ তিন বোন। প্রতিদিন আৰু বিকেল পাঁচটাৰ মধ্যেই দোকান থেকে ফিরি। কিন্তু পৱশ্ব ফিরতে আমাৱ রাত্ৰি প্ৰায় নটা হয়ে যায়। সকালবেলা দোকানে ঘাওয়াৱ আগে সেদিন সিদ্ধান্ত খুলে যখন কয়েকটা আবশ্যিকীয় কাগজ-পত্ৰ রাখিছ, দালিলটা তখনো সিদ্ধান্তেই ছিল মনে আছে।

আপনাৰ দেখতে ভুল হয়ন তো কাকাবাবু?

দেখবাৱ ভুল আমাৱ কোন দিনই হয় না বাবা, তা হলে এত বড় ব্যবসাটা চালানো আজ কষ্টকৰ হত। যাহোক শোন। দালিলটা তখনও সিদ্ধান্তেই ছিল। সেই রাত্ৰে একটা ব্যাপার ঘটেছিল; প্ৰথমে ভেবেছিলাম তাৱ হয়তো কোন শুনুন্ত নেই, কিন্তু পৱে অনেক ভেবে মনে হচ্ছে সে ব্যাপারটাৰ সঙ্গে কোথাও দালিল চৰিৰ ঘাওয়াৱ একটা সূত্ৰ জট পাৰিয়ে থাকলোও থাকতে পাৰে। রাত্ৰি তখন বোধ কৰি একটা হৈব। রাত্ৰে আমাৱ তেমন সৰ্বনিম্ন হয় না কিছুদিন থেকে। সামৰ্ণ্য শব্দে ঘূৰ ভেঙে যায়। কিন্তু সেদিন বড় ক্লান্ত ছিলাম বলে ঘূৰটা যেন বেশ গাঢ়ই হয়ে এসেছিল। হঠাৎ একটা খস্খস্ শব্দে ঘূৰ ভেঙে গোল। প্ৰথমে ভাবলাম ও কিছু নয়। কিন্তু তবুও কান খাড়া কৱেই রইলাম। আবাৱ খস্খস্ শব্দ কানে এল, শব্দটা যেন পাশেৱ ঘৰ থেকেই আসছে মনে হল। ভাবলাম হয়তো বেড়াল হবে। হঠাৎ একটা কাঁচ কৱে শব্দও হল। এবাৱ আৱ দোৰি না কৱে উঠে পড়লাম। ঘৰেৱ বাতি নিভানো। ডায়নামো রাবিত্ এগাৱটাৰ পৱ বল্ছ হয়ে যায়। ঘৰে ঘোমবাৰ্তি থাকে, প্ৰয়োজন হলে তাই জন্মলানো হয়। শব্দ্যা থেকে উঠে শিয়াৱেৱ কাছে রাঙ্কিত ঘোমবাৰ্তিটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে পাশেৱ ঘৰেৱ দিকে চললাম। পাশেৱ ঘৰটা খালি। কিন্তু ঘাৱাল্দাৱ দিকেৱ দৱজাটা হা-হা কৱছে খোলা ও দৱজাটা চিৱদিন আৰু নিজ হাতেই বল্ছ কৱে শুই, সেদিনও তাই কৱেছিলাম। কেমন খটকা লাগল। তাড়াতাড়ি দৱজা দিয়ে বাইৱে ঘাৱাল্দাৱ এলাম। আকাশে সামান্য একটু খার্ণ চাঁদ; তাৱই অস্পষ্ট আলোয় মনে হল, যেন কে দ্রুতপদে সিৰ্পিড়ি দিয়ে নেমে ঘাচ্ছে নীচে। ঘোমবাৰ্তিটা চট কৱে নিভিয়ে দিয়ে সিৰ্পিড়িৰ দিকে এগিয়ে গোলাম; কিন্তু আৱ কিছুই চোখে পড়ল না। তবু নীচে পৰ্যন্ত গোলাম। বাইৱে ঘাৱাৱ দৱজা বল্ছ। মানে রাত্ৰে ওটা তালা দেওয়া থাকে কিনা বৱাবৰ। তোমাৱ কাকীমাই প্ৰত্যহ রাত্ৰে শুভে ঘাৱাৱ আগে তালা দিয়ে ঘান, আবাৱ সকালে উঠে তালা খুলে দেন। নীচেৱ তিনটে ঘৰও বল্ছ, চেলে দেখলাম। হয়তো ব্যাপারটা আগাগোড়া আমাৱ চোখেৱ ভুল হতে পাৰে। ঘূৰেৱ চোখে উঠে গোছ। কিন্তু মনেৱ খুতখুতুনিটা কিছুতেই যেন গেল না। নীচেটা সৰ্বত্ অন্তৰ্ভুক্ত কৱে অনুস্থান কৱেও কিছু পেলাম না। সকালে উঠে দারোয়ান চৰ্দন সিংকে ও গুৱৰিলকে প্ৰশ্ন কৱলাম, কিন্তু তাৱাও কিছু বলতে পাৱলৈ

না। শেষে নটার সময় সিন্দুক খুলে দালিলটা নিতে গিরে দৈখি সিন্দুকে দালিল নেই। যথারীতি খেঁজাখেঁজি করে বাধ্য হয়ে শেষটায় প্রলিসে সংবাদ দিলাম। গতকাল রাত্রে, তখন বোধ করি সাড়ে বারোটা হবে, আমার শোবার ঘরের সংলগ্ন ব্যালকনিতে চৃপচাপ চেয়ারটায় অন্ধকারে বসে আছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম ব্যালকনির নীচে থেকে যেন একটা তীক্ষ্ণ শিশের শব্দ। চমকে উঠে দাঁড়ালাম এবং অন্ধকারে খুঁকে নীচে বাগানের দিকে তাকালাম। অন্ধকারে কিছুই বোবার উপায় নেই। আর দোরি না করে তখন চিন্কার করে গুরুবালিকে ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গেই নীচের বাগানে কে যেন দ্রুতপদে ছুটে পালিয়ে গেল, তার স্পষ্ট শব্দ পেলাম। তোমার কাকীমার কাছ থেকে তখন চাবি নিয়ে নীচের দরজা খুলে বাইরে গেলাম। তারপর দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বাগানটা তখন তর করে খুঁজেও কিছু দেখতে পেলাম না। কিন্তু টেচের আলোয় বুরতে পারলাম, ব্যালকনির নীচে কেউ কিছু ক্ষণ আগে দাঁড়িয়ে ছিল। কেননা ঐ জায়গায় কতকগুলো নতুন ফুলের চারা লাগানো হয়েছে, মালী সেখানে বিকলের দিকে জল দিয়েছিল। নরম মাটির ওপরে অনেকগুলো জুতোর ছাপ পড়েছে।...

কিরীটী এতক্ষণ গভীর ঘনোয়োগের সঙ্গে মধুসূদনের কথা শুনছিল, একটি কথাও বলেনি। হঠাতে সে ধীর সংবত ভাবে বললে, দালিলটা বোধ হয় আপনার পাওয়া যাবে কাকাবাবু। আছা প্রলিসের কছে কি এসব কথা আপনি বলেছেন কাকাবাবু?

না। হয়তো তারা হাসবে এই ভয়ে বালিন।

বেশ করেছেন, এখনও বলবেন না। তবে একটা কাজ করতে হবে আপনাকে।

কী?

দিনরাত্রি গোপনে বাড়ির আশপাশে পাহাড়া রাখতে হবে এখন থেকে।

সে আর এমন কঠিন কি? আমার বাড়িতে তিনজন দারোয়ান আছে এবং দোকানে দুজন আছে। দোকান থেকে একজনকে নিয়ে আসব; চারজন অনায়াসেই পাহাড়া দিতে পারবে।

আপনি এখন সেই ব্যবস্থা করুন। আপনাকে আর আপাততও আমার প্রয়োজন হবে না।

এরপর মধুসূদনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে নিষ্কান্ত হয়ে গেলেন।

মধুসূদন চলে গেলে কিরীটী ঝুঁক কাছে শোনা কথাগুলো আগাগোড়া আর একবার মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখল। চাবির রহস্যটা কিছুতেই সে যেন উল্ধুর করতে পারছে না। চাবিটা চুরি গিয়েছিল এ বিষয়ে কোন ভুলই নেই। কিন্তু কেমন করে চুরি গেল সেটাই রহস্য। কে চুরি করতে পারে? কার ঘোরা চুরি হওয়া সম্ভব? সহসা তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটা পথ সে অস্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছে। তাই যদি হয়, তবে চাবি চুরিরও একটা মৌমাঙ্গা পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে মধুসূদনের কাহিনীরও একটা মৌমাঙ্গা আপাততও থাড়া করা সম্ভবপর। কিন্তু তাও কি সম্ভব? সম্ভবই বা নয় কেন? এ দুর্নিয়ায় মানুষ স্থার্থের জন্য করতে না পারে এমন কিছু আছে কি? কিন্তু স্বার্থটা কোথায় এবং কার?

কি ভাবিছস কিরীটী? সলিল প্রশ্ন করে।

আজকের রাতটা জাগতে হবে সলিল, পার্বি তো ?

নিশ্চয়ই পারব।

তবে শোন্ কি করতে হবে আমাদের। ঐ আলমারিটার পিছনে তোকে
আজ রাত্রি দশটার পর থেকে অতি গোপনে থাকতে হবে। আর আমি থাকব
তোদের ছাদের ওপরে চিলেকোঠার মধ্যে। সধ্যার পরই আমি সে ঘরে থাব।
ষতক্ষণ না আমার বাঁশীর আওয়াজ পার্বি বের হবি না।

বেশ। কিন্তু চিলেকোঠাটা তো ভীষণ নোংরা হয়ে আছে।

ক্ষতি নেই তাকে এতটুকু।

রাত্রি বারোটা। শীতের রাত্রি যেন ঘূর্ম-ভারাক্রান্ত। কোথাও এতটুকু
হাওয়া নেই। চারিদিক নীরব নিখর। কিরীটী নিঃশব্দে কাঠের প্যার্কিং কেসের
ওপরে বসে আছে।

রাত্রি দেড়টা।

ছাদের ওপর কার নিঃশব্দ চাপা পায়ে চলাচলের আভাস। কিরীটী
উদ্গীব হয়ে ওঠে।

পায়ের শব্দ ঝুমেই এগিয়ে আসছে...হাঁ, এগিয়ে আসছে এই ঘরের
দিকেই। খুট করে একটা শব্দ হল শিকল খোলার। কিরীটী তীক্ষ্য দ্রুতে
তাকিয়ে রইল।

মাথার স্বচ্ছ ঘোমটা, সারাদেহ বস্ত্রাবৃত কে যেন ঘরে এসে প্রবেশ করল।
ফস্ক করে দেশলাই জবলাবার শব্দ হল। আগন্তুক একটা মোমবাতি জবলালে।
মোমবাতির আলোয় ঘৰটা যেন সহসা জেগে উঠল।

মোমবাতিটা হাতে করে আগন্তুক এগিয়ে বাগানের দিকে জানালার ওপরে
মোমবাতিটা বসালে। তারপর নিঃশব্দে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

এক মিনিট দু মিনিট কেটে গেল। কিরীটীও তেরিনি চুপচাপ, আগন্তুকও
নিঃশব্দ। এমনি করে আধ ধূটা কেটে গেল। সহসা এমন সময় আগন্তুক
সেই ধূলিমালিন মেঘের ওপর লুটিয়ে কাঁদতে শুরু করলে।

কিরীটী এবারে এগিয়ে এল।

ভুল্দুঠতা নারীর সর্বাঙ্গ কান্নার বেগে ফুলে ফুলে উঠছে। এলোচ্ছল
মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

ধীরে ধীরে কিরীটী ডাকলে, পিসিমা ?

কে ? হ্যন্তে পিসিমা উঠে মোমবাতিটা হাতে নিয়ে পেছনাদিকে তাকালেন,
তাঁর অবস্থা দেখে মনে হয় যেন আচমকা পথের মাঝে ভূত দেখেছেন ! কপাল
বেয়ে তখনও অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে।

পিসিমা উঠে বসুন। ভয় নেই আপনার, আমি কিরীটী।

পিসিমা যেন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেছেন। কিরীটী এই সময়
—এত রাত্রে—এইখানে ? সমস্ত কেমন গোলমাল হয়ে থাচ্ছে।

* * *

কিরীটী ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিতে যেতেই আর্দ্ধবরে পিসিমা
বলে উঠলেন, না না—নিভিও না।

কিন্তু তবু কিরীটী আলোটা নিভিয়ে দিল, না পিসিমা, আলোটা না
নিভিয়ে দিলে সে ধরা পড়বে। তাতে আপনার লজ্জা আরো বেশী হবে।

নিঃশব্দে সে পালিয়ে যাক। ধরা পড়লে যে কলঙ্ক হবে, তা থেকে তাকে বাঁচানো মুশ্কিল হবে। ভয় নেই পিসিমা আপনার কোন। কত বড় দুঃখে যে আপনি এ কাজে হাত দিয়েছেন, আপনি না বললেও তা আমি বুঝতে পারছি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। কিরীটীর কথার কথনে খেলাপ হয় না।

সহসা পিসিমা কিরীটীর দু হাত চেপে ধরে চাপা কান্নায় ভেঙে পড়লেন, শম্ভুকে বাঁচাও কিরীটী। সে আমার ছেলে। আজ তোমাকে আমি সব খুলে বলব। দীর্ঘদিন এই দুঃসহ ব্যথা ও লজ্জা আমি বুকে চেপে বেড়াচ্ছি। লোকে জানে শম্ভু মারা গেছে, কিন্তু আসলে তা নয়। শম্ভুর যখন তেরো বছর বয়স তখন তার বাবা মারা যান। লেখাপড়া শিখিয়ে তাকে মানুষ করতে আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু অসৎ সঙ্গে মিশে সে গোঁজায় গেল। চোল্দ বছর বয়সের সময় সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। দু বছর কত খুজলাম, কিন্তু তার কোন স্থানই পেলাম না। শেষে দাদার এখানে চলে এলাম। দীর্ঘ এগার বছর পরে দিনদশেক আগে কালীঘাটের বন্দিরে সন্ধ্যার সময় তার সঙ্গে দেখা হল। তাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম। সে আমাকে কালীমন্দিরে দেখা করবার জন্য আগে একটা চিঠি দিয়েছিল। সঙ্গদোষে আজ সে অধঃপতনের শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে। রোগজীণ কঙ্কালসার দেহ। বোধ হয় আজ আর তার কোন নেশাই বাদ নেই।

কাঁধের ওপরে তার একরাশ ধার। যার কাছ থেকে সে টাকা ধার নিয়েছে, সে শাসিয়েছে আগামী দশদিনের মধ্যে টাকা না শোধ করতে পারলে তাকে তারা জেলে দেবে। তাই সে আমার শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু আমি বিধবা, মান খুঁইয়ে ভাইয়ের সংসারে এসে পড়ে আছি, কোথায় আমি টাকা পাব? একটা কাজ করতে পারলে একজন তাকে এক হাজার টাকা দেবে বলেছে। সে কাজ হচ্ছে দাদার সিল্ক থেকে সোনারপুরের বাড়ির দলিলটা এনে দেওয়া। শুনে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু সে কাঁদতে লাগল, টাকা না পেলে তাকে জেলে যেতে হবে। আর কোন উপায়ই নেই। হায় রে মায়ের প্রাণ!...তিনি রাত বিবেকের সঙ্গে ঘূর্ন করছি; শেষে সন্তানের দাঁবিই জয়ী হল। কি করে যে দলিলটা চুরি করেছিলাম, সে লজ্জার কথা আর বলতে চাই না বাবা তোমার কাছে। কথা ছিল পরের দিন রাতে সে বাগানে এসে দাঁড়াবে এবং শিস দেবে, আমি দলিলটা জানলা দিয়ে নীচে ফেলে দেব। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। তাই আজ এসেছিলাম এ ঘরে—আলোর নিশানা তাকে জানাতে। ...আমার মানসম্মত আজ সবই তোমার হাতে বাবা। পিসিমা কাঁদতে লাগলেন।

কাঁদবেন না পিসিমা, চুপ করুন। আমি জানি দলিলটা কোথায়। এ কাহিনী আমি ছাড়া আর কেউই জানতে পারবে না। আপনি নীচে যান। যা করবার আমি করব।

পিসিমা নিঃশব্দে নীচে চলে গেলেন। কিরীটীও নীচে গেল। সলিল তখনে আলমারির পিছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে।

সলিল বেরিয়ে আয়! ডাকলে কিরীটী।

সলিল আলমারির পিছন থেকে বের হয়ে এল, কি ব্যাপার?

দলিল পাওয়া গেছে।

সত্ত্ব ?

হ্যাঁ—বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে কিরীটী মধুসন্দনের বাবার ফটোর পিছন থেকে খামসমেত দলিলটা বের করে দিল।...পাশের ঘরে মধুসন্দনবাবুর তথনো জেগেই বসে ছিলেন, কিরীটীর সঙ্গে সালিল গিয়ে মধুসন্দনের হাতে দলিলটা দিল।

মধুসন্দন বিষয়ে একেবারে থ হয়ে গেছেন যেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে পেলে ?

ঢাঁটি আমাকে মাপ করতে হবে কাকাবাবু। আর্মি বলতে পারব না কেমন করে কোথায় পেলাম এবং কে চুরি করেছিল !

বেশ। কিন্তু অপরাধীর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন, এ কথা তো মানো তুমি ?

কাকাবাবু, প্রথমীতে সব অপরাধেরই কি শাস্তি হয় ? আপনার দলিলের প্রয়োজন, দলিল পেয়েছেন। আর একটা অন্তরোধ আপনার কাছে—এ বিষয় নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করতে পারবেন না আপনি।

বেশ তাই হবে।

এর পরদিন কিরীটী এক হাজার টাকা এনে পিসিমাৰ হাতে দিল।

এ টাকা কিসের কিরীটী ? পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন।

শম্ভুকে দেবেন পিসিমা, আর তাকে বলবেন এবাৰ সৎপথে চলতে। ওপথে কেবল দুঃখই বাড়ে, সুখ নেই। এটা আমার প্রণামী পিসিমাকে।

একটা কথা কাল থেকে কেবলই আমার মনে হচ্ছে বাবা, কী করে তুমি জানতে পেরেছিলে ?

কিরীটী তখন মধুসন্দনের কথাগুলো আগাগোড়া বলে গেল। প্রথম থেকেই বুৰুতে পেরেছিলাম, কোন বাইরের লোক দলিল চুরি করতে পারে না। নিশ্চয়ই কোন ঘরের লোক এ কাজ করেছে। কিন্তু কে ? বাড়িৰ লোকজনের মধ্যে আপনি, সালিলের কাকা এ ছাড়া আৱ কাউকেই সন্দেহ কৰা যায় না—এবং বুৰোছিলাম দলিল এখনও বাড়িৰ বাইরে যার্নান এবং শৌভাই সেটা বাইরে যাবে। শ্বিতীয়ৰ রঞ্জে চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সংগ্ৰহকাৰী বিফল হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। আবাৰ সে আসবেই, তাই সব আঁটাটো বেঁধে আৰ্মি কাজে নেমেছিলাম। তবে আপনাকে আৰ্মি একেবারেই সন্দেহ কৰিন—কৰেছিলাম সালিলের কাকাকে। আপনাকে চিলেকোঠায় দেখে সত্ত্বাই চমকে গিয়েছিলাম। কাকাবাবুৰ বাবাৰ ফটোটা একটা কাত হয়ে ছিল, কিন্তু মনে একটা খটকা লাগলো সেটা খুঁজে দৈখিনি। পৱে আপনার কথা শুনে বুৰোছিলাম, তাড়াতাড়িতে আপনি ফটোৰ পিছনে দলিলটা রেখে পালিয়ে এসেছিলেন।

সত্ত্বাই তাই, দাদাৰ পায়েৰ শব্দ পেয়ে আৰ্মি ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঘরেৰ লোকই যে নিয়েছে তা তুমি বুৰুলে কি কৰে ?

কাকাবাবুৰ একটি মাতৃ কথায়। পায়েৰ শব্দ শুনে তিনি যখন পাশেৰ ঘরে আসেন, তখন দৱজাটা খোলা ছিল পাশেৰ ঘরেৰ এবং তিনি দেখেছিলেন কাউকে পালিয়ে যেতে, তাৱপৰ নীচে গিয়ে দেখলেন, বাইৱে যাওয়াৰ দৱজাটা তালা দেওয়া। তাতেই বুৰোছিলাম বাইৱেৰ কেউ নয়, ভিতৱেৱই কেউ।...আচ্ছা পিসিমা, আজ তবে আসি।

কিরীটী পিসিমাকে প্রণাম কৰে ঘৰ থেকে নিষ্কা঳ত হয়ে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

ଚକ୍ର

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিক সমন্বয়ের উপকূল ঘৰে 'সাগর-সৈকত' হোটেলটি। বলতে গেলে ছোট-খাটো শহরটি যেন গড়ে উঠেছে সাগরেরই কূল ঘৰে। শহরটিতে নানা শ্রেণীর স্বাস্থ্যব্যবস্থাদের ভিড় ও আনাগোনা যেন লেগেই আছে। এবং একমাত্র বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের বার্ষিক সময়টা নানা জাতীয় নানা শ্রেণীর যাত্রীদের আনাগোনা চলে। মাঝে মাঝে হোটেলে স্থান পাওয়াই দুর্ভুক্ত হয়ে ওঠে। 'সাগর-সৈকত' হোটেলটির মালিক একজন সিদ্ধী। সময়টা মাঝের শেষ এবং শীত এখনো যেন বেশ অংকড়েই বসে আছে এখানে। কিরীটীর ধারণা, শীতিকলে কোনো সমন্বয়সৈকতই নাকি রৌদ্রসেবনের প্রফুল্ল স্থান এবং এখন কোন স্থানে আসতে হলে নাকি মনের মত একজন সঙ্গী বা সাথী অপরিহার্য, অতএব আমাকেও সে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে, আমার কোন যদ্বিস্তেই সে কান দিতে চায়নি।

আমি অনেক করে ওকে বোাবার চেষ্টা করেছিলাম, রৌদ্রসেবনের আমার আদৌ প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমার জন্মগত দৈহিক কৃষবর্গের উপরে আর এক পোঁচ কৃষ রঙ সূর্যদেবতার নিকট হতে আমি গ্রহণে একান্তই অনিচ্ছুক, কিন্তু আমার যদ্বিস্তে সে মেনে নিতে রাজি হয়নি, বলেছে, গাঁয়ের রঙটাই বড় কথা নয় সদ্ব্যুত। আমাদের মাথার ঘধ্যে যে স্নায়ুকোষের প্রে সেলগুলো আছে, সূর্য-রাশির মধ্যস্থিত বেগনী-পারের আলোর প্রভাবে সেগুলো আরো সজীব ও সর্কুল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া সমন্বয়ের মত মনের খোরাকও কেউ দিতে পারে না। তুই দেখিব, কী আশ্চর্য-রকম সর্কুল করে তোলে রৌদ্রসেবন তোর মনকে ও চিন্তাশিক্ষিকে!

কিন্তু রৌদ্রসেবন তো এখানে বসেও চলতে পারে?

উঃঃ। এখানে হলে চলবে না। রৌদ্রসেবনেরও অনুপান আছে—সমন্বয়সৈকত। কিরীটী মাথা নেড়ে জবাব দেয়।

কিরীটীর যদ্বিস্তে হয়তো তর্কের বাঞ্ছা তুলে কিছুক্ষণ ক্ষতিবিক্ষত করতে পারতাম কিন্তু তাতেও তাকে নিরস্ত করা যেত না; কারণ রৌদ্রসেবন ও সমন্বয়সৈকত একটা অচিলা মাত্র। মোট কথা মনে মনে কোন একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানগা সে স্থির করেছে এবং কিছুদিনের জন্য সে সেখানে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন খানিকটা নির্দিষ্ট আরাম উপভোগ করতে চায় এবং সাথী হতে হবে আমায়। তাই ব্যথা আর যদ্বিস্তর্কের জাল না বনে একান্তভাবেই ওর হাতে আস্তসমর্পণ করে দিনপাঁচেক হল আমরা এই জ্ঞানগাটিতে এসে 'সাগর-সৈকত' হোটেলে অধিষ্ঠিত হয়েছি এবং হোটেলের সামনে খোলা জ্ঞানগাটিতে বসে রীতিমত রৌদ্রসেবনও চলেছে আমাদের।

'সাগর-সৈকত' হোটেলটি থেকে সমন্বয় হাত-কুড়ি-পাঁচশের বেশী দূরে হবে না। হোটেলের বারান্দা হতে সমন্বয় একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়—ঐ দিগন্তে আকাশ ও সমন্বয় যেন প্রীতির আনন্দে কোলাকুলি করছে। একটানা সমন্বয়ের নোনা বাতাসে ভেসে আসছে যেন অবিশ্রাম নিষ্ঠার চাপা হাসির একটা উল্লাস।

সফেন তরঙ্গগুলি যেন আদি-অন্তহীন সম্মুদ্রের ঘকবাকে করাল দৃষ্টিপাত। পৃথিবীর তিনি ভাগ জল, একভাগ স্থল। বলতে গেলে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মাটি, যেটাকু সম্মুদ্রের বলয়গ্রাসের বেষ্টনীতে বন্দী হয়ে আছে সেটাকুও যেন গ্রাস করবার জন্য দুর্বল নিষ্ঠার ঐ জলধির চেঁটার অন্ত নেই। ব্যাকুল নির্মল লক্ষ লক্ষ বাহু প্রসারিত করে মুহূর্মুহুর সে মাটির বুকে দুর্বল উল্লাসে ঝাঁপড়ে পড়েছে। ক্ষুরধার ত্রুষিত লোল জিহব দিয়ে লেহন করে নিষ্ঠার কলহাসিতে যেন পরক্ষণেই আবার ভেঙে শতধায় গুড়িয়ে চণ্ণিবচ্ছ হয়ে থাচ্ছে।

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা হবে। সূর্যের তাপ এখনো প্রথর হয়নি। হোটেলের সামনেই বালুবেলার উপরে নিত্যকারের মত আমি ও কিরীটী দুটো ক্যার্মিবিসের ফোলাডং চেয়ার পেতে কিরীটীরই নির্দেশমত শোলার হ্যাট চাঁপড়ে গেঁজি গায়ে পায়জামা পরিধান করে যথানিয়মে রোম্বেবন করাছি। রোম্বেবনের ফলাফল থাই হোক, শীতের সকালে সম্মুদ্রোপকূলে বসে রোদ্বের তাপটাকু বেশ উপভোগই করছিলাম।

অল্প দ্রেই সম্মুদ্র-সৈকত এবং শীতকাল হলেও নানাজাতীয় ঘূর্বা-বৃক্ষ-পুরুষ-রঘণ্টী ও কিশোর-কিশোরী স্নানাথী ও দর্শকদের ভিড়ে সম্মুদ্র-সৈকতটি আলোড়িত হচ্ছে এবং মধ্যে মধ্যে তাদের উল্লাসের সুস্পষ্ট গুঞ্জনও কানে আসছে সাগর-বাতাসে ভেসে।

হোটেলের সামনে যে জায়গাটিতে আমরা বসে আছি তাকে ছোটখাটো একটা উদ্যান বলা চলে। নানাজাতীয় পাতাবাহারের গাছ ও মরসুমী ফুলের বিচ্ছিন্ন রঙিন সমারোহ স্থানটিকে সৱ্যসাতী মনোরম করে রেখেছে। হোটেল থেকে যে পায়ে-চলা-পথটা বরাবর সাগর-সৈকতে গিয়ে গিশেছে, তার দু' পাশে ঝাউয়ের বীথি। সাগর-বাতাসে ঝাউ গাছের পাতায় একটা করুণ কান্না যেন নিরন্তর দীর্ঘশ্বাসের মত ছাঁড়িয়ে থাচ্ছে।

অল্পক্ষণ আগে কিরীটী তার মাথা থেকে শোলার টুপিটা খুলে একটা মোটা লাঠির মাথায় বসিয়ে পাশেই বালুর মধ্যে লাঠিটা পুঁতে দিয়ে আড় হয়ে আরাম-কেদারটার ওপরে বাম হাঁটুর উপরে ডান পা-টা তুলে দিয়ে মুদু মুদু নাচাচ্ছিল সামনের সাগর-সৈকতের দিকে তাকিয়ে। হাতের মুঠোয় ধরা একটা ইংরাজী উপন্যাস। হঠাৎ আমাকে সম্বোধন করে বললে, সু, এই সাদা ফ্লানেলের লংস ও গায়ে কালো গ্রেট কোট একটা চাঁপড়ে ঘূর্বকটি এই দিকেই আসছে, স্বেফ ওর চলা দেখে এই মুহূর্তে ওর মনের চিন্তাধারার একটা study করে বলতে পারিস কিছু?

হাতের মধ্যে ধরা বাংলা বইটা বুজিয়ে কিরীটীর কথায় সামনের দিকে তাকালাম, শ্লথ মল্থের পায়ে ঘূর্বকটি এইদিকেই আসছে। একেবারে পথের ধারের ঝাউবীথ ঘেঁষে আসছে ঘূর্বক। মুখের রঙ শ্যামবর্ণ। মাথার এক-রাশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বাতাসে চুলগুলো এলামেলো হয়ে উড়েছে। চুলের সঙ্গে তেলের বা চিরন্তনির যে সংস্পর্শ বড় একটা নেই বোৰা যায় বিপ্রস্ত রূক্ষ চুলগুলো দেখে। ঘূর্বকের দৃষ্টি হাতই পরিহিত গ্রেট কোটের দু' পাশের পকেটে প্রবিষ্ট। মুখটা নিচু করে হাঁটার দরুন ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় কোন কারণে ঘূর্বক যেন একটা চিন্তিতই।

ভদ্রলোকটি বোধ হয় কিছু ভাবছেন !

ভাবছেন ? কী ভাবছেন ? কিরীটী প্রশ্ন করে, হিত না অহিত ?

চলতে চলতে ঐ সময় যুবকটি একবার সামনের দিকে দ্রৃষ্টি তুলে তাকাল ।

তা কী করে বলি, থট্‌রীড় তো জানা নেই !

থট্‌রীড় করতে তো বলিনি তোকে, বলেছি ভদ্রলোকের গেইট্‌ অর্থাৎ শাটো দেখে বলতে,—অর্থাৎ পা থেকে মাথা ।

কিরীটীর মুখের কথাটা শেষ হল না, হঠাতে কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল । সেই সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় উপরিষ্ঠ কিরীটীর পাশেই লাঠির মাথায় বসানো তার শোলার টুপিটা ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ল ও অস্ফুট একটা কাতর শব্দও কানে এল ।

ঘটনার আর্কিমিকতায় দ্রুজনেই চমকে উঠেছিলাম । জায়গাটায় হাওয়া ছিল কিন্তু হাওয়ার বেগ এত ছিল না যাতে করে সহসা অমন করে লাঠির মাথায় বসানো কিরীটীর টুপিটা উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়তে পারে ।

সামনের দিকে তাকিয়ে দোখ, মাত্র হাত ৮।১০ ব্যাবধানে একটু প্রবে হৈ যুবকটিকে কেন্দ্র করে আমাদের কথাবার্তা চলছিল, সে বাঁ হাতে তার নিজের ডান কাঁধটা চেপে মাটির উপরেই বসে পড়েছে । আর্মি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলাম যুবকটির দিকে । তার সামনে গিয়ে পেঁচবার আগেই যুবক উঠে দাঁড়িয়েছে, চোখে-মুখে তার সুস্পষ্ট একটা যন্ত্রণার চিহ্ন । যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে আর্মি প্রশ্ন করলাম, পড়ে গিয়ে হঠাতে কাঁধে লাগল বুঝি ? পড়ে গেলেন কি করে ?

আমার প্রশ্নে যুবকটি মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল । মুদ্রকণ্ঠে বললে, ঠিক বুঝতে পারলাম না । হঠাতে কাঁধে যেন একটা ধাক্কা লাগতে পড়ে গেলাম আচমকা । না, তেমন কিছু লাগেনি ।

হঠাতে ধাক্কা লাগল মানে ? বিস্মিত আর্মি প্রশ্ন করলাম ।

কিরীটী ইতিমধ্যে তার টুপিটা মাটি হতে কুড়িয়ে আমাদের কাছে এসে কখন দাঁড়িয়েছে টের পাইনি । সহসা অতি নিকটে তার কণ্ঠস্বর শুনে যুগপৎ আমরা দ্রুজনেই ফিরে তাকালাম ।

মনে হচ্ছে একটা বুলেট স্বীকৃত !

বুলেট ! সর্বিস্ময়ে কথাটা উচ্চারণ করে সপ্রশ্ন দ্রৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে ঘূরে তাকালাম ।

কিরীটী কিন্তু তখনও গভীর মনোযোগ সহকারে তার হস্তধ্বত টুপিটা ঘূরিয়ে দেখছে এবং দেখতে দেখতেই মুদ্র কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই—*it was a bullet and that blessed bullet pierced through and through my poor hat !*

এবং কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় হস্তধ্বত টুপিটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে আমার দ্রৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথাটা ? Well see—এই দেখ ।

তাকিয়ে দেখলাম কিরীটীর কথা মিথ্যা নয়, সত্য । টুপিটার দুই দিকে দুটি গোলাকার ছিদ্র ।

কিন্তু সর্বাশ্রে আপনাকে একবার দেখা দরকার । বলতে বলতে কিরীটী

আমাদের সম্ভূত দণ্ডায়মান ঘূরকটির দিকে অগ্রসর হয়। বুবতে অবশ্য পারছি আঘাতটা নিশ্চয়ই তেমন মারাত্মক হয়নি, তা হলেও আপনার কাঁধের ক্ষতস্থানটা একটিবার পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। জামাটা খুল্লন তো!

না না—বিশেষ কিছু হয়নি, ঘূরকটি কাঁধের উপর থেকে ততক্ষণে হাতটা সরিয়ে নিয়েছেন। স্মিতভাবে বললেন, ব্যস্ত হবেন না।

আপনি বলছেন কি—মানে—

আমার নাম শতদল বোস। না, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। মৃদু হাস্যতরল কঠে জবাবটা দিলেন মিঃ বোস। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় গায়ের গরম ওভার-কোটটা খুলে ফেলে দিলেন। কোটের নিচে সাদা টুইলের শার্ট ছিল। দেখা গেল মিঃ বোসের কথাই সত্য। গুলিটা তাঁর কাঁধ ছুঁয়ে গেলেও কোটের নীচে শার্ট পষ্টন্তও পেঁচাইয়নি। বোধ হয় সামান্য কাঁধের উপর দিয়ে ছুঁয়ে গেছে, ধার ধাক্কাতেই বেমক্কা তিনি টলে পড়ে গেছেন।

যাক, গে—না লেগে থাকলেই ভাল! But it was a bullet—এয়া খুব বেঁচে গেছেন যা হোক। কিরীটী স্বস্তির একটা নিখিল নিয়ে বলে।

মিঃ বোস আবার কথা বলেন, কিন্তু কিছুই আমি বুবতে পারছি না তো! আপনি বলছেন একটা বুলেট, কিন্তু কই, কোন ফায়ারিং-এর শব্দও শুনলাম না! তা ছাড়া এখানে আমাকে গুলিই বা করবে কে? এবং কেন?

কে আর করবে! করেছেন অবশ্য তিনিই যিনি হয়তো এ প্রথবীতে আপনার বেঁচে থাকাটা বাঞ্ছনীয় মনে করছেন না! তা ছাড়া ফায়ারিং-এর শব্দ বলছেন? সম্ভবের হাওয়া ও সী-বীচের স্নানার্থীদের একটানা হৈ-হঞ্জার মধ্যে ফায়ারিং-এর শব্দটা না শুনতে পাওয়াটাও বিশেষ কিছু আশ্চর্য নয়। তা ছাড়া পিস্তলে সাইলেন্সারও তো লাগানো থাকতে পারে। তাতেও আপনি ফায়ারিং-এর শব্দ শুনতে পাবেন না। কিন্তু কেউ না কেউ যে একটা গুলি ছুঁড়েছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। বলতে বলতে হঠাতে কথাটার মোড় ঘূরিয়ে কিরীটী অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, আপনিও আমাদের মতো স্বাস্থ্যাবেষী নার্কি মিঃ বোস? না এইখানেই থাকেন?

আজ্ঞে দুর্গোর একটাও নয়। মাস্থানেক হল বিশেষ একটা কাজে এখানে এসে আছি। ঐ দেখছেন যে দীক্ষণ দিকে পাহাড়ের ওপর বাঁড়িটা—ঐ বাঁড়িতেই আমি থাকি।

শতদলবাবুর কথা অনুসরণ করে দীক্ষণিদকে আমরা তাকালাম। সম্ভবের কোল ঘেঁষে একটা ছোট পাহাড়, তারই উপরে যেন ঐতিহাসিক দুর্গের মতো বাঁড়িটা দূর থেকে মনে হয়। দুর্গের মতো পাহাড়ের উপরের ঐ বাঁড়িটার প্রতি এখানে এসে পেঁচাইবার পর্যাননই প্রত্যায়ে কিরীটী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দূর হতে মনে হয় একখানা ছাঁবি। পাহাড়টা লোকালয় হতে আধ মাইলটাক দূর তো হবেই।

কিরীটী শতদলবাবুর কথায় দূর পাহাড়ের মাথায় দুর্গের মতো বাঁড়িটার দিকে তখনও তার্কিয়ে ছিল অন্যমনে। একসময় ঐ দিক হতে দ্রুত ফিরিয়ে শতদলের মুখের দিকে তার্কিয়ে বললে, অন্দুত জয়গায় বাঁড়িটা তৈরী করা হয়েছে! বাঁড়িটা যিনি তৈরী করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে দুটো কথা কেউ না

ବଲଲେଓ, ସ୍ଵତଃଇ ମନେ ହୟ—

କୀ ବଲୁନ ତୋ ? ସକୌତୁକେ ଶତଦଳ ପ୍ରଫଳ କରେ ।

ପ୍ରଥମତଃ, ଯିନିହି ବାଡ଼ିଟା ତୈରୀ କରେ ଥାକୁନ, ବିଶେଷ ଖେଳାଳୀ-ପ୍ରକୃତିର ଛିଲେନ ତିନି । ନ୍ଯିବିତୀଯତଃ, ତା'ର ଅର୍ଥେର ଅଭାବ ଛିଲ ନା—

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ! ସଂତ୍ୟ ତାଇ । ବାଡ଼ିଟା ଆମାର ଦାଦାମଶାଇଯେର । ଏକକାଳେ ପୂର୍ବ-
ବିଶେଷ ଶୁଣେଇ ଦେଇଲେ ମୁହଁରେ ସ୍ଵର୍ଗିତୀର୍ଣ୍ଣ ଜମିଦାରି ଛିଲ । ଯାର ଆୟ ଛିଲ ଶୁନେଇ ପ୍ରାୟ ବାଂସାରକ
ଲଙ୍ଘାଧିକ ଟାକା । ଆର ଦାଦାମଶାଇ ଲୋକଟିଓ ଛିଲେନ ନିଜେ ଏକଜନ ନାମକରା ଚିତ୍ତ
ଓ ଘଣ୍ଟିଲାପାଣୀ । ଶିଳପୀର ରଣଧୀର ଚୌଥୁରୀର ନାମ ଶୁନେଛେନ ନିଶ୍ଚଯ !

ନିଶ୍ଚଯଇ । ଶୁନେଇ ବୈକି । ଅତ ବଡ଼ ଶିଳପପ୍ରାତିଭା ନିଯେ ଆମାଦେର ଦେଶେ
ଥିବ କମ ଲୋକଇ ଜମେଛେନ । ଆପନି ତାରଇ ଦୋହିତ ?

ହ୍ୟା । ତା'ର ଏକମାତ୍ର ମେଯେର ଏକମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ । ତା'ର ବିରାଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଶେଷ ଓ
ଏକମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ତା'ର ଐ 'ନିରାଳା' ନାମକ ପାହାଡ଼େର ଓପରେ ବାଡ଼ିଖାନାର ଓୟାରିଶନ ।
ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟତରଳ କଟେ ଶତଦଳ ବଲଲେ ।

ଏକଜନ ଶିଳପୀର ଜୀବନେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ । ମୁଲ୍ଯେର ଦିକେ ଯାଚାଇ କରତେ
ଗେଲେ ହୟତେ ଆପନାକେ ହତାଶେଇ ହତେ ହବେ । କିନ୍ତୁ ସାଗରେର ଉପକ୍ଲେ ଐ
ପାହାଡ଼ରେ ଉପର ନଗରେର କୋଲାହଳ ହତେ ଦୂରେ ଅଗନ ଏକଥାନା ବାଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ସେ
ମହାମୂଳ୍ୟବାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ସ୍ମୃତିର ଇଞ୍ଜିଗତ ଓର ପ୍ରତିଟି ଗାଁଥୁରିନର ମଧ୍ୟେ ଓତୋପ୍ରୋତ
ହୟେ ଜାଗିତ ଆଛେ, ତାର ମୁଲ୍ୟ ନିଛକ ଶ୍ରେଫ କାଣ୍ଡନମୁଲ୍ୟେ ତୋ ଧାର୍ଵ କରା ଯାଇ ନା
ଶତଦଳବାବୁ । ବିଶେଷ ମୁଲ୍ୟେଇ ସେ ଓର ବିଶେଷତ୍ୱ ।

ଶତଦଳବାବୁ, କିରୀଟୀକେ ବାଧା ଦିଯେ କୀ ବଲତେ ଉଦୟତ ହତେ କିରୀଟୀ ବଲେ
ଓଠେ, ନା ନା ଶତଦଳବାବୁ, ଏ ସଂସାରେ ସବ କିଛିକେଇ ନିଛକ ଟାକାର ନିର୍ଣ୍ଣତେ ଓଜନ
କରବେନ ନା । ଏ ଶିଳପୀର ପ୍ରତିଭା—

ଆପନିଓ ହୟତେ ଆମାର ଦାଦର ମତଇ ଶିଳପ-ପାଗଳ, ତାଇ ଓଇ ନିର୍ଜନ
ମଧ୍ୟରେ ଉପକ୍ଲେ ଜନମାନବେର ବର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ିଯେ ପାହାଡ଼ରେ ଉପର ବାଡ଼ିଖାନା ଦୂର
ଥେବେ ଦେଖେଇ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚୟ 'ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ' ଆଭାସ ପାଚେନ । ଏବଂ ବାଡ଼ିଟାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ
କରଲେ ହୟତେ ଆରଓ କିଛି ଦେଖିତେ ପାବେନ । କାରଣ ବାଡ଼ି-ଭାର୍ତ୍ତ ସବ ନର-ନାରୀର
ଚଟ୍ୟାଚ୍ଛ ଏବଂ ଅଯେଲ ଓ ଓୟାଟାରକଳାର ପେଣ୍ଟିଂ, ଏ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛି ନେଇ । କିନ୍ତୁ
ଆମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁତାନ୍ତ୍ରକ ଲୋକ, ଅତି ସାଧାରଣ ଛାପୋୟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟ,
ଆମାର କାହେ ଓର କାହୀ-ଇ ବା ମୁଲ୍ୟ ବଲୁନ ! ଶତଦଳ ହାସତେ ହାସତେ ବଲେ ।

ମାନ୍ୟରେ ମନ ଏମନିହି ବିଚିତ୍ର ବଟେ ମିଃ ବୋସ, କିନ୍ତୁ ମନ ଆପନାର ଯତଇ ବସ୍ତୁ-
ତାନ୍ତ୍ରକ ହୋକ, ଆପାତତଃ କ୍ଷମା କରବେନ, ଏକଟା କଥା ଆପନାକେ ଆୟି କିନ୍ତୁ ନା
ବଲେ ପାରିବ ନା—ଆପନାର ପ୍ରାଣଟି ନେବାର ଜନ୍ୟ କେଉଁ-ନା-କେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍‌ଗ୍ରୀବ
ହୟେ ଉଠେଛେନ ।

ଏବାରଇ ହାସାଲେନ ମଶାଇ । ଆମାର ମତ ଏକଜନ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକେର
ପ୍ରାଣେର ଏଗନ କି ମୁଲ୍ୟ ଆଛେ ବଲୁନ ତୋ ସେ ସେଟି ନେବାର ଜନ୍ୟ କେଉଁ ଉଦ୍‌ଗ୍ରୀବ
ହୟେ ଉଠେବେ ! ନା ଆଛେ ଆମାର ଅଗାଧ ସମ୍ପର୍କ, ନା ଆଛେ ଏ ଦୂରନ୍ୟାଯ୍ୟ ଆମାର
କୋନ ଶତ୍ରୁ ।

ହତେ ପାରେ, ତବେ ଆମାର କଥାଯ ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ କରେନ ତାହଲେ ଜାନବେନ—
it was a pure and simple attempt on your life !

ସଂତ୍ୟ ନାକି ? ଆମାର କୋତୁଲଟା ମାପ କରବେନ, ଆପନାର ନାର୍ମଟ ଜାନତେ
ପାରି କି ?

কিরীটী রায়। মন্দুককষ্টে কিরীটী জবাব দেয়।

নমস্কার। আপনাই কি বিখ্যাত সেই রহস্যভেদী কিরীটী রায়?

বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে আরিই কিরীটী রায়। মন্দু হেসে কিরীটী জবাব দেয়।

আর উনি?

স্মৃত!

কৈ সৌভাগ্য, আপনার মত লোকের এখানে পদাপর্ণ হয়েছে অথচ জানতেও পারিনি! তা আস্ত্র না আজ আমার বাড়িতে। রাত্রির আহারপর্বতী গর্বীবের ঘরেই সারবেন—

বিলক্ষণ, সে একদিন হবেখন। তবে আজ নয়, কাল সকালের দিকে থাব, আপনার ঐ বাড়িটা দেখতে। কিরীটী জবাব দেয়।

আসবেন, নিশ্চয় আসবেন কিন্তু। শতদলবাবু অনুরোধ জানান দরদ দিয়ে।

থাব। কিন্তু আমার কথাটা মনে থাক যেন।

কি বলুন তো? শতদল সপ্তশন দৃঢ়িতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল আবার।

একটু সাবধানে থাকবেন। আপনার আততারীটীর নিশানা একবার ব্যথ হলেও, বার বার ব্যথ নাও হতে পারে।

সতীই কি আপনার তাই সন্দেহ নাকি কিরীটীবাবু, আমার জীবনের উপরেই কেউ attempt নিয়েছিল!

কোন ভুল নেই তাতে। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, একটু ভেবে বলুন তো—আজকের এই দুর্ঘটনার আগে আপনার অন্য কোন accident দুর্দশাদিনের মধ্যে হয়েছে কিনা?

Accident!

হাঁ, মনে কোনপ্রকার দুর্ঘটনা?

কই, এমন বিশেষ কোন ঘটনা তো আমার মনে পড়ছে না যাকে প্রাণহানিকর দুর্ঘটনার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

ভেবে দেখুন—

না মশাই। তবে—, কিন্তু তাকে দুর্ঘটনাই বা বলি কি করে এবং সেগুলো যে আমার জীবনের উপরেই attempt নেওয়া হয়েছে তাই বা—

কী ঘটেছিল বলুন তো?

এমন বিশেষ কিছুই নয়। এই তো পরশু রাত্রে যে ঘরে শুই—আমার ঠিক শিররের ধারে মাথার উপরে দেওয়ালের গায়ে মস্ত বড় একটা অয়েলপেন্টং টাঙানো ছিল, হঠাতে মাঝরাত্রে সেটা ছিঁড়ে আমার মাথার কাছেই পড়ে—অবশ্য অল্পের জন্যই আঘাত পাইনি—

হ্যাঁ। আর কোন ঘটনা ঘটেছে?

গতকাল সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের গায়ের ঢালু পথ বেয়ে নিচে নেমে আসছি, হঠাতে একটা বড় পাথরের চাঁই গড়াতে আর একটু হলে হয়তো আমার ঘাড়েই পড়ত এবং ঐ পাথরটা এসে গায়ে পড়লে একেবারে যে পিষে ফেলত তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে দুটো ব্যাপারই তো pure and simple accident! আমার জীবনের উপরে attempt বলি কী করে! আপনি না

বললে হয়তো মনেও পড়ত না, ভুলেই গিয়েছিলাম—

ভুলে যে ধাননি তার প্রমাণ আপনার ঘটনা দ্বাটির narration এবং আগের দ্বাটি যেমন আপনার জীবনের উপরে attempt হয়েছিল, আজও ঠিক তেমনি চেষ্টা হয়েছিল। তিনি-তিনির নিষ্ফল হয়েছে যখন, চতুর্থবারের প্রচেষ্টা হয়তো খুব শীঘ্রই হবে। সাবধান হবেন।

কিরীটীর চরিত্রের সঙ্গে আমি যতখানি পরিচিত অনেকেই তা নয় এবং বিশেষ করে সে যখন কোন সাবধান বাণী উচ্চারণ করে, তার গুরুত্ব যে কতখানি সেও আমার চাইতে বেশী কেউ জানে না। কিন্তু শতদলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, তিনি যেন কিরীটীর কথায় কোন গুরুত্বই আরোপ করতে পারছেন না। সামান্য দু-চারটে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বুঝেছিলাম, শতদলবাবু মানুষটি বেশ দিলখোলা ও সরল প্রকৃতির। সংসারের ক্টনীতি যেন তাঁকে কোনরূপে স্পষ্টই করতে পারে না।

শতদল হাসতে হাসতেই এবার প্রত্যুষের দিলেন, আপনি যখন অত করে বলছেন যিঃ রায়, চেষ্টা করব সাবধান হতে।

হ্যাঁ, করবেন। এবং শুধু বাইরেই নয়, বাড়ির মধ্যেও সাবধানে থাকবেন। বাড়ির মধ্যেও সাবধানে থাকব? কী বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!

এই ধরন, যে যারে আপনি রাখে শয়ন করেন সে ঘরটা ভাল করে দেখে-শুনে শোবেন।

কেন বলুন তো, রায়েও কেউ আমার শয়নঘরে চড়াও হয়ে আমার প্রাণ-হানি করবার চেষ্টা করবে নাকি?

ঘরের বাইরে ও ভিতরে যখন চেষ্টা হয়েছে, সেটা কিছু অসম্ভব নয়। সহসা এমন সময় কুড়ি-বাইশ বৎসরের অপরূপ সন্দর্ভী একটি তরুণী হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে শতদলবাবুকই সম্বোধন করে বললে, বাবাঃ, এতক্ষণে তোমার আসবার সময় হল? দোতলার বারান্দা থেকে তোমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসছি। স্টেশনে আসান কেন?

তরুণীর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে আমরা তিনজনেই আগন্তুক তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

এই তো সবে সকালেই আজ তোমার চিঠি পেয়েছি রাণু—তুমি কবে এসে পেঁচেছ?

কাল সকালের গাড়িতে—, রাণু জবাব দেয়, কিন্তু সত্য তুমি আজই আমার চিঠি পেয়েছ?

হ্যাঁ। কৌতুকজ্ঞবল দ্বিতীয়ে তাকায় শতদল রাণুর মুখের দিকে।

বিশ্বাস করি না। অভিমান-স্ফুরিত কণ্ঠে রাণু জবাব দেয়।

সে হবেখন। এসো আগে একদের সঙ্গে তোমার আলাপটা করিয়ে দিই রাণু। আশ্চর্য ভাবেই একদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল এইমাত্র। একে চেনো? বিখ্যাত রহস্যভেদী কিরীটী রায় আর ইনি স্বীকৃত রায়—

শতদলের কথায় রাণু আমাদের দিকে তাকাল। কিন্তু আমাদের পরিচয় পেয়ে যে সে বিশেষ কিছু আনন্দিত হয়েছে তেমন কোন কিছু তার মুখের চেহারায় বোঝা গেল না।

তথাপি সে হাত তুলে বোধ হয় একান্ত সৌজন্যের খাতিরেই আমাদের নমস্কার জানাল।

সহসা এমন সময়ে কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, চল, স্মরণ, সমন্দ্রের ধারে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

বলে কাউকে কেনোরূপ আর কোন কথার অবকাশ আশ্বিন না দিয়ে সমন্দ্র-সৈকতের দিকে এগিয়ে চলল। অগত্যা কতকটা যেন বাধ্য হয়েই তাকে আর্ম অনুসরণ করলাম।

কিরীটীর হঠাত এভাবে চলে আসাটা কেমন যেন আকস্মিক ও বিসদৃশ বলেই আমার কাছে ঘুন হল।

কিন্তু কিরীটী বেশী দ্রু অগ্রসর না হয়েই সামনেই জলের একেবারে কোল ঘেঁষে বালুর উপরেই একটা জায়গায় হঠাত বসে পড়ল। আর্মও পাশে বসলাম।

কিছুক্ষণ দ্রজনেই চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। বুরলাম, কোন একটা বিশেষ চিন্তা আপাততঃ কিরীটীর মাথার মধ্যে ফেরিয়ে চলেছে।

জিঞ্চাসা করলাম, কি ভাবিছিস কিরীটী?

কিরীটী আনমনে সমন্দ্রের দিকেই তাকিয়ে ছিল। সেই দিকেই তাকিয়ে সে বলল, পর পর দুটি আৰ্বির্ভাৰ। বুলেট ও নারী—সন্দৰ্বলী তরুণী!

কিরীটীর কঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে তার মুখের দিকে না তাকিয়ে আর্ম পারলাম না।

॥ ২ ॥

কিরীটী কিছুক্ষণ আবার সমন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

হঠাত আবার কতকটা যেন খাপছাড়া ভাবেই কিরীটী বলে উঠল, এমন সন্দৰ্বল প্রথিবী অথচ মানুষগুলোর কি বিচিত্র স্বভাব! শান্তির মধ্যে নিশ্চয়তার মধ্যে যেন ওরা কিছুতেই দিন কাটাতে চায় না!

ম্দু হেসে বললাম, কেন, তোর আবার শান্তির অভাব ঘটল কিসে?

এখনো বলছিল অভাব হল কিসে? এর পরও শান্তিতে থাকতে পারব বলে মনে কৰিস? দুর্ঘটনাটা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে স্থির করেছিলাম ওদিকে চোখ দেব না কিন্তু শতদল আৱ রাগদ,—নাঃ, কিছুতেই যোগে মিলছে না। কিন্তু তারও আগে সৰ্বাগ্রে আমাকে একটিবাৰ ঐ নিজৰ্ণ সাগৰকলে পাহাড়ের উপরে ‘নিরালা’ নামক বাড়িখানি দেখতে হচ্ছে—

তোর কি তাহলে ধারণা যে, ঐ বাড়িটার সঙ্গেই কোন রহস্য জড়িয়ে আছে কিরীটী?

নিশ্চয়ই, নচেৎ এমন অকস্মাৎ বুলেটের আৰ্বির্ভাৰ ঘটিবে কেন?

কিন্তু একটা কথা তোকে না বলে পারছি না। বুলেটটা যেন বুরলাম, কিন্তু রিভলবারের—

কথাটা আমায় কিরীটী শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠে, আওয়াজটা শব্দতে পার্সান, এই তো? কিন্তু বললাম তো—

কিন্তু—

ରିଭଲବାରେ ସଙ୍ଗେ ସାଇଲେମ୍‌ପାର ଫିଟ କରା ଛିଲ ।

କିନ୍ତୁ ଗୁଲିଟା ଏଲ କୋନ୍ ଦିକ୍ ଥେକେ ?

ପୂର୍ବ ଦିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଗରେ ଦିକ୍ ଥେକେଇ ଏସେହେ ବଲେ ଆମାର ମନେ ହୁଏ ।

ଏସମୟ ସେଇ ଦିକେ ଅତ ଲୋକଜନ ଛିଲ ।

ସେଠା ତୋ ଆରୋ ଚମ୍ବକାର କେମୋଫ୍ରାଜ—ଶତଦଲବାବୁର ଦିକ୍ ଥେକେ ସାମାନ୍ୟ ଏକଟ୍ରିକ୍‌ଶରୀରର ଜନ୍ୟ ଆମି ଅନ୍ୟମନ୍ଦର ହେଯେ ପଡ଼େଛିଲାମ ସ୍ଵର୍ଗତ, ତୋର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲତେ ବଲତେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇ ମୃହିତିଟିତେ ବ୍ୟାପାରଟା ସଟେ ଗେଲ, ନଚେ ଆମାର ଦୃଷ୍ଟିକେ ମେ ଏଡାତେ ପାରିବ ନା ।

ସହସା ଏକଟା ଆନନ୍ଦ-ମିଶ୍ରିତ ହାସିର ଶବ୍ଦେ ଚମକେ ଫିରେ ତାକାଳାମ । ଆମ ହାତ-ଆଟ-ଦଶ ଦୂରେ ସମ୍ବନ୍ଧେର ଧାର ଦିଯେ ଶତଦଲ ଓ ରାଗ୍ ପାଶାପାଶ ହେଟେ ଚଲେଛେ । ଏବଂ ରାଗ୍ ଓ ଶତଦଲ ଦୂରନେଇ ଖୁବ ହାସିଛେ ।

ଚମ୍ବକାର ମାନିଯେଛେ କିନ୍ତୁ ଓଦେର ଦୂରନକେ କିରାଟୀ ! ଚେଯେ ଦେଖ, a nice pair !

ଆମ ଓଦେର ସମ୍ପକ୍ତେ ବିଶେଷ କରେ ବଲା ସତ୍ତ୍ଵେ କିରାଟୀ ଫିରେ ତାକାଳ ନା, କେବଳ ମୃହିତେ ବଲଲେ, ନିର୍ଜନ ସାଗରକୁଲେ ପାହାଡ଼େ ଉପରେ ଏକ ଦୁର୍ଗ ଗଡ଼େ ତୁଳେଛିଲ ଏକ ଆପନଭୋଲା ଶିଳପୀ । ଦିନେର ପର ଦିନ, ରାତର ପର ରାତ ସେଇ ଦୁର୍ଗେର ମଧ୍ୟ ଶିଳପୀ ବସେ ବସେ କଥନେ ଆକତ ଛାବି, କଥନେ ଗଡ଼ି ମୃତ୍ତିର୍, କିନ୍ତୁ ତାର ଚାଇତେ ବଡ଼ କଥା—ଆମାଦେର ଦେଶେ ସେ ଏକଟା ପ୍ରବାଦ ଆଛେ, ଯରା ହାତିର ଦାମଓ ଲାଖ ଟାକା—ସିଦ୍ଧ ସେଇ ଦିକ୍ ଦିଯେ ଭାବା ଘାସ, ତାହଲେ କୀ ଦାଁଡ଼ାସ ବଳ ?

କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସରାଧିକାରୀ ଶତଦଲବାବୁଇ ତୋ ଏକଟ୍ର ଆଗେ ବଲେ ଗେଲେନ, ଅବଶ୍ଯଟ ଏଥିନ ଆମ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱାନ୍ତିର୍ । ସମ୍ପକ୍ତିର ଆର କିଛି, ଅବଶ୍ଯଟ ନେଇ—

ତାରଇ ଦାମ ଲାଖ ଟାକା । ଚଲ, ଓଠା ଘାକ । ହୋଟେଲେ ଗିଯେ ଆପାତତଃ ତୋ ଏକ କାପ ଗରମ ଚା ସେବନ କରା ଘାକ । ବଲତେ ବଲତେ କିରାଟୀ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଳ ଏବଂ ହୋଟେଲେର ଦିକେ ଚଲତେ ଶୁରୁ କରଲ । ଆମ ତାକେ ଅନୁସରଣ କରଲାମ ।

ସମ୍ପକ୍ତଟା ଶିବପ୍ରହର କିରାଟୀ ହୋଟେଲେର ସାମନେର ବାରାନ୍ଦାଯ ଏକଟା ଇରିଜେସ୍‌ଯାରେ ଉପରେ ହେଲାନ ଦିଯେ ଏକଟା ମୋଟାମତ ବାଂଲା ଉପନ୍ୟାସ ନିର୍ମେଇ କାଟିଯେ ଦିଲ ।

ସକାଳେର ବ୍ୟାପାରେ ତାକେ ବିଶେଷଭାବେ ସେ ଏକଟ୍ର ଉତ୍ସେଜିତ ବଲେ ମନେ ହେଯେ-ଛିଲ, ସେ ଉତ୍ୱେଜନାର ସେନ ଏଥିନ ଅବଶ୍ଯକତାମାତ୍ରାତ୍ମାତ୍ମା ନେଇ । ତାର ହାବଭାବ ଦେଖେ ମନେ ହୁଏ ବ୍ୟାପାରଟା ସେନ ସେ ଈତମଧ୍ୟେଇ ଏକେବାରେ ଭୁଲେଇ ଗିଯେଛେ । ମନେର ମଧ୍ୟେ ତାର କୋନ ଚିହ୍ନାତ୍ମା ନେଇ ।

ବାଇରେ ଶୀତେର ରୌନ୍‌ରୌନ୍ ଇତିମଧ୍ୟେଇ ଝିମିଯେ ଏସେହେ । ନିଭନ୍ତ ଦିନେର ଆଲୋଯ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେନ ରୂପ ବଦିଲେଯେଛେ । ବିଷଳ କ୍ରାନ୍ତିତେ ସମ୍ବନ୍ଧେର ନୀଳ ରଙ୍ଗ କାଳୋ ରୂପ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ନିଚ୍ଛେ ସେନ । ଏ ବେଳା ଆର ସନାନାଥୀଦେର କୋନ ଭିଡ଼ ନେଇ । ତବୁ ବାଯସେବନକାରୀଦେର ଚଲାଚଲ ଶୁରୁ ହେଯେଛେ ।

ହୋଟେଲେର ଭୂତ୍ୟ ଶିବଦାସ ଚାରେ ଟିଟେ କରେ ଚା ଓ କିଛି କେକ ବିକ୍ଷୁଟ ରୂଟି ଜ୍ୟାମ ସାମନେର ଟାର୍ଟିବଲେର ଓପରେ ଏନେ ନାମିଯେ ରୋଖେ ଚାରେର କାପଟା ଏଗିଯେ ଦିତେ ଦିତେ ବଲଲାମ, ଚା !

କିରାଟୀ ହାତେର ବୀଟା ମୁଢ଼େ କୋଳେର ଉପର ନାମିଯେ ରୋଖେ ଚାରେର କାପଟା ହାତେ ତୁଲେ ନିଲ । ଉକ୍ତ ଚାରେର କାପେ ଚମ୍ବକ ଦିତେ ଦିତେ ବଲଲେ, ତୋର ସଙ୍ଗେ

টর্ট' আছে না সুন্দরত ?

আছে ।

কেডস্ জুতো আছে ?

না, তবে আমার ক্লেপ-সোলের জুতো—

ওতেই হবে ।

কোথাও বের হবি নাকি ?

হ্যাঁ, 'নিরালা' দর্শনে যাব ।

আধ দ্বিতীয় ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে দ্বিতীয়ে 'নিরালার' দিকে অগ্রসর হলাম ।
সূর্যাস্তের পূর্বে ওখানে আমাদের পেশেইতে হবে । কিরীটী বলল ।

তা আর পারা যাবে না কেন ?

ক্রমে লোকালয় ছেড়ে সমন্বয়ের কোল ঘৰে অপশঙ্গ একটা পায়ে-চলা পথ
ধরে আমরা দ্বিতীয়ে এগিয়ে চললাম । সমন্বয় যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ।
টের পাছে সমন্বয়ের পাড় যেন ক্রমে সমন্বয় থেকে উচ্চ হয়ে চলেছে । সমন্বয়ের
গর্জমান ঢেউগুলো পাড়ের গায়ে এসে ধৰা দিয়ে ভেঙে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে ।
এ জায়গাটোয় সমন্বয়ের পাড়টা বড় বড় পাথর দিয়ে বাঁধানো । মধ্যে মধ্যে বড়
বড় এক-একটা ঢেউ বাঁধানো পাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলকণার ফ্লুবুর্বুরি
ছাঁড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে । বিকেল থেকেই হাওয়াটাও ঘেন বেড়েছে ।

ক্রমে খাড়াই পথ ধরে আমরা উপরের দিকে উঠাই । চমৎকার বাঁধানো
পথ । সূর্য ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে অনেকটা নেমে এসেছে পশ্চিম দিগ্বলয়ে ।

তিন-চারশো ফুটের বেশী পাহাড়টা উচ্চ হবে না ।

ক্রমে যত উপরের দিকে উঠাই, ডান দিকে সমন্বয় আরো স্পষ্ট ও অবারিত
হয়ে ওঠে । ভারি চমৎকার দ্রশ্যটি ।

এখন জায়গায় শিল্পী না হলে কেউ এত খুরচ করে বাঢ়ি করে !

কিরীটীর কথায় সায় না দিয়ে আর্ম পারলাম না, যা বলেছিস । সোকটা
সত্তাই শিল্প-পাগল ছিল ।

আরো কিছুদ্বিতীয়ের উপরের দিকে উঠাই একটা সোহার গেট দেখতে পেলাম ।
এবং গেটের সামনে দাঁড়াতেই বাড়িটার সামনের দিকটা সুস্পষ্ট হয়ে চোখের
উপর ভেসে উঠল ।

মৃ঳ল ঘৃণের স্থাপত্যশিল্পের পরিপূর্ণ একটি নির্দশন যেন বাড়িখানি ।
শিল্প বাড়িটা, চারাদিকে চারাটি গোলাকার গম্বুজ । গম্বুজের গায়ে বৌশ
হয় নানা রঙের পেটেট ষেটন বসানো, অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি সেই পাথর-
গুলোর ওপরে প্রতিফলিত হয়ে যেন মরকতমণির মতো জুলাই ।

বাড়িটার সামনেই একটা নানাজাতীয় ফুল-ফুলের বাগান । গেট বন্ধ ছিল,
এক পাশের থামে শ্বেত-পাথরের প্লেটে সোনালী অক্ষয়ে বাংলায় লেখা :
নিরালা ।

গেট ঠেলে দ্বিতীয়ে ভিতরের কম্পাউন্ডে প্রবেশ করলাম । হাত-চারেক
চওড়া লাল সুরকি ঢালা পথ বরাবর বাড়ির সদর দরজার সামনে গিয়ে
শেষ হয়েছে । এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দ্বিতীয়ে সামনের দিকে এগিয়ে
চললাম ।

দোতলার ও একতলার সব জানালাগুলোই দেখিহ ভিতর থেকে বন্ধ ।

আবামারি রাস্তা এগিয়েছি, হঠাতে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে পাশের দফকে তাকালাম। একবাড়ি গোলাপগাছের সামনে হাতে একটা ধূরূপ নিয়ে কঙজন প্রোট দাঁড়িয়ে।

কাকে চান?

দেখলাম লোকটা বেশ রৌদ্রিমত ঢাঙ্গ। এবং একটু কুঁজো হয়েই যেন ফাঁড়িয়ে আছে। পরিধানে একটা ধূতি ও গায়ে একটা গরম গেঁজ। গেঁজির তাতা দৃঢ়ো গোটানো এবং দৃঢ়ই হাতেই কাদাঘাটি লেগে আছে। বুরুলাম প্রোট গানের গোলাপ গাছগুলোর সংস্কার করছিল।

প্রোটের মাথার চূলগুলো সবই প্রায় পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। কপালের উপর বলিয়েখাগুলো বয়সের ইতিগত দিলেও দেহের মধ্যে যেন একটা বলিষ্ঠ কর্ষপট্টা দেহের সমগ্র পেশীতে পেশীতে স্কুল্পট ও সজাগ হয়ে আছে। দেখলেই বোৱা যায়, এককালে ভদ্রলোক শরীরে ব্যথেষ্ট শক্তি তো ধরতেনই, এখনও অবশিষ্ট যা আছে তাও নেহাত কম নয়।

দেহের ও মুখের রঙ অনেকটা তামাটে। রৌদ্র-জলে পোড়-খাওয়া দেহ। হাতের আঙুলগুলো কী মোটা মোটা ও লম্বা!

ভদ্রলোকের প্রশ্নে এবার কিরীটী জবাব দিল, শতদলবাবু আছেন?

শতদল! সে তো এমন সময় কখনো বাঁড়িতে থাকে না। গোটাচারেকের সময় বের হয়ে যায়।

ফেরেন কখন?

তা রাতে ক্লাব থেকে ফিরতে রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটা হয়।

এখানকার ক্লাব বলতে 'সাগর-স্কেক্ট' হোটেলেরই নিচের একটা ঘরে নাচ-গান তাস দাবাখেলা ও ড্রিশ্কের ব্যবস্থা আছে, সেটাই এখানকার ক্লাব। এখানকার স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সেইখানেই প্রতিদিন সম্ম্যায় এসে মিলিত হন। এবং রাত দশটা পর্যন্ত আনন্দ চলে সেখানে।

আমি শতদ্রু জানতাম, শতদলবাবু এখানে একাই থাকেন! কিরীটী প্রোটকে আবার প্রশ্ন করে।

শতদল তো মাত্র মাসখানেক হল এসেছে। আমি আমার স্ত্রী ও আমার মালী রঘুনাথ আছে।

ওঃ, তা আপনি শতদলবাবু—

রঞ্জনীর আমার সম্পর্কে শ্যালক হত।

ওঃ, রঞ্জনীরবাবুর আপনি তাহলে ভগ্নীপতি হন?

হ্যাঁ।

চমৎকার জায়গায় বাঁড়িটি কিন্তু,—, কতকটা যেন তোয়ামোদের কল্পেই কথাটা উচ্চারণ করে কিরীটী।

আর মশাই চমৎকার জায়গা! নেহাত আটকা পড়ে গিয়েছি, নইলে এমন জায়গায় মানুষ থাকে? আধ মাইলের মধ্যে জন-অর্নার্ন্যা পর্যন্ত একটা নেই। রাতৰিয়েতে ডাকাত পড়লে চেঁচিয়েও কারো সংশ্লা পাবার উপায় নেই।

কিরীটী হাসতে হাসতে জবাব দেয়, বাইরে থেকে যেভাবে বাঁড়ি তৈরী দেখেছি তাতে ডাকাত পড়লেও বিশেষ তেমন কিছু একটা স্বীক্ষা করতে পারবে মনে তো মনে হয় না—

এমন সময় সুর্যিণি মেয়েলী গলায় আহবান শোনা গেল, বাবা গো বাবা !
এত করে তোমাকে ডাকছি, তা কি শুনতে পাও না ? শুনিকে চা যে জুড়িয়ে
জল হয়ে গেল !

চেয়ে দেখি একটি উনিশ-কুড়ি বৎসরের শ্যামবর্ণ একহারা চেহারার মেয়ে
আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

মেয়েটির পরিধানে চৰৎকার একটি নৈলাম্বরী শার্ডি, কলকাতার কলেজের
মেয়েদের মত স্টাইল করে পরা, গায়ে সাদা রাউজ।

মেয়েটি ততক্ষণে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কখন আবার তুই ডাকলি আমায় সীতা ! মেয়েটির বাপ জবাব দেন।

রোগা একহারা চেহারা হলে কী হয় এবং গায়ের রঙ শ্যাম হলেও অপরূপ
একটা লাবণ্য ঘেন মেয়েটির সর্বদেহে। সর্বাপেক্ষা মেয়েটির মৃথখানির ঘেন
তুলনা হয় না—চোখে-মুখে একটা তৌক্ষ্য বৃন্ধির ছাপ রয়েছে।

মেয়েটির দেহের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ তার পর্যাপ্ত ঝুঁগিত কেশ। বর্মীদের
ধরনে মাথার উপরে প্যাগোড়ার আকারে বাঁধা। হাতে একগাছি করে কাচের
চৰ্দি।

এইটাই আমার মেয়ে সীতা। হ্যাঁ, ভাল কথা—আপনাদের নাম তো জানা
হল না ! আমার নাম হরবিলাস ঘোষ। হরবিলাস নিজের পরিচয় দিলেন।

পরিচয়টা দিলাম এবারে আমিহই, আমার নাম সুরুত রাখ, আর ইনি হচ্ছেন
কিরীটী রায়।

আবার একদফা নমস্কারের আদান-প্রদান হল।

আসুন না কিরীটীবাবু, শতদলের কাছে এসেছেন, সে যখন বাড়িতে নেই
আমার আতিথেয়েতাটুকু না হয় গ্রহণ করল, এক কাপ করে চা—আপাত্তি আছে
নাকি কিছু ? কথাগুলো বলে হরবিলাস একবার কিরীটী ও একবার আমার
মুখের দিকে তাকালেন।

আমি একটু ইতস্তত করছিলাম, কিন্তু কিরীটী স্বিধামাত্র না করে বললে,
সানন্দে। বিশেষ করে চা যখন। কিন্তু সীতা দেবী, আপনার আপাত্তি নেই
তো ? কথাটা শেষ করল কিরীটী সীতার মুখের দিকেই তাকিয়ে।

আপাত্তি ! বা রে, আপাত্তি হবে কেন ? আসুন না—

হ্যাঁ, চলুন। এই পাঞ্জব-বর্জিত বাড়িতে লোকের মৃখ দেখবার্রও তো
উপায় নেই। তাছাড়া আমার স্তৰীও আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে স্থৰ্থী হবেন।
রোগী মানুষ, কোথাও তো বের হতে পারেন না।

রোগী ! কিরীটী সর্বসময়ে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, আজ দু বছর ধরে নিম্ন-অঙ্গের পক্ষাঘাতে ভুগছেন। তাঁর জনেই
তো এখানে আসা আমার শ্যালকের অন্তরোধে।

ইতিমধ্যে সম্ম্যার অব্ধকার প্রকৃতির বুকে ঘন হয়ে এসেছে। দ্বারে সম্ম্যার
অস্পষ্ট আলোয় মনে হয়, সমুদ্রের জলে কে ঘেন একরাশ কালো কালি চেলে
দিয়েছে, কেবল মধ্যে মধ্যে ঢেউয়ের চৰ্ডায় শুন্দি ফেনাগুলো কোন ক্ষুধিত করাল
দানবের হিংস্র দণ্ডপাতির মত বিকিয়ে উঠছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে চাপা
ক্ষুধ গজ্জন একটানা ছেদহীন।

প্রকাণ্ড দুরজা পার হয়ে আমরা সকলে বাড়ির মধ্যে এসে প্রবেশ
করলাম।

সামনেই একটা বারান্দা এবং বারান্দা অতিক্রম করে একটা সুসজ্জিত হলঘর, সেটা পার হয়ে মাঝারি গোছের একটা আলোকিত কক্ষমধ্যে এসে আমরা প্রবেশ করলাম।

ঘরে সিলিং থেকে একটা বাতি ঝুলছে। সেই আলোর প্রথমেই নজরে পড়ে ঘরের ঠিক মধ্যখানে একটা টেবিলের পাশে একটা ইনভালিড চেয়ারের উপরে বসে একজন স্থূলাঙ্গী মধ্যবয়সী মহিলা উল ও কাঁটার সাহায্যে কী যেন একটা বুনে চলেছেন অত্যন্ত ক্ষিপ্র হস্তে।

ভদ্রমহিলা আমাদের পদশব্দে মৃদু তুলে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু হাত দৃঢ়ি যেন মেশিনের মতই অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে বয়নকার্য চালিয়ে যেতে লাগল।

সিলিং থেকে ঝুলত আলোর স্বচ্ছ রশ্মি যা সেই উপরিভাগ ভদ্রমহিলার মুখের উপরে এসে পড়েছিল তাতেই তাঁর মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পাথরের মত ভাবলেশহীন এমন মৃদু ইতিপূর্বে খুব কমই যেন চোখে পড়েছে। আর তাঁর দৃঢ়িট ক্ষুর স্থিত দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমাদের অন্তস্তল পর্যন্ত ভেদ করে চলে যাচ্ছে। আমাদের চোখে-মুখে এসে যেন বিধ্বে। মুখের একটি রেখারও এতটুকু পরিবর্তন দেখা গেল না।

আড়চোখে একবার কিরীটীর দিকে না তাঁকয়ে পারলাম না, কিন্তু কিরীটীর চোখে-মুখে কোন কিছুরই সন্ধান পেলাম না।

হিরণ দেখ, এ'রা আজ আমাদের গৃহে সান্ধ্য-অর্তিথ। সুরুতবাব, কিরীটীবাব—এই আমার স্ত্রী হিরণ্যরী—হরিবলাস শেষের কথাগুলো আমাদের উভয়ের দিকে ফিরে তাঁকয়ে শেষ করলেন।

আসুন। বসুন। কী সৌভাগ্য আমাদের! হিরণ্যরী আমাদের নিষ্প্রাণ কষ্টে যেন আহবান জানালেন। আমরা উভয়ে পাশাপাশি দৃঢ়ি চেয়ার টেনে নিল্লে বসলাম।

আশ্চর্য একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম, ঘরের সব কিট জানলাই বন্ধ। একটা চাপা গুমোট ভাব যেন সমস্ত ঘরটার মধ্যে থমথম করছে। বৃক্তা কেমন চেপে ধরছে।

সাঞ্জন টেবিলটার ওপরে সুস্ক্রু সুচের এম্ব্ৰয়ডারি করা একটি টেবিল-কুঠ বিছানো, তার উপরে সঁজ্জিত চায়ের সাজসরঞ্জাম। ঘরের মধ্যে আসবাব-গুলি সামান্য যা আছে তাও একলত পরিপাটিভাবে যেখানকার যেটি ঠিক হওয়া উচিত রুটিচসম্মতভাবে সাজানো। তথাপি মনে হচ্ছিল, সব কিছুর মধ্যে একটা সবুজ সুচারু পরিচ্ছন্নতা থাকলেও কিসের যেন একটা অভাব আছে। সবই আছে অথচ কী যেন নেই! কোথায় যেন ছন্দপতন হয়েছে!

সত্যিই সৌভাগ্য আমাদের কিরীটীবাব, আপনাকে আজ আমার ঘরে অর্তিথ পেয়ে। হিরণ্যরী দেবী কিরীটীকে লক্ষ্য করেই কথাটা উচ্চারণ করলেন, আপনাকে ইতিপূর্বে আমার দেখবার সৌভাগ্য না হলেও আপনার নাম আমি শুনেছি।

কিরীটীর ওষ্ঠপ্রাণেতে মৃদু একটা হাসির আভাস যেন বঙ্গিম রেখায় জেগে উঠেই ঘুলিয়ে যায়।

তা ছাড়া—, হিরণ্যরী দেবী আবার বলতে শুরু করেন, আজ দেড় বৎসরের মধ্যে এমন জায়গায় পড়ে আছি যে কারও সঙ্গে বড় একটা দেখাই হয় না, তাই

কেউ এলে মনে হয় যেন বন্ধ এই ঘরটার মধ্যে একটা খোলা হাওয়ার বলক বয়ে গেল। উঃ, এই ঘরট এবং পাশের ছোট একটা ঘর—এরই এই সংকীর্ণতার মধ্যে এই দীর্ঘ দেড় বছরের রাত্তি দিন দৃপ্তিরগুলো কীভাবে যে কাটাচ্ছ তা আমি জানি। একটা ক্লান্ত অবস্থাতা যেন হিরণ্যবীর কঠিনের মৃত্যু হয়ে ওঠে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন তাঁর বুকখানা কাঁপিয়ে বের হয়ে আসে।

হরবিলাস কন্যাকে তাড়া দিলেন, কই রে সীতা, এঁদের চা দে!

সীতা ইতিমধ্যে চায়ের কাপগুলো সাজিয়ে দুধ দিয়ে চা ঢালতে শুরু করেছিল। আমার দিকে তাঁকয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের কে কয় চামচ করে চিনি নেন চায়ে?

আমি বললাগ, আমাকে ছোট চামচের এক চামচ দেবেন, আর ওকে দেড় চামচ দেবেন।

সীতা আমাদের দিকে চা ও প্লেটে কিছু কেক এঁগিয়ে দিল।

চা-টা নিতে নিতে বললাগ, ও প্লেটটা সরিয়ে রাখন সীতা দেবী—বিকেলে হোটেল থেকে বের হবার প্লেটেই একপেট থেয়ে এসেছি।

তা হোক, তা হোক, একটু থেরে দেখুন—বাজারের জিনিস নয়, আমার স্তৰীরই নিজের হাতের তৈরী। হরবিলাস বলে উঠলেন।

কিন্তু পেটে যে একেবারে জায়গা নেই হরবিলাসবাবু! কিরীটী হাসতে হাসতে বলে।

আরে মশাই, এক পীস কেক আর থেতে পারবেন না? বললে হয়তো বলবেন লোকটা তার নিজের স্তৰীর প্রশংসা করছে, কিন্তু তা নয়, উন্নতিশ বছর ধর করছ তো, অমন রাজ্য মশাই কোথাও খেলাগ না! আসবেন একদিন, এখানে দৃপ্তির আহার করবেন।

না না, উনি রোগী মানুষ—কিরীটী প্রতিবাদ জানায়।

তাতেও কি উনি নিশ্চিল থাকেন! ঐ invalid' চেয়ারে বসে বসেই রোজ দৃবেলা রাজ্যের যাবতীয় সব করেন।

সাত্য আশ্চর্য তো! আমি বলি, কষ্ট হয় না আপনার?

বরং এমনি করে সারাটা দিন চেয়ারের উপর নিষ্কৃত হয়ে বসে থাকাটাই আমার দৃশ্য লাগে। তাই যত পারি নিজেকে engaged হোৰে দেহের এই অভিশাপটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করি। তাছাড়া দেখুন, এমন জায়গায় পড়ে আছি, একটা লোকজনের মৃত্যু পর্যন্ত দেখবার উপায় নেই। তাই তো ওকে বলি, যে ভাই এত আদর করে এখানে নিয়ে এল আমায়, সেই যথন চলে গেল—আর কেন, চল অন্য কোথাও চলে যাই। দেহটা অকর্ম্য হয়ে গিয়েছে বলে বেশী দিন এক জায়গায় থাকতেও ভাল লাগে না।

ঘরের মধ্যে অত্যন্ত গরম বোধ হচ্ছিল। শীতকাল হলেও কপালে বিল্ড, বিল্ড, ঘাম দেখা দেয়। কিরীটীরও বোধ হয় গরম লাগছিল ঘরের মধ্যে। সেই বলে উঠল, ঘরটার মধ্যে বেশ গরম মনে হচ্ছে যেন—

ওঃ, সীতাই তো, আমারই ভুল হয়ে গিয়েছে। সীতা, দাও তো মা দর্শকগের জানালাটা খুলে। এ বাড়তে এত বেশী হাওয়া যে বিরক্ত ধরে যায়, তাই বেশীর ভাগ সময় জানালাগুলো এঁটে রাখি—

না না, থাক না, তেমন কিছু বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। কিরীটী প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে। সীতা কিন্তু ততক্ষণে মাঝের আদেশে এঁগিয়ে

গিয়ে ঘরের একটা জানালা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সমন্বয়ক্ষ থেকে একবালক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঝুঝুক করে বয়ে এল সমন্বয়ের নোনা স্বাদ নিয়ে। সেই সঙ্গে এল অদূরাগত সমন্বয়ের শব্দকল্পনা। বাইরের দূর্বলত খ্যাপা সমন্বয়ের স্পর্শ যেন সমস্ত ঘরটার মধ্যকার পর্যাপ্তি বর্ণ আবহাওয়াটাকে মুক্ত করে এসে একটা মুক্তির স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে গেল।

দেখলাম জানালাটা খুলে সীতা আর ফিরে এল না, খোলা জানালার গরাদ ধরেই দাঁড়িয়ে রইল ঘরের দিকে পিছন ফিরে। বাইরের রহস্যময় সমন্বয়ের মত সীতার দেহটাও যেন একটা রহস্যে পরিণত হয়েছে।

এখানে বৃষ্টি বেড়াতে এসেছেন মিঃ রায়? হিরণ্যরী আবার প্রশ্ন করলেন কিরীটীকেই লক্ষ্য করে।

হ্যাঁ। সী-সাইডটা এখানকার ভারী চমৎকার!

শতদলের সঙ্গে আপনার আগেই বৃষ্টি আলাপ ছিল?

না। আজই সকালে সবে আলাপ হয়েছে।

ওঃ, সবে আজই আলাপ হয়েছে?

হ্যাঁ।

আপনারা আসবেন সে কি জানত না? আবার প্রশ্ন করলেন হিরণ্যরী দেবী!

না। ভেবেছিলাম একটা surprise visit দেব।

সহসা এমন সময় বাইরের অন্ধকার ভেদ করে সমন্বয়ের একটানা গর্জনকে ছাঁপয়ে ক্রুদ্ধ একটা জন্মুর চিৎকার কানে ভেসে এল। বাইরের অন্ধকার যেন সহসা একটা আর্তনাদ করে উঠলো। চমকে হিরণ্যরী দেবীর মুখের দিকে তাকাতেই প্রিতীয়বার আবার সেই ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল, এবারে বৃষ্টিলাম কোনো বড় জাতীয় বিলেতী কুকুরের ডাক সেটা।

ইঠাঁ সীতা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুতপদে কক্ষ হতে বের হয়ে গেল।

কুকুরটার গম্ভীর ডাকটা বাইরের অন্ধকারকে যেন ফালি ফালি করে দিচ্ছে।

॥ ৩ ॥

হিরণ্যরী দেবীই প্রথমে কথা বললেন, সীতার কুকুর টাইগারটা অগ্ন করে চেঁচাচ্ছে কেন?

কিরীটী ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। হরবিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, আজ এবার তাহলে আমরা উঠিং মিঃ ঘোষ!

উঠবেন? এখনি উঠবেন? হিরণ্যরী দেবী প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, রাত হয়ে গেল। আবার কাল-পরশ্ব আসব। শতদলবাবুকে তাহলে বলবেন আমরা এসেছিলাম।

বলব, দেখা হলে বলব। হরবিলাস জবাব দিলেন।

কেন, আপনাদের সঙ্গে কি দেখা-সাক্ষাত হয় না? এক বাড়িতেই তো—

এক বাড়ি হলে কি হয়? বাইরের মহলের সঙ্গে ভিতরের মহলের কোন যোগাযোগ নেই, সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা থাকি বাইরের মহলে, তাই বড় একটা দেখা-সাক্ষাত হয় না। জবাব দিলেন হিরণ্যরী দেবী।

হৰিবলাসই আমাদের দোরগোড়া পৰ্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। এবং কিৱীটীই তাঁকে অনুৱোধ জানাল আৱ বেশী দূৰ না আসবাৰ জন্যে।

আপনাকে আৱ গেট পৰ্যন্ত কষ্ট কৰে আসতে হবে না, মিঃ ঘোষ। এবাৰে আমৰা নিজেৱাই ষেতে পাৱে।

না না, তাতে কি, চলুন না গেট পৰ্যন্ত।
না, আপনি যান।

হৰিবলাস ফিৰে গেলেন। পাশাপাশি আমৰা দৃঢ়নে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম।

গেটেৰ কাছাকাছি প্ৰায় এসেছি, হঠাৎ একটা চাপা কুণ্ড গ্ৰ-ৰ- শব্দ শুনে দৃঢ়নেই থমকে দাঁড়াই।

শব্দটা লক্ষ্য কৰে সামনেৰ অন্ধকাৰে গেটেৰ ঠিক পাশেই চামেলী-ৰাঢ়িটাৰ দিকে তাৰ্কিয়ে চোখেৰ দৃঢ়ত আমাৰ পাথৰেৰ মতই স্থিৰ হয়ে গেল। অন্ধকাৰে দৃঢ়টা আগনৈৰ ভাঁটা যেন কুণ্ড জিঘাংসায় ধক্খক্ জৰলছে। অশৱীৱী কোন প্ৰেত যেন হিংসলোলুপ হয়ে আমাদেৱ পথৰোধ কৰে দাঁড়িয়েছে।

গোঁ-গ্ৰ-ৰ- একটা চাপা কুণ্ড গৰ্জন।

আঃ Tiger, stop ! Stop ! চাপা মেয়েলী কঞ্চে একটা নিৰ্দেশ শোনা গেল।

সীতাৰ গলা।

অন্ধকাৰে চামেলী-ৰোপটাৰ নিচ থেকে ছায়াৰ মত নিঃশব্দে সামনেৰ দিকে এগিয়ে এল সীতা এবং তাৱ পাশে এগিয়ে এল প্ৰকাণ্ড একটা কালো আলসেসিয়ান কুকুৰ তো নয়—যেন একটা বাধ !

কিন্তু আশ্চৰ্য, কুকুৰটা তাৱ মানবেৰ নিৰ্দেশে তখন একেবাৰে চূপ কৰে গিয়েছে—শান্ত, স্থিৰ !

চলে যাচ্ছেন বৰ্কি ? সীতা আবাৰ প্ৰশ্ন কৰল।

হ্যাঁ। আপনার ঐ টাইগাৰেৰ ডাকই বৰ্কি একটু আগে শোনা গিয়েছিল ! প্ৰশ্ন কৰল কিৱীটী।

হ্যাঁ। অচেনা কাৰো সাড়া পেলে টাইগাৰটা যেন একেবাৰে ক্ষেপে ওঠে। বোধ হয় কোনমতে আপনাদেৱ সাড়া পেয়েছিল। হাসতে হাসতে জবাৰ দেয়।

কিন্তু একটু দেৱততে পেয়েছিল বোধ হয় মিস ঘোষ ! প্ৰত্যুন্তৱে হাসতে হাসতে কিৱীটী জবাৰ দেয়।

কিৱীটীৰ ইঞ্জিতটা সীতা বৰুতে পাৱল কিনা বোৰা গেল না, কাৱণ জবাৰে সে বললে, আৱ কখনো আপনাদেৱ দেখলে ও গোলমাল কৰবে না। টাইগাৰ, চিনে রাখ, এৰা আমাদেৱ বন্ধু ! ভাল লোক।

কুকুৰটি আপনার কী খায় মিস ঘোষ ? কিৱীটী আবাৰ প্ৰশ্ন কৰে।

মাংস আৱ ঝুঁটি। জবাৰ দেয় সীতা।

আছো চলি, মিস ঘোষ, নমস্কাৰ। কিৱীটী হাত তুলে নমস্কাৰ জানিয়ে এগিয়ে গেল।

চলুন, নিচ পৰ্যন্ত আপনাদেৱ এগিয়ে দিয়ে আসি কিৱীটীবাৰু। এ পাহাড়টাৰ উপৰ বেজায় সাপেৱ উৎপাত।

তাই নাকি ? কিৱীটী চলতে চলতেই বলে।

হ্যাঁ। সব একেবারে ভয়ঙ্কর বিষধর গোথরো।

সাপকে বৃংকি আপনার ভয় করে না? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না, সঙ্গে টাইগার থাকলে এ জগতে কিছুকেই আর্ম ভয় করি না।

না মিস ঘোষ, তার আর প্রয়োজন হবে না। আপনি ফিরে যান। আয় স্বীকৃত। কিরীটী বেশ দ্রুতপদেই গেট অতিক্রম করে পাহাড়ের গা দিয়ে ঢালু পথ বেয়ে এগিয়ে চলল। আর্ম কতকটা একপ্রকার বাধ্য হয়েই অতঃপর কিরীটীকে অনুসরণ করি।

এগিয়ে চলোছি অন্ধকার পথ ধরে আবার হোটেলের দিকে।

শীতের কুফপক্ষের রাত্রি হলেও কালো আকাশটা তারায় তারায় যেন ঝক্খক করছে। বাঁয়ে কালো কালির মত গর্জন-উচ্চবেলিত সমুদ্র।

মাঝামাঝি পথ আসতেই দ্রুতে হোটেলের আলোগুলো অন্ধকার আকাশপটে ছেমে ফুটে উঠতে লাগল। কিরীটী নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করছিল, একক্ষণ একটি কথাও বলেনি। কিন্তু কিরীটীর নিম্নত্বতা আমাকে যেন কেমন পীড়ন করছিল। আর্মই কথা বললাগ, হিরণ্যয়ী দেবীকে কেমন লাগল, কিরীটী?

কেন, ভদ্রমহিলা বেশ ভালই তো!

হরবিলাসের উপরে একটা অসাধারণ হোল্ড রয়েছে বলে যেন মনে হল!

স্বাভাবিক। ধনীর কন্যা বিবাহ করলে স্বামীকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্তৰীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় ও মধ্যে মধ্যে স্তৰীর আজ্ঞাবহও হতে হয়। বিশেষ করে আবার এক্ষেত্রে শ্রীমতী হিরণ্যয়ী দেবীর মত প্রথর বৃণ্খিমতী নারীর কাছে হরবিলাসের একটা inferiority complex থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু তা তুই ভাবছিস না, অন্য কিছু ভাবছিস! আর্ম আবার কিরীটীর চিন্তান্বিত মনটাকে একটা খোঁচা দিয়ে আমার প্রতি সজাগ করে তোলবার চেষ্টা করি।

এবং কিরীটীর পরবর্তী জবাব শুনে বুল্লাম প্রচেষ্টা আমার একেবারে নিষ্কল হয় নি। কিরীটী মদ্দ হাসাসহকারে জবাব দিল, শতদলবাবু, যে আজ সকালবেলাতে বললেন এই বাড়ির একমাত্র উন্নৱার্ধিকারী এখন তিনিই, তা তো কই মনে হচ্ছে না! তিনি নার্তি এবং হিরণ্যয়ী দেবী বোন। সেদিক দিয়ে শ্রীমতী সীতাও তো মালিকের মাতৰ্নী। আরো আছে কিনা তাই বা কে জানে!

এতক্ষণে বুঝতে পারি কিরীটীর বর্তমান চিন্তাধারাটা ঠিক কেন্দ্ পথ ধরে চলেছে। সকালবেলাকার আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে শতদলের রহস্যাটাই তার সম্পত্তি চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এবং এতে বুঝতে পারলাম, শতদল-রহস্য মীমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত এখন থেকে কিরীটী নড়বে না। সঙ্গে সঙ্গে আমারও নড় চলবে না। অতএব অনিদৃষ্ট কালের জন্য এখন এখানেই অবস্থানও হবে অবধারিত।

বস্তুতঃ শতদলের রহস্যাটা যে আমার মনকেও বেশ কিছুটা চগ্নি করে তোলেনি তা নয়। কিন্তু কোন কিছুরই যেন হার্দিস পার্শ্বলাম না। সকাল হতে কতকগুলো ছিন্ন ছিন্ন ঘটনা ও কয়েকটি বিভিন্ন চারিত্রের নর-নারী—যার সংস্পর্শে আমরা এসেছি, কোন কিছুর মধ্যেই যেন একটা পূর্ণ যোগপ্রত খুঁজে

পাঞ্চলাম না। সহসা একটা প্রশ্ন আমার মনের অন্ধকারে বিদ্যুৎ-চমকের মতই ঘেন বিলিক হেনে গেল, কিন্তু কিরীটীকে সে প্রশ্নটা করবার পূর্বেই সে আমাকে বললে, রাত আটটা বাজে প্রায়, একটু পা চালিয়ে চল সুরুত, হোটেলের ক্লাব-ঘরে বহু জনসমাগম হয়, দেখা যাক আজ তাদের মধ্যে কারো সঙ্গে একটা-আঁষট আলাপ-পরিচয় করা যায় কিনা। এর্তাদিন এখানে এসেছে হোটেলে আছি, অথচ কারো সঙ্গে আলাপ হল না! এ অন্যায়। চল্।

হোটেলে এসে যখন পেঁচলাম রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা।

কিরীটী ও আমি সোজা একেবারে হোটেলের নিচের তলায় যে হলঘরটি স্থানীয় ক্লাব-ঘর বলে এখানে পরিচিত, সেই ঘরে এসে প্রবেশ করলাম।

প্রশংস্ত হলঘরটি তখন হোটেলের ও স্থানীয় অধিবাসী নরনারীতে গমগম করছে। বলতে গেলে হোটেলে আসবার পর এই সর্বপ্রথম ঐ ঘরে আমাদের পদাপর্ণ।

হলঘরের একধারে কাউণ্টার। সেখানে উর্দ্দি-পরা হোটেলের ওয়েটার নানা-জাতীয় কড়া ও নরম পানীয়ের বোতলগুলো সাজিয়ে ত্বরিতজনদের পানীয় পরিবেশন করছে। মধ্যে মধ্যে ছেট-বড় সব চৌকো ও গোলাকর টেবিল ও চেয়ার পাতা। সেই চেয়ারগুলো অধিকার করে নানাবয়সী নরনারীর ভিড় জমেছে। উচ্চ ও চাপা হাসির গুঞ্জন ও তর্কাতর্কির শব্দে সমগ্র হলঘরটি মুখ্যরিত। চারদিকেই সর্বত্র একটা আনন্দমন উচ্ছবসের সাড়া। কেউ গল্প করছে, কেউ তাস খেলছে, কেউ দাবা, কেউ টেবিল-টেনিস, আবার কেউ কেউ বা পানীয়ের শ্লাসে নিয়ে বসে আছে ও মধ্যে মধ্যে এক-আধ সিপ ড্রিংক করে স্বপ্নালুক দ্রিঙ্গিতে আশেপাশে চেয়ে দেখছে।

ঘরের এক কোণে একটা গোলাকার খালি টেবিলের পাশে খান্তিনেক খালি চেয়ার পড়েছিল। কিরীটী আমাকে আকর্ষণ করে সেই দিকে নিয়ে গেল। এবং নিজে একটা চেয়ারে বসে আমাকে বললে, বোস্।

পকেট থেকে চামড়ার সিগারের কেসটা বের করে একটা সিগার কেস থেকে নিয়ে অংশসংযোগ করতে করতে বললে, যাস্মিন্ দেশে যাদাচারঃ—কী খাব বল?

চেয়ে দেখি ইর্তমধ্যে আমাদের চেয়ারে বসতে দেখে একসময় একজন উর্দ্দি-পরিহিত ওয়েটার আমাদের সামনে জার্মান-সিলভারের একটা ট্রে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

একটো ছোট বিয়ার অ্যান্ড জিন—তুই কী খাব বল-সুরুত?

আমি—মানে ওসব আমার চলবে না ভাই।

এক যাহায় পৃথক্ক ফল নেই, you must keep company! আর দেখে, এ সাবকে নিয়ে একটো ছোটো জিন অ্যান্ড লাইম লাও!

ওয়েটার সেলাম জানিয়ে কাউণ্টারের দিকে চলে গেল।

কিন্তু ভাই, ওসব খেয়ে যদি মাতাল হই? ভয়ে ভয়ে কিরীটীর ঘুথের দিকে তাকিয়ে বললাম।

একটা ছোট জিন অ্যান্ড লাইম খেয়েই মাতাল হৰিব? Rubbish!

অভ্যাস নেই যে ভাই;

আমার ঘেন কতকালের অভ্যাস আছে! থাম্।

একটু পরে ওয়েটার ট্রেতে করে দুটো পেগ ফ্লাস এনে টেবিলের উপরে

নামিষ্ঠে রাখল, আউর কুছ সাব ?

হ্যাঁ, দেমোমে থোকা করকে পানি ঘিলা দো।

ওয়েটার একটু একটু করে দুটো পেগ লাসে জল ঢেলে দিয়ে ঢেলে গেল।

সন্তপ্তির সঙ্গে একটু একটু করে সিপ করছি আর অনুভব করবার চেষ্টা করছি নেশা ধরল কিনা। হঠাৎ এমন সময় খোলা দরজার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম, শ্রীমতী রাণু ও শতদল হাসতে প্রবেশ করল ঘরের ঘর্থে।

এবং তারা আমাদের দুটো টেবিলের পরের টেবিলে এসে বসল। ওরা আমাদের দুজনকে লক্ষ্য করেনি।

বোয়—বোয় ? শতদলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বয় এসে ওদের সামনে দাঁড়াল।

একটো ইইঞ্জিন সোডা, আউর একটো অরেঞ্জ স্কেয়ার্স—, শতদল অর্ডার দিল।

কিরীটীর দিকে তাকালাম। সে দৈখ অন্যাদিকে তাকিয়ে একমনে সিগার টেনে ঘাছে, শতদল বা রাণুর দিকে তার দৃঢ়িট নেই।

কিন্তু তোমার মা, simply I can't stand her রাণু! তিনি যে আমাকে খুব বেশী পছন্দ করেন তা বলে মনে হয় না—, শতদল রাণুকে বলছে কানে এল।

ওটা তোমার ভুল ধারণা দল—

না, ভুল ধারণা নয়। কুমারেশের প্রতিই তাঁর একটু,—, কথাটা শতদল শেষ করে না।

Don't be silly, দল ! রাণু জবাব দেয়।

একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কাউন্টারের পাশে কনসার্ট বাজানো শুরু হয়েছিল। বেহালা, পিয়ানো ও ফ্র্যান্ট—মাত্র তিনটি ঘন্টের সহযোগে চমৎকার এককান বাদ্য। স্বরটা একটা পরিচিত বাংলা গানের। কনসার্ট-বিরতি করেক মিনিটের জন্য হতেই আবার শতদলের কণ্ঠ শোনা গেল, কুমারেশের আজ পর্যন্ত কোনো সংবাদই আর পাওয়া যায়নি ?

না। রাণু জবাব দেয়।

কিন্তু এবারও কুমারেশের অলিম্পিকে যোগ দেবার কথা। সারা ভারতবর্ষ থেকে তো ওই এক সাঁতারে সিলেকটেড হয়েছে।

এতক্ষণে ব্যতে পারি কুমারেশ মানে বিখ্যাত সাঁতার কুমারেশ সরকারের কথা হচ্ছে। নামটা তাই প্রথম থেকেই কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

এখানে আসবাব দিন পনেরো আগে সংবাদপত্রে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, বিখ্যাত সাঁতার কুমারেশ সরকার তার কলকাতার বাসভবন থেকে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে নিরূপ্যেশ হয়েছে। সংসারে তার আপনার বলতে একমাত্র ব্যক্তি আপক ডঃ শ্যামাচরণ সরকার। বছর পাঁচেক হল ডঃ সরকার চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। কুমারেশ সরকার শুধু একজন বিখ্যাত সাঁতারই নয়, কণ্ঠসংগীতেও আধুনিক গায়কদের ঘর্থে সে অন্যতম। গায়কদের ঘর্থেও কুমারেশ রেডিও গ্রামফোন জগতে একচ্ছত্র সংগৃহীত। সেইজন্যই কুমারেশ

সরকারের নিরুদ্দেশের সংবাদ যথেষ্ট আলোড়ন সংগঠিত করেছিল এবং এ-ও জানি, এখন পর্যন্ত সেই নিরুদ্দেশট কুমারেশের কোন সংবাদই পাওয়া যাইনি। ব্যাপারটা সত্যিই যেমন রহস্যপূর্ণ তেমনি চাষ্পল্যকর।

আবার রাগু গলা শোনা গেল, সত্যিই শতদল, তুমি জান না কুমারেশ কোথায় গিয়েছে?

সকালবেলাতেই তো বলেছি জানি না।

কিন্তু আমি কি ভেবেছিলাম, জান?

কি?

তুমই তার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু, অন্ততঃ তুমি বোধ হয় জান সে কোথায়!

শুধু তোমার কেন, সকলেরই তাই ধারণা। অথচ এরা কেউ বিশ্বাস করে না যে, তার সংবাদ জানা সত্ত্বেও গোপন করে রাখার কী আমার স্বার্থ থাকতে পারে! জগতে কুমারেশের চাইতে প্রিয় বন্ধু আর আমার নেই। সেই স্কুলের জীবন থেকে আমাদের বন্ধুস্ত, তার প্রতিটি কাজে চিরাদিন আমিই সর্বাঙ্গে তাকে উৎসাহ দিয়েছি, তার জীবনের প্রতিটি success-এ আমিই তাকে এগিয়ে দিয়েছি। সে শুধু আমার বন্ধুই নয়, সহোদরের চাইতেও অধিক।

জানি। মদ্দকচে রাগু কেবল জবাব দেয়।

আবার বাজনা শুন্ন হয়; এবারে কিন্তু আর ঐকতন নয়, কেবল বেহালা-বাদক বেহালা বাজাতে শুন্ন করে। চমৎকার বাজনার হাত লোকটির। আমার ঘনটা বাজনার প্রতি আবার আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

হঠাৎ কিরীটী চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। চেয়ে দোখ, রাগু আর শতদলও চেয়ার ছেড়ে উঠে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিরীটী দ্রু থেকে ওদেরই অনুসরণ করে, আমিও কিরীটীর পিছনে চললাম।

মাথাটা একটু হালকা-হালকা বোধ হয়। বুরলাম জিন ও লাইমের কার্বশুন্ন হয়েছে আমার অস্তিক্রমের স্নায়ুকোষগুলোতে।

শতদলবাবু? কিরীটীর ডাকে চমকে শতদল ফিরে তাকাল, কে? ও মিঃ রায়, our detective! Hallow! মনে আছে স্যার, আপনার সেই সাবধান বাণী। আর বলতে হবে না।

ব্যাপার কি শতদল? বিস্মিতা রাগু প্রশ্ন করে শতদলের মুখের দিকে তাঁকিয়ে।

মিঃ রায়ের ধারণা, আমার জীবনের উপরে কেউ না কেউ attempt নিচ্ছে, উনি আমাকে তাই আজ সকালে সাবধান করে দিয়েছেন—, মদ্দ হাস্যসহকারে বলে শতদল।

তোমার life-এর ওপরে attempt! বিস্মিত সপ্রশ্ন দ্রুঞ্জিতে আবার তাকাল রাগু শতদলের মুখের দিকে।

কিন্তু আমি অন্য কথা বলবার জন্য আপনাকে ডেকেছিলাম শতদলবাবু,—, কিরীটী বললে।

কী বলুন তো?

আপনার বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম। হর্বিলাসবাবু, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল।

Really! তিনটে পাগল—তিন শ্রেণীর। কেমন লাগল পাগলগুলোকে?

হাসতে হাসতে শতদল বলে।

কিন্তু আপনার 'নিরালা' দেখা ইল না, তাই ভাবছি কাল সকালের দিকে হাব।

নিশ্চয় নিশ্চয়। আসবেন। তুমিও এস না রাণ্ড। রাণ্ডের দিকে ফিরে তাকিয়ে শতদল বলে।

কোথায়, তোমার ওখানে ?

হ্যাঁ। সকালে চা-পৰটা আমার ওখানেই না হয় হবে সকলের, কী বলেন মিঃ রায় !

বেশ তো। তাহলে রাণ্ড দেবী যাবেন নাকি !

কখন যাবেন ? রাণ্ড প্রশ্ন করে।

একটু সকাল-সকালই না হয় বের হওয়া যাবে। কিরীটী জবাব দেয়।

হঠাৎ একটা ভারিকী ঘেয়েলী কঠে সামনের দিকে তাকালাম।

এই যে রাণ্ড, কোথায় ছিল এতক্ষণ ? সেই কখন বের হয়েছে—

একটি বিধবার বেশ পরিহিতা মধ্যবয়সী মহিলা। পরিধানে বিধবার বেশ থাকলেও ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের চিহ্ন যেন তাঁর চোখ-গুথ হাব-ভাব, এমন কি দাঁড়াবার ভঙ্গীটুকু থেকে পর্যন্ত ফটে বের হচ্ছে। পরিপাটি চূল আঁচড়ানো। হাতে একগাছি করে সোনার চূড়ি। চোখে সোনার ফ্রেঞ্চের চশমা।

কোথায় ছিল এতক্ষণ ? আবার মহিলা প্রশ্ন করলেন।

এই—মানে, বলতে বলতে এদিক-ওদিক তাকায় রাণ্ড।

চেয়ে দৰ্দিৰ্থ, আমাদের ধাৰে-কাছে কোথাও শতদলের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কখন একসময় ইতিমধ্যেই নিঃশব্দে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে সে গা-চাকা দিয়েছে।

॥ ৪ ॥

এঁৱা কে রাণ্ড ? ভদ্রমহিলা রাণ্ডের দিকে তাকিয়ে আমাদের ইঁঁগত করে প্রশ্ন করলেন।

রাণ্ড যেন শতদলের আকর্ষণক অন্তর্ধানে কতকটা আরাম অনুভব করে এবং একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার মা। ইনি মিঃ কিরীটী রায়, ইনি মিঃ সুব্রত রায়। মিঃ কিরীটী রায়ের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে মাঝি—বিখ্যাত রহস্যভূদে।

নমস্কার, মিঃ রায়—আমার স্বামীর নাম নিশ্চয়ই আপনি শুনে থাকবেন—স্যার আর. এন. মিট—

কোন স্যার আর. এন.? বিখ্যাত মার্টেন্ট, গত বৎসর সুইজারল্যান্ডে যিনি অপারেশন হতে গিয়ে মারা যান ?

হ্যাঁ। প্রথমবারিখ্যাত সার্জেন্টের দিয়ে অপারেশন করানো ইল এখন থেকে ফাই করে গিয়ে...কিন্তু oh dear ! He could not be saved—লেডি মিট হাতের দামী সংগৰ্ধবৃক্ষ রেশেষী রূমালটা চোখের উপরে একবার বৰ্দলয়ে নিলেন এবং মনে ইল গলার স্বরটা যেন একটু অশ্রুস্ত হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, সংবাদপত্রে ঘটনাটা পড়েছিলাম। কিরীটী মৃদুকঠে জবাব দেয়।

শ্রীমতী রাণ্ড তাহলে ক্রোড়পৰ্তি স্যার আর. এন.-এর সমস্ত সম্পত্তির

একমাত্র উত্তরাধিকারীণী এবং শ্রীমান শতদল তাহলে বেশ উচ্চ ডালের দিকে হস্ত প্রসারিত করছে !

আস্নন না, আমাদের ঘরে চলুন না। আপনারাও তো এই হোটেলে এসেই উঠেছেন? লেডি মিশ তাঁর ঘরে আমন্ত্রণ জানালেন।

হ্যাঁ! আজ থাক মিসেস মিশ, রাত হয়েছে। কিরীটী মণ্ড প্রতিবাদ জানায়।
রাত আর এমন বেশী কি হয়েছে? লেডি মিশ তাঁর সুড়োল মণ্ডবন্ধ চোখের সামনে তুলে ধরে দামী রিস্টওয়ার্টার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই তো সবে রাত পোনে দশটা। আস্নন আস্নন, তিন-চার দিন হল এই হোটেলটায় এসে উঠেছি, তা একটা লোক পেলাগ না ধার সঙ্গে দৃঢ় আলাপ করা হতে পারে। ও হোটেলটায় জায়গা পেলাগ না, তাই কতকটা বাধ্য হয়েই এসে এই হোটেলটায় উঠতে হল। এত ভাল ভাল সী-সাইড থাকতে কেন যে রাগুর এই হত্তচাড়া ন্যাপ্স্ট জায়গাটাতে আসবার জন্মেই এত জেদ চাপল! আস্নন মিঃ রায়, মিঃ স্বৰত, আপনিও আস্নন।

তরল পানীয়ের প্রভাবে পেটের মধ্যে তখন আমার ক্ষুধার প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছে। বাধা দিতে যাচ্ছলাম, কিন্তু কিরীটীকে মিসেস মিশকে অনুসরণ করতে দেখে একপ্রকার বাধ্য হয়েই আমাকেও ওঁদের পশ্চাতে অনুসরণ করতে হল।

হোটেলের দোতলায় কোগের একট বড় ঘর নিয়ে মাতা ও পুত্রী আছেন। এবং সঙ্গে এসেছে ওঁদের একজন বয়, একজন আয়া ও একজন দাই। এও দেখলাম ঘরে প্রবেশ করে যে, হোটেলের আসবাবপত্রের উপরেই ঊরা একবারে নির্ভর করেননি, কিছু কিছু শয়ান্দুব্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র যা হয়তা তাঁরা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিলেন, তারই সাহায্যে নিজেদের বাসের কক্ষটি যথাসাধ্য রূচিসম্মতভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছেন। ধনের প্রাচৰ্য ও অভিজ্ঞাতোর চিহ্ন সর্বশেষ ঘরের মধ্যে পরিষ্কৃত।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে লেডি মিশ বললেন, আস্নন। May I offer you a drink Mr. Roy? লেডি মিশ কিরীটীর ঘুর্খের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

No, thanks! Just now we had one!

What about you Mr. Subrata Roy? এবাবে আমার প্রতি প্রশ্ন বর্ষিত হল।

No, thanks!

বেশ, প্রিঙ্ক না চান, চা-কোকো-কফি অব ওভালটিন?

ব্র্যালাম লেডি মিশ নাছেড়াবাল্দা। অতিথিদের অন্ততঃ কিছু না পান করিয়ে স্বীক্ষ্ণির হতে পারছেন না।

বেশ, তাহলে চা আনতে বলুন। কিরীটী জবাব দেয়।

বয়, চা লাও। বয়কে চাহেন আদেশ দিয়ে সোফাটির উপরে নিজে একটু ভাল করে গুছিয়ে বসে লেডি মিশ আমাদের দিকে তাঁকিয়ে বললেন, বসে বসে আলাপ করবার সময় কোন একটা 'ডিঙ্ক' সঙ্গে না থাকলে আমি চিরদিনই যেন কেমন bored feel করি। আমার বহুদিনকার habit। মেরের দিকে তাঁকিয়ে বললেন, রাগু, দাঁড়িয়ে আছ কেন, বোসো!

রাগু এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়েই ছিল, মায়ের আদেশ পেয়ে আমাদেরই পাশের খালি চেয়ারটার ওপরে উপবেশন করল।

আমার only child এই, মিঃ রায়। লরেটো থেকে এবাব সিনিয়ার কেম্ব্ৰেজ

ପାସ କରେଛେ । Oh dear, ରଣେନେର ଇଚ୍ଛେ ଛିଲ ରାଣ୍ଡ ବିଲେତ ଯାଏ, ଓକେ ତାର ବ୍ୟାରିସ୍ଟାରି ପଡ଼ାବାର କୀ ଇଚ୍ଛେଇ ଛିଲ ! But where is he now ? ସବ ଆମାର ଥାଡେ ଚାପିଯେ ଦିଯେ ଦେଖନ ନା—how cruel ! ଆବାର କଟ୍ଟମ୍ବର ତାଁର ଅଶ୍ଵତେ ଗଦଗଦ ହେଁ ଉଠେଇଲ, କିନ୍ତୁ କିରୀଟୀ କଥାର ମୋଡ଼ଟା ପାଲଟେ ଦିଲ ।

ମେ ବଲଲେ, ଆପନାରା ତାହଳେ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଏଥାନେଇ ଥାକବେନ, ଲେବି ମିଶ୍ର ? ହୟ୍ୟ, ସର୍ତ୍ତଦିନ ନା ଓର ଆବାର ଇଚ୍ଛେ ହୟ ଫିରେ ଯାବାର ! ବଞ୍ଚ ଜେଦୀ ଆର ଏକ-ଗୁମ୍ଭେ ମେଯେ ଆମାର ।

କିରୀଟୀ ହାସତେ ହାସତେ ବଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଓଁ ସଙ୍ଗେ ଆମାର ଯା ଆଲାପ ହରେଛେ, ତାତେ ମନେ ହୟ she is really charming !

ଆପନାନ୍ତି ବଲନ ତୋ ମିଃ ରାଯ୍, ଜାଯଗାଟି really ଚମ୍ରକାର ନୟ ? ମାର୍ମିର ଧାରଣା, ଏମନ ବିଶ୍ରୀ ଜାଯଗା ନାକି ଆର ଭୂ-ଭାରତେ ନେଇ ! ରାଣ୍ୟ ଏବାରେ ଜବାବ ଦେଯ ।

ବୟ ସ୍ନାନ୍ୟ ଚାଯେର ଟ୍ରେ ଓପରେ ଚାଯେର ସରଜାମ ନିଯେ ଏସେ ସାମନେର ଟ୍ରେବଲେର ଉପରେ ନାମିଯେ ରାଖଲ ।

ଚାଯେର କାପେ ଚମ୍ରକ ଦିତେ ଦିତେ କିରୀଟୀ ବଲଲେ, ଆପନି ବୋଧ ହୟ ହୋଟେଲେର ବାହିରେ ସାରାନି ଲେବି ମିଶ୍ର, ଗେଲେ ଦେଖତେନ ବାହିରେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଥାନକାର ସଂତାଇ ଚମ୍ରକାର !

ଆମାର ଆବାର ପାରେ ହେଟେ ବେଡ଼ାତେ ଏମନ ବିଶ୍ରୀ ଲାଗେ ! ଲେବି ମିଶ୍ର ଜବାବ ଦିଲେନ ।

ତା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ, ପାରେ ହେଟେ ବେଡ଼ାନୋଓ ଆପନାର ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ, ଭାଲୋ ତୋ ସାଗବେଇ ନା ଆପନାର । କିରୀଟୀ ଲେବି ମିଶ୍ରର କଥାଯ ସାର ଦିଯେଇ କତକଟା ଯେନ ବଲେ ଓଠେ ।

ଏମନ ଚମ୍ରକାର ସୀ-ସାଇଟେ କେଟ ଆବାର ଗାଡିତେ ଚେପେ ବେଡ଼ାଯ ନାକି, ମାର୍ମିର ସେମନ ଉଚ୍ଚଟ ସବ—, ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତିବାଦ ଜାନାଯ ।

ଶୁଣନେ ମିଃ ରାଯ୍ ଆମାର ମେଯେଟିର କଥା ?

ତା ତୋ ସଂତ୍ୟ, ଅଭ୍ୟାସ ନା ଥାକଲେ—, କିରୀଟୀ ଆବାର ବଲେ ।

ଅଭ୍ୟାସ ! ଅଭ୍ୟାସ ଆବାର କୀ ? ଦୂରିନ ହେଟେ ବେଡ଼ାଲେଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଁ ଯାଏ । ମେଯେ ବଲେ ଓଠେ ।

ନା ମିସ ମିଶ୍ର, ତାରଓ ଏକଟା ବୟସ ଆଛେ । କିରୀଟୀ ମୂର ହାସାହକାରେ ବଲେ ।

ମେ ରାତ୍ରେ ଆମାଦେର ଆହାର ଶେଷ କରତେ କରତେ ପ୍ରାଯ୍ ରାତ ସାଡେ ଏଗାରୋଟା ବେଜେ ଗେଲ ।

ଦୂରିନେ ଏସେ ହୋଟେଲେର ବାରାନ୍ଦାୟ ଦୂଟେ ଚେରାର ଟେଲେ ନିଯେ ପାଶାପାଶ ବସଲାମ । ହୋଟେଲୀଟ ଇନ୍ତମଧେଇ ସେନ ନିଷ୍ଠତ୍ୱ ହେଁ ଗିରେହେ । ସରେ ସରେ ସେ ଧାର ଶର୍ଯ୍ୟ ନିଯେହେ ରାତ୍ରେର ଘତ । ବୋଧ ହୟ କେବଳ ଆମରା ଦୂରିନେଇ ଜେଗେ ଏଖନ୍ତା କଲାଜବାସେ । ଭାଙ୍ଗ ଚେତ୍ତିଯେର ଚର୍ଚ୍‌ଗୁଲୋତେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଫସଫରାସେର ସୋନାଲୀ ଚମ୍ରକ କିଲାମିଲ କରେ ଓଠେ । ଦିବାରାତ ଏକଟାନା ଚେତ୍ତ ଭେଙେ-ଗଡ଼େଇ ଚଲେହେ ଯେନ ମୟୁଦ୍ରେର ଖେଳା । ଓର ଢୋଖେ କି ଘର ନେଇ !

ଆମିଇ ନିଷ୍ଠତ୍ୱତା ଭଙ୍ଗ କରଲାମ, ବ୍ୟାପାର କୀ ବଲ୍ ତୋ କିରୀଟୀ, ଲେବି ମିଶ୍ରକେ ହଠାତ ଅତ ତୋଷାମୋଦ କରତେ ଶରୁ କରିଲ କେନ ?

ଭଦ୍ରମହିଳାକେ ସଥିନ ଏକଟି ତୋଷାମୋଦପ୍ରଯାଇ ଦେଖଲାମ, ଆଗେ ଥାକତେଇ

খানিকটা তোষামোদ করে ভবিষ্যতের জন্য হাতের মধ্যে রেখে দিলাম, প্রয়োজন হলে কাজে লাগানো যাবে।

তোর মতলবটা কি সত্য করে বলবি? সত্যই কি তুই সকালবেলাকার কী একটা accident হয়ে গিয়েছে, সেটার ভূতকে এখনো কাঁধে করে বেড়াচ্ছেস?

হ্যাঁ রে, কতকটা সেই সিন্দবাদ নাবিকের অবস্থা। কিন্তু আমার কথা যদি বিশ্বাস করিস তাহলে বলতে পারি, সকালবেলাকার ব্যাপারটা যোগসূত্রহীন সামান্য একটা এলোমেলো দৃশ্যটাই নয়। পর পর কতকগুলো দৃশ্যটা, যেগুলো একস্থে গাঁথলে শেষ পর্যন্ত হয়তো গিয়ে দাঁড়াবে একটা মার্ডাৰ বা নিষ্ঠুৰ হত্যায়!

You mean—

হ্যাঁ I mean শীঘ্রই যদি আমার প্ৰব' দুরদৃষ্টিৰ ক্ষমতা না নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকে, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, I can hear the footsteps! হ্যাঁ সুন্তৰ, আমি স্পষ্ট শুনতে পাইছি নিষ্ঠুৰ গত্ত্ব নিঃশব্দে ফেলে এগিয়ে আসছে অবশ্যভাবী অবধারিত। কিৱীটীৰ কণ্ঠস্বরে উজ্জেনার স্মৃষ্টি আভাস। কিৱীটী তখনও তার বক্তব্য শেষ কৰোনি, কিন্তু আমার চোখে যখন ব্যাপারটা পড়েছে, আমি চেষ্টা কৰিব to my last to stop it! প্রতিৰোধ কৰতে আমৰা যথসাধ্য চেষ্টা কৰিব।

তোর কি স্থিৰ বিশ্বাস তাহলে something is going to happen? কোনো একটা কিছু শীঘ্রই ঘটবে?

হ্যাঁ, যদি আমার ক্যালকুলেশন ভুল না হয়, চৰিশ থেকে আটচল্জিশ ঘণ্টার মধ্যেই আবাৰ একটা চেষ্টা হবে। বাৰ বাৰ চাৰবাৰ।

কিৱীটীৰ অনুমান যে কতখানি নিৰ্ভুল, পৱেৱ দিন সকালেই সেটা জানা গেল।

খুব ভোৱে উঠেই আমি, কিৱীটী ও রাণু 'নিৱালা'ৰ উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম।

ভোৱের আলো তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সমন্বেৱ বৰকে একটা আলো-ছায়াৰ পৰ্দা যেন থিৰ থিৰ কৰে কাঁপছে। শীতেৱ সকাল হলেও কোথাও-কুয়াশাৰ লেশমাত্ৰ ছিল না। আকাশেৱ প্রাণ্তে শুকতারাটা নিভে যাইৱানি তখনও।

'নিৱালা'ৰ লৌহফটকেৱ সামনে এসে আমৰা যখন পেঁছলাম, প্ৰব' দিগন্ত যেখানে জলকে আলিঙ্গনেৰ মধ্যে টেনে নিয়েছে, সেখানটা সূৰ্য-সারাথিৰ রথ-চক্ৰেৰ ঘৰ্ষণে ঘৰ্ষণে ও সপ্ত অশ্বেৱ খুৰেৱ আঘাতে যেন রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে।

গতকাল সন্ধ্যাৰ মত লৌহফটক খোলাই ছিল, ফটক ঠেলে তিনজনে আমৰা কম্পাউণ্ডেৱ ভিতৰে প্ৰবেশ কৰলাম।

একটা অগ্সৱ হতেই হৱিলাসেৱ সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কালো রঞ্জেৱ একটা ওভাৱকোট গায়ে, হাত দুটো পকেটেৱ মধ্যে প্ৰবিষ্ট কৰে হাঁটতে হাঁটতে হৱিলাস গেটেৱ দিকেই এগিয়ে আসছিলেন।

এই যে মিঃ ঘোষ, সুপ্ৰভাত! কিৱীটীই প্ৰথমে সুপ্ৰভাত জানাল।

হৱিলাসও আমাদেৱ শুভ প্ৰভাত জানালেন প্ৰত্যন্তৰে, সুপ্ৰভাত। খুব সকালেই এসেছেন দেৰ্থিছ! ধান, শতদল বোধ হয় বসেই আছে। সারাটা রাত

বেচারা শোবার ঘরে খিল ভুলে বসে আছে, পাশে একটা লোডেড রিভলভার
নিয়ে।

ব্যাপার কী? কোন দৃঘটনা? উদ্বিগ্ন কষ্টে কিরীটী প্রশ্ন করে।

কী জানি মশাই, রাত দৃটো-আড়াইটোর সময় হঠাত পর পর দৃটো বন্দুকের
গুলির শব্দে চৰকে উঠে—

বন্দুকের গুলির শব্দ! প্রশ্নটা এবাবে করলাগ আমি।

হ্যাঁ। চট কৰে রাতে ঘুম আসে না, তাই অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে
বই পড়ি। কালও রাতে বসে বসে নিজের ঘরে একটা বই পড়িছিলাম, হঠাত
বন্দুকের গুলির আওয়াজ, তারই কিছুক্ষণ পরে শতদল ও অবিনশ্বের চেঁচামৌচ
শুনে অল্দরের দিকে ছুটে যাই। শতদলের ঘরে গিয়ে দৈখ, বেচারী অত্যন্ত
নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ঘুম আসছিল না বলে জেগে ঢেবিলের আলোয় বসে কী
একটা বই পড়িছিল, এমন সময় হঠাত বন্দুকের গুলির আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে
ডেবিলল্যাপ্সের চিম্নিটা ভেঙে চুরুমার হয়ে ঘর অন্ধার হয়ে যায়। ও কিছু
বেঁকুবার অগেই অন্ধকারেই আবার একটা গুলি এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কৰে।
কী ভয়ানক ব্যাপার বলুন তো মিঃ রায়! ও বলে, কেউ ওকে হত্যা কৱার চেষ্টা
কৰছে। কিন্তু হঠাত কে আবার শতদলকে হত্যা কৱাবার চেষ্টা কৰবে বলুন
তো? আমি তো মাথামুড়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ও নিজেও এমন
ঘাবড়ে গিয়েছে যে, বাকি রাতটুকু বোধ হয় শোয়ওনি। চলুন, আপনি
এসেছেন ভালই হল, ওকে একটু সাহস দিয়ে যান—

হরবিলাস গতরাত্রে ব্যাপারটায় যে বেশ একটু উদ্বেজিতই হয়ে উঠেছেন,
ওর কথাবার্তাতেই সেটা বোঝা গেল এবং ব্যাপারটার মধ্যে ঘটেও উদ্বেজনার
থোরাক থাকা সত্ত্বেও কিরীটীকে কিন্তু একান্ত নির্বিকার বলেই মনে হতে
লাগল। অস্বাভাবিক বা অত্যাশ্চর্য কিছুই তেমন ঘটেনি, শান্ত ও নির্বিকার
কষ্টেই সে এবাবে হরবিলাসবাবুকে প্রশ্ন কৱল, তা এত সকালে আপনি কোথায়
বাঁচ্ছেন?

সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। গত-
রাত্রে আপনারা চলে যাবার পর আমার স্তৰীর মুখে আপনাদের অনেক কীর্তি-
কাহিনীই শুনেছি, তাতে কৰে আমার মনে হল এ ব্যাপারে আপনিই ঘোগ্য
ব্যাক্তি বেচারীকে একটা পরামর্শ দেবার—

কেন, শতদলবাবু কি বলেননি আজ সকালে আমাদের তিনি চায়ের
নেমন্তন্ত্ব কৱেছেন, আমরা আসব? কিরীটী ম্বিতীয় প্রশ্ন কৱল।

কই, না তো! সর্বসময়ে জবাব দিলেন হরবিলাস।

ও, আচ্ছা চলুন দৈখ—

হরবিলাসবাবুকে অনুসূরণ কৰে আমরা তিনজন অগ্রসর হলাম। সংবাদটা
শোনা অবধিই লক্ষ্য করিছিলাম, রাণু ঘুঁথের পরিবর্তন। রাণু যেন সত্যাই
বিস্মিত ও হতচকিত হয়ে গিয়েছে। রাণু আমার ও কিরীটীর মধ্যবর্তনী হয়ে
পথ চলাচ্ছিল, সহসা একসময় চাপা কষ্টে কিরীটীকে সে প্রশ্ন কৱল, আপনি
শতদলকে সাবধান কৰে দিয়েছেন, কালই সকালে আমাকে বলছিল! আপনার
নাকি ধারণা, ওকে মারবার জন্য কেউ attempt নিছে! শতদল তো বিশ্বাস
কৱেইনি, সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমিও কৱিনি। কিন্তু এসব কী
শুনেছি—how horrible!

বিশ্বাস করেননি ভুলই করেছেন, এবারে বোধ হয় বিশ্বাস করবেন! কিরীটী মণ্ডকচ্ছে জবাব দেয়।

অন্দর ও বহির্মহলের মধ্যে যোগাযোগের স্বারটা, সেটা অন্দর থেকে বন্ধই ছিল। বাইরের দরজায় একটা দাঁড়ি খুলছিল, হর্বিলাসবাবু, সেটা ধরে বারদ্বাই টান দিতেই অন্দর থেকে একটা অস্পষ্ট ঘটাধৰনি শোনা গেল এবং অলপক্ষে পরেই দরজাটা খুলতেই চোখে পড়ল খোলা স্বারপথে দাঁড়িয়ে একজন ব্রহ্মগোছের লোক। লোকটার বয়স পঞ্চাশের উধের তো নিশ্চয়ই। রোগা ও বেঁচেমেত চেহারা। দেহের সমস্ত মাংসপেশীগুলো যেন একেবারে শেণের দাঁড়ির মত পার্কিয়ে গিয়েছে। মাথার চুলগুলো কঁচায়-পাকায় মেশানো। লোকটার পরিধানে একটা ধোপদুরস্ত ধৰ্তি ও হাতকাটা গরম বেনিয়ান। বেনিয়ানের উপরে একটা চাদর জড়ানো।

আবিনাশ, শতদল কোথায়? প্রশ্ন করলেন হর্বিলাসই।

বাবু, তাঁর ঘরেই আছেন। এখনো দরজা খোলেননি। বাবুর কাছেই ঘাঁচ্ছিলাম, আপনাদের ঘণ্টা শুনে—

এদের বাবুর ঘরে নিয়ে যাও।

আসুন—আজ্জে, আবিনাশ আমাদের আহবান জানাল।

একটা দীর্ঘ টানা বারাল্দা পার হয়ে আমরা আবিনাশকে অন্দরে করে প্রশস্ত শ্বেতপাথেরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে গিয়ে উঠলাম সকলে। উপরের তলাতেও ঠিক নিচের মতোই অন্দরুপ একটি টানা বারাল্দা। বারাল্দার দৃশ্যমাণের দেওয়ালে সব বড় বড় ফ্রেমে বাঁধানো নানাপ্রকারের চিত্র টাঙ্গানো। মধ্যে মধ্যে স্ট্যান্ডের উপরেও রাঙ্কিত জয়পুরী টিবে পার্শ্বিত্ব। বাড়িটা যে কোন এক শিল্পীর, বুরুতে সেটা আর্দ্ধে কঢ়ে হয় না। বারাল্দার শেষপ্রান্তে যে বন্ধ ঘরটার সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম, তারই ঠিক দরজার দৃশ্যমাণে দৃটো বহুদাকারের স্ট্যাচু। একটি স্ট্যাচু হচ্ছে অপ্রবৃ একটি অর্ধউলঙ্গ নারীর এবং নিবতীয় স্ট্যাচুটি হচ্ছে একটি পুরুষের।

এই ঘরে আছেন বাবু। আবিনাশ বললে আঙ্গুল তুলে ঘরটা ইঁগিতে দেখিয়ে দিয়ে।

কিরীটী দরজার গায়ে নক করল ট্রুকটুক করে এগিয়ে গিয়ে, মিঃ বোস! শতদলবাবু!

ভিতর হতে আহবান এল, কে?

আমি কিরীটী, শতদলবাবু, দরজা খুলুন—

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। সামনেই দাঁড়িয়ে শতদল। চমকে উঠলাম শতদলের মুখের দিকে তাঁকিয়ে। মাত্র এক রাত্রের মধ্যে এ কী চেহারা হয়েছে তার? সমস্ত মুখে শুধু যে রাণি-জাগরণের ক্লান্তি তাই নয়, একটা নির্বিত্তশয় ভয় ও উৎকণ্ঠা যেন মুখের রেখায়-রেখায় সন্দৃশ্য হয়ে উঠেছে।

এই যে মিঃ রায়, again there was an attempt last night! আবার কাল রাত্রে কেউ, somebody, আমাকে গুলি করে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। এখন সপষ্টই বুবাতে পারচি মিঃ রায়, you were right! আপনার কথাই ঠিক—সত্যিই someone is after me! কেউ আমার পিছনে লেগেছে। কিন্তু কে এবং কেন? উজ্জেন্যায় শতদলের কঠস্বর যেন একেবারে ভেঙে পড়ে।

Don't be nervous ! চলুন শতদলবাবু, ঘরের মধ্যে চলুন। হরিবিলাস-
বাবুর মুখেই এইমাত্র গতরাত্রের সমস্ত ব্যাপার শুনেছি—, কিরীটী যেন
একপ্রকার শতদলকে ঠেলেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

আমরাও পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

দেখবেন, সাবধান, কাচের টুকরো এখনো ঘরময় ছাড়িয়ে আছে! সাবধান
করে দিলেন আমাদের শতদলবাবু।

॥ ৫ ॥

শতদলবাবুর কথায় তাঁকয়ে দেখলাম, সাতাই ঘরময় ছোট-বড় কাচের টুকরো
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কিরীটী সাবধানে পা ফেলে এগুতে এগুতে
বললে, ইস, কাচের টুকরোগুলো এখনো এইভাবে ঘরময় ছাড়িয়ে রেখে দিয়ে-
ছেন! কাউকে বলুন ঘরটা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দিতে!

হ্যাঁ, এক্সেন পরিষ্কার করাচ্ছ। বলে শতদল ভূত্য অবিনাশকে ডেকে
ঘরটা পরিষ্কার করে দিতে আদেশ দিল।

ঘরটা বেশ বড় আকারের হবে। ঘরের মেঝেটা লাল সিমেণ্টের তৈরী এবং
প্রাতন হলেও এখনো ব্যক্তিক করে এমন চমৎকার পালিশ। একধারে মস্ত বড়
একটা পালঞ্চক এবং তারই একপাশে একটা লোহার সিল্ডুক, কাঠের একটা চৌকির
ওপরে বসানো। ঘরের অন্য কোণে একটা জানলার একেবারে বরাবর একটা
লিখার টেবিল; ঐ টেবিলটি এখন বিশেষ ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না,
কারণ টেবিলের উপরে নানা কাগজপত্র ও বই এলোমেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে।
সেই টেবিলটা থেকে হাতচারেক দূরে অনেকটা ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট
একটি রাইটিং টেবিল, তারই উপরে টেবিল লাম্প বোধ হয় বসানো ছিল এবং
জানালাপথে নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে ল্যাম্পটি মেঝেতে ছিটকে পড়ে চিমনিটা
ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

অবিনাশই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একটা ঝাড়নের সাহায্যে কাচের টুকরো-
গুলো তুলে, তখনও মেঝের উপরে উলটে-পড়ে-থাকা ল্যাম্পটা তুলে রাখতে
যাচ্ছে, কিরীটী এগিয়ে গিয়ে অবিনাশের হাত থেকে একবিদেক ধানিকটা টোল-
থেরে-শাওয়া ল্যাম্পটা হাতে নিলে চেয়ে, দেখি অবিনাশ, ল্যাম্পটা?

অবিনাশ ল্যাম্পটা কিরীটীর হাতে এগিয়ে দিয়ে ঘর হতে চলে গেল।
বারকয়েক ল্যাম্পটাকে ঘূরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ল্যাম্পটা
সামনের টেবিলের উপর বসিয়ে রাখল। এবং হঠাত শতদলের একেবারে মুখো-
মুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, গুলিটা কোন্ দিনে এসে ঢুকেছিল শতদল-
বাবু?

সামনের ঐ বাগানের দিককার জানালাটাই রাত্রে খোলা ছিল। ঐ জানালা-
পথেই গুলিটা এসেছিল।

শতদলবাবু হাত তুলে ঘরের অনেকটা মধ্যস্থলে রাঙ্কিত রাইটিং-টেবিলটার
ঠিক মুখোমুখি যে জানালাটা তখনও বৃক্ষ ছিল, সেইটার দিকে হাত তুলে
দেখাল।

কিরীটী আর নিষ্ঠায় প্রশ্ন উচ্চারণ না করে নিজেই এগিয়ে গিয়ে ছিট-

কিন্টা তুলে হাত দিয়ে ঠেলে জানালার বন্ধ করাট খুলে দিয়ে সামনের দিকে
তাকিয়ে কী যেন গভীর ঘনোষেগের সঙ্গে দেখতে লাগল।

কৌতুহলভরে আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এ বাড়ির পশ্চাতের অংশ সেটা। দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না, দীর্ঘদিন
জমিটা অসংকৃত অবস্থায় পারিগত হয়ে আছে। বড় বড় ঘাস ও আগাছায়
জায়গাটা জঙগলে পরিগত হয়েছে বললেও অতুর্যাস্ত হয় না। মধ্যে মধ্যে শেয়া-
কুলের ঝোপ ও ঝাউগাছ। শেষপ্রান্তে জমির সীমানা দেড়-মানুষ-সমান উচ্চ
প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের ওদিক দিয়ে জমি ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে,
সমন্বয় বেশ কিছুটা দ্বারে সেখান থেকে। এসব ঝোপ ও আগাছার মধ্যে আঘা-
গোপন করে থেকে আততায়ীর পক্ষে এই ঘরের মধ্যে অবস্থিত কাউকে লক্ষ্য
করে গুলি ছেঁড়িটা এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, কারণ নিচের ঐ জমিতে
দাঁড়িয়ে ঘরের এই জানালাটা খোলা থাকলে ঘরের ভিতরের অনেকটা অংশই
চোখে পড়া সম্ভব মনে হল।

আততায়ী এখান থেকেই বোধ হয় শতদলবাবুকে রাত্রে আলোর সামনে
বসে থাকতে দেখে গুলি ছঁড়েছিল। কথাটা কিরীটীকে সম্বোধন করেই
নিম্নস্বরে বললাম আমি।

কিরীটী বোধ হয় নিজের আঘাতিতায় অন্যমনস্ক ছিল, আমার প্রশ্নে
চমকে ফিরে তাকাল, কী বলছিলি স্বীকৃত?

বলছিলাম, এখান থেকে অন্যাসেই গুলি ছেঁড়া যেতে পারে—

তা পারে। মুদ্রকষ্টে কিরীটী জবাব দিল। কিরীটীর কষ্টস্বরে যেন কোন
আগ্রহের সুরই নেই।

রাণু একঙ্গ একটি কথাও বলেনি আমাদের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করা
অবধি, এবাবে সে শতদলকে বলছে শুনতে পেলাম, তুমি কিন্তু সাত্যসাতাই
কাল খুব বেঁচে গেছ শতদল!

হ্যাঁ, তাই তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সাত্য কথা বলতে কি রাণু, এখনো
যেন এর মাথামুড়ি কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারছি না! আমাকে কারো হত্যা
করে কী লাভ থাকতে পারে? তা ছাড়া তুমি তো জান, এ জগতে কারো সঙ্গেই
আমার কোন শত্রুতা নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা যে রকম দাঁড়াচ্ছে—

রাণুর কথায় প্রতিবাদ জানিয়ে শতদল বলে, সে যাই হোক, ব্যাপারটা
ক্ষমে এমন দাঁড়াচ্ছে যে, এর একটা হেস্তনেস্ত না করে চূপ করে বসে থাকাটাও
হয়তো আর উচিত হবে না। আপনি কি বলেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ, তা বইকি। We must see to its end! কিরীটী ফিরে দাঁড়িয়ে
জবাব দিল।

তাহলে এখন আমার কী করা উচিত? আপনার পরামর্শ কী?

সেইটাই একঙ্গ আমি ভাবছিলাম, শতদলবাবু। দুটো কাজ সর্বাঙ্গে
আপনাকে করতে হবে। কিরীটী শতদলের দিকে তাকিয়ে বলে।

কী, বলুন?

প্রথমত সমস্ত ব্যাপারটা এখানকার স্থানীয় থানা-ইনচার্জকে জানাতে
হবে। কারণ তাঁদের বাদ দিয়ে আমরা এসব ব্যাপারে এক পাও এগুতে পারব
না, তাছাড়া সেটা একেবাবেই আইনসঙ্গতও হবে না।

হ্যাঁ, গতরাত থেকে আমিও ঐ কথাটাই ভাৰছিলাম। মদ্দতাবে শতদল বলে।

শুধু ভাৰা নয় মিঃ বোস, আপনার উচিত ছিল ইতিমধ্যে থানা-ইনচার্জকে সংবল ব্যাপার বলে তাঁৰ পৰামৰ্শ নেওয়া। যাক আৱ দৰি কৰবেন না, এখনীন কোন একজনকে থানার পাঠিয়ে দিন এবং লিখে পাঠান তিনি যেন এখনীন একবাৱ অনুগ্ৰহ কৰে এখানে আসেন, লিখবেন বিশেষ জৱাৰী।

এখনীন দেব ?

হ্যাঁ, আৱ এক মদ্দত ও দৰি কৰা উচিত হবে না।

কিৱাইটীৰ নিৰ্দেশমত তখনীন শতদল একটা কাগজে স্থানীয় থানা অফিসারকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা লিখে এবং কিৱাইটীৰ নামটায় ঐ সঙ্গে যোগ কৰে মালী রঘুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

থানা অফিসার আসুন, ততক্ষণ আমৱা চা-পান-পৰটা শেষ কৰে নিই, কি বলেন শতদলবাৰু ?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি এখনীন আসীছ—, শতদল বোধ হয় সকলৈৱ চায়েৰ ব্যাস্থা কৰতেই ঘৰ হতে নিষ্কান্ত হয়ে গেল।

ৱাগু দেবী সম্মুদ্রে দিককাৰ খোলা জানালাটাৰ ধাৱে গিয়ে চৰ্পচাপ বাইৱেৰ দিকে তাৰিকয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি কিৱাইটীৰ মুখেৰ দিকে তাৰিকয়ে বললাই, তৰো দৃজনেই যে নাৰ্ডস হয়ে গিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে !

কিৱাইটী পকেট থেকে সিগাৱ-কেসটা বেৱ কৰে একটা সিগাৱ কেস থেকে ঢেনে নিয়ে সেটাতে অগ্নিসংযোগেৰ চেষ্টায় ছিল, আমাৱ কথার কোন জবাৰ দিল না। বুবতে পাৱলাম তাৰ নিঃশব্দতাৰ কাৱণ। কোনো একটা বিষয়ে যখনই সে গভীৰভাৱে চিন্তা কৰে, সেই চিন্তাৰ মধ্যেই সে বৰাবৰ এমনভাৱে অন্যমনা হয়ে যায় যে বাইৱেৰ পাৰিপার্শ্বকেৰ থেকে সে যেন অনেক দূৰে চলে যায়।

আমি আৱ একবাৱ কতকটা অনন্যোপায় হয়েই ঘৰটাৰ চাৰিদিকে তাৰিকয়ে তাৰিকয়ে দেখতে লাগলাম। ঘৰটাৰ দৃঢ়-দিকে তিনটে তিনটে কৰে ছেটা জানালা। দক্ষিণেৰ দিকে সমুদ্ৰ, উত্তৱেৰ দিকে একটু প্ৰৱে' দেখা সেই খোলা জানিটা— প্ৰাচীৱ দিয়ে ঘেৱা বাড়িটাৰ পশ্চাতেৰ অংশ। ঘৱেৱ দেওয়ালে বড় বড় সব অয়েল-পেনাটিং এবং সবগুলোই নারী ও পুৱৰুষেৰ প্ৰতিকৃতি। বোধ হয় শিশুপী রূপৰীৰ চৌধুৱীৰ প্ৰৱ'পুৱৰুষদেৰ প্ৰতিকৃতি। প্ৰতেকটা প্ৰতিকৃতি যেন একে-বাবে সজীব, প্ৰাণবন্ত। কী অল্ভূত শিশুপাতুৰ্য !

শতদল এসে প্ৰবেশ কৱল আবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে, আবিনাশেৰ হাতে চায়েৰ টৈ।

চা পাৰিবেশন কৱল ৱাগু দেবী কিৱাইটীৰই অনুৱাধে। চা-পান কৰতে কৰতেই একসময় কিৱাইটী তাৰ অৰ্ধসমাপ্ত কথার জেৱ ঢেনেই যেন বলতে লাগল, যে কথাটা আপনাকে বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম, আমাৱ কিন্তু মনে হয়, এৱ পৱ আৱ আপনার এইভাৱে একা একা বাড়িতে থাকা উচিত হবে না। এবং যদ্বিসংগতও হব্বে না মিঃ বোস—

ৱাগু যেন কিৱাইটীৰ কথাটা কতকটা লুক্ফে নিল। সে বলে ওঠে, আমিও সেই কথাটাই বলব বলব ভাৰছিলাম তোমাকে শতদল। কিৱাইটীৰবাৰু ঠিকই বুলেছেন। এ বাড়িতে আৱ তোমাৱ এভাৱে risk নিয়ে একা একা থাকা উচিত

নয়।

তোমার যেমন কথা রাণ্ডু! একা একা আবার আমি এ বাঢ়িতে আছি কোথায়? ভিতরের মহলে অবিনাশ আছে, দিন দুই হল অবিনাশের এক ভাইপো এসেছে, রমেশ। তাকেও এ বাড়ির কাজে আমি নিয়ন্ত্র করেছি, তাছাড়া দাদুর একমাত্র বোন হিরণ্যমৌৰ্দী দীন্দি ও হরবিলাস দাদু, এবং তাঁদের মেয়ে সীতা আছে। এতগুলো লোক বাঢ়িতে আছে! প্রতিবাদ জানায় শতদল।

তা হোক শতদলবাবু, হরবিলাসবাবু ও তাঁর স্ত্রী-কন্যা তাঁরা সকলেই থাকেন বাইরের মহলে। ভিতরে এত বড় মহলটায় বলতে গেলে আপনি তো একাই থাকেন। অবিনাশের বয়স হরেছে, সেও হয়তো থাকে ভিতরের দিকে, কিন্তু এ অবস্থায় রাত্রে ঘৰ্য্যাদ আচমকা একটা বিপদ-আপদ ঘটে তো সময়মত কারো সাহায্যও তো আপনি পাবেন না! তা ছাড়া আমি এমন একজন লোককে সর্বদা আপনার কাছে কাছে রাখতে চাই, যিনি সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য তো করতেই পারবেন এবং সর্বদা আপনার প্রতি দ্রষ্টিও রাখতে পারবেন। কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু এমন কোন একজন সহচর আমি এখন পাই বা কোথায় মিঃ রায়? শতদল যেন একটু চিন্তিতই হয়ে ওঠে।

এমন কোন আঘাতীয় কেউ কি আপনার নেই, যিনি অন্ততঃ কিছুদিন এসে আপনার কাছে থাকতে পারেন?

কিছুদিন মানে! সপ্তশন দ্রষ্টিতে তাকায় শতদল কিরীটীর মুখের দিকে।

এই ধৰ্মন, দিন ১৫।২০! দেখন না ভেবে কেউ আছেন কিনা? কিরীটী আবার শতদলের মুখের দিকে তাকায় কথাটা বলে।

না, এমন কাউকেই মনে পড়ছে না। তবে আমার দাদুর বোন ঐ হিরণ্যমৌৰ্দী দেবী, ওঁদেরই না হয় আমি অনুরোধ জানাতে পারি ভিতরের মহলে এসে থাকতে—শতদল বলে।

আমার মনে হয়, সেইটাই সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা হবে। আমই কথাটা বলি।

হরবিলাসবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে অনুরোধ জানাতে তাঁরা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হলেন অন্দরমহলে এসে থাকতে এবং মনে হল হরবিলাস যেন প্রস্তাবটা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু কেন যেন আমার মনে হল কিরীটীর এ প্রস্তাবে হরবিলাসবাবু সম্মত হওয়ায় শতদল খুব বেশী সন্তুষ্ট হতে পারেনি। হরবিলাসবাবুকে প্রস্তাবটা জানাবার জন্য আমরাই সকলে নিচে বাইরের মহলে গিয়েছিলাম। হরবিলাস-পরিবারের স্থান পরিবর্তনের ব্যবস্থাটা যাতে ঐদিনই সম্ভব হয়, কিরীটী শতদলকে সেই অনুরোধ জানাল।

শতদল বললে, রঘু ফিরে আসুক, সে এলৈই অবিনাশ ও রঘু সব ব্যবস্থা করে দেবে'খন।

ঠিক এই সময় রঘু এসে ঘরে প্রবেশ করল এবং বললে, দারোগাবাবু এসেছেন নিজেই। বাইরে অপেক্ষা করছেন।

চলন শতদলবাবু, উপরে আপনার ঘরে যাওয়া যাক। রঘু, দারোগা-

বাবুকে উপরের ঘরে নিয়ে এস। রঘুর দিকে তাঁকয়ে কিরীটী নির্দেশ দিল।

শতদলবাবুকে নিয়ে আমরা অন্দরমহলে তাঁর ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম, যদ্ব বাইরে চলে গেল দারোগাবাবুকে ডাকতে।

স্থানীয় থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষাল, বয়স ত্রেষিশের বেশী হবে না।

ভদ্রলোকের বোধ হয় নিয়মিত ব্যায়াম করা অভ্যাস, বেশ বিলঞ্চ পেশী-বহুল চেহারা। লোকট কথাবার্তায় অত্যন্ত অমায়িক। আমি কিরীটীর পরিচয় দিতে তিনি সোজাসে এগিয়ে এসে কিরীটীর সঙ্গে করমদ্বন্দ্ব করলেন, কী সৌভাগ্য, আপনিই মিঃ কিরীটী রায় ?

ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে আমিও যেন মনে মনে অনেক স্বীকৃত পাই। অন্ততঃ এর পর প্রতি পদে যার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে, তাঁর মধ্যে কোন পর্দলসী অহৰ্মিকা বা গাম্ভীর্য নেই। সত্যই ভদ্রলোক !

কিরীটীই শতদলবাবুর সঙ্গে ঘোষাল সাহেবের পরিচয়টা ঘটিয়ে দিল, ইনিই শতদলবাবু, এই বাড়ির মালিক ; ইনিই আপনাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে-ছিলেন মিঃ ঘোষাল।

বলতে লজ্জা নেই মিঃ রায়, আমি কিন্তু ওঁর চিঠিতে আপনি এখানে উপস্থিত জেনেই, থানার সমস্ত কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি এখানে ছুটে এসেছি। কী আশ্চর্য দেখুন, আপনি এখানে এসেছেন জানতেও পারিনি !

মিঃ ঘোষালের কথা শুনে শতদল একবার ঘোষালের দিকে তাকালেন।

কিরীটীর দিকে চেয়ে দোখ, কিরীটী কিন্তু ম্দুর ম্দুর হাসছে। ব্যাপারটার মধ্যে যে হাসির কি কারণ থাকতে পারে সেদিন ঐ মুহূর্তে বৰ্বৰিন, পরে যখন রহস্যটা উপলব্ধি করেছিলাম—থাক্ক সে কথা, বহুবার বহুক্ষেত্রে দেখেছি, কিরীটীর অত্যাশ্চর্য অনুসন্ধানী দ্রুণ্ট রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে সর্বদা এমন ভাবে সজাগ থাকে যে, ভাবতেও বিস্ময়ে যেন অভিভূত হয়ে যেতে হয়। শুধুমাত্র তাই নয়, বহুক্ষেত্রে তুচ্ছাদিপ তুচ্ছ ঘটনা, অনেক সময় যার কোন তাৎপর্যই হয়তো আমরা খুঁজে পাই না,—কিরীটী প্রবলভাবে সেইটার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এবং বারংবার সেইটা নিয়েই নাড়াচাড়া করতে থাকে নিজের মনের গভীর তলদেশে। কিরীটীকে ঐ সম্পর্কে পরে প্রশ্নও করেছি। জবাবে সে বলেছে, প্রত্যেক মানুষেরই বিভিন্ন দ্রুণ্টকোণ আছে স্বীকৃত এবং তার বিচার-পদ্ধতিটাও মানুষ-বিশেষে বিভিন্ন। সামান্য একটা তুচ্ছ ঘটনা, যা হয়তো অনেকেরই চিন্তায় রেখাপাতও করে না, অনেক সময় সেই তুচ্ছ মধ্যেই আমি রহস্যেরই ইঙ্গিত পাই।

কিরীটীর কথায় আবার আমার সম্বৃৎ ফিরে এল, তাহলে আপনাকে আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলেই বলি, মিঃ ঘোষাল। যদিও ব্যাপারটার মধ্যে কাল পর্যন্তও শতদলবাবু কোন গুরুত্বই আরোপ করেন নি এবং গতরাত্রি থেকে কতকটা বাধ্য হয়েই মত পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন, সেটা হচ্ছে ভদ্রলোক বর্তমানে সত্যই বিপম হয়ে পড়েছেন। আরো সোজা করে বললে বলা উচিত, শতদলবাবুর প্রাণ কয়েক দিন থেকে বিপম হয়ে উঠেছে।

বিপম হয়ে উঠেছে, কী রকম? প্রশ্ন করে ঘোষাল মশাই কিরীটীর ঘুর্থের দিকে তাকালেন।

Somebody is after his life !

বলেন কী? সঁত্য?

হ্যাঁ, চার-চারটে attempt, অর্থাৎ অত্যন্ত সাধুপ্রচেষ্টা ওর জীবনের ওপরে হয়ে গিয়েছে!

চার-চার-বার attempt হয়েছে?

হ্যাঁ। প্রথমবার, এই যে দেখছেন খাটের পাশে মাটিতে নামানো বড় অয়েল পেনাইটটা, ট্রাই বোধ হয় ওর অঙ্গতে কোন এক সময় এমন কায়দা করে ফিট করে রাখা হয়েছিল, যাতে করে রাত্রে ঘুমের ঘোরে কোন এক সময় সহসা ছবিটা মাথার উপরে ছিঁড়ে পড়ে ওর মাথাটা থেঁতলে দিয়ে ওর মৃত্যু ঘটায়। যদিও ব্যাপারটা গতকালই মাত্র ওর মুখে শেনা, আজ ঘরে চুকে একসময় ইতিপূর্বে ঐ ছবিটার প্রতি নজর দিয়েই আমি দেখেছি এবং আপনিও ইচ্ছা করলে এগিয়ে গিয়ে দেখে আসতে পারেন, ছবিটা টাঙানো ছিল একটা মোটা তার দিয়ে এবং সে তারটাকে এমন ভাবে সামান্য একটু অংশ বাঁক রেখে কাটা হয়েছে যে ছবির ভাবে বাঁক তারের অংশটাকু ছিঁড়ে পড়া একসময় এমন কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়।

কিরীটীর কথা শুনে আমরা সকলেই খাটের পাশে নামিয়ে রাখা ছবিটির দিকে তাকালাম এবং বুবলাম কিরীটীর কথাটা মিথ্যা নয়। গতকাল সকালে হোটেলের সামনে সৌ-বীচে শতদলবাবু ছবি সম্পর্কে কিরীটীকে কী বলে-ছিলেন ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ আবার হঠাতে কিরীটীর কথায় মনে পড়ে গেল।

এগিয়ে গেলাম সকলে কিরীটীর সঙ্গে-সঙ্গেই ছবিটার দিকে।

যে তারের সাহায্যে ছবিটা দেওয়ালে পেরেকের সঙ্গে পাকাপোক্তভাবে টাঙানো ছিল, দেখলাম পরামীকা করে, সঁত্য সঁত্যই সে তারটা কোন কিছুর সাহায্যে এমন ভাবে কাটা যে অংশটাকু কাটা ছিল না সেটা ছবির ভাবেই ছিঁড়ে গিয়েছে। কিরীটী কথাটা ভোলেনি এবং আজ ঘরে প্রবেশ করে অন্যান্য কথাবার্তার মধ্যেও ছবিটাকে লক্ষ্য করেছে এবং বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই সবটাকু লক্ষ্য করেছে ইতিমধ্যেই। কিরীটী আবার বলতে লাগল, তারপর স্বিতার্যবার attempt হয় এই বাড়ির বাইরে। এখানে আসবার সময়ই লক্ষ্য করে থাকবেন হয়তো মিঃ ঘোষাল, বাড়ির গেট থেকে যে রাস্তাটা বরাবর সামনের দিকে চলে গিয়েছে, বাড়িটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত বলে রাস্তাটা ক্ষেত্রে ঢালু হয়ে নিচে গিয়েছে, সেই ঢালু রাস্তা দিয়ে একসময় শতদলবাবু যখন আবাসনস্ক হয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন, পিছন থেকে কেউ একটা বড় পাথরের চাঁই গাড়িয়ে দিয়ে ওকে পিষে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল।

ঘোষাল শতদলের মুখের দিকে জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকালেন।

হ্যাঁ। ম্দু, কঠে শতদল বললে, প্রথমটায় আমি বিশ্বাস করিনি ব্যাপারটা, ভেবেছিলাম হয়তো সাধারণ ভাবেই হঠাতে পাথরের চাঁইটা নিচের দিকে গাড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন বুবতে পারছি, কিরীটীবাবুর কথাই ঠিক, that was also an attempt on my life !

তারপর তৃতীয় প্রচেষ্টা গতকাল সকালে সমন্বয়েকত হোটেলের সামনে সৌ-বীচে—কিরীটী আবার বলে।

বলেন কি মিঃ রায়?

হ্যাঁ, and that was a bullet ! কিন্তু আততায়ী লক্ষ্যস্ত হয়। ফলে

উনি তো বেঁচে যানই, আমার প্রৈত্তক প্রাণটাও—মানে প্রাণ ঠিক নয়, মাথাটাও বেঁচে যাই।

সত্তা? বিস্ময়ে যেন একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছেন ঘোষাল কিরীটীর কথায়।

হ্যাঁ, আমার মাথার টুপিটা ফুটো করে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ব্লেটো বের হয়ে যাই। এবং সেই ব্যাপারের পরই আর্কশিকভাবে ঊর সঙ্গে আমাদের চেনা-পরিচয়। আমি আর সুন্দর তখন ঠিক ঐ সময় সী-বীচে বসে রৌদ্র-সেবন করছিলাম।

কই, এ কথা তো তুমি কাল আমাকে বলোনি শতদল! এতক্ষণে প্রশ্ন করল রাগু শতদলকে।

কী বলব তোমাকে, গতকাল ব্যাপারটা আমি কি বিশ্বাস করেছিলাম! শতদল বিষয় ভাবে জবাব দেয়।

কিন্তু দিনের আলোয় অমন জায়গায় কাউকে গুলি করে হত্যা করবার প্রচেষ্টা, এ যে তাঙ্গজ ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে মিঃ রায়! আপনি না হয়ে অন্য কারো মুখে ব্যাপারটা শনলে তো আমি বিশ্বাসই করতাম না, হেসেই উড়িয়ে দিতাম। ঘোষাল বললেন।

ব্যাপারটা অবশ্য কতকটা সেই রকমই বটে, মিঃ ঘোষাল। তবে অনেক সময় দেখা গিয়েছে, সত্যিকারের তীক্ষ্ণবৃদ্ধিসম্পন্ন ক্রিয়ন্যাল দৃ-একটা ঐ প্রকারের দৃঃসাহসের কাজ করে থাকে। যাই হোক, এর পর আমি কতকটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই শতদলবাবুকে fourth attempt সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিই!

দিয়েছিলেন ঊকে সতর্ক করে?

হ্যাঁ। And the fourth attempt was rather too early! ভাবতেই পারিনি, এত দ্রুত আবার আততায়ী ঊর জীবনের উপরে attempt নেবে! এবারেও গুলি এবং এই ঘরের মধ্যে!

এই ঘরের মধ্যে?

হ্যাঁ। পিছনের বাগান থেকে কেউ ঊকে গতরাতে টেবিলের সামনে আলোয় বসে লেখাপড়া করতে দেখে নিশ্চিন্ত মনে বল্দুক চালায়। এবং সোঁভাগ্য-বশতঃ এবারের নিষ্কিপ্ত মৃত্যুবাণিটও লক্ষাভেদে করতে সক্ষম হয়নি আততায়ীর। আলোর চিমনিটার উপর দিয়ে গিয়েছে। এরপর আপনাকে সংবাদ না দিয়ে থাকাটা এবং সব কিছু আপনার গোচরণীভূত না করাটা বিবেচনার কাজ হবে না বুবোই আপনাকে সংবাদ পাঠানো হয়েছে। Now you are in the spot, এবারে আপনি এর একটা বিহিত করুন, কারণ আইন আপনাদেরই হাতে। আমরা সম্পূর্ণ ততীয় ব্যক্তি, বৃদ্ধি বা মৌখিক সাহস দিতে পারি ঊকে, কিন্তু সত্যিকারের সাহস বলতে যা বোবায় একমাত্র তা উনি আপনাদের কাছেই আশা করতে পারেন ও পেতে পারেন। কিরীটী চূপ করল।

ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সমস্ত ঘটনা শেনবার পর তাঁর অবস্থা কতকটা ন যয়ো ন তচ্ছোঁ।

ভদ্রলোক বিমুক্ত ও বিহুল হয়ে পড়েছেন। অসহায়ের মতই ঘোষাল কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে আমি যে ঠিক কি ভাবে ঊকে সাহায্য করতে পারি,

সেটা তো বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ রায় ! অবশ্য যদি উনি ভালো বোবেন তো জন-দুই পাহারাওয়ালা এবাড়তে চার্কিশ ষণ্টার জন্য মোতাবেন করতে পারি !

কিন্তু তাতে করে বিশেষ কোন ফল হবে বলে কি আপনার মনে হয়, মিঃ ঘোষাল ? কিরীটী ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ।

তবে কি ভাবে আমি সাহায্য করতে পারি বলুন ! I would be always at your service ! ঘোষাল বললেন ।

তার চাইতে যদি কোন plain dress-এর গোয়েন্দাকে সর্দা শতদল-বাবুকে পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করা যায়,—কথাটা আমি বললাম ।

না, না মিঃ ঘোষাল, ও-সব কিছুর প্রয়োজন নেই । তার চাইতে যা বলছিলেন, রাতে জন-দুই যদি পাহারাওয়ালা আমার এ বাড়টা পাহারা দেবার জন্য পাঠাতে পারেন, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি । শতদলবাবু আমার কথার প্রতিবাদ জানান ।

কিরীটী নিঃশব্দে চোখ বুজে আপন মনে চেয়ারটার উপর বসে পা নাচাচ্ছিল, শতদলবাবুর প্রতিবাদে একটিবার মাত্র বোজা চোখ দৃঢ়ি খুলে শতদলের মুখের দিকে তাকিয়েই আবার প্রবৰ্বৎ পা নাচাতে লাগল ।

শতদলবাবুর প্রস্তাবে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন বলে ঘোষালকে মনে হল । তিনি কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি, মিঃ রায় ?

কিরীটী সহসা উঠে দাঁড়ায়, হ্যাঁ, আপাততও তাই করুন । আচ্ছা শতদল-বাবু, আমরাও তাহলে উঠি । আর্পন তাহলে হরিবলাসবাবুদের অন্দরমহলে আনার ব্যবস্থা করুন আজই ।

হ্যাঁ, তাই করব । তবে আপনার সাহায্যও কিন্তু আমি চাই, মিঃ রায় !

কিরীটী হাসল, তা অবশ্যই পাবেন বইকি । তা ছাড়া ব্যাপারটায় আমি নিজেও কম interested নই । চল সুরত,—কিরীটী দরজার দিকে অগ্রসর হয় । ঘোষালও আমাদের অনুসরণ করলেন ।

সিঁড়ির শেষ ধাপে অবিনাশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ।

কিরীটী হঠাতে দাঁড়াল, অবিনাশ ?

আজ্জে বাবু !

অনেকদিন এ বাড়তে আছ, না ?

হ্যাঁ, বাবু মশাইয়ের কাছেই আমি তো পনের বছর চার্কার করেছি—

হঠাতে কিরীটী শতদলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা শতদলবাবু, কর্তব্য আগে আপনার ঘরের সেই ছবিটা ছিঁড়ে পড়েছিল বলুন তো ?

তা দিনচারেক আগে হবে । শতদলবাবু জবাব দেন ।

ব্যাপারটা তুমি জান অবিনাশ ? কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে এবারে অবিনাশকে প্রশ্ন করে, শতদলবাবুর ঘরের ছবি ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিল !

হ্যাঁ বাবু, দেখেছি । তাজ্জব ব্যাপার ! অমন মোটা তারটা যে কী করে ছিঁড়ল—

ছেঁড়েন তো—কেউ কেটে রেখেছিল তারটাকে ! কিরীটী জবাব দেয় ।

বলেন কি বাবু ! বিস্মিত অনিবাশ কিরীটীর মুখের দিকে তাকায় ।

হ্যাঁ । তুমি আর রঘু ছাড়া তো বাড়ির মধ্যে কেউ ঢোকে না ? কিরীটী-

আবার প্রশ্ন করে।

আজ্জে না। তবে দিনকতক হল আমার ভাইপো এসেছে, বাবু তাকে চাকরিতে বহাল করেছেন দয়া করে।

ও! বাবুর রাঙ্গাবালা করে কে?

হিন্দুস্থানী ঠাকুর আছে একটা, বাবুর সঙ্গেই তো এসেছে। অনিবাশ জবাব দেয়।

কই, আপনি তো সেকথা বলেননি শতদলবাবু? কিরীটী প্রশ্ন করে শতদলের মুখের দিকে তাকায়।

মনে ছিল না। হ্যাঁ, ভুখনা আছে, আমার সঙ্গেই এসেছে, লোকটা বোবা আর কালা।

বোবা আর কালা! এমন রঞ্জিট কোথায় পেলে শতদল? প্রশ্নকারী রাণু দেবী।

লোকটা অনেকদিন থেকেই আমার কাছে আছে। জাতে ছগ্নী। রাঙ্গা করে চেংকার। শতদল জবাব দেয়।

কই ডাকুন তো, দৰ্দি লোকটাকে! আমিই বলি।

অবিনাশ, ভুখনাকে ডেকে নিয়ে এস তো! শতদল অবিনাশের দিকে তাকিয়ে আদেশ করে।

অবিনাশ ভুখনাকে ডাকতে চলে গেল।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম সকলে।

॥ ৬ ॥

ভুখনাকে ডেকে নিয়ে এল অবিনাশ।

দৃষ্টব্য বটে ভুখনা। যেমনি লম্বা তেমনি ঢাঙ্গা। দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ফুট ছয় ইঞ্জির কাছাকাছি হবে। দেহের অর্তারিণ দৈর্ঘ্যের জন্যই বোধ হয় লোকটা একটু কোলকুঁজো হয়ে হাঁটে। বড় বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখের তারায় কেমন একপ্রকার বোবা নির্বাধ দৃষ্টি। ছড়ানো চোকো চোয়াল। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, অন্ধকারে আচম্কা লোকটাকে দেখলে অঁতকে ওঠাও কিছু অসম্ভব নয়।

লোকটা তো বলছিলেন বোবা আর কালা, তা ওকে দিয়ে কাজ চালান কেমন করে শতদলবাবু? প্রশ্ন করল কিরীটী।

অনেকদিন আমার কাছে থেকে থেকে এখন আমার মুখ নাড়া দেখলেই ও ব্যাকতে পারে কী আমি বলতে চাই। তাই কাজকর্মের কোন অসুবিধা হয় না। তা ছাড়া একমাত্র রাঙ্গা করানো ছাড়া ওকে দিয়ে তো আর অন্য কোন কাজই করানো হয় না। শতদল জবাব দেয়।

এখনে আসবার পূর্বে তো আপনি কলকাতাতেই ছিলেন—তাই না শতদল-বাবু?

হ্যাঁ, কলকাতার একটা বেসরকারী কলেজের আংগ ইংরেজীর অধ্যাপক।

কিরীটী আবার অবিনাশের দিকে ফিরে তাকিয়ে তাকেই প্রশ্ন করল, ভুখনা একেবারেই শুনতে পায় না অবিনাশ, না?

তাই তো মনে হয় বাবু, একেবারে বেহৃদ কালা!

এমন সময় সহসা গতরাত্রের সীতার সেই ভয়ঙ্কর আলসেসিয়ান কুকুরটার
ডাক শুনতে পেলাম।

ঘেউ ঘেউ করে টাইগার ডাকছে।

আমরা সকলেই কুকুরের ডাকে চমকে বোধ হয় ক্ষণেকের জন্য অন্যমন্ত্রক
হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ কিরীটীর দিকে তাকিয়ে দেখি, নিষ্পলক দ্রষ্টিতে সে
ভুখনার দিকেই তাকিয়ে আছে।

ভুখনার ঢোকে কিন্তু সেই বোবা নির্বাধ দ্রষ্ট। নিষ্প্রাণ, স্থির।

চলুন যিঃ ঘোষাল! কিরীটীই আবার সর্বাগ্রে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।
আমরাও সকলে তাকে অনুসরণ করলাম।

শতদল গেট পর্যন্ত আমাদের পের্চে দিয়ে বিদায় নিয়ে ফিরে গিয়েছে।

নিঃশব্দে সর্বাগ্রে কিরীটী ও যিঃ ঘোষাল পাশাপাশি এবং আমি ও রাণু
দেবী পাশাপাশি পাহাড়ের ঢালু পথটা দিয়ে এগিয়ে চলেছি হোটেলের দিকেই।

সকালের শীতের রৌদ্রে নীল সমন্বয়ে যেন চূর্ণ ঢেউয়ের মাথায় মাথায় গুচ্ছ
গুচ্ছ জড়ই ফুল ছাড়িয়ে আপন মনে খেলে চলেছে। আমার মনের মধ্যে তখন
'নিরালা' ও তার অধিবাসীদের কথাই ঘোরাফেরা করছে।

শতদলবাবুর জীবন বিপন্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন? কোন গোপন রহস্য
কি ঐ 'নিরালা'র মধ্যে লুকিয়ে আছে? কিংবা কোন গুপ্তধন? শতদলই শিল্পী
রণধীর চৌধুরীর যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হল কি করে? আইনের
দিক থেকে সীতা বা তার মা হিরণ্যয়ী দেবীর কি কোন স্বত্বই নেই মত
শিল্পীর সম্পত্তি? এবং শতদল, সীতা ও হিরণ্যয়ী দেবী ব্যতীত আর
কোন উত্তরাধিকারীই কি নেই? আর শতদলবাবুই বা বলেন কি করে তিনিই
তাঁর মত দাদুর যাবতীয় সম্পত্তির একমেবাচ্চিতীয়ম্ উত্তরাধিকারী? কোন
উইল বা ঐ জাতীয় কোন লেখাপড়া আছে কি? মত শিল্পী রণধীর চৌধুরীর
কি কোন আইন-উপদেষ্টা সালিস্টার বা অ্যাটোর্নি ছিল না? না আছে?
বৎসরাধিককাল হরবিলাস, তাঁর স্ত্রী হিরণ্যয়ী ও তাঁদের কন্যা সীতা ঐ
'নিরালা'তে আছেন এবং রণধীর চৌধুরীর জীবিতকালে তাঁরই আমন্ত্রণে রূপ
হিরণ্যয়ী ওখানে আসেন—তাঁরা বাইরের মহলে থাকেন কেন? বাবস্থাটা কি
রণধীর চৌধুরীরই? তাই যদি হয়, তাহলে নিজের রূপা ভাগিনীর প্রতি এ
ব্যবহার কেন? কোন কারণবশতঃই কি তিনি—রণধীর চৌধুরী তাঁর রূপ
বোনকে বাইরের মহলেই এনে স্থান দিয়েছিলেন? ভাইয়ের মত্তু হয়েছে,
তথাপি হিরণ্যয়ী দেবীরা এখনো এখান হতে অন্যত যাননি কেন? হরবিলাসদের
কী ভাবেই বা সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়? প্রবেই বা কী করতেন, এখনই বা
কী করেন! পেনশন পান, না কোন জিমদারী বা সংগৃত অর্থ আছে!
তাই যদি থাকে, তাহলে এভাবে হতাদেরে বাহিরহলে পড়ে থাকবারই
বা কী কারণ থাকতে পারে! বাড়ির প্রত্যেকটি প্রাণীই যেন আমার মনের মধ্যে
আনাগোনা করে ফিরতে থাকে। একান্তভাবে পজুরীর শরণপন্থ ও মুখাপেক্ষী
হরবিলাস, তাঁর স্ত্রী—পক্ষাঘাতগ্রস্ত চলচ্ছিঙ্গীন প্রোঢ়া স্ত্রী হিরণ্যয়ী; তাঁর
চক্র অন্তর্ভৰ্দী দ্রষ্ট। তাঁদের একমাত্র তরুণী কন্যা সীতা যেন একটি
নির্বাক দৃষ্টি। সদা-সঙ্গী তার ভীষণাকৃতি আলসেসিয়ান কুকুর—টাইগার।
ব্যাপ্তি প্রতান ভৃত্য অবিনাশ। প্রতান মালী রঘু। শতদলের বোবা ও
কালা ছত্রী অন্তর ভুখনা। সহজ সরল অধ্যাপক মানুষ শতদল, ক্লোডপ্রতির

একমাত্র কন্যা অনন্যাসুন্দরী তরুণী রাগ দেবীর অনুরূপ।

নিঃশব্দেই আমরা সকলে দীঘি পথটা অতিক্রম করে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘোষাল কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে এবারে আমাকে বিদায় দিন মিঃ রায়।

তা কি হয়, এক কাপ চা অন্তত না খেয়ে—আসুন? রাগ দেবী, আপনি? কিরীটী রাগুর মধ্যের দিকে তাকাল।

আমাকে ক্ষমা করতে হবে মিঃ রায়—কয়েকটা জরুরী চিঠি সকালেই আমাকে শৈশ করতে হব। তা ছাড়ি অনেকক্ষণ বের হয়েছি, মা হয়তো ব্যস্ত হয়ে আছেন।

রাগ বিদায় নিয়ে উপরে চলে গেল।

আমরা তিনজনে হোটেলের বারান্দায় এসে বসলাম তিনটে চেয়ার টেবিলে নিয়ে; আমার মাথার মধ্যে তখনও পূর্বের চিন্তাগুলোই নিঃশব্দে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে। সম্ভুতের রৌদ্রালোকিত সম্ভুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে রইলাম আমি।

কিরীটী ও ঘোষাল নিম্নস্বরে কী সব আলাপ করতে লাগল।

মধ্যে মধ্যে কেবল তাদের দু-একটা কথার অঙ্গস্ত টুকরো শ্রদ্ধিপথে আমার ভেসে আসছিল। বুলাই সম্পূর্ণ অন্য সাধারণ কথাবার্তা। ‘নিরালা’ সম্পর্কে বা শতদল-ঘটিত কোন আলোচনাই নয়।

দিন দুই এর পর যেন কতকটা নির্বাবাদেই কেটে গেল। দুটো দিন কিরীটীও বিশেষ হোটেল থেকে কোথাও একটা বের হয়নি। বেশীর ভাগ সময়ই বারান্দায় ডেকচেয়ারে শুয়ে নিঃশব্দে একটার পর একটা সিগার ধৰ্য্যস করেছে। মনে হয়েছে, সে যেন চার্যাদিক হতে হঠাত নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বিশেষ কোন একটা চিন্তায় সমাধিস্থ হয়ে পড়েছে। হতীয় দিন হঠাত বিকালের দিকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চল সুরত, সম্ভুদ্রের ধার দিয়ে একটা ঘূরে আসা যাক।

দুজনে নিঃশব্দে সম্ভুদ্রের বাল্বেলার উপর দিয়ে পাহাড়টার দিকে হেঁটে চলেছি, হঠাত দূরে মনে হল যেন কে একটি তরুণী আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। অস্তমাখী স্লান সূর্যলোকে দূর হতে সীতাকে দেখে আমার চিনতে কঢ় হলেও কিরীটীর কিন্তু চিনতে কঢ় হয়নি।

সে বলে ওঠে, আশ্চর্য! সীতা দেবী একাকী আসছেন? সেগু তাঁর সেই চিরানুগত সাথী দুর্বল ব্যাঘ-সদৃশ ভৱংকর আলসেসিয়ান কুকুর টাইগারকে কই দেখছি না যে!

সীতা সীতাই আসছে।

কাছাকাছি আসতে কিরীটীই প্রথমে হাত তুলে সম্ভাষণ নমস্কার জানাল, শুভ সন্ধ্যা। এই যে সীতা দেবী, একা যে, আপনার অনুগত সাথীটি কই? তাকে দেখছি না যে?

নমস্কার। সীতাও হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললে, আমার অনুগত সাথী?

হ্যাঁ, আপনার সেই টাইগার?

সহসা লক্ষ্য করলাম কিরীটীর প্রশ্নের সেগু সীতার চোখের তারা দুটি যেন কেমন বিষম হয়ে উঠল, কাল রাতে হঠাত গুলি লেগে বেচারার একটা

পা জখম হয়েছে, মিঃ রায়। কাতুর কষ্টেই সীতা বললে।

বলেন কী, টাইগার গুলতে জখম হয়েছে! হাসতে হাসতে কিরীটী
শেষের কথা কয়টি উচ্চারণ করে, তারপর সহস্র সীতার মুখের দিকে তার্কিয়েই
বলে, কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? এ যে বাঘের ঘরে ঘোষের ব্যাপার!

সীতাই আশ্চর্য ব্যাপার, মিঃ রায়! আমি আপনার সঙ্গেই হোটেলে দেখা
করতে যাচ্ছলাম—

আমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছলেন?

হ্যাঁ। আপনি তো জানেন, সেদিনই আমাদের অন্দরমহলে থাকবার জন্য
শতদল-ভাগ্নে অন্তরোধ জানান। আপনারা চলে আসবার পর কতকটা যেন নিজে
উৎসাহ দেখিয়েই একপ্রকার আমাদের অন্দরমহলের দর্শকণ দিককার যে দুটো
ঘর খালি পড়ে ছিল, তাতে নিয়ে গিয়ে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেন।
একটা দিন ও একটা রাত ভালোই লাগাছিল। কিন্তু—, কথাগুলো বলে সীতা
যেন একটু দম নেয়।

কিরীটীও আমি দুজনই উদ্গ্ৰীব হয়ে সীতার কথা শুন্নাছি।

সীতা আবার বলতে শুনুৰ করে, কাল রাত তখন বোধ হয় গেটো দুই হবে।
অন্যান্য দিনের মতই টাইগার আমার ঘরের বাইরে শুয়ে ছিল। হঠাৎ তার ক্রুশ
একটা চাপা গোঁ-গোঁ শব্দে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল কোন কারণে
টাইগার যেন হঠাৎ ভীষণ খাম্পা হয়ে উঠেছে। তারপরই পর পর দুটো গুলির
শব্দ!

গুলির শব্দ?

হ্যাঁ। প্রথমটায় তো সীতা কথা বলতে কি মিঃ রায়, ভয়ে আতঙ্কে আৰ্ম
একেবাবে কাঠ হয়েই গিরেছিলাম ঘটনার আকস্মিকতায়। কিন্তু চিৰদিনই ভয়
বস্তুটা আমার একটু কম। নিজেকে সামলে নিতে তাই আমার খুব বেশী সময়
লাগেন। তাড়াতাড়ি বিছানা হতে উঠে দুরজ্যটা খুলে একেবাবে বাইরে চলে
এলাম। মাঝেরাতে কাল বোধ হয় চাঁদ উঠেছিল। শ্লান চাঁদের আলো বারান্দাটার
উপরে এসে পড়েছে। দেখলাম টাইগার তখনও আমার ঘরের দুরজার অল্প দূরে
দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তার্কিয়ে গোঁ গোঁ করে গজুরাচ্ছে ঘন্টায়। ইতিমধ্যে
পাশের ঘরে মা-বাবার এবং উপরের তলায় শতদল-ভাগ্নেরও ঘূম ভেঙে গিরেছিল,
তারাও যে যার ঘর থেকে টাইগারের গজন শুনে বের হয়ে এসেছে। শতদল-
ভাগ্নের ডাকাডাকিতে অবিনাশ ও ঘূম ভেঙে উঠে এল। আৰ্ম টাইগারকে ডাকতেই
সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ভালো করে তার্কিয়ে দৈর্ঘ্য
তার ডান পা-টা বেশ গুরুতর ভাবেই জখম হয়েছে। রক্ত ঝরছে তখনও।
বারান্দাতেও রক্ত। আৱ—আৱ বারান্দায় দেখলাম, অনেকগুলো কেডস্ জুতোৱ
সোলের ছাপ। ছাপগুলো জুতোৱ সোলে বোধ হয় ভিজে কাদা লেগেছিল
তারই। এবং জুতোৱ ছাপ লক্ষ্য করে দেখলাম, বৰাবৰ বারান্দার দর্শকণ প্রাণ্তের
শেষ পর্যন্ত যেখানে প্রাচীর শুনুৰ হয়েছে এবং প্রাচীরেৰ গায়ে যে দুরজাটা সেই
পর্যন্ত চলে গেছে। দুরজাটা কিন্তু বন্ধ। দুরজাটা বাইরেৰ থেকে শিকল
তুলে বন্ধ কৰে দিয়েছে। এদিককার খিল খোলা। দুরজাটা ভিতৰ থেকেই
খিল এঁটে বন্ধ কৰা ছিল।

সীতা চৃপ কৱল।

কিরীটী আগাগোড়া সীতার বৰ্ণত কাহিনী গভীৰ মনোযোগ সহকাৰে

শুনছিল। এতক্ষণে কথা বলল, আচ্ছা সীতা দেবী, ইতিপূর্বে আর কখনো
ঐ বাড়িতে থাকাকালীন সময়ের মধ্যে আপনার টাইগারের উপর কোন প্রকার
attempt হয়েছিল কি?

এখন মনে হচ্ছে, দিন দশেক আগে একবার বোধ হয় টাইগারের উপর কোন
attempt হয়েছিল।

কী রকম?

সে-রাতেও ঠিক অর্মানি কালকের রাতের মতই টাইগারের চাপা গর্জন শুনে
ঘর থেকে আমি বের হয়ে আসি কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না—

কোন miring-এর শব্দ শুনেছিলেন সে-রাতে?

না।

হ্যাঁ। কিরীটী মহূর্তকাল কি যেন ভাবে, পরে প্রশ্ন করে, শতদলবাবু,
কোথায়? এখন বাড়িতে আছেন নাকি?

তিনি ষষ্ঠাখানেক আগেই বের হয়ে এসেছেন; জানি না ঠিক কোথায়
গিয়েছেন!

আচ্ছা সীতা দেবী, জুতোর সেই ছাপগালুো বারান্দায় এখনো আছে কি?
কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

বোধ হয় আছে। কারণ সকালেই তো থানা-অফিসার মিঃ ঘোষালকে সংবাদ
দেওয়া হয়েছিল।

মিঃ ঘোষাল গিয়েছিলেন ওখানে?

হ্যাঁ। তিনি দুপুরেই এসেছিলেন। বললেন, আপনার সঙ্গে তিনি দেখা
করবেন। বুরতে পারাই তিনি দেখা করেন নি।

সন্ধ্যার ধূসর অস্পষ্টতা ক্রমে যেন চারিদিকে চাপ বেংধে উঠছে। একটু
একটু করে চারিদিকার পটচ্ছায়া লম্পন্ত হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যাকাশে দেখা দিতে
শুরু করেছে একটি-দুটি করে তারা। অল্পদূরে ডানাদিকে সমন্বয় সন্ধ্যার তরল
অন্ধকারে একটানা গর্জনে জানাচ্ছে তার অস্তিত্ব।

ক্ষণগালের জন্য কিরীটী বোধ হয় কী চিন্তা করে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে
সীতা দেবীর দিকে তারিকে বলে, সীতা দেবী, আপনার বাবা মিস্টার ঘোষ
এখন বাড়িতেই তো আছেন, না?

হ্যাঁ। বাড়ি থেকে বড় একটা তিনি তো কোথাও বের হন না। ম্দুরুণ্ঠে
জবাব দেয় সীতা।

চলুন। একবার না হয় আপনাদের ওখান থেকেই ঘুরে আসা যাক।
শতদলবাবু, এর মধ্যে ফিরে এলে তাঁর সঙ্গেও হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে,
কী বলেন?

চলুন। হতেও পারে। কতকটা সোংসাহেই সীতা যেন কিরীটীর প্রস্তাবটা
অনুমোদন করে।

কিরীটী ও সীতা পাশাপাশি এগিয়ে চলে, আমি ওদের অনুসরণ করতে
লাগলাম।

মাথার উপরে শীতের কুয়াশাহীন প্রথম রাতের কালো আকাশে তারা-
গলো বেশ উজ্জ্বল মনে হয় এখন। সমন্বয়ের ভাঙা ঢেউয়ের শীর্ষে শীর্ষে
ফসফরাসের সোনালী ঝিলিক চিক-চিক করে ওঠে। কালো জলে আলোর
চৰ্মাক ওগুলো যেন।

সহসা কিরীটীই আবার প্যাপার্শ চলতে চলতে সীতাকে প্রশ্ন করে,
আপনি আমার ওখানে ঘাঁচলেন কেন মিস ঘোষ ?

ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করব—

পরামর্শ ! কিসের বলুন তো ?

এখানে, মানে ঐ বাড়িতে থাকাটা আর ভলো হবে কি না তাই ভাবছি—
কেন ?

ভাবছিলাম মা'র বর্তমান অবস্থা ভেবেই। এর্ঘনিতে মা'র নার্ভ খ'র স্ট্রং
কিন্তু গতরাত্রের ব্যাপার দেখেশুনে মা যেন বেশ একটা নার্ভাসই হয়ে পড়েছেন
বলে মনে হয়। জানেন তো, একে প্যারালেটিক রোগী—ডাক্তারের অ্যাডভাইস
আছে যেন ঊর পক্ষে কোন সময়েই কোনপ্রকার মানসিক উদ্ভেজনার কারণ না
ঘটে। মাকে সর্বদাই তাই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি যাতে ঊর মানসিক শাস্তি
অটুট থাকে। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে ঐ বাড়িতে যা সব ঘটেছে—সুস্থ-
মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষেই উদ্ভেজনার কারণ হচ্ছে, তা মা তো রোগী—

কথাটা অবশ্য ভাববার, মিস ঘোষ ! কিন্তু আপনার বাবা কী বলেন ?
কিরীটী প্রশ্ন করে।

বাবা ! এসব ব্যাপারে অত্যন্ত indifferent। জান হওয়া অবধি দেখে
আসাছ তো, কোন ব্যাপারেই তিনি বড় একটা থাকতে চান না। নির্লিপ্ত।
অস্ত্রখ'লেও মা-ই সব কিছু দেখাশোনা করেন। তাঁর পরামর্শমতই সব চলে।
কিন্তু এক্ষেত্রে যে মাকে নিয়েই কথাটা ।

সীতার কথার এবারে আর কিরীটী কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে কেবল
পথ অতিক্রম করতে থাকে।

সীতাই আবার কথা শব্দ করে, মা'র আপনার উপরে একটা অসাধারণ
শ্রদ্ধা আছে মিঃ রায়। আমার তো মনে হয়, এ অবস্থায় আমাদের আর ও
বাড়িতে বেশী দিন থাকা উচিত হবে না। যে যাই বলুক, definitely some
foul play is going over there ! তা ছাড়া স্বাক্ষেপের জন্যই মা'র ঐ বাড়িতে
থাকা—স্বাক্ষেপের দিক দিয়েও মা'র বর্তমানে বিশেষ যে কোন progress হচ্ছে
বলেও আমার মনে হয় না—

কিন্তু কোন প্রকার foul play-ই যে বর্তমানে ঐ বাড়িতে চলেছে তাই বা
আপনার ধারণা হল কেন মিস ঘোষ ?

নইলে গত কয়েক দিন ধরে যে সব ব্যাপার ঘটেছে, এ-সবের আর কি
explanation হতে পারে, আপনাই বলুন ! একটা হানাবাড়ি—

ভূত-প্রেতে আপনার বিশ্বাস আছে নাকি সীতা দেবী ?

না, না—ঠিক সেভাবে কথাটা আমি অবশ্যই বলিনি, মিঃ রায়। বলছিলাম,
যা ও বাড়িতে ঘটেছে, যন্ত্র-তর্ক দিয়েও যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি
না !

আমার কি মনে হয় জানেন সীতা দেবী ?
কী ?

এখন ও-বাড়ি ছেড়ে হয়তো আপনার মা অন্যত্র কোথাও যেতে রাজী
হয়েন না।

বিশ্বাস-ভরা দ্রষ্টব্যে কিরীটীর ঘুরের দিকে চোখ তুলে তাকাল সীতা,
এ কথা বলাহেন কেন ?

সীতার প্রশ্নের জবাবটা কিরীটী বোধ হয় একটু ঘুরিয়েই দিল, আপনার মাঝ স্বগাঁয় রংধীর চৌধুরীর সম্পত্তিতে আপনাদের কি কোন অংশই নেই, মিস ঘোষ ?

তা তো জানি না !

রংধীর চৌধুরী গত হয়েছেন কর্তাদিন ?

মাস দৃষ্টি হল।

তাঁর কোন উইল বা ঐজাতীয় কোন নির্দেশনামা নেই ?

বলতে পারিব না।

আপনার মাঝেও কিছু শোনেননি ?

কিরীটীর শেষ প্রশ্নে সীতা কেমন যেন একটু ইতস্তত করতে থাকে। কিরীটীর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধৎসাতে সেটুকু এড়ায় না। কিরীটী সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রশ্ন করে, সাধারণ ভাবে বিচার করে দেখতে গেলে আপনার মাঝেও তাঁর ভাইয়ের সম্পত্তিতে কিছু দাবী থাকাটা তো বিচিত্র নয়। তবে অবশ্য যদি তিনি তাঁর ধাবতীয় সম্পত্তি উইল করে তাঁর একমাত্র মেয়ের ছেলে-নাতকেই দিয়ে গিয়ে থাকেন তো আলাদা কথা। আপনার মাঝে শতদলবাবুকেও ও-সম্পর্ক কোন দিন বলতে শোনেননি ?

শতদল-ভাগ্যে এখানে আসবার কয়েক দিন পরে মাঝে তাঁর ঐ ধরনের কি সব কথাবার্তা হচ্ছিল, আর্য বিশেষ কান দিইনি। মৃদুকণ্ঠে সীতা জবাব দেয়।

ইতিমধ্যে আমরা প্রায় ‘নিরালা’র গেটের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। অন্ধকারে কালো আকাশপটের নীচে ‘নিরালা’ যেন কেমন একটা ভয়াবহ ছায়ার মতই মনে হয়। যেন কোন প্রাণীত্বাসীক ঘুগের বিরাটকাঁঠ রক্তলোপ জানোয়ার ঘাপটি মেরে বসে আছে। নিজের অজ্ঞাতেই গা-টা অকারণেই কেমন যেন ছমছম করে ওঠে।

গেটটা খোলাই ছিল। সর্বাগ্রে সীতা, পশ্চাতে কিরীটী, তারও পশ্চাতে আর্য ভিতরে প্রবেশ করলাম।

অস্পষ্ট তারকার আলোয় চারিদিককার গাছপালা কেমন ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট। হঠাৎ তিনজনেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

দোতলার একটা জানালা খুলে গেল আর সেই জানালাপথে একটা শক্ত-শালী টর্চের অনুসন্ধানী আলো নীচের অন্ধকারে এসে উর্ধবর্দ্দিকে উৎক্ষিপ্ত হল। শূন্য আকাশপথে অন্ধকারে আলোর রেখাটা কয়েক মুহূর্তে ঘুরে-ফিরে দপ করে একসময় নিবে গেল। আলোটা দেখা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটী দ্রুত বলিষ্ঠ হাতে আকর্ষণ করে আমাকে ও সীতাকে নিয়ে একটা মোটা ঝাউগাছের আড়ালেই আঘাগোপন করেছিল। আলোটা নিভে ধাওয়া সত্ত্বেও আমরা তিনজনেই গাছের আড়ালেই দাঁড়িয়েছিলাম আঘাগোপন করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। কিরীটীর দ্রুত হাত দিয়ে তখনও আমাদের দ্রুজনের হাত ধরা। তিনজনেই নির্নিয়মে আমরা উপরের খোলা জানালাটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ একটা মানুষের ছায়া।

ছায়াটা ক্ষির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিতের মত।

সহসা চাপা গলায় কিরীটী প্রশ্ন করে, কোন ঘরের জানালা ওটা বলতে-

পারেন মিস ঘোষ ?

মনে হচ্ছে শতদল-ভাগ্নের ঘরের জানলা ! চাপা উন্নেজিত কঠেই জবাব
দেয় সীতা ।

আমারও তাই ধারণা ! কতকটা যেন স্বগতোষ্ঠাই করে কিরীটী ।

একটু পরেই জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল ।

আরো কিছুক্ষণ পরে আমরা গাছের আড়াল হতে বের হয়ে সদর দরজার
দিকে এগিয়ে গেলাম । দরজাটা ভিতর হতে বন্ধই ছিল । কিরীটী দরজা
খোলার সংকেত-ঘণ্টার দড়ির প্রা঳টা ধরে টেনে দরজাটা খোলবার জন্য দড়ির
সঙ্গে সংযুক্ত ভিতরের ঘণ্টাটা বাজাতে যাবে, হঠাতে দরজাটা খুলে গেল । খোলা
দরজার সামনে হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে অবিনাশ ।

অবিনাশই কথা বললে, বুড়োবাবু তো ঠিকই বলেছেন, আপনারা এসেছেন,
দরজাটা খুলে দিতে !

বুড়োবাবু ? তিনি জানলেন কী করে যে আমরা এসেছি ? প্রশ্ন করল
কিরীটীই ।

তা তো জানি না । তিনি দরজাটা এসে খুলে দিতে বললেন, তাই তো
খুলতে এলাম । ম্দুর হাসির সঙ্গে কথাটা বললে অবিনাশ ।

॥ ৭ ॥

শতদলবাবু বাড়িতে ফিরে এসেছেন, অবিনাশ ? নিবৃত্তীয় প্রশ্ন করল কিরীটী
অবিনাশের দিকে তাকিয়ে ।

আজ্ঞে, কই না ! দাদাবাবু তো এখনও ফেরেননি বাবু । ম্দুরকঠে
অবিনাশ জবাব দিল ।

কখন ফিরবেন কিছু বলে গিয়েছেন ? কিরীটী অবিনাশকে পুনরায়
জিজ্ঞাসা করে ।

আজ্ঞে না । তা তো কিছুই বলে যাননি ।

কোথায় গিয়েছেন তুমি জান ?

না ।

অতঃপর কিরীটী আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, চল সু, ভিতরে
গিয়ে বসা যাক । এখন হয়তো শতদলবাবু এসে পড়বেন—চলুন সীতা দেবী ।

সকলে আমরা অন্দরের দিকে অগ্সর হলাম । অন্ধকার বারান্দাটা । আগে
আগে হ্যারিকেন বাতিটা হাতে ঝুলিয়ে ঢলেছে অবিনাশ, পশ্চাতে আমরা
তিনজন । বেশী দূর অগ্সর হইনি, একটা খস-খস শব্দ শুনে সামনে দিকে
তাকাতেই অস্বচ্ছ আলোকিত বারান্দাপথে নজর পড়ল ইন্ড্যালিড চেয়ারটার
উপরে উপরিষ্ট পক্ষাঘাতে চলছজ্জিত্বীন হিরণ্যয়ী দেবী দৃষ্টি হাতে মন্থর গতিতে
উপরিষ্ট চেয়ারটার দৃষ্টি পাশের চাকা দৃষ্টো দৃষ্টিপাশের হ্যান্ডলের সাহায্যে
ঘোরাতে ঘোরাতে ঐদিকেই এগিয়ে আসছেন ।

সকলের আগে ছিল হ্যারিকেন হাতে অবিনাশ, তাকেই প্রশ্ন করলেন
উদ্বেগাকুল কঠে হিরণ্যয়ী দেবী, অবিনাশ, সীতা এল ?

অবিনাশ জবাব দেবার আগেই সীতা জবাব দেয়, এই যে মা, এসেছি আমি

—বলতে বলতে সামনের দিকে সে এগিয়ে যায়।

অন্ধকারে পশ্চাতে বোধ হয় আমাকে ও কিরীটীকে দেখতে পানীন প্রথমটায় হিরণ্যায়ী দেবী। তাঁর রূপ বিরাঙ্গিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এত রাত করে কোথায় ছিলে শূন্য? কিন্তু পরক্ষণেই কিরীটীকে সীতার পশ্চাতে দণ্ডায়মান দেখে হিরণ্যায়ী দেবীর কষ্টের ক্ষণপূর্বের সমস্ত বিরাঙ্গ যেন নিমেষে অন্তর্হৃত হয়ে গেল এবং এবারে আর কন্যাকে নয়, কিরীটীকেই সম্বোধন করে প্রশংস্ত ক্ষিন্দু কষ্টে বললেন, এ কি। কিরীটীবাবু নাকি? আসন্ন, আসন্ন। কোথায় দেখা হল আপনার সঙ্গে ওর?

তুমি ওঁদের ভিতরে নিয়ে এস মা। আমি চায়ের জল চাপাচ্ছি। কথাগুলো বলে সীতা সহসা অন্ধকারে বেশ যেন দ্রুত পদবিক্ষেপেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

তীক্ষ্য একটা দৃঢ়িত কন্যার গমনপথের দিকে মুহূর্তের জন্য নিষ্কেপ করে হিরণ্যায়ী দেবী আমাদের দিকে আবার ফিরে তাকলেন। ইনভালিড চেয়ারটার হ্যান্ডলের উপরে রাঙ্কিত দুই হাতের মুদ্রিত দুটো মনে হল যেন মুহূর্তের জন্য কঠিন হয়ে আবার শলথ হয়ে গেল। এবং এবারে শান্তকষ্টে কিরীটীকেই লক্ষ্য করে বললেন, চলুন মিঃ রায়। শতদলের কাছেই বোধ হয় এসেছেন! সে বোধ হয় তো বাড়তে নেই—, ক্ষণপূর্বেই বিরাঙ্গির লেশমাণ্ডও কঠিনবরে নেই।

সকলে আবার ভিতরের দিকে অগ্রসর হলাম। অবিনাশ আগে আগে আলো দেখিয়ে চলল। সকলের আগে হিরণ্যায়ী দেবীর চলমান ইনভালিড চেয়ারটার পাশাপাশি হেঁটে চলেছে কিরীটী। পশ্চাতে আমি।

আপনাদের এদিকেই আসছিলাম। পথেই আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা হতে তাঁরই মুখে শুনলাম শতদলবাবু বাড়তে নেই। কিরীটী এতক্ষণে কথা বললে।

গতরাতের ব্যাপার বোধ হয় তাহলে সীতার মুখেই সব শুনেছেন মিঃ রায়? হ্যাঁ, শুনলাম। মুদ্রস্বরে জবাব দেয় কিরীটী।

এর পর আর এ-বাড়তে বাস করা খুব বিবেচনার কাজ হবে না—আপনি কি বলেন কিরীটীবাবু?

খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই?

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়! এই সেদিন রাতে শতদলের ঘরে কে বন্দুক ছড়ল এবং শতদলের মুখেই কালকের রাত্রের ঘটনার পর আজ সকালে শুনলাম ইতিপূর্বেও নাকি তার উপরে আক্রমণ হয়েছিল—

সে তো তাঁর জীবনের ওপরে attempt হয়েছিল! জবাব দিলাম আমি।

কিন্তু কাল রাত্রের ঘটনাটা? সীতার কুকুরটাকে গুলি করেছে! এক বাড়তে থখন আছি, ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘাড়েও বা বিপদ আসতে কতক্ষণ? আমিও ওঁকে আজ স্পষ্টেই বলে দিয়েছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ-বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাব। স্মৃতের চাইতে স্মোয়াঙ্গিত ভালো—কি বলেন মিঃ রায়!

তা তো বটেই। কিরীটী জবাব দেয় মুদ্রুকষ্টে।

আমরা সকলে এসে হরাবিলাসবাবুর ঘরেই ঢুকলাম। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই নজরে পড়ল হিরণ্যায়ী দেবীর পূর্বের কার ঘরের মত এ ঘরখানির মধ্যেও রূচিসম্মত পরিচ্ছন্নতা। দুদিনের মধ্যেই ঘরখানি তিনি স্লুরভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন, তবে এ ঘরেও লক্ষ্য করলাম জানালাগুলো প্রায় সবই ভিতর হতে বক্ষ। একটা বক্ষ বায়ু যেন থমথম করছে।

বসন্ন, মিঃ রায়। বসন্ন সুব্রতবাবু।

হিরণ্যয়ুবী দেবীর আহবানে আমরা দুজনে দুখানা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে
উপবেশন করলুম।

ঘরের সিলিং থেকে একটা প্রকাণ্ড গোলাকৃতি সাদা তুমের মধ্যে চারটে
মোমবাতি জুলছে। এবং তাতেই ঘরটা বেশ পরিষ্কার ভাবেই যেন আলোকিত
হয়ে উঠেছে।

ঘরে প্রবেশ করতেই দেওয়ালে টাঙানো কয়েকখানা চিত্র দৃঢ়টকে আকর্ষণ
করে। তার মধ্যে গোটা দুই ল্যান্ডস্কেপ এবং বাঁকি দুটো অল্পবয়সী দুই
নারীর অয়েল-পেঁপিংটং।

দুটি নারী-প্রতিকৃতি একটু নজর দিয়ে দেখলেই মনে হবে দুটি যেন যমজ
বোন। মৃত্যুর চেহারাও হ্ৰবহ্ৰ বলতে গেলে শায় একই, এমন কি তাকাবাৰ
ভঙ্গিটা পৰ্যন্ত যেন এক। কিৱীটীকে কথাটা বলব ভেবে ওৱ মৃত্যুর দিকে
তাকিয়ে দৈখ একদণ্ডে ঐ ছৰি দুখানার দিকেই তাকিয়ে আছে। ছৰি দুটো
তাহলে কিৱীটীর তীক্ষ্ণ দৃঢ় এড়ায়নি!

ষ্টেতে করে টি-পট ও অন্যান্য চায়ের সরঞ্জাম হাতে এমন সময় সীতা এসে
কক্ষমধ্যে প্রবেশ কৰল।

ঘরের মধ্যাস্থিত টেবিলের ওপৱে চায়ের সরঞ্জাম রেখে সীতা কাপে কাপে
চা ঢালতে লাগল।

সহসা কিৱীটী হিরণ্যয়ুবী দেবীর মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে প্ৰশ্ন কৰল, ঐ
দেওয়ালের অয়েলপেন্সিপ্টং দুটো কাৰ মিসেস ঘোষ?

কিৱীটীর প্ৰশ্নে যেন চমকে তাকালেন হিরণ্যয়ুবী দেবী দেওয়ালের গায়ে
টাঙানো ছৰি দুটোৰ দিকে।

দেখলে মনে হয় যেন একই জনের দুটি প্রতিকৃতি! কিৱীটী আবাৰ মন্তব্য
কৰে।

জানি না ও কাৰ ছৰি! মৃদুকণ্ঠে হিরণ্যয়ুবী দেবী জবাৰ দিলেন।

শতদলবাবুৰ মা তো আপনাৰ ভাইৰি, তাই না?

কিৱীটীৰ এবাৰকাৰ প্ৰশ্নে কিৱীটীৰ মৃত্যুর দিকে দৃঢ়টিপাত না কৰেই
ইতিমধ্যে অৰ্ধসমাপ্ত ষে উলৱেৰ বৰ্ননটা কোলেৰ মধ্যে ছিল সেটা তুলে নিয়ে
অতলত কিপ্ৰহস্তে বৰ্নতে বৰ্নতে মৃদুকণ্ঠে জবাৰ দিলেন হিরণ্যয়ুবী দেবী, হ্যাঁ!

তাঁকে, মানে শতদলবাবুৰ মাকে আপনি দেখৰ্নানি?

খৰ ছোট—যখন তাৰ তিন বছৰ বয়স হবে সেই সময় তাকে দৈখ, তাৰ
পৱ আৰ দৈখৰ্নানি। তাৰ বিবাহেৰ সময়ও আসতে পাৰিনি—পৱে আৱ দেখা-
সাক্ষাৎই হয়নি। শতদলেৰ যখন বছৰ তিনেক বয়স তখনিন তো সে মারা যায়।
কথাগুলো যেন একটানা সুৱে কতকটা বলে গেলেন হিরণ্যয়ুবী দেবী।

আপনাৰ ভাবেৱও ঐ একটিমাত্ৰ মেয়েই ছিলেন, তাই না?

না, দাদাৰ দুই মেয়েই ছিল। বনলতা আৱ সোমলতা। সোমলতা বনলতাৰ
৪।৫ বছৰেৰ ছোট, তাকে আমি কোন্দিনও দেখিনি—

তিনি, মানে বনলতা দেবী—চোখুৰী মশায়েৰ ছোট মেয়ে বেঁচে আছেন
কি?

না। সহসা হিরণ্যয়ুবী দেবীৰ কণ্ঠস্বরটা যেন রূক্ষ শোনাল।

হিরণ্যয়ুবী দেবীৰ আকৰ্ষণক কৰ্কশ কঠে আমি চমকে ঊৱ দিকে না তাকিয়ে
পাৱলাম না।

পূর্বের মতই হিরণ্যরী দেবীর দ্রষ্টিতাঁর হাতের বননের উপরে নিবন্ধ
এবং তিনি ক্ষিপ্তস্থেত বনন-কার্য রত।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। সে-মুখে
রাগ দ্বেষ বা বিরক্তি কোন কিছুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শান্ত ও নির্বিকার।
চায়ের কাপটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, নিঃশেষিত চায়ের কাপটা সামনের টেবিলের
ওপরে নামিয়ে রাখতেই সীতা এগিয়ে এসে কিরীটীকে প্রশ্ন করল, আর চা
দেব মিঃ রায়?

চা? না থাক, ধন্যবাদ।

বাইরের দালানে জুতোর মসমস শব্দ শোনা গেল।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই বোধ হয় ঘরের বাইরে সেই জুতোর শব্দ
শুনতে পেয়েছিল। সীতা নিম্নকণ্ঠে বললে, শতদল-ভাষ্মে এল বোধ হয়—

সীতা কথাগুলো বলবার আগেই কিরীটী চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে
অগ্নসর হয়েছিল এবং খোলা দরজাপথে অদ্শ্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার
কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এই যে শতদলবাবু, কোথায় গিয়েছিলেন?

কে! কিরীটীবাবু নাকি? আপনি এখানে, আর আমি যে আপনার
খোঁজেই হোটেলে গিয়েছিলাম!

কথা বলতে বলতে দৃঢ়নে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।

সীতা, চা সব শেষ, না এক কাপ মিলতে পারে? ঘরে প্রবেশ করেই
শতদল সীতাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলে।

না না, আছে বৈকি, দিচ্ছি, বসো। সীতা জবাব দেয়।

হঠাৎ ঐসময় আমার দ্রষ্টিটা হিরণ্যরী দেবীর উপরে গিয়ে পড়তেই দেখ
ইতিমধ্যে তাঁর ক্ষিপ্ত বননরত হস্ত দ্রুটি কখন থেমে গিয়েছে এবং তিনি
বিস্মিতভাবে দ্রষ্টিতে একবার শতদল ও একবার সীতার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন,
কিন্তু সীতা বা শতদল কারো সেদিকে দ্রষ্ট নেই।

সীতা একটা কাপে ততক্ষণে চা ঢালতে শুরু করেছে।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম। প্রাতান একটা সংবাদপত্র টেবিলের
উপর পড়েছিল, ইতিমধ্যে কখন একসময় টেবিলের উপর থেকে সংবাদপত্রটা টেনে
নিয়ে সে গভীর মনোযোগ সরকারে কী যেন পড়ছে। ঘরের মধ্যে যে আমরা
আরও চারটি প্রাণী উপস্থিত আছি, ঐ গৃহতে সে সম্পর্কে যেন সম্পূর্ণ
অচেতন।

চিনি ও দুধ মিশিয়ে চায়ের কাপটা সীতা শতদলের দিকে এগিয়ে দিতে
দিতে বললে, এই যে—

সবেবাত শতদল সীতার প্রসারিত কর হতে চায়ের কাপটি হাতে তুলে
নিয়েছে, আচম্ভকা কিরীটী কণ্ঠস্বরে আমি যেন চমকে উঠলাম, আপনি একটু
বেশী চিন খান চায়ে, না মিঃ বোস?

চায়ের কাপটা আর ওষ্ঠের নিকটে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল না, শতদল
বিস্মিত প্রশ্নভূত দ্রষ্টিতে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে এবং বললে, চিন
বেশী থাই চায়ে!

হ্যাঁ, দেখলাম যে সীতা দেবী তিন চামচ চিন দিলেন চায়ে।

হাতে-ধো সংবাদপত্রটা ভাঁজ করতে করতে হাস্যোদ্ধীপ্ত কণ্ঠে প্রত্যক্ষের দেয়
কিরীটী, নিশ্চয় সীতা দেবীর ওটা deliberate mistake নয়, কী বলেন সীতা

দেবী ?

শতদলের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। কেমন একটা অসহায় অপ্রস্তুত ভাব শতদলের চোখে-মুখে। কিন্তু সীতার মুখে ঠিক যেন একটা বিপরীত ভাবের সন্তুষ্ট আভাস। সমস্ত মুখখানা যে তার লজ্জায় রাস্তম হয়ে উঠেছে, ঐ মৃহূর্তে ঘরের স্বপ্নগালোকেও সেটা দ্রষ্টিতে এড়ায় না।

অবশ্য চিনি কেউ কেউ চায়ে একটু বেশীই খান এবং আস্বাদনের ব্যাপারটা ও যখন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন, এ বিষয় নিয়ে কোন কথাই চলে না, কি বলেন সীতা দেবী ? কথাটা বলে নিজে সঙ্গে সঙ্গে হেসে ঘরের ঐ মৃহূর্তের আবহাওয়া-টাকে যেন কিরীটী লঘু করে দেবার চেষ্টা করল।

হিরণ্যরী দেবীর দিকে তাকিয়ে দোখ, অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে তাঁর বুনন-কার্য চলেছে।

শতদল নিজেকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে এবং ব্যাপারটা ও যেন আগাগোড়াই একটা কৌতুক ছাড়া কিছু নয়, এইভাবে চায়ের কাপে একটা দীর্ঘ আরামসূচক চুম্বক দিয়ে বললে, সর্তাই কি সীতা তুমি আমার চায়ে তিন চামচ চিনি দিয়েছ নাকি ?

কেন ? এখনো বুবতে পারেননি নাকি সেটা ? হাসতে হাসতে কিরীটী বলে।

হাঁ, সীতা বড় বেশী মিণ্ট হয়ে গেছে চা-টা সীতা, আর একটু লিকার এর মধ্যে ঢেলে দাও—

বলতে বলতে শতদল চায়ের কাপটা সীতার দিকে এগিয়ে দিল।

সীতাও টি-পট্‌ থেকে আরও খানিকটা লিকার ঢেলে মি঳ক-পট্‌ থেকে একটু দ্রুত ঢেলে চা-টা চামচ দিয়ে নেড়ে দিল।

শুনলাম কাল রাত্রে নাকি আবার এ-বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, শতদলবাবু ! কিরীটী আচম্বক প্রশ্নটা করে যেন প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

হ্যাঁ, সেই জন্যই তো আপনার ওখানে গিয়েছিলাম। এও শুনেছেন বোধ হয়, এবারে সীতার কুকুরটার উপর দিয়েই ফাঁড়াটা আমার গেছে।

শুনলাম। মদ্দকশ্টে কিরীটী জবাব দিল, সীতা দেবীর মুখে অবিশ্য ব্যাপারটা শুনেছি, তাহলেও আপনার মুখ থেকে ব্যাপারটা আর একবার শুনতে চাই, শতদলবাবু।

এবারেও ঘটনাটা অবিশ্য extremely mysterious—রাত তখন প্রায় গোটা বারো কি সাড়ে বারো হবে, সে রাত্রের ঐ ব্যাপারের পর থেকে সীতা কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি যেন একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছি, রাত্রে ঠিক যেন আর sound sleep হয় না, বিছানায় শুরোচ্ছিলাম বটে তবে ঠিক ঘুমোইনি, একটা তন্দুরাত ভাব—হঠাতে সীতার কুকুরের ঘন ঘন ডাকে চমকে উঠে পড়লাম। জামাটা গায়ে চাঁপয়ে জুতোটা পায়ে গালয়ে দরজা খুলে সিঁড়তে পেঁচাবার আগেই দড়িম দড়িম দুটো গুলির আওয়াজ পেয়ে থামকে দাঁড়ালাম আর ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন বিশ্রী করুণভাবে আর্তনাদ করে উঠলো সীতার কুকুরটা।

আপনি নিচে নেমে এলেন, না ? প্রশ্নটা এবার শতদলকে করলাম।

হ্যাঁ, দু-চার মিনিটের জন্য বোধ হয় কেমন একটু ইকচকিয়ে গিয়েছিলাম, তার পরই তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসি। জবাব দেয় শতদল।

আপনি তখন কোথায় ছিলেন ? আচম্বকা কিরীটী প্রশ্ন করে সীতার

মুখের দিকে তারিক্ষে।

আমি? আমিও তখন টাইগারের চেচানি শুনে ঘরের বাইরে বের হয়ে এসেছি। জবাব দিল সীতা।

আর আপনি মিসেস ঘোষ?

আমি? হিরণ্যরী দেবী হাতের বুনন থামিয়ে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, আপনি!

আমি আর আমার স্বামী দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বের হয়ে আসি ঘর থেকে। কতকটা যেন ইতস্তত করেই কথাটা বললেন হিরণ্যরী দেবী।

হঁ। হরবিলাসবাবুকে দেখছি না, তিনি কোথায়?

আমাকে খুঁজছিলেন বৃষ্ণি, মিঃ রায়? কথাটা কেমন একটা ব্যঙ্গের সূরে উচ্চারণ করতে করতে ঠিক কিরীটীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কট্টা যেন মাটি ফুঁড়ে বের হয়ে আসবার মতই ঐ মুহূর্তে হরবিলাস ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর আকর্ষিক আবির্ভাব ও প্রশ্নের জবাবে মনে হল, কিরীটীর মুহূর্ত-অগেকার প্রশ্নটির জন্যই বৃষ্ণি এতক্ষণ হরবিলাস ঠিক ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

গায়ে কালো রঙের সেই গরম গলাবন্ধ ঘূল-কোট, গলায় ও মাথায় একটা উলেন কম্ফর্টার জড়ানো, মুখ-ভার্তা কাঁচ-পাকা খোঁচা খোঁচা দাঢ়ি—মনে হয় পাঁচ-ছাঁদিন বৃষ্ণি ক্ষেরকর্ম করেননি। হাতে একটা মোটা লাঠি।

ঘরের মধ্যে আমরা সকলেই নির্বাক। কেবল কিরীটী যেন অন্তর্ভুক্ত দাঁড়িতে হরবিলাসের দিকে তারিক্ষে। আচম্ভকা যেন ঘরের সমস্ত আবহাওয়াটা থম্খমে হয়ে উঠেছে।

অতঃপর ঘরের মধ্যে উপস্থিত নির্বাক সকলের মুখের দিকে নিঃশব্দে বারেকের জন্য নিজের দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে শতদলের মুখের দিকে তারিক্ষে একটু যেন কর্কশ কঢ়েই তাকে সম্বোধন করে হঠাত হরবিলাস বলে উঠলেন, তোমার ঐ অবিনাশকে সাবধান করে দিও, শতদলবাবু!

কেন, অবিনাশ আবার তোমার কী করল শুনি? প্রশ্নটা করলে হিরণ্যরী দেবী তাঁর স্বামীকে। এবং চেয়ে দেখি পূর্ব-বৎ তিনি আবার তাঁর বুননকার্যে মনোনিবেশ করেছেন।

ক্ষিপ্রগতিতে হাত দুটো বুনন করে চলেছে।

কি করল মানে? হরবিলাসের কঠস্বরে বেশ একটা সন্দেশট বিরাস্ত, his every movements is suspicious! তোমার দাদার এ বাড়ি তো নয়, যেন একটা কবরখানা, আর ঐ বেটা কখন আচম্ভকা কোন্ পথে যে এসে সামনে হঠাত হাজির হয়! রোজ সন্ধ্যার পরে একা একা এ বাড়ির পিছনে ঐ ভাঙা গোল-ঘরটায় অন্ধকারে ও কি করে বল তো? দেখ শতদলবাবু, I am definite he is after something! নিশ্চয় ওর—

হরবিলাসের মুখের কথাটা শেষ হল না, হঠাত একটা ভারী কোন বস্তু পতনের দুম করে একটা শব্দ ও সেই সঙ্গে রাধির স্তন্ত্রতাকে দীর্ঘবিদীণ করে একটা কাচ ভাঙার বন-বন শব্দ যেন খানখান হয়ে ~~প্রাণবন্ধন~~ সঞ্চক্ষিত করে তুলল।

অর্থাৎ সেই কোন একটা ভারী বস্তু পতনের ও ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গে কাট ভাঙার ঘনঘন শব্দটা ঘরের মধ্যে আমাদের সকলকেই সচাকিত করে দিয়ে গেল। কথা বললে নিষ্ঠাত্বা ভঙ্গ করে প্রথমে আমাদের মধ্যে কিরীটাই, কাচের কোন জিনিস ভাঙার শব্দ !

তাই তো, শব্দটা উপরের তলা থেকেই এল বলে মনে হল ! যাই দেখে আসি কি ভাঙল—, শতদল ঘর হতে বের হয়ে যেতেই কিরীটাই ও তাকে অন্ধ-সরণ করে আর আমি করি কিরীটাইকে। দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির দেওয়ালের গায়ে যে ওয়াল-ল্যাম্পটা টিভিটি করে জুলছে, তাতে করে সিঁড়িপথের অল্ধকার দ্রুতভূত হওয়া তো দ্রুরের কথা, দ্রুপশের দেওয়ালের চাপে পড়ে আরো যেন ঘন হওয়ায় এবং তার মধ্যে আলোর স্বল্পতায় যেন একটা কেমন ছমছমে ভাবের স্রষ্টি করেছে।

সর্বাগ্রে শতদলবাবু, তার পশ্চাতে কিরীটাই ও সবার শেষে আমি সিঁড়ি-পথ অতিক্রম করে উপরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই একটা সাদা কাপড়ে ঢাকা ছায়ামৃত্তি যেন সোঁ করে আমাদের চোখের সামনে দিয়েই বারান্দার শেষপ্রান্তের দরজাপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা এত চকিতে, যেন মনে হল, একটা স্বল্পের মতই ছায়ামৃত্তি অল্ধকারে বারান্দার ওদিকে ঝিলঝিলে গেল।

কিরীটাই কিন্তু মৃহূর্তের জন্যও সময় নষ্ট করেনি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যেন একপ্রকার দৌড়েই বারান্দার শেষপ্রান্তে ষেদিকে অল্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে ক্ষণ-পৰ্বে সেই ছায়ামৃত্তি, সেই দিকে এগিয়ে গেল।

আমিও কতকটা যেন ঘন্টালিতের মতোই কিরীটাইকে অন্ধসরণ করলাম।

দরজাটা পার হলেই একটা অপরিসর ছাদের মতো, তিনাদিকে তার এক বৃক্ষ-সমান প্রায় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কিরীটাই দেৰি সেই প্রাচীরের উপর দিয়ে ঝুঁকে অল্ধকারে নিচে তাকিয়ে আছে। আমি ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

নিচে অল্ধকারে বাগানের মধ্যে গাছপালাগুলো নিঃশব্দে ছায়ার মত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। দোতলার ছাদ থেকে নিচের বাগানে চট করে কারো পক্ষে ঝাঁপয়ে পড়া সম্ভবপর না হলেও, প্রাণের দায়ে যে কেউ ঝাঁপয়ে পড়বে না এমন কোন কথা নেই। এবং বেকায়দায় নিচে পড়লে গুরুতর জখম বা আহত হওয়াও এমন কিছু আশ্চর্য নয়।

ছায়ামৃত্তি এই ছাদের দিকেই ঘনে এসেছে এবং স্পষ্ট আমরা ঘনে সকলেই চোখে দেখেছি এবং এই ছাদ থেকে অন্য কোথাও যাওয়া ঘনে সম্ভব-পর নয়, তখন একমাত্র নিচের ঐ বাগানে ঝাঁপয়ে পড়ে আঘাতে পুরুষ করা ছাড়া ছায়ামৃত্তি আর অন্য কোথায় যেতে পারে?

সু, তোর সঙ্গে টর্চ আছে? কিরীটাই হঠাৎ প্রশ্ন করে।

না তো! জবাব দিই।

হঠাৎ এমন সময় আমাদের ঠিক পশ্চাতেই শতদলবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমার ঘরে টর্চ আছে মিঃ রায়, এনে দেব?

না, প্রয়োজন নেই। চলুন দেখা যাক কিসের শব্দ হয়েছিল ! বলতে বলতে কিরীটীই আবার বারান্দার দিকে পা বাড়াল।

সকলে ভিতরে এসে প্রথমে বারান্দা অর্তক্রম করে। শতদলবাবুর শয়ন-ঘরের ঠিক পাশের ঘরটির দরজা হাঁ করে খোলা দেখে প্রথমে শতদলবাবুই থেমে বললে, একটি ! ঘরের দরজাটা খোলা কেন ?

দরজাটা বন্ধ ছিল সৌন্দিনও দেখেছি, যতদ্বাৰ আমাৰ মনে পড়ছে তালা-বন্ধই ছিল, না শতদলবাবু ? কথাটা বললে কিরীটী।

হ্যাঁ। দাদুৰ স্টৰ্ডিও-ঘৰ। এটা সৰ্বদা বন্ধই থাকে, আমি এখানে আসা পৰ্যন্ত,—মাদুৰকষ্টে শতদল জৰাব দেয়, আশচৰ্য ! এ দৰজায় একটা হবস্-এৰ ভাৱী তালা লাগানো ছিল—তালাটাই বা কোথায় গেল ? পৰক্ষণেই ঘৰে দাঁড়িয়ে সিঁড়িৰ দিকে অল্প একটু এগিয়ে শতদল উচ্চকষ্টে ডাকল, অবিনাশ ? অবিনাশ ?

অমনি অবিনাশকে একটা আলো নিয়ে আসতে বলুন তো ! কিরীটী কথাটা বললে।

কিন্তু অবিনাশের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

শতদল সিঁড়িৰ দণ্ড-চারটে ধাপ এগিয়ে গিয়ে আবার উচ্চকষ্টে হাঁক দিল, অবিনাশ ? ভুখনা ?

এবাবেও অবিনাশের বা ভুখনার কারোৱাই কোন সাড়া পাওয়া গেল না নিচের তলা হতে।

উপৰে একটা বাঁতি নিয়ে আয় ভুখনা ! তথাপি শতদল চৰ্চিয়ে বললে।

কিছুক্ষণ পৱেই সিঁড়িতে ক্রীগ পদশব্দ পাওয়া গেল এবং দেখা গেল শতদলবাবুৰ সেই বিচিত্র চেহারার রাঁধনী বামুন একটা হ্যাঁরিকেন হাতে উপৰে উঠে আসছে।

হ্যাঁরিকেন বাঁতটা হাতে নিতে নিতে শতদল ভুখনার দিকে তাৰিয়ে প্ৰশ্ন কৰলে, অবিনাশ কোথায় ?

নিঃশব্দে ভুখনা মাথাটা একবাৰ দোলাল মাত্ৰ, সে জানে না।

যা, দেখ অবিনাশ কোথায় আছে, তাকে একবাৰ ডেকে দে।

ভুখনা চলে গেল।

সৰ্বাণ্গে হ্যাঁরিকেন হাতে শতদল এবং পশ্চাতে আমি ও কিরীটী ঘৰেৱ মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

হ্যাঁরিকেনেৱ বাঁতটার অনুভজ্বল আলোয় অকস্মাত ঘেন ঘৰেৱ মধ্যে চাৰিদিক হতে অনেকগুলো চোখেৱ দৃষ্টি একসঙ্গে আমাদেৱ উপৰে এসে বাঁপয়ে পড়ল।

একসঙ্গে অনেকগুলো চোখেৱ দৃষ্টি আমাদেৱ চাৰিদিকে হঠাত সজীব হয়ে জিজ্ঞাসায় প্ৰথৰ হয়ে উঠেছে, কে তোমো ? কি চাও ?

ঘৰেৱ দেওয়ালে বিৱাট সব প্ৰমাণ-সাইজেৱ কলাৰ ও অয়েলপেণ্টং, নানা আকাৱেৱ পাথৰ, প্লাস্টাৱ ও ৱোঝেৱ প্ৰতিমূৰ্তি। মনে হয় একটু আগেও বৰ্দ্ধিৰ ওদেৱ প্ৰাণ ছিল, হঠাত কেড় মন্দোচ্চারণে ওদেৱ বোৰা কৱে দিয়ে গিয়েছে। অনুভজ্বল আলোৱ অপৰ্যাপ্ত আভা চাৰিদিককাৰ ছৰ্ব ও মৃত্তি-গুলোৱ উপৰে প্ৰতিফলিত হয়ে ঘেন সূৰ্ণ্ণি কৱেছে কি এক ঘনীভূত রহস্যেৰ !

কিরীটী শতদলবাবুৰ হাত হতে হ্যাঁরিকেনটা নিয়ে উঠু কৱে চাৰিদিকে

ঘূরিয়ে একবার দেখতেই, সকলেরই আমাদের ঘৃণ্গপৎ দৃঢ়িট গিয়ে পড়ল ঘরের পুর কোগে মেঝেতে একটা ভারী কারুকাব্য-খচিত চওড়া বোঝের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি মেঝেতে পড়ে আছে এবং তার চারপাশে ছাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য কাঁচের টুকরো। বোৱা গেল ক্ষণপূর্বে আমরা ঐ ভারী ছবিটারই পড়ে গিয়ে ভাঙার শব্দে নীচে থেকে সচাকিত হয়ে উঠেছিলাম। কিৱীটী নিঃশব্দে বাঁতটা হাতে নিয়ে সর্বাপ্রে সেই দিকে গেল।

ছবিটা উব্দু হয়ে পড়ে আছে।

একটা মোটা তার দিয়ে দেওয়ালের গায়ে বড় একটা পেরেকের সাহায্যে ছবিটা দেওয়ালে টাঙানো ছিল। দেখা গেল ছবির সঙ্গে তারটাও অক্ষতই আছে, দেওয়ালের গায়ে পেরেকটাও ঠিক আছে। তবে ছবিটা এইভাবে মাটিতে খসে পড়ল কী করে?

কিৱীটী হ্যারিকেনটা মেঝেতে একপাশে নামিয়ে রেখে নীচ হয়ে মাটি হতে ছবিটা তুলে সোজা করে দাঁড় কৱাল।

চোগা-চাপকান পরিহিত মাথায় পাগড়ি-আঁটা বিৱাট এক পুরুষের প্রতিকৃতি অয়েলকলারে অঙ্গিত। প্রশস্ত ললাট, উন্নত খেঁজের মত নাসিকা, দীর্ঘ আয়ত চক্ষু এবং সেই চক্ষুর দ্রষ্টি যেন মনে হয় সজীব এবং অন্তর্ভুদ্বী।

ছবিখানা দৃহাতের সাহায্যে একবার মাটি থেকে উচ্চ করে কিৱীটী বোধ হয় ছবিটার গুজনটা পৱনীক করে আবার নামিয়ে রাখল, বেশ ভারী ছবিখানা! ওজনে অন্ততঃ পনের-ষোল সেৱ হবে!

মদ্দ আঞ্চাগত ভাবেই যেন কথাগুলো কতকটা উচ্চারণ কৱল কিৱীটী। তার পৰেই শতদলের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন কৱল, চেনেন শতদলবাবু, এ ছবিটা কার?

না। এখানে আসবার পৰ একদিন মাত্ৰ এ ঘৰে ঢুকেছিলাম। এৱ আগে দৃ-একবার যা এখানে এসেছি, এই স্টুডিও-ঘৰে কখনো প্ৰবেশ কৰিবন। দাদ কখনো কাউকে এ ঘৰে ঢুকতে দিতেন না।

কেন? প্ৰশ্নটা কৱলাম এবাবে আৰ্মই।

তিনি ঠিক কাৱো এই স্টুডিও-ঘৰে প্ৰবেশ কৱাটা পছন্দ কৱতেন না। বৰাবৰই লক্ষ্য কৱেছি, এই স্টুডিও-ঘৰে প্ৰবেশ সম্পৰ্কে তাৰ যেন একটা sentiment ছিল। দিবাৱাৰত এই ঘৰের মধ্যেই প্ৰায় রং-তুল, ইজেল অথবা ছেনী-বাটালী নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতেন। দীৰ্ঘকাল ধৰে একবেলাই আহার কৱতেন শুনেছি রাখে। এও শুনেছি অনেক রাত্ৰে নাকি তিনি খাওয়াৰ কথা পৰ্যন্ত ভুলে যেতেন, এই ঘৰেৱ মধ্যে তাৰ রাত কেটে যেত—

শিল্পীৰ সাধনা-ক্ষেত্ৰই বটে। শিল্পী রণধীৰ চৌধুৰী যেন এখনো এই মৃতি ও ছবিগুলোৰ মধ্যেই বেঁচে আছেন। নিঃভৃত এই কক্ষখানিক মধ্যে তিনি আপনাকে যে একান্তভাৱে সম্পৰ্ণ কৱেছিলেন এবং যে সম্পৰ্ণেৱ ভিতৰ দিয়ে এই বিস্ময় তিল তিল কৱে গড়ে উঠেছে তাৰই সাক্ষ্য যেন কক্ষেৱ চতুর্দিকে।

এই ঘৰেৱ চাৰিটা?

সেটা তো আৰ্ম যে ঘৰে থাকি সেই ঘৰেৱ আলমাৰিৰ ডুয়াৱেৱ মধ্যে থাকত একটা রিংয়ে অন্যান্য চাৰিব সঙ্গে।

দেখন তো সে রিংয়ে চাৰিটা আছে কিনা? কিৱীটী শতদলকে অনুৰোধ

জানায়।

দেখছি—, শতদলবাবু ঘর হতে বের হয়ে ঘাবার আগেই আবার কিরীটী
বললে, শতদলবাবু, just a minute, এ সঙ্গে kindly একটা টর্চও নিয়ে
আসবেন।

শতদল ঘর হতে অতঃপর নিষ্কান্ত হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে এখন আমরা
দ্রুজমই—কিরীটী ও আমি। হ্যারিকেন-বার্তির স্বল্পে আলোয় কিরীটীর
মুখের দিকে তাকালাম।

মুখের রেখায় রেখায় কোন কিছু একটা চিন্তার সূচপঞ্চ আভাস। তার
ইতিপূর্বের ধীর মদ্দ সংযত কষ্টস্বর ও নিষ্ক্রিয়তা থেকেই ব্যর্থেছিলাম, এই
মুহূর্তে গভীর ভাবেই কোন একটা চিন্তা কিরীটীর মাথার মধ্যে পাক খেয়ে
চলেছে। এবং এই সময়ে সে নিজ হতে স্বেচ্ছায় মুখ না খুললে কারো সাথ্য
নেই তাকে কথা বলায়। ব্যবতে পারছিলাম ছবিটা অমর্ন আকস্মক ভাবে
মাটিতে পড়ে গিয়ে ভাঙার ব্যাপারটা সে খুব সহজভাবে নেয়ান। শতদলের
ক্ষণপূর্বের জবানিতে জানা গিয়েছে ঘরটা বন্ধ ছিল এবং এ ঘরের চারিবাটাও
তারই ঘরে ছিল। অথচ দেখা যাচ্ছে ঘরের দরজায় কোন তালা নেই—দরজা
খোলা এবং ঘরের মধ্যে এই ছবিটা ভগ্ন কাচের টুকরোর মধ্যে পড়ে আছে।
আরো ভাঙার শব্দটা কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা নিচের তলা থেকেই শুনেছি।
ছবিটা আপনা হতেই পড়ে গিয়ে যে ভাঙেন তারও প্রমাণ পাইছ।

সব কিছু পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এ কথাটা স্বতঃই মনে হচ্ছে, কেউ
নিশ্চয়ই এ ঘরে এসেছিল। এবং ছবিটা পাড়তে গিয়ে বা নামাতে গিয়ে
দেওয়াল থেকে আচম্কা অসাধানতাবশতঃ তার হাত থেকে হয়তো মাটিতে
পড়ে গিয়ে কাচটা ভেঙেছে। খুব সম্ভব সেই কারণেই হয়তো তাকে আচম্কা
ঘটনাবিপর্যয়ে স্থানত্যাগ করতে হয়েছে।

এক্ষেত্রে তাহলে বক্তব্য হচ্ছে, কেউ না কেউ কিছুক্ষণ আগে এ ছবিটার জন্য
এ-ঘরে এসেছিল। যেই অসুর! কিন্তু কেন?

এ ছবিটার প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল তার। কিন্তু কেন? কী প্রয়োজন
ছিল তার?

ওজনে অত ভারী এবং আকারে অত বড় ছবিটা চট করে কোথায়ও নিয়ে
যাওয়া বা লুকোনোও তো সহজ নয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, তার
ছবিটা সরাবার বা কোথাও নিয়ে যাওয়ার ঠিক প্রয়োজন ছিল না, কেবল হয়তো
ছবিটা দেওয়াল হতে নামিয়ে দেখতেই চেয়েছিল সে। কিন্তু ছবিটা দেখবারই
মাদ্দ প্রয়োজন ছিল তার, দেওয়ালে টাঙানো অবস্থাতেও তো দেখতে পারত?
দেওয়াল হতে নামাবার কী প্রয়োজন ছিল?

বাইরে এমন সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। ব্যবলাম শতদলবাবু
চাবির রিং ও টর্চ নিয়ে এই ঘরেই আসছে।

অনুমান মিথ্যা নয়। শতদলবাবুই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন এবং নিঃশব্দে
চাবির রিংটা ও পাঁচ-সেলের একটা হান্টিং টর্চ কিরীটীর দিকে এগিয়ে
দিলেন।

ডান হাতে চাবির রিংটা ধরে বাম হাতে টর্চটা নিল কিরীটী।

এই রিংয়ের মধ্যেই এই ঘরের তালার চাবিটা ছিল? কিরীটী শতদলকে
প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

দেখুন তো সে চাবিটা আছে কি না? সব, বাঁতটা একটু তুলে ধর।
কিরীটীর নির্দেশমতো বাঁতটা আমি তুলে ধরলাম।

চাবির গোছাটা কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখে শতদল মৃদুকষ্টে বললে, এই
তো, চাবিটা রিয়ের ঘথেই আছে দেখিছ!

একটা বড় আকারের চাবি গোছার ভিতর থেকে আলাদা করে কিরীটীর
সামনে ধরল শতদল।

চাবির রিংটা আপনার ঘরে যে আলমারির ড্রয়ারে ছিল বলছিলেন, সেটা
কি চাবি দেওয়াই থাকত শতদলবাবু?

হ্যাঁ। চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলেই তো রিংটা নিয়ে এলাম।

ড্রয়ারের চাবিটা কোথায় ছিল?

আমার পকেটেই ছিল। সর্বদা পকেটেই রাখি।

আপনার ঘরটা কি সাধারণতঃ যখন আপনি থাকেন না, তালা দেওয়া
থাকে?

না।

কিরীটী অতঃপর টচের আলো ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে কী
যেন দেখল এবং ফিরে এসে বললে, তালাটা নেই দেখিছ। ভাল কথা, আজ
কখন আপনি বাইরে বের হয়েছিলেন? কতক্ষণই বা বাইরে ছিলেন
শতদলবাবু?

প্রায় গোটা-চারেকের সময় বাইরে গিয়েছি—

যাওয়ার সময়ও এই ঘরের দরজার সামনে দিয়েই আপনি গিয়েছিলেন,
তখন লক্ষ্য করেছিলেন কি, এই ঘরের দরজার তালাটা ছিল কিনা?

না, লক্ষ্য করিনি।

কোথায় গিয়েছিলাম আপনি?

থানায় গিয়েছিলাম দারোগাবাবুকে গতরাত্তের ব্যাপারটা জানাতে।

দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা হল?

হয়েছে।

হোটেলে কখন গিয়েছিলেন?

থানার ঘণ্টাখানেক ছিলাম, বোধ করি সাড়ে ছটা নাগাদ হোটেলে পেঁচাই।
সেখানে আপনাদের না পেয়ে বরাবর এখানে ফিরে আসি।

হ্যাঁ। আচ্ছা একটা কথা বলতে পারেন শতদলবাবু, হিরণ্যয়ী দেবীরা
এখন নিচের মহলে যে ঘরটায় আছেন সেই ঘরের দেওয়ালে পাশাপাশ যে দুটি
মহিলার ছবি টাঙানো আছে তাঁরা কারা?

আমি লক্ষ্য করে দেখিনি তো! বিস্মিত দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে
তাকিয়ে শতদল জবাব দেয়।

দেখেননি? কাল একবার দিনের বেলা ছবি দুটো ভাল করে দেখে আমাকে
বলবেন তো, চিনতে পারেন কিনা ছবি দুটো কার? কতকটা যেন নির্দেশের
সুরেই কথাগুলো বললে কিরীটী।

কিরীটী প্রস্তাবে শতদল যেন একটু ইতস্ততঃ করে বলে, উনি মানে
আপনার ঐ হিরণ্যয়ী দেবী, আমাকে ঠিক যেন পছন্দ করেন বলে আমার মনে
হয় না মিঃ রায়। কাজেই তাঁর ঘরে যাওয়া—

অবিশ্য যদি কিছু মনে না করেন—আপনার ওরকম মনে হওয়ার কোন কারণ আছে কি?

থাকলেও অন্ততঃ আমি জানি না যিঃ রায়, কারণ এবাবে এখানে আসবার প্ৰ্বে পৰ্যন্ত গুদের সঙ্গে আমার কোন চেনা-পৰিচয়ই ছিল না।

হিৱিলাসবাৰ, হিৱিয়ী দেবী ও গুদের মেয়ে ঐ সীতা—এংদের কারণ সঙ্গেই প্ৰ্বে আপনার আদৌ কোন পৰিচয় ছিল না আপনি চলতে চান শতদলবাৰ কি?

প্ৰশ্নটাৰ মধ্যে যেন কোন গুৰুত্ব নেই, কথার পিঠে কথাপুসঙ্গে এসে গিয়েছে এমনি ভাবেই অত্যন্ত শান্ত ও নিৰ্লিপ্ত কষ্টে কথাগুলো বলতে বলতে ইতিমধ্যে হাতেৰ টুচ্টা জেবলে তাৰ আলোয় কিৱীটী ঘৰেৱ চতুৰ্দিকে দেওয়ালে ঘূৰিয়ে ঘূৰিয়ে দেখতে লাগল। শতদল মৃহূৰ্তকাল চূপ কৰে থেকে মৃদু সংযত কষ্টে জবাব দিল, না।

আচম্কা কিৱীটী ঘূৰে দাঁড়াল শতদলেৱ মুখোমুখি হয়ে এবং তাৰ স্বাভাৱিক অনুসন্ধানী চাপা অথচ স্পষ্ট কষ্টে প্ৰশ্ন কৱল, ছিল না?

না।

মৃহূৰ্তেৰ জন্য কিৱীটীৰ কষ্টে বে অনুসন্ধিংসা জেগে উঠেছিল তাৰ পৱতৰ্ণ প্ৰশ্নে যেন তাৰ আৱ লেশমাত্ৰও অবিশ্বষ্ট রাইল না, আপনার সঙ্গে গুদেৱ প্ৰ্ব-পৰিচয় যদি কিছু না-ই থেকে থাকে, তাহলে হঠাতই বা হিৱিয়ী দেবী আপনাকে অপছন্দ কৱতে যাবেন কেন?

তাহলে কথাটা আপনাকে খুলৈ বলিঃ রায়, যদিচ কাৱণটা আমার কাছে একালতই হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়। হিৱিয়ী দেবী দাদুৰ মৃত্যুৰ পৰ আমার এভাবে এখানে আসাটাই যেন পছন্দ কৱেননি। আৰ্য না এলৈ দাদুৰ সম্পত্তি সম্পত্তিৰ একমাত্ৰ উত্তৱাধিকাৰীণী তো তিনিই হতেন, যদিচ দাদুৰ সম্পত্তিৰ মধ্যে তো এই বাড়িখানা ও একগাদা ছৰি ও মৃত্তি। আমার কাছে তো এৱ কোন ঘূলাই নেই আৱ দাবিও কৱব না। একা মানুষ, বিয়ে-থাৱ কৱিন, যা মাইনে পাই প্ৰফেসাৰ কৱে তা প্ৰয়োজনেৱ অতিৱৰ্ষত। এ কথা এখানে আসবার পৱই ওদেৱ আঘি বলেছিলাম, কিন্তু—

কিন্তু কী?

কিন্তু উনি জবাব দিলেন, যতটুকু তাৰ প্ৰাপ্য তাৱ এক কড়াকুলিতও উনি বেশী চান না এই সম্পত্তিৰ!

ইঁ। মনে কিছু কৱবেন না শতদলবাৰ, একটা কথা হঠাত মনে পড়ে গেল এবং না বলেও পাৱছ না—

নিশ্চয়ই, বলুন না?

প্ৰথমে যেদিন সৈকতে আপনার সঙ্গে পৰিচয় হয়, মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার, আপনি কথায় কথায় বলেছিলেন, যতদুৰ আমার মনে পড়ে যে শিল্পী রংধীৰ চৌধুৰীৰ বিৱাট সম্পত্তিৰ শেষ ও একমাত্ৰ অবিশ্বষ্ট তাৰ এই নিৱালাৰ ওয়াৰিশ আপনি। তাই নয় কি?

কিৱীটীৰ অমন সোজা ও স্পষ্ট অভিযোগে শতদল প্ৰথমটায় কেমন যেন একটু বিহুল হয়েই পড়ে, কিন্তু মৃহূৰ্তে সে বিহুলতাটুকু কাটিয়ে হাস্যতরল কষ্টে বলে গুঠে, হ্যাঁ বলেছিলামই তো এবং এখনও তাই বলব, কিন্তু ঊৱা সে কথা মানতে চান না।

মানতে চান না কেন? রণধীরবাবুর কোন উইল নেই?

উইল—সেটাকে উইলই বলা চলে, মানে দাদুর লেখা একখানি চিঠি আমার কাছে আছে যেটা অন্যায়ে আইনের চোখে উইলের সমপর্যায়ে পড়ে।

ওঃ, তবে সেটা ঠিক উইল নয়?

না। ঠিক উইলের খসড়ায় ফেলে রেজেস্ট্রী করবার বা কোন আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করবারও হয়তো তিনি সময় পাননি, কারণ সেটাকে চিঠিই বলুন বা উইলই বলুন, তাঁর মতুর মাত্র দিনসাতেক আগে লেখা—

সেই উইলে কী আছে?

চলুন না আমার ঘরে—ঐ ঘরের দেওয়াল-সিল্ডেকেই উইলটা আছে—

যাবখন, তবু বলুন না আপনি কী লেখা আছে সেই চিঠিতে?

বিশেষ কিছুই না, লেখা আছে এই ‘নিরালা’ ও এ-বাড়ির যাবতীয় সব কিছু আমাকে তিনি দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর মতুর পরে।

বাইরের দালানে এমন সময় অস্পষ্ট পদশব্দ পাওয়া গেল। এবং ঘরের অধ্যাস্থিত একমাত্র হ্যারিকেন বার্টিটা, হঠাৎ মনে হল, কেমন যেন তার আলোর শিখাটা নিষ্ঠেজ হয়ে আসছে।

আলোটার দিকে দ্রৃষ্টি আমারই প্রথম পড়ল, আলোটায় তেল নেই বলে যেন মনে হচ্ছে শতদলবাবু!

আমার কথায় আকৃষ্ট হয়ে কিরীটী ও শতদল দ্বিজনেই আলোটার দিকে তাকাল।

আলোটা নিষ্ঠেজ হয়ে এসেছে।

পদশব্দটা ঠিক দরজার গোড়ায় এসে থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ-বারের মত বার-দুই দপ দপ করে আলোর শিখাটা কেঁপে নিবে গেল হঠাৎ।

অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই যেন আলোর শিখাটা নিবে গেল।

অন্ধকার। নিষ্ঠেজ অন্ধকার ঘৃহ্ণণ্টে যেন আমাদের সমস্ত দ্রষ্টিকে গ্রাস করল।

অন্ধকারে কিরীটীর গলা শোনা গেল, কে? কে ওখানে?

কথার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর হস্তধ্বনি পাঁচ-সেলের হানটিং টর্চের সুতীর্ণ অনুসন্ধানী আলোর রশ্মিটা উচ্চস্থ ঘ্রাণপথে গিয়ে পড়ল।

কে?

চিনতে কষ্ট হল না টর্চের আলোর। দরজার ঠিক ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে এ-বাড়ির পুরাতন ভৃত্য অবিনাশ।

আজ্ঞে আমি অবিনাশ! অবিনাশ জবাব দিল, আমায় ডাকছিলেন দাদাবাবু?

হ্যাঁ। কোথায় থাক তোমরা? আলোগুলোতে তেল থাকে কি না থাকে সেদিকেও তোমাদের এতটুকুও নজর নেই, কী কর যে সব সারাদিন বসে বাড়িতে? ঝাঁঝালো বিরক্তি-পূর্ণ কষ্টে বলে উঠলেন শতদলবাবু।

কেন? আজ দুপুরেও সব বার্তাতে তেল ভরে দিয়েছি!

তেল ভরেছ তো বার্ত নিবে ধায় কি করে? যাও, আর একটা বার্ত নিয়ে এস শিগগির করে।

যাই। অবিনাশ নিঃশব্দে চলে গেল।

କିରୀଟୀ ହସ୍ତଧୃତ ଟଚେର ଆଲୋ ଫେଲେ ସରେର ମେରୋଟା ଆବାର ଦେଖତେ ଲାଗେଲ । ସେ ଜାଗାଯି ଦେଓଯାଳ ଥେକେ ଛବିଟା ଯେବେତେ ପଡ଼େଇଲ ତାର ଚାରିଦିକେ କାଚେର ଟ୍ରିକରୋ ଛାଡିଯେ ରହେଛେ ଇତ୍ସତ ।

ଦେଓଯାଲେର ଗାୟେ ସେଥାନେ ଛବିଟା ଟାଙ୍ଗନୋ ଛିଲ କିରୀଟୀ ସେଥାନେ ଆଲୋ ଫେଲିଲ, ତାରପର ଆବାର ସରେର ଚାରିଦିକେ ଅନୁସଞ୍ଚାନୀ ଆଲୋ ଫେଲେ ଘ୍ରାନ୍ତିକଣ୍ଠେ ବଲଲେ, କତକଟା ସେନ ଆସଗତ ଭାବେଇ, ଆଶର୍ଯ୍ୟ ! ଟ୍ରିଲଟା ଦେଖିଛ ନା—ଗେଲ କୋଥାଯ ?

କୀ ବଲଲେନ ମିଃ ରାୟ ? ପ୍ରଶ୍ନଟା କରଲେନ ଶତଦଲବାବୁଙ୍କ ।

ଏକଟା ଟ୍ରିଲ—

ଟ୍ରିଲ ! ବିପ୍ରିଷ୍ଟ କଣ୍ଠେ କଥାଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ କିରୀଟୀର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଝଇଲେନ ଶତଦଲ ।

ହଁ, ଟ୍ରିଲ ବା ଏଇ ଜାତୀୟ ଏକଟା କିଛୁ—, ହଁ ଭାଲ କଥା, ଆପନାର କାହେ ମଜବୂତ ତାଲା ଆଛେ ଶତଦଲବାବୁଙ୍କ ?

ତାଲା ! ତା ଆଛେ ବୋଧ ହୟ—

ନିଯେ ଆସନ୍ତି ଆମାକି ଘରଟା ତାଲା ଦିଯେ ରାଖତେ ହବେ ।

ଶତଦଲବାବୁ ଘର ହତେ ନିଷ୍କାନ୍ତ ହୟେ ଗେଲେନ ।

କିରୀଟୀ ହାତେର ଆଲୋଟା ତତ୍କଣେ ଭୂପରିତ ଛବିଟିର ଉପରେ ଫେଲେଛେ ଏବଂ ଆମାକେ ଏବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବଲଲେ, ଛବିର ଫ୍ରେମଟା କିସେର ତୈରୀ ବଲେ ମନେ ହୟ ସାଙ୍କ ?

ଛବି—ମାନେ ଏଇ ଛବିର ଫ୍ରେମଟା ?

ହଁ ! ଚରେ ଦେଖ ଛବିର ଫ୍ରେମଟା ଏକଟା ସେନ peculiar ! ବ୍ରୋଞ୍ଜ-ଜାତୀୟ କୋନ ମେଟାଲେର ତୈରୀ । ଏବଂ ସେମନ ମଜବୂତ ତେମନି ଭାରି । ଓୟାଟାର-କଲାର ଏକଟା ଛବି ଓ ତାର କାଚେର ଓଜନ ଏତ ବେଶୀ ହତେ ପାରେ ନା । ଛବିଟାର ସା-କିଛୁ ଓଜନ ଓହି ଫ୍ରେମଟାର ଜନାଇ । କଥାଗ୍ଲୁମେ ବଲେ ସହସା ସେନ ଅତଃପର କତକଟା ମ୍ବଗତୋତ୍ତର ମତାଇ ଆମେତେ ଆମେତେ ବଲଲେ, କିଳ୍କୁ କେନ ?

କୀ ବଲାଲି ! ପ୍ରଶ୍ନଟା କରଲାମ ଆମିଇ କିରୀଟୀର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକିଯେ ।

ଭାବାଛ ଛବିର ଫ୍ରେମଟାର କଥାଇ । ବିନା ପ୍ରଯୋଜନେ ଏ ଜଗତେ କିଛୁଙ୍କୁ ତୈରୀ ହୟ ନା ସାଙ୍କ ! ଛବିର ଫ୍ରେମଟାଓ ନିଶ୍ଚଯାଇ ଐଭାବେ ତୈରୀ କରିବାର ଆଟିଚେଟର କୋନ ଏକଟା ଉଲ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଛିଲ ।

ହୟତେ ଛବିଟାକେ ମଜବୂତ ଓ ଟେକସଟି କରିବାର ଜନାଇ ।

There you are ! You are cent per cent right, ସାଙ୍କ ।

ବାଇରେ ଏମନ ସମୟ ପଦଶବ୍ଦ ଶୋନା ଗେଲ ।

ଅବିନାଶ ଏକଟା ଆଲୋ ହାତେ ସରେର ମଧ୍ୟେ ଏମେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ ।

ହଠାତ୍ କିରୀଟୀ ଅବିନାଶେର ଦିକେ ତାକିଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲ, ପାଯେ ତୋମାର ବ୍ୟାକ୍ ଚୋଟ ଲେଗେଛେ ଅବିନାଶ ?

କିରୀଟୀର ଆଚମ୍କା ପ୍ରଶ୍ନେ ଅବିନାଶ ସେନ ଏକଟା ଚମକେ ଥତମତ ଥିଲେ ବଲେ, ଆମେ ?

କେମନ ଏକଟା ଥିଲେ ନାହିଁ ହାଁଟିଛ ଦେଖିଛି କିନା । ପାଯେ ଚୋଟ ଲେଗେଛେ ନାକି ? ବେଶ ମୋଲାଯେମ କଣ୍ଠେ କିରୀଟୀ ଆବାର ଶୁଧୋଯ ।

ଆମେ ଠିକ ଥିଲେ ନାହିଁ, ତବେ ଜନ୍ମ ହତେଇ ବାଁ ପା-ଟା ଏକଟା ଥାଟୋ କିନା, ତାଇ ଏକଟା ଟେନେ ଚଲିଲେ ହୟ ଚିରାଦିନାଇ ।

শতদলবাবু এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর একটা ভারী পিতলের বড় তালা ও একটা চার্বি।

এই নিন তালা কিরীটীবাবু! তালা ও চার্বিটা এগিয়ে দিল শতদল কিরীটীর দিকে।

হাঁ! দিন। কিরীটী তালা ও চার্বি শতদলবাবুর হাত থেকে নিল, চার্বি কি এই একটাই, না duplicate key আছে?

আছে।

সেটা কোথায়?

ও-ঘরে চার্বির রিঞ্জে আছে। এনে দেব কি?

না, থাক। চলুন বাইরে যাওয়া থাক।

সকলে আমরা বাইরে এলাম। কিরীটী নিজ হাতে দরজায় তালাচার্বি দিয়ে চার্বিটা নিজের জামার পকেটে রেখে দিল, এটা আমার কাছেই রইল শতদলবাবু। ড্রপ্লিকেট চার্বিটাও আমাকে দেবেন।

বেশ তো।

তারপর হঠাতে যেন কথাটা মনে পড়েছে এইভাবে আলো হাতে দণ্ডায়মান অবিনাশের দিকে ফিরে তাঁকিয়ে কিরীটী তাকেই প্রশ্নটা করলে, ভাল কথা অবিনাশ, আজ এই কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যার দিকে তুমি যখন আমাদের সদর দরজা খুলে দিতে গিয়েছিলে, বলেছিলে না, বড়বাবু মানে হরাবিলাসবাবু তোমাকে আমাদের আসবার কথাটা জানতে পেরেই সদর দরজাটা খুলতে পাঠিয়েছিলেন?

আজ্ঞে! মৃদুকষ্টে অবিনাশ জবাব দিল।

আমরা যখন এ-বার্ডির সদরে এসে বাইরে থেকে ঘণ্টার দড়ি নাড়া দিই, তুমি আর তোমার বড়বাবু কোথায় ছিলে?

আমি রান্নাঘরের দিকে ছিলাম—

আর বড়বাবু?

বড়বাবু রান্নাঘরের সামনে অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছিলেন।

হঁ। ভুখনা কোথায় ছিল?

সে তো রান্নাঘরেই ছিল। প্রব'বৎ মৃদুকষ্টে অবিনাশ জবাব দেয়, রান্না করছিল বোধ হয়।

হঁ। আচ্ছা তুমি যেতে পার। আলোটা এইখানেই রেখে যাও।

অবিনাশ কিরীটীর নির্দেশমত হাতের হ্যারিকেনটা বারান্দায় নামিয়ে রেখে সিংড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

একদ্রে কিরীটী অবিনাশের গমনপথের দিকে তাঁকিয়ে ছিল।

এবারে আমিও স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, সীতাই অবিনাশ যেন তার ব' পা-টা একটু টেনেটেনেই চলছে। যতক্ষণ অবিনাশকে দেখা গেল, কিরীটী একদ্রে সেই দিকে তাঁকিয়ে রইল। ত্রুটে অবিনাশ সিংড়ি-পথে নেমে নিচের দিকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর কিরীটী শতদলের দিকে ফিরে তাঁকিয়ে প্রশ্ন করলে, একটা ব্যাপার কখনো লক্ষ্য করেছেন শতদলবাবু—আপনাদের ঐ প্রদরনো চাকর অবিনাশের চলাটা একটু defective! মানে চলবার সময় ব' পা-টা একটু টেনে টেনে চলে?

কই, না? কখনো লক্ষ্য করিনি তো? শতদল জবাব দেয়।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେନନ୍ତି ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !

ନା, ସିଂ୍ଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାମ୍ବି। ତବେ ସାଧାରଣତଃ ଓ ଏକଟ୍ଟ ଆମେତେଇ ଯେଣ ଚଳା-
ଫେରା କରେ ବଲେ ମନେ ହୁଯା । ଶତଦଲ ବଲଲେ ।

ଚଳାନୁ ଆପନାର ସରେ ସାଓସା ସାକ । କିରୀଟୀ ଯେଣ ତାର ନିଜେର ଦିକ
ହତେଇ ଉଚ୍ଛିତ କ୍ଷଣପର୍ବେର ପ୍ରଶନ୍ତା ଅତଃପର ଏଡ଼ିଯେ ଗିଯେ ଶତଦଲବାବୁର ଶୟନ-
କଙ୍କେର ଦିକେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପା ବାଡ଼ାମ ।

ସକଳେ ଏସେ ଆମରା କିରୀଟୀର ପିଛୁ ପିଛୁ ଶତଦଲବାବୁର ସରେର ମଧ୍ୟେ
ପ୍ରବେଶ କରିଲାମ । ଏକ କୋଣେ ଏକଟା ଉଚ୍ଚ ଟାଙ୍କେର ଓପରେ ସାଦା ଡୋମ-ଚାକା ଆଲୋ
ଜବଲଛେ । ସମ୍ମତ ସରଟା କିନ୍ତୁ ତବୁ ସମାନଭାବେ ଆଲୋକିତ ହୁଯାନି । ସରଟା
ଆକାରେ ବଡ଼ ହୁଏଇ ଦରଳନ୍ତି ବୌଧ ହୁଯ ଏକଟିମାତ୍ର ଆଲୋଯ ସମ୍ମତ ସରଟିକେ ତେମନ-
ଭାବେ ଆଲୋକିତ କରତେ ପାରେନି । ସରେର ଏକଟିମାତ୍ର ଜାନାଲା ଛାଡ଼ା ବାକି ସବ
କରାଟି ଜାନାଲାଇ ବନ୍ଧ । ଏବଂ ଏକଟିମାତ୍ର ଐ ଖୋଲା ଜାନାଲାପଥେ ହରି-ହରି କରେ
ସମ୍ମୁଦ୍ରର ହୁଏଇ ସରେର ମଧ୍ୟେ ଏସେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲ ।

, କିରୀଟୀ ସରେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଐ ଖୋଲା ଜାନାଲାଟାର ଦିକେ
ଏଗିଯେ ଗେଲ । ଆମିଓ କିରୀଟୀକେ ଅନୁସରଣ କରେ ତାର ପାଶେ ଗିଯେ
ଦାଁଡ଼ାଲାମ ।

ଦୂରେ ସମ୍ମୁଖେ ଦୃଷ୍ଟିର ସାମନେ ଯେଣ ଏକଟା ଦିଗନ୍ତପ୍ରସାରୀ କୁଞ୍ଚ ଚାଦର ଆର
କାନେ ଭେସେ ଆସେ ଏକଟାନା ଏକଟା ଚାପା ଗର୍ଜନ ଅନ୍ଧକାର ଭେଦ କରେ । କିରୀଟୀର
ହାତେ ତଥନ ଶତଦଲବାବୁର ଦେଓୟା ପାଂଚ ସେଲେର ହାଂଟିଂ ଟର୍ଟା । ତାରଇ ଆଲୋ
ସମ୍ମୁଖେର ଦିକେ ଫେଲିଲ କିରୀଟୀ ।

ଆଲୋର ରାଶଟା ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଲ—ଏକେବାରେ ଏ-ବାଡ଼ିର ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ହାତେର ଆଲୋଟା ବାର କରେକ କିରୀଟୀ ନୀଚେ ଚାରିଦିକେ ସ୍ଵାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଵାର୍ଯ୍ୟ
ଦେଖିଲ, ତାରପର ଆଲୋଟା ନିବିଯେ ସ୍ଵରେ ଦାଁଡ଼ାଲ ଏବଂ ଶତଦଲେର ଦିକେ ତାରିକ୍ୟେ
ପ୍ରଶନ୍ କରିଲ, ଆପନି ତୋ ବଲାଇଲେନ ଶତଦଲବାବୁ, ଏ ସରଟା ଆପନାର ଅନୁ-
ପଞ୍ଚିତିତେ ତାଳା ଦେଓୟାଇ ଥାକେ, ତାଇ ନା ?

ହ୍ୟୁ ।

ଆଜି ତାଳା ଦେଓୟାଇ ତୋ ଛିଲ ?

ନା, ବୋଧ ହୁଯ ତାଳା ଦେଓୟା ଛିଲ ନା ।

ଛିଲ ନା ?

ନା, ଏସେଓ ଦେଖିଲାମ ଏକଟ୍ଟ ଆଗେ ଟର୍ଟା ନିତେ ଏସେ—ସରେର ଦରଜାଟା କେବଳ
ଭେଜାନୋଇ ଆଛେ, ତାଳା ଲାଗାନୋ ନେଇ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ସତଦର ମନେ ପଡେ,
ବିକାଳେ ବେରୁବାର ଆଗେ ଯେଣ ତାଳା ଦିଯେଇ ଗିରେଇଲାମ । କୀ ଜାନି, ବୋଧ ହୁଯ
ତାଳା ଦିତେ ଭୁଲେ ଗିରେଇଛି !

ଚାବିଟା କୋଥାଯା ଛିଲ ?

ଆମାର ପକେଟେଇ ଛିଲ ।

ଆପନାର ଏ-ସରେର ତାଳାର କୋନ duplicate ଚାବି ତୋ ନେଇ ? କିରୀଟୀ
ଆବାର ପ୍ରଶନ୍ କରେ ଶତଦଲକେ ।

ଆହେ, ସେଇ ଏ ଚାବିର ରିଙ୍ଗେର ମଧ୍ୟେ ଚାବିଟା ଆହେ କିନା ? ହ୍ୟୁ, ଐ ସଙ୍ଗେ ରିଂ ଥେକେ

ଟାଙ୍କିଡିଯୋର ସରେର ତାଳାର duplicate ଚାବିଟାଓ ଆମାକେ ଖୁଲେ ଦିନ ।

କିରୀଟୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଶତଦଲବାବୁ ସରେର କୋଣେ ରାଙ୍ଗିତ ଏକଟା କାଠେର ଭାରୀ

চেস্ট ড্রয়ারের টানা খুলে তার ভিতর হতে অনেকগুলো চাবির গোছাসমেত একটা রিং বের করলেন। চাবির রিং থেকে প্রথমেই শতদল স্ট্যান্ডও-ঘরের তালার ডুপলিকেট চাবিটা খুলে কিরীটীকে দিলেন; তারপর এ-ঘরের তালার ডুপলিকেট চাবিটা রিঙের চাবির মধ্যে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু রিঙের সমস্ত চাবিগুলো তন্ম তন্ম করে খুঁজেও প্রয়োজনীয় ডুপলিকেট চাবিটা খুঁজে পাওয়া গেল না।

কী হল, চাবিটা নেই? আমি প্রশ্ন করলাম।

আশ্চর্য, সত্তাই চাবিটা তো নেই দেখো! বুরতে পারছ না স্বরত-বাবু—পরশু—তো যতদ্বয় মনে পড়ছে দেখোছিলাম যেন রিঙের মধ্যে সে চাবিটা ছিল!

যাক, ও নিয়ে আর মিথ্যে ধ্যন্ত হবেন না শতদলবাবু। আমি প্রবেষ্ট অনুমান করেছিলাম চাবিটা পাওয়া যাবে না। কথাটা বললে কিরীটীই।

অনুমান করেছিলেন। বিস্মিত সপ্রশ্ন দ্রষ্টব্যতে তাকান শতদল কিরীটীর ঘুর্থের দিকে।

হ্যাঁ। কিরীটীর কণ্ঠ হতে হোট সংক্ষিপ্ত জবাবটি উচ্চারিত হল।

আমি আপনার কথা তো ঠিক বুৰতে পারলাম না মিঃ রায়!

আপনিই হয়তো দু-চার দিনের মধ্যেই আমার কথার তৎপর্যটা বুৰতে পারবেন, আমাকে আর কণ্ঠ করে বলতে হবে না শতদলবাবু। কিন্তু সেকথা থাক, আপনি যে একটু আগে কী একটা চিঠির কথা বলছিলেন, চিঠিটা একটি-বার দেখতে পারি কি?

নিশ্চয়ই। শতদলবাবু এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা দেওয়াল-আলমারি খুলে তার ড্রয়ার থেকে একটা সাদা বড় আকারের রঙ ও তুলির সাহায্যে চিত্ৰ-বিচিত্ৰ খাম বের করে এনে কিরীটীর হাতে দিলেন।

কিরীটী শতদলবাবুর হাত হতে খামটা নিয়ে আলোর সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল। আমিও পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

খামটার উপরে রঙের বাহার যেন চিত্ৰ-বিচিত্ৰ হয়ে উঠেছে। মানুষের মুখ হতে শুরু করে পশ্চু-পার্থি, ফল-ফুল, লতা-পাতা কী যে নেই তার ঠিকানা নেই!

অনেকক্ষণ ধরে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে কিরীটী খামের উপরে আঁকা চিত্ৰগুলি দেখতে লাগল। খামের মুখটা খোলাই ছিল, অতঃপর তার ভিতর হতে একটা ভাঁজ-করা কাগজ টেনে বার করল।

আলোর সামনে ভাঁজ খুলে কাগজটা মেলে ধরল।

একটা চিঠিঃ চিঠির শৈর্ষে ব্র্যাকেটের মধ্যে দুই লেখা।

(২)

আমার আভাসিদের প্রতি—ইহাই আমার শেষ নির্দেশ (৩)

সজ্জানে লিখিয়া বাইতেছি, রংধনীর চৌধুরী আমি (০)

আমার ধাবতীয় সম্পত্তি ও এই 'নিরালা' গৃহখান আমার (৩)

দোহিতা গ্রীমান শতদল বোসকে আমার মৃত্যুর পর (৫)

বর্তাইবে। কেবলমাত্র সে যেন স্বরণ রাখে যে আমার স্ট্রিডওতে	(৪)
যে সব আঘাতের ছাঁবিগুলো, যেমন পিতামহ প্রপিতামহের	(৬)
সেইগুলো ও অন্যান্য যে সকল পোশ্টং ও ছৰ্বি	(৩)
এবং এ সঙ্গে এ কক্ষ-মধ্যস্থিত সমস্ত মৃত্যুগুলোরও স্বত্ত	(২)
বাকি সব বর্তাইবে আমার দোহিত্র শতদলকুমারে	(৩)
শুধু এ নয়, আমার শিল্পী-জীবনের নিম্না ও ঘনের	(২)
উত্তরাধিকারীও একমাত্র সেই হইবে	(৩)

ইতি—

রণধীর চৌধুরীঃ ৩০৩৫৪৬৩২৩২৩ :

১৮ই ভাদ্র ১৩৫৩

অবাক বিস্ময়েই চিঠিটা বার-দ্বাই আগাগোড়া পড়াবার পরও চিঠিটার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। লেখা ছাড়াও চিঠিটার মধ্যে দৃশ্যান্বিত মুখের রেখাচিত্র বা স্কেচ অঁকা।

কিরীটীর দিকে আড়চোখে তাকালাম। কিরীটীর সমস্ত চেতনা যেন চিঠিটার মধ্যেই তন্মৰ হয়ে গিয়েছে। স্থির নিষ্পন্দ ভাবে চিঠিটা আলোর সামনে প্রসরাত করে হাতের মধ্যে ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে।

সহসা শতদলবাবুর কঠস্বরে কিরীটীর তন্ময়তা ভঙ্গ হল।

দেখলেন তো চিঠিটা পড়ে মিঃ রায়? আমি আপমাকে ঠিক বলেছিলাম কিনা যে, আমিই দাদুর যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং তাঁর সম্পত্তি বলতে এই 'নিরালা' গৃহটা আর স্ট্রিডওর মধ্যে একটু আগে যে ছৰ্বি ও মৃত্যুগুলো দেখে এলেন ঐগুলোই!

হ্যাঁ, অন্ততঃ চিঠিটায় মোটামুটি ভাবে সেই নির্দেশই রয়েছে দেখলাম। অত্যন্ত মৃদুকষ্টে যেন কিরীটী শতদলের কথার জবাব দিল।

ঘরের মধ্যে দেরাজের উপর রাখার আকারের একটা টাইমস-পৰ্সি ছিল, হঠাৎ সেটা রিং-রিং করে বেজে উঠতেই চমকে টাইম-পৰ্সিটার দিকে তাকালাম, রাণি প্রায় পৌনে নটা।

শতদলও অ্যালার্মের শব্দে চমকে উঠেছিল, এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি অ্যালার্মের বোতামটা টিপে অ্যালার্ম বন্ধ করে দিলেন। কিরীটী রণধীর চৌধুরীর লেখা চিঠিটা ভাঁজ করে পুনরায় খামের মধ্যে ভরে রাখতে রাখতে বললে, যদি কিছু মনে না করেন শতদলবাবু, এই চিঠিটাও আজকের রাতের মত নিয়ে যেতে চাই আমি। কাল আবার ফিরিয়ে দেব।

বেশ তো, নিয়ে যান না। শান্তকষ্টে প্রত্যুভবদেন শতদল।

ধন্যবাদ। আজকের মত তাহলে আমরা বিদায় নেব শতদলবাবু। কাল সকালে একবার পারেন তো হোটেলে আসবেন। আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে।

যাৰ।

শতদল আমাদের সদৰ দৰজা পৰ্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

অধ্যকারে দৃজনে পাশাপাশি আমি ও কিরীটী সাগরের ধার দিয়ে হোটেলের দিকে ফিরে চলেছি। অক্ষম্বাত যেন কিরীটী অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

কোন একটা চিন্তা যে তার মাথার মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছে ব্যাপতে কষ্ট

হয় না। এবং যে চিন্তাই হোক, বিষয়বস্তুটা যে তাকে বেশ বিচালিত করে তুলেছে বুঝতে পারিছিলাম। আমিও অনেক কিছুই ভাবিছিলাম।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই সম্ধ্যায় যে সব ঘটনা পর পর ঘটে গেল, কোনটার সঙ্গে কোনটারই কোন যোগস্থ একটা খুঁজে না পেলেও একটা ব্যাপার যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটা হচ্ছে শতদলের সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্য যেন ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। একটা আশা, অঙ্গলের ছায়া যেন ক্রমে ক্রমে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোন একটা অভাবনীয় দৃঘটনা যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। এবং অবশ্যম্ভাবী সে দৃঘটনাকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আমাদের কারোরই হবে না।

হোটেলের সামনে সী-বীচে কয়েকদিন আগেকার সকালের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, এই কয়দিন ধরে যে ব্যাপারটাকে অল্পতৎ আমি আদপেই কোন গুরুত্ব দিইনি, অথচ প্রথম হতেই যেটা কিরীটীকে বিচালিত করেছে সেটাই যেন এখন ক্রমশ স্পষ্ট আকার নিয়ে সঠিক জিটিল হয়ে উঠেছে।

কিরীটীই একসময় নিষ্ঠত্বতা ভঙ্গ করে কথা বলে উঠল, তোকে একটা কাজ করতে হবে সু।

কী?

লুকিয়ে সীতার ও তার মাঝের গতিবিধির উপর নজর রাখতে হবে।

কেমন করে সেটা সম্ভব হবে? ওরা থাকে বাড়ির মধ্যে—

যতদ্বাৰা আমার মনে হয়, খুব বেশীদিন নজর রাখতে হবে না। দু-চারদিন নিরালা'র আশেপাশে সম্মুদ্রের ধারে ও 'নিরালা'র পিছনের বাগানে ঘোরাফেরা করতে পারলেই কিছু-না-কিছু তুই জানতে পারিব। তবে হ্যাঁ, তোকে জেলের ছন্মবেশ ধরতে হবে।

বেশ, কাল সকাল থেকেই তাহলে শুরু করিব!

না, আজ রাত থেকেই।

আজ রাত থেকেই?

হ্যাঁ।

হোটেলে পেঁচে দোখি, আমাদের ঘরের সামনে বারান্দায় ইঞ্জিচেয়ারে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন থানা-অফিসার রসময় ঘোষাল।

কিরীটীই প্রথম ঘোষালকে সংবর্ধনা জানাল, ঘোষাল সাহেব যে, কতক্ষণ?

তা প্রায় আধ ঘণ্টাটাক তো হবেই। এসে শুনলাম আপনারা বেড়াতে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেননি। এত রাত হল যে?

হ্যাঁ, একটু রাত হয়ে গেল। 'নিরালা'য় গিয়েছিলাম। কিরীটী বসতে বসতে বললে, উঠেছেন কেন, বসুন!

আমি কিরীটীর পাশেই উপবেশন করলাম।

এতক্ষণ 'নিরালা'য় ছিলেন? শতদলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে? পুনরায় বসতে বসতে ঘোষাল বললে।

হয়েছে।

সব শুনেছেন তো?

পরশ্ব রাত্রের ব্যাপারটা তো? কিরীটী শুধোয়।

হ্যাঁ। মশাই, আমিও সঠিক তাজ্জব বনে গিয়েছি!

ভাল কথা মিঃ ঘোষাল, আপনার যে দুজন plain dress পর্ণলসের
ও-বাড়িটা সর্বদা পাহারা দেবার কথা ছিল, পরশু রাত্রে তারা ছিল না?

ছিল।

তদের রিপোর্ট কি?

সেরাতে ঐ সময় অশোক সাহা বলে আমার যে লোকটি পাহারায় ছিল,
সেও নার্কি গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। ঐসময় সে ‘নিরালা’র পিছনের
বাগানেই ছিল।

অন্য কিছু সন্দেহজনক তার নজরে পড়েন?
না।

পরে অশোক কি ঐ রাত্রে শতদলবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিল?
করেছিল।

হ্যাঁ। ‘নিরালা’র একতলার বারান্দার শেবপ্রাপ্তে কতকগুলো কেডস
জুতোর সোলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, জানেন?

জানি। এবং তার ফটোও তুলে নেওয়া হয়েছে। আজ সকালেই আপনার
সঙ্গে দেখা করতে আমি আসতাম, কিন্তু স্থানীয় একটা আসন্ন উৎসবের
ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায়—

উৎসব! কিসের?

সামনেই ২য়া মাঘ; ঐ রাতে প্রতি বৎসর এখানে একটা মেলা বসে সম্মতের
ধারে। এখানকার লোকেরা বলে মাঘী মেলা। এবং রাত্রে একটা বিরাট বাজির
প্রতিযোগিতা হয়।

বাজির প্রতিযোগিতা!

হ্যাঁ, হ্যাঁ জায়গা হতে এখানে লোকেরা বাজির প্রতিযোগিতায় এসে যোগ
দেয়, রাত নটা থেকে প্রায় বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত বাজি পোড়ানো হয়।
এই জায়গায় ‘নিরালা’র উচ্চতা সব চাইতে বেশী বলে অনেকেই ঐ বাড়িতে গিয়ে
ছাদে উঠে বাজি পোড়ানো দেখে। রণধীর চৌধুরীর আমল থেকেই নার্কি ঐ
নিয়ম চলে আসছে। বছরের মধ্যে ঐ রাতটির জন্য তিনি সকলের জন্য বাড়ির
দরজা খুলে দিতেন। এখন তো বাড়ির মালিক শতদলবাবু, তাই তাঁকে ডেকে
পাঠিয়েছিলাম আমি জনসাধারণের দিক হতে, তাঁর কোন আপত্তি আছে কিনা
জানবার জন্য—

তা কী বললেন শতদলবাবু?

বললেন, নিশ্চয়ই তাঁর কোন আপত্তি নেই। চিরদিন যা চলে এসেছে তাঁর
দাদুর আমল থেকে, এখনও সেই নিয়ম চালু থাকবে। সকলেই স্বচ্ছন্দে তাঁর
ওখানে গিয়ে বাজি পোড়ানো দেখতে পারেন। সব ব্যস্থাই তিনি করে রাখবেন।
After all he is a nice man! চমৎকার লোক। ঘোষাল বিশেষণ যোগ
দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

আর দিন-পাঁচেক বাদেই তাহলে সেই মেলা? প্রশ্নটা করলাগ আমি।

হ্যাঁ। কাল-পরশু থেকেই সব দোকান-পসারীরা এসে ভিড় জমাবে দেখবেন।
আশেপাশে অনেক জায়গা হতেই সব লোকজন আসে। কিন্তু আসলে আপনার
কাছে আমার আসবাব উল্লেখ্য ছিল মিঃ রায়—শতদলবাবুর ব্যাপারটা আমাকে
বিশেষ ভাবিত করে তুলেছে। এ বিষয়ে আমি আপনার পরামর্শ ও সাহায্য
দুই-ই চাই। শতদলবাবু নিজেও যেন অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

তা তো হবারই কথা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমার পক্ষেও কোন মতামত দেওয়া তো সম্ভব নয় মিঃ ঘোষাল! তবে আজ সন্ধ্যা থেকেই একটা কথা আমার মনে হচ্ছে মিঃ ঘোষাল যে, শিল্পী রণধীর চৌধুরীর সম্পূর্ণ কেবল ঐ ‘নিরালা’ প্রাসাদখানিই নয়—there is something more! Something more!

কী আপনি বলতে চান মিঃ রায়?

আর্মি নিজেও এখন অন্ধকারেই মিঃ ঘোষাল। কয়েকটা ছিম সূত্র কেবল হাতে এসেছে, ভাসা-ভাসা অস্পষ্ট। হয়তো দু-একদিনের মধ্যেই এমন কোন ঘটনা ঘটবে যাব সাহায্যে আমরা কোন একটা সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে যেতে পারব। Matter will take a shape!

কিরীটীর নির্দেশন ঐ রাতেই সাধারণ একজন জেলের ছফ্ফবেশে আমাকে হোটেল থেকে বের হতে হল।

রাতি তখন বোধ করি এগারটা হবে।

সাগরের কিনার দিয়ে হনহন করে চলোছি নিরালা'র দিকে। চাঁদ উঠতে এখনো ঘণ্টাখানেক দুরী।

সঙ্গে আমার একটা দড়ির মই, একটা টর্চ ও লোডেড পিস্তল।

নিরালা'র গেটের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালাম। গেট হতে আমার দূরত্ব তখন প্রায় হাত-কুড়ি হবে।

তারার অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, পাশাপাশি দৃঢ়ি ছায়া-মৃত্তি' গেট খুলে বাইরে বের হয়ে এল।

চট করে রাস্তার ধারে পাথরের আড়ালে আঘাতে আঘাতে করলাম।

ছায়া-মৃত্তি' দৃঢ়ো এগিয়ে আসছে। কে? কারা ওরা? অন্ধকারেই তাকিয়ে রাইলাম।

॥ ১০ ॥

এই দিকে এগিয়ে আসছে ছায়া-মৃত্তি' দৃঢ়ো। কাছে—আরো কাছে। ততক্ষণে তাদের অস্পষ্ট কথাবার্তার দু-একটা টুকরো টুকরো শব্দও কানে আসছে।

চমকে উঠলাম এবার, চিনতে পেরেছি ওদের। শতদল ও সীতা। দূরের একটানা সমন্বিত নকে ছাপিয়েও ওদের মৃদু কথার শব্দতরঙ্গ আমার কানে এসে প্রবেশ করছিল। অন্ধকারে স্পষ্ট না দেখতে পেলেও কঠিনরূপে ওদের চিনেছি। সীতা বলছিল, তুমি জান না শতদল, মায়ের দৃঢ়িট কী অসম্ভব প্রথৰ! আমার মনে হয়, ঘূরের মধ্যও তাঁর দৃঢ়োখের দৃঢ়িট আমার সমস্ত গর্তিবিধির ওপরে রেখেছেন। তিনি যদি ঘৃণাক্ষরেও জানতে পারেন এত রাতে তোমার সঙ্গে আমি বাড়ির বাইরে এসেছি—

সেই জন্যই আরও নিরালা'র বাইরে এলাম। তোমার মার শকুনির মত দৃঢ়িট। সাত্যি বলছি, আমার গা শিরশির করে। শতদল জবাব দেয়, তাই তো চিঠি লিখে তোমায় এত রাতে এই বাইরে ডেকে এনে তোমার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা আমাকে করতে হয়েছে!

কিন্তু আমি যে তোমার চিঠি পেয়ে এত রাতে বাইরে আসব ভাবলে কী

করে ? যদি না আসতাম ?

আমি জানতাম তুমি আসবেই, সেই জন্যই চিঠি দিয়েছিলাম। যাক, এই পাথরটার উপরেই এস বসা যাক।

পথের ধারে একটা বড় পাথরের উপর দৃজন পাশাপাশি বসল আমার দিকে পিছন ফিরে। এ একপক্ষে ভালই হল। আমি যে পাথরটার আড়ালে আগামোপন করে ছিলাম সেই পাথরটা থেকে হাত-তিনেক দূরেই বড় পাথরটার উপরে দৃজনে পাশাপাশি বসেছে।

মাথাটা একটু উঁচু করে দেখলাম, পিছন ফিরে সীতা বসে আছে, সাগর-বাতাসে তার শাড়ির আঁচলটা ও খোলা চুলের রাশ উড়ছে। সীতার একেবারে গা ঘেঁষে বসে আছে অত্যন্ত র্বণষ্ঠভাবে শতদল।

শতদলের কথায় সীতা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর একসময় বলে, সব কিছুর পরেও তুমি কি আশা করেছিলে শতদল যে আমি আসব তোমার চিঠি পেয়ে ?

তুমি আমাকে আগামোড়াই ভুল ব্যবেছ সীতা !

সব জায়গায় ভুল করলেও একটা জায়গায় মেয়েমানুষ বড় একটা ভুল করে না। সীতা জবাব দেয়।

মানুষ মাত্রেই ভুল করতে পারে সীতা, তা সে কি মেয়েই হোক বা পুরুষই হোক। একতরফা তুমি বিচার করেছ।

একতরফা বিচার করেছি ! সীতার কণ্ঠে যেন বিস্ময়ের সূর ধর্বনিত হয়ে ওঠে।

নিশ্চয়ই। কেন যে তুমি হঠাতে আমার ওপরে বিরাগ হয়ে উঠলে সেটা তুমি আমায় জানানো পর্যন্ত কর্তব্যবোধ করলে না !

জলের মতই যেখানে সব কিছু পরিষ্কার, সেখানে গলা উঁচিয়ে জানাতে ঘাওয়াটা কি বিড়ব্বনা নয় ? কিন্তু কাসুলি ঘেঁটেই বা কি আর লাভ বল ?

তাহলে সাত্য-সত্যাই তুমি আমাদের অতীত সম্পর্কটাকে একেবারে নিশ্চহ করে ধূয়ে-মুছে ফেলতে চাও সীতা ?

সব দিক দিয়ে এক্ষেত্রে সেটাই তো বাঞ্ছনীয় শতদল। সেতারের একবার তার ছিঁড়ে গেলে আর কি ছেঁড়া তার জোড়া লাগালে পূর্বের সেই সূর বের হয় ! তবে কেন আর ?

কোন কথাই তাহলে তুমি আর আমার শূনতে চাও না ?

মনে মনে আমি সীতার কথা শুনে না হেসে পারি না। এমনই মেয়েদের মন বটে ! সমস্ত সম্পর্ক শতদলের সঙ্গে ধূয়ে-মুছে গেছে বলেই বুঝি শতদলের একথানা চিঠি পেয়ে এই নিশ্চৰ্ণত রাত্রেও বাঁড়ির বাইরে আসতে বিব্ধাবোধ করেনি ?

শোন সীতা, কি কারণে তুমি হঠাতে আমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছ না জানি না। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় তো আজকের নয়—গত তিন বৎসর হতে—এই তিন বৎসরেও কি আমাকে তুমি ব্যবহার করেনি ?

এতদিন তোমাকে আমি ব্যবহার করেছি বলেই আমার ধারণা ছিল কিন্তু অখন ব্যবহার করেছি আমার সে জানাটাই ভুল। কিন্তু সে কথা থাক। কি জন্য এত রাতে এভাবে চিঠি লিখে তুমি আমাকে এখানে ডেকে এনেছ বল ?

আমাকে যখন তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না, তখন সে-কথা তোমার

ଆର ଶୁଣେଇ ବା ଲାଭ କାହିଁ ବଲ ? ସାକ ମେ କଥା,—ଶତଦଳେର କଣ୍ଠେ ସ୍ଵପ୍ନଷ୍ଟ
ଅଭିମାନେର ସ୍ଵର ।

ଏରପର କିଛିକଣ ଦ୍ୱାଜନେଇ ସତ୍ୱ ହେଁ ଥାକେ । କେଉ କୋନ କଥା ବଲେ ନା ।
ଅଖଣ୍ଡ ରାଯିର ସତ୍ୱତା ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ଵିବତୀ ଗର୍ଜମାନ ସାଗରେର କଳକଳୋଳେ ପାର୍ଦିତ
ହେଁ ଥାକେ ।

ଏଦେର ମାନ-ଅଭିମାନେର ପାଲାଗାନ କତକ୍ଷଣ ଚଲବେ କେ ଜାନେ ! କିରାଟୀର
ଉପରେ ସତ୍ୱତା ରାଗ ଧରାଇଲ । ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ହୋଟେଲେର ବିଛାନାୟ ଆରାମ କରେ ନାକ
ଡାକାଛେ, ଆର ଆମାକେ ଏହି ଶୀତରେ ରାତେ ଠେଲେ ଦିମେଛେ ! କାହିଁ କୁକୁଙ୍ଗେଇ ସେ ଓର
ପାଞ୍ଚାଯ ପଡ଼େ ଏହି ଜାଗିଗାଯ ମରତେ ଏସେଛିଲାମ ! ଭେବେଛିଲାମ କରେକଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
ଦିନ ଆରାମେ କାଟିରେ ଦିଯେ ସାଓଯା ସାବେ ସାଗର-ସିନାରି ଦେଖେ, ତା ନା, କାହିଁ ଏକ
ଝାମେଲାଯାଇ ନା ପଡ଼ା ଗିରେଇ ! କୋଥାକାର କେ ଏକ ପାଗଲା ଆର୍ଟିସ୍ଟ, ପାହାଡ଼େର
ଉପରେ ଏକ ହାନାବାର୍ଡ, ସତ ସବ ଭୂତୁଡ଼େ କାନ୍ଦକାରଥାନା, ତାର ମଧ୍ୟେ ମିଥ୍ୟେ ମିଥ୍ୟେ
ଏମନ କରେ ଜାର୍ଦିଯେ ପଡ଼ିବାର କି ପ୍ରୟୋଜନ ଛିଲ ବାପଦ ?

ହଠାତ୍ ଆବାର ସୀତାର କଥାଯ ଚମକ ଭାଙ୍ଗୁ ।

ତୁମ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତାରଣ କରେଛ ଶତଦଳ !

ପ୍ରତାରଣ କରେଛ ? ଏ-ସବ ତୁମ କି ବଲଛ ସୀତା ? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଏ କଥା
ବଲଲେ ସେ ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ଆମି ପ୍ରତାରଣ କରେଛ !

ହୁଁ, ପ୍ରତାରଣ । ନିଚିଯାଇ ପ୍ରତାରଣ ବୈକି । ଆଜ ବୁଝାତେ ପାରେଛ, ଦିନେର ପର
ଦିନ ତୁମ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମେର ଖେଲାଇ ଖେଲେ ଏସେଛ । ମନେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନେର
ଚିନ୍ତା ଅହୋରାତ୍ କରେ ବାହିରେ ଆର ଏକଜନେର ସଙ୍ଗେ ତୁମ ଖେଲା କରେଛ । କିନ୍ତୁ
କାହିଁ ଏର ପ୍ରୟୋଜନ ଛିଲ ? ଆମି ତୋ ସେଚେ ତୋମାର କାହେ କୋନାଦିନ ଦାଢ଼ାଇଲିନ ।
ତୁମ—, ଶେଷେ ଦିକେ ସୀତାର କଷ୍ଟସବ କାନ୍ଦାୟ ସେନ ବୁଝେ ଆସେ । ହାଯ ରେ ! ସେଇ
ଚିରାଚାରିତ ପିକୋଣ ରହିଯା । ଶତଦଳ, ସୀତା ଓ ରାଣ୍ୟ । ଏକଟି ପ୍ରାର୍ଦ୍ଧ, ଦୃଢ଼ି
ନାରୀ । ସେଇ ଚିର-ପ୍ରାରାତନ ଚିର-ନ୍ତନ ଖେଲା । ସେଇ ପଞ୍ଚଶରେର ଏକଘେରେ ରାମିକତା ।

ଛି ଛି ! ଏତିଦିନ ଏ କଥା ତୁମ ଆମାକେ ବଲାନି କେନ ? ରାଣ୍ୟ—ରାଣ୍ୟକେ ନିଯେ
ତୁମ ମନ୍ଦେହ କରେଛ ? ରାଣ୍ୟ ତୋ କୁମାରେଶର ବାଗଦନ୍ତା । ଓରା ପରମ୍ପରକେ
ଭାଲବାସେ । ଆର କୁମାରେଶର ସଙ୍ଗେ ସେ ଆମାର କତଥାନ ବନ୍ଧୁର ତାଓ ନିଶ୍ଚଯାଇ
ତୋମାର ଅଜାନା ନେଇ !

କୁମାରେଶ ? କୋନ୍‌ କୁମାରେଶ ?

କୁମାରେଶକେ ଚେନୋ ନା ? କୁମାରେଶ ସରକାର ! ଅଧ୍ୟାପକ ଡାଃ ଶ୍ୟାମାଚରଣ
ସରକାରେର ଏକମାତ୍ର ଛେଲେ । ମସତ ବଡ଼ ଧନୀ । କିନ୍ତୁ ତାର ଚାଇତେଓ ତାର ବଡ଼
ପରିଚୟ ହଛେ ଏଶ୍ୟାର ମଧ୍ୟେ ସବଚାଇତେ ବଡ଼ ସାଂତାର୍ଦ୍ର । ଏବାରେ ଅଲିମ୍ପକେ ଯାର
ସାଂତାରେ ସୌଗ ଦେଉୟାର କଥା ।

ଓଃ, ତୋମାର ସେଇ ଗାୟକ କୁମାରେଶ ?

ହୁଁ, ହୁଁ । ସେଇ କୁମାରେଶ ଓ ରାଣ୍ୟ, ଓରା ପରମ୍ପରକେ ବହୁଦିନ ହତେ
ଭାଲବାସେ । ଆଜ ପାଂଚ-ଛ ବହୁର ଓଦେର ଆଲାପ ଦ୍ୱାଜନେର ସଙ୍ଗେ । ଛି ଛି ! ଦେଖ
ତୋ କାହିଁ ଏକଟା ମିଥ୍ୟା କଳପନାୟ ଅନର୍ଥକ ବ୍ୟକ୍ତ କରେଛ ?

ଆମି ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଦ୍ଧ, ଶତଦଳଓ ପ୍ରାର୍ଦ୍ଧ, ତାଇ ଶତଦଳେର ଶେଷେର କଥାଗୁଲୋ
ଶୁଣେ ମନେ ହିଚିଲ ଶତଦଳେର ପରିମିତିତେ ଆମି ପଡ଼ିଲେ ଆମିଓ ହେଲା ଐରାପିଇ
ଅଭିନନ୍ଦ କରତାମ । ଐ ମୁହଁତେ ଆମାର ମନେ ପଡ଼ିଛିଲ, ମାତ୍ର କହେକ ରାଯି ଆଗେ
ହୋଟେଲେର ବାରେ ଶତଦଳ ଓ ରାଣ୍ୟ କଥୋପକଥନ ।

তাহলে মিথ্যে তুমি দেরি করছ কেন? মাকে এবাবে সব বললেই তো হয়! সীতা অনুরোধ জানায শতদলকে।

দাঁড়াও, আর কয়েকটা দিন যেতে দাও। অ্যাটেন্রীকে আমি চিঠি দিয়েছি, এই বাড়িটা আমি বিক্রি করতে চাই। পেপারে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে।

পাহাড়ের উপরে এই প্রমো বাড়ি কে তোমার কিনবে? কিনবে কী বলছ? জান, ইতিমধ্যেই দৃঢ়জন খরিদ্দারের কাছ থেকে অফার পাওয়া গিয়েছে!

অফারই যদি পেয়েছ তো বিক্রি করে দিচ্ছ না কেন?

দাঁড়াও—ভাল দাম না পেলে ছাড়ব কেন?

এইরকম একটা বাড়ির জন্য তুমি ভাল দাম পাবে আশা কর?

নিশ্চয়ই! দাদুর হাতে অঁকা ছবিগুলোরই কি কম দাম! দাদুর মতই পাগল শিল্পী আছে যারা এই ছবিগুলোর collections-এর জন্যই বাড়িটা হয়তো একটা fanatic দাম দিয়েও কিনবে।

কিন্তু কয়েক দিন ধরে যেভাবে তোমার উপর দিয়ে বিপদ যাচ্ছে—

সেটাই তো চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে সীতা। ব্যাপারটার মাথা-মুঝে কিছুই আমি ব্যবহার করতে পারছি না। প্রথমটায় কিরীটীবাবুর কথা আমি তো হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার পরের ব্যাপারগুলো সংতাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এখন বেশ স্পষ্ট ব্যবহার করবেন নি তে যেন ব্যবহার করবেন নি। কিন্তু কেন? কারও তো আমি কোন ক্ষতি করিনি? আমার তো কোন শত্রু নেই?

বাবা কী বলেন জান?

কী?

এ এই মামার প্রেতাত্মা! এ-বাড়ির মায়া আজও তিনি কাটাতে পারেননি তাই—

পাগল! বলতে বলতে শতদল হঠাত সীতাকে দৃঢ়হাতে আরও কাছে টেনে নেয়।

না না—আমার সংতা কিন্তু তাই মনে হয়—

দাদু, আমাকে কত ভালবাসতেন তা জান! আর কেউ হলে না-হয় বিশ্বাস করা যেত। দাদু, আমার কোন ক্ষতি করবেন এ আমি ভাবতেও পারি না। স্বেচ্ছায় তিনি সব আমার নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন—

মা কিন্তু তা বিশ্বাস করেন না।

তা জানি, কিন্তু তাঁর চিঠি আছে—

মা বলেন, ও চিঠির কোন মূল্য নেই—

মূল্য আছে কি না আছে, সেটা কোটই স্থির করবে। সেজন্য আমি ভাবি না। তা ছাড়া আমি তো দিদিমাকে বলেছিই, বাড়ি বিক্রি হলে কিছু টাকা তাঁকে দেব—তাঁর কোন প্রাপ্য এ-বাড়িতে তাঁর অধিকার। কিন্তু তা তিনি চান না। তিনি বলেন এ বাড়িতে তাঁর অধিকার। তারপর একটু থেমে আবার বলে, বাড়ি বিক্রির টাকা থেকে কিছু যে তাঁকে দেব বলেছি সেও তোমার জন্য সীতা। দাদুর বোন বলে নয়—তোমার মা বলে।

এ তো খুব ভাল প্রস্তাব। মা ব্যবি তাড়ে রাজী নন?

না। এক-একবার কি মনে হয় জান সীতা?

কৰী ?

দিয়ে দিই বাড়িটা তাঁকে। কৰী হবে গিয়ে আপনার জনের সঙ্গে এই একটা প্ল্যানে বাড়ি নিয়ে গোলমাল করে? শেষ পর্যন্ত বাড়িটা তো আমারেই হবে—

কৰী রাকম ?

আরে তোমাকে বিয়ে করলে তো আর আমি পর থাকব না! আর তুমি ছাড়া ওঁদের বা আর কে আছে সংসারে? যাক গে চল, অনেক রাত হল—এবাবে ওঠা যাক।

চল।

অতঃপর দুজনে উঠে দাঁড়াল। আমারই পাশ দিয়ে তারা দুজনে পাশাপাশ ঝাঁঝয়ে গেল।

নিঃশব্দে আমি তাদের অনুসরণ করলাম।

একটা নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। শতদল আর সীতার সম্পর্ক। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা নতুন সংশয় মনের মধ্যে এসে উর্ধ্ব দিচ্ছে। বেশ কিছুটা দুরত্ব রেখে ওদের আমি পিছনে পিছনে চলেছি। দেখতে পেলাম, দুর হতে অন্ধকারে অস্পষ্ট, ওরা ‘নিরালা’র গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। আমি দাঁড়ালাম, ভাবছি এবাবে কী করব, সহসা কার মৃদু করম্পশ‘ প্রস্তুতিশে অনুভব করতেই চিকিত্বে চমকে ফিরে তাকাতেই দোখি, সর্বাঙ্গে একটা কালো বশ জড়িয়ে ঠিক আমার পশ্চাতেই দাঁড়িয়ে—মুখের ওপরে ঘোঁটা তোলা, কেবলমাত্র মুখটা অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—

কে?

চূপ! আস্তে—আমি।

চাপা সতর্ক কণ্ঠস্বরেও চিনতে কষ্ট হয় না। কিরীটী।

কিরীটী!

। হ্যাঁ চল, ফেরা যাক।

কিন্তু—

চল। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। বলে কিরীটী সৰ্তা-সৰ্তাই ঢালু পাহাড়ী পথ ধরে নিঃশব্দে নীচের দিকে নামতে লাগল। অগত্যা আমিও তার পিছু নিলাম।

দুজনে পাশাপাশ আবাব হোটেলের দিকে হেঁটে চলেছি।

এদিকে কোথায় এসেছিল?

‘নিরালা’র স্টেডিও-ঘরে কাজ ছিল। মৃদুবল্টে কিরীটী জবাব দেয়। তারপর একটু থেমে পথ চলতে চলতেই বলে, কী এত মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনছিল?

শুনছিলাম বলেই জানতে পেরেছি—

কি? ওদের আগে থাকতেই পরম্পরের সঙ্গে ভাব ছিল?

আশ্চর্য হই কিরীটীর কথায়। কিন্তু আমার কোনরূপ প্রশ্ন করবার আগেই কিরীটী বলে, সে-রহস্যও সন্ধ্যাবেলাতে জানা হয়ে গিয়েছে। Nothing new!

তুই জানতে পেরেছিল?

নিশ্চয়ই। শতদলের চায়ের কাপে সীতার তিন চামচ চিন দেওয়াটা

অনিচ্ছাকৃত অন্যমনস্ক হয়ে ভুল নয়। শতদলের চায়ে তিন চামচ চিনি খাওয়ার অভ্যাসটার সঙ্গে সীতা পূর্ব হতেই স্মৃতিরচিত। এবং তা থেকেই আমি বুঝেছিলাম ওদের—শতদল ও সীতার মধ্যে একটা জানাশোনা আছে এবং দুটি তরুণ-তরুণীর জানাশোনা মানেই রঙের ব্যাপার! একান্ত অবলীলাক্রমেই যেন কিরীটী কথাগুলো বলে গেল।

বিষয়ে একেবারে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। কিরীটীর অতীব সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে আমি একান্তভাবেই স্মৃতিরচিত, কিন্তু তবু যেন নতুন করে আমার বিষয়ের অবধি থাকে না। কত সামান্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে কিরীটী তার মীমাংসার স্থগ্ন খন্ডে বের করে, আবার নতুন করে যেন আমার উপলব্ধি হল।

হিরণ্যয়ী দেবী ওদের এই সম্পর্কের কথা জানেন বলে তোর মনে হয় কিরীটী?

না জানলেও তিনি সল্লেহ করেন।

কিন্তু শতদলের রাগুর সঙ্গে সম্পর্কটা?

রাগু ও শতদলের পরম্পরার পরম্পরারের প্রতি চিন্তাধারাটা আলাদা। বলতে বলতে হঠাতে যেন কথার মোড়টা ঘূরিয়ে দিয়ে বললে, শতদল আর সীতার মান-ভাঙ্গাভাঙ্গি নিয়ে তুই ব্যস্ত ছিলি, ওদিকে ‘নিরালা’র গেলে অন্য কিছু তুই দেখতে পেতিস—more interesting! আসলে সেইজন্যই তোকে আমি এই রাগে ওইদিকে পাঠিয়েছিলাম।

কেন, সেখানে আবার কি হল? শতদলের হত্যাকারীর কোন সন্ধান পেলি নাকি? শেষের কথাটা যেন কতকটা ঠাট্টা করে আমি বলি।

চোখ থাকলে দেখতে পেতিস, শতদলের হত্যাকারী দ্রুরের লোক তো নয়ই, ধৈঁয়াটেও নয়। কিন্তু তার চাইতেও যে ব্যাপারটা বর্তমানে আমাকে বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছে—

কী?

বৃংড়ো শিল্পীর চিঠিটা। যেটা শতদলের কাছ হতে আমি আজ সন্ধ্যায় চেয়ে এনেছি। চিঠিটা শুধু যে বৃংড়োর শেষ উইল তাই নয়, ‘নিরালা’-রহস্যের আসল চাবিকাঠিই ওর মধ্যে আছে। ওই চিঠির মধ্যের প্রতিটি অক্ষরে—আঁচড়ের মানে আছে। তাছাড়া শতদল মুখে যাই বলুক, ‘নিরালা’র কোন ম্ল্য নেই—একটা পুরনো বাড়ি ও কতগুলো ছৰি, আসলে নিশ্চয়ই তা নয়। অন্যথায় হিরণ্যয়ী ও তার স্বামী হরিবিলাস, শতদল ও বাড়ির পুরাতন ভৃত্য অবিনাশ এরা অমনি করে খুঁটি পেতে বসে থাকত না।

তোর তাহলে মনে হয় কোন গুপ্তধন ঐ বাড়ির মধ্যে কোথাও না কোথাও লুকনো আছে?

গুপ্তধন আছে কিনা বলতে পারি না, তবে থাকলেও আশ্চর্য হব না। সেটাই বরং স্বাভাবিক।

শতদলের প্রাণের উপরে এই যে পর পর attemptগুলো হল, তাহলে তাঁরও কারণ তাই?

তাছাড়া আর কি!

শতদলের এখন কিন্তু বিশ্বাস হয়েছে যে সীতা-সীতাই তার প্রাণ নেবার চেষ্টায় কেউ না কেউ ঘূরছে।

হলেই ভাল। কতকটা উদাসীন ভাবেই যেন কিরীটী কথাটা বলে।
এতক্ষণে হঠাতে আমার মনে ইয়ে, আমার সঙ্গে এতক্ষণ নানা ধরনের
কথা বললেও তার মনের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কী ভাবছিস বল্ব তো? প্রশ্ন করিব।

ভাবছিলাম একটা মজার কথা—

কী রে?

তোদের হিরণ্যরী দেবীও পঙ্গু নন, আর তোদের ভূখনাও কালা নন।
বিলস কী!

হ্যাঁ। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেন একজন পঙ্গুর অভিনয়—আর কেনই বা
অন্যজন কালার অভিনয় করে যাচ্ছে? আর—

আর আবার কী?

দৃজনের একজনের ইতিমধ্যে মরবার কথা ছিল, কিন্তু এখনো মরছে না
কেন?

বোকার মতই কিরীটীর ঘুর্খের দিকে তাকাই। ওর কথার মাথা-মুখু
কিছুই ব্যবতে পার্জন না। তবু প্রশ্ন না করে পার্জন না, দৃজন কারা?

কুর্জী মন্থরা বা প্রিয়সখী লালিতা! কিরীটী জবাব দেয়।

॥ ১১ ॥

ইতিমধ্যে আমরা হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম।
হাতর্বাড়ির রেডিয়ুম-ডায়েলের দিকে তাঁকিরে দেখি রাত প্রায় দেড়টা।

কুর্জী মন্থরা বা প্রিয়সখী লালিতা! কিরীটীর শেষোচ্চারিত কথাটারই
জের টেনে কী যেন আবি বলতে ঘাঁচিলাম, কিন্তু কিরীটী আমাকে বাধা দিয়ে
নিরস্ত করলে, বক্ত ঘূর্ম পেয়েছে রে। চোখ আর খুলে রাখতে পার্জন না।

কথাটা উচ্চারণ করতে করতেই কিরীটী আমাদের নির্দিষ্ট ঘরের দিকে
একেবারে এগিয়ে গেল সোজা। বুঝলাম এখন আর কোনৱ্ব আলোচনা;
করতে কিরীটীর ইচ্ছে নেই, তাই তার অকস্মাৎ ঘোনভাব।

সত্য-সত্যিই কিরীটী অতঃপর সোজা পায়ের জুতোটা খুলে শয্যার
ওপরে চট্টপট চাদরটা গলা অবধি টেনে নিয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

অগত্যা নির্বাপায় আমাকেও গঁয়ে বাঁকি রাতটুকুর জন্য শয্যা আশ্রয় নিতে
হল। কিন্তু আমার চোখে আর তখন ঘূর্ম নেই। বাঁকি রাতটুকু আমায় জেগেই
কাটাতে হবে। শতদলের ব্যাপারটা ক্রমেই যেন বেশী অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে।
নিজে সেই সন্ধ্যা হতে মনে মনে সব কিছু বিশেষণ করে একটা ব্যাপার ব্যবতে
পার্জিলাম, ‘নিরালা’র ম্ল্য একমাত্র সেই বাঁড়িটাই নয়, আর কিছু আছে এবং
সেইখানেই এ রহস্যের ম্ল্য। শতদল ও সীতার কথাগুলো মনে পড়ছে। শতদল
বাঁড়িটা বিন্দি করতে চায় এবং কয়েকজন খরিদ্দারও ইতিমধ্যে জুটেছে এবং
আশাতীত ম্ল্য দিয়ে তারা বাঁড়িটা ক্রয় করতে চায়। কিন্তু কেন?

তা ছাড়া আরও একটা কথা। কিছুক্ষণ আগে হোটেলের পথে কিরীটী
যা বলছিল, হিরণ্যরী দেবী নাকি পঙ্গু নন! কী উল্লেখ্য তিনি নিজেকে
এভাবে পঙ্গু সাজিয়ে রেখেছেন? আর পঙ্গুই যদি তিনি নন—পঙ্গুর অভিনয়ই

বা করে যাচ্ছেন কেন? আর কর্তব্য থেকেই বা এ অভিনয় করছেন? আর ভুখনাও নার্কি 'কালা' নয়! ভুখনা শতদলের নিজের চাকর। তার কথা নিষ্ঠচাই শতদল জানে। শতদল কি জানে হিরণ্যায়ী দেবীর রহস্য? আশ্চর্য! এও তো বোঝা যায় না, একজন এমান করে সন্স্থ হয়েও দিনের পর দিন রাতের পর রাত পঙ্গুর অভিনয় করে যাচ্ছেন। আর ভুখনাই বা কেন কালা সেজে থাকে!

ইতিপূর্বে আরো কত জটিল রহস্যের ঘীমাংসা করেছি, কিন্তু এতখানি জটিলতার সম্মুখীন ইতিপূর্বে হয়েছি বলে মনে পড়ে না।

* * *

কিরীটীর অনুমান যে এত তাড়াতাড়ি সত্ত্বে পরিণত হবে, এমন পৈশাচিক নিষ্ঠচারায় সত্ত্ব রূপ নেবে, সাত্যই সেদিন সন্ধ্যাতে ভার্বিন। এবং সত্ত্ব কথা বলতে কি, শতদলের ব্যাপারটাকে প্রথম হতেই আমি খুব বেশী একটা গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু কিরীটী বুঝেছিল, তাই বোধ হয় দৃঢ়-চারবার অবশ্যভাবী সেই সর্বনাশের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

শুধু শতদলের ব্যাপারেই নয়, ইতিপূর্বে আমিও দৃঢ়-চারবার দেখেছি কিরীটীর অন্তর্ভুক্ত বিশ্লেষণ-শক্তি—অন্ধকারের ঘণ্টে যেন ভবিষ্যতের পদসপ্তার মে শুনতে পায়। পঞ্চ অন্ধকৃতির বাইরে তার যে একটা বিচিত্র ষষ্ঠ অন্ধকৃতি, যার সাহায্যে অনেক সবুজ অসাধ্য সাধন করেছে সে, ভাবতে গেলে যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কিরীটী বলে ওটা নার্কি তার common sense, স্বাভাবিক বৃদ্ধির বিচারশক্তি।

কিন্তু যাক, যে কথা বলছিলুম।

দিন দুই পরের কথা। মেলার উৎসবে ছোট শহরটিতে যেন প্রাণ-চাঞ্চল্যের একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে।

রাত্রে বিস্তীর্ণ সমন্বয়ের বাল্বেলার ওপরে বাজির প্রতিযোগিতা হবে। অ্যামেচার ও পেশাদার বাজিকরদের ভিড়ে সৈকতের নির্দিষ্ট স্থানটি গমগম করছে। রাত আটটা হতে বিস্তীর্ণ দলের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। 'নিরালা'র উল্লম্বন গেট খুলে দেওয়া হয়েছে বিকাল হতেই। সর্বসাধারণের কাছে আজ অবারিত 'নিরালা'র লৌহ-ফটক। আমি, কিরীটী ও স্থানীয় থানা-ইনচার্জ গিয়ে দাঁড়িয়েছি। শতদল সকলকে অভ্যর্থনা করতেই ব্যস্ত। হোটেল হতে রাণ্ট দেবীও এসেছে। আসেননি তার মা মিসেস মিশ। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে নার্কি ঝুঁতে আঞ্চলিক হয়েছেন তর্ণি। দুবেলাই স্থানীয় ডাক্তার চ্যাটোজী যাতায়াত করছেন হোটেলে।

আজকের রাতের শীতটা বেশ আরামদায়ক। স্থানীয় দৃঢ়-চারজন অফিসারের স্ত্রী ও কন্যারা এবং স্থানীয় ভদ্রলোকেরাও অনেকে স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে বাজি প্রতিযোগিতা দেখতে এসেছেন।

পরিষ্কার আকাশ। বাকবাক করছে তারাগুলো।

হঠাৎ একটা মিষ্টি হাসির তরঙ্গেচ্ছবাসে সামনের দিকে চেরে দৰ্দি, সীতা রাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চবিস্তভাবে হাসছে।

সীতার এমন হাসিখণ্টি আনন্দ-রূপ এ কর্যন্বয়ের পরিচয়ের মধ্যে এক দিনের জন্মেও দৰ্দিনি।

সীতাকে মানিয়েছেও আজ ভারি চমৎকার। সাদা চওড়া জরির পাড় বসানো কালো জজেট শাড়ি, গায়ে সিফনের সাদা ব্লাউজ, মাথার চুল বেণীর আকারে

পঞ্চদেশে লম্বমান।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় বাজির প্রতিযোগিগতা শুরু হল।

বিচ্ছ সন্দৰ্ভে দশ্য। কালো আশমানের বৃক্কে লাল নীল সাদা হরেক
রঙের আগুনের ফ্লাইকগুলো বেন আলোর ফ্লাইরি ছাড়য়ে চলেছে।
হাউইগুলো সোনালী সার্পেল রেখায় কালো আকাশের এক প্রান্ত হতে অন্য
প্রান্ত পর্যন্ত যেন এক-একটা অগ্নি-ইঞ্জিত এঁকে চলে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে।
হারিয়ে যাচ্ছে।

সকলেই আমরা যেন আনন্দে উচ্ছ্রসিত হয়ে উঠেছি। হঠাত সেই কল-
গঞ্জনের মধ্যে শতদলের কণ্ঠস্বর কানে এল।

শতদল সীতাকে বলছে, এই ঠাণ্ডার মধ্যে গরম জামা গায়ে দাওনি কেন
সীতা?

ঠাণ্ডা আবার কোথায়!

হঠাতে ঠাণ্ডা লাগতেই বা কতক্ষণ? যাও, নিচে গিয়ে একটা গরম জামা
গায়ে দিয়ে এস।

কিছু হবে না।

না। আমার এই শালটাই না হয় গায়ে দাও।

না, না—তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

না। আমার গায়ে জামা আছে। নাও—

কতকটা জোর করেই যেন শতদল সীতার গায়ে ডীপ লাল রঙের কাশ্মীরী
শালটা নিজের গা হতে খুলে জড়িয়ে দিল।

ঠিক ভিড়ের মধ্যে নয়, ছাদের একেবারে কিনার ঘেঁষে একধারে পাশাপাশি
দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সীতা ও শতদল। আর্মি ওদের থেকে হাত্তাত্তনেক মাঝ দূরে
দাঁড়িয়ে ছিলাম বলেই ওদের পরস্পরের কথাগুলো প্রায় স্পষ্টই শনতে পেয়েছি।
একটু পরেই দেখলাম শতদল ভিতরের দিকে চলে গেল।

ভিড় বাঁচিয়ে ছাদের অন্য দিকে দাঁড়িয়ে কিরীটী ও থানা-ইনচার্জ রসময়
ঘোষাল নিম্নকণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করছে।

বাজি পোড়ানোর ব্যাপারে কিরীটীর যে খুব বেশী মনোযোগ আছে বলে
মনে হয় না। আজকের উৎসবে যোগ দিলেও সে যেন উৎসবকে বাঁচিয়ে চলেছে।

অর্তিথ—বিশেষ করে বিশিষ্ট অর্তিথের প্রতি যে শতদলবাবুর লক্ষ্য
আছে ব্যবলাভ যখন কিছুক্ষণ বাদে ভৃত্য অবিনাশ ট্রেতে করে কেক, বিস্কিট ও
ধূমায়িত চা পরিবেশন করে গেল আমাদের।

আরো আধ ষষ্ঠটাক পরে।

কালো আকাশ-পটে তখন বিচ্ছ বাজির অপূর্ব আলোর খেলা চলেছে।

প্রত্যেকেই আমরা অন্য হয়ে একেবারে আকাশের দিকে তাঁকিয়ে আছি।
ঐ মুহূর্তে ছাদের উপরে উপস্থিত সকলেরই মনোযোগ ও দ্রং আকাশের
দিকে কেন্দ্ৰীভূত।

হঠাতে আমরা চমকে উঠলাম একটা মেয়েলী কঠের আর্ট তাঁক্ষ্য চিংকারে।

ভয়ার্ট আকুল চিংকার।

কী হল? ব্যাপার কী? সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়া করছে।
সকলের চোখেই একটা প্রশ্ন যেন।

চিৎকারটা এসেছিল কোন দিক থেকে তাও ভালো করে প্রথমটায় বোৰা ঘাস্তন। সকলেই আমরা যেন বিশ্বয়ে চাকিতে হতভব বিমৃচ্ছ।

ঠিক সেই সময় একটি সুবেশা তরুণী একপ্রকার চেঁচাতে চেঁচাতেই ছাদে এসে দাঁড়ালেন, খন! খন! হয়েছে!

কথা বলতে বলতে তরুণীটি হাঁপাছিলেন। ভয়ে আতঙ্কে চোখের মাণি দৃঢ়ে যেন তাঁর ঠিকরে বের হয়ে আসছে।

মৃদুত্তে চারপাশ হতে সকলে এসে তরুণীটিকে ঘিরে ধরে।

খন! কোথায় হয়েছে? কে খন হল? যুগপৎ একসঙ্গে বহু কষ্ট হতে প্রশ্ন উঠিত হল।

হঠাতে এমন সময় কিরীটীর শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, একটু অন্তর করে আপনারা সরে দাঁড়ান তো। সরুন। পথ ছেড়ে দিন।

তাকিয়ে দেখি, কিরীটী ও তার পাশে থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষাল।

সরুন না! পথ ছাড়ুন না! শতদলের কণ্ঠস্বর।

শতদল মধ্যবর্তী তরুণীর কাছে এগিয়ে যাবার জন্য সকলকে পথ ছেড়ে দেবার মিনতি জানাচ্ছে।

বহু কষ্টে আমরা তরুণীর সম্মুখবর্তী হলাম।

শতদল প্রথমে প্রশ্ন করে, আপনি কে? কে খন হয়েছে? কোথায়?

তরুণী তখনও হাঁপাচ্ছে। চোখে-মুখে ভয়াত্ত ব্যাকুলতা।

এবারে কিরীটী তরুণীর সামনে এগিয়ে যায়, কোথায় খন হয়েছে বলুন তো?

নীচের বসবার ঘরে—

কিরীটী বলে, আসুন শতদলবাবু। আপনিও আসুন।

সকলে অতঙ্কের আমরা দোতলায় নেমে এলাম। অভ্যাগতদের বসবার জন্য দোতলার স্ট্রাইডও-ঘরের পাশের ঘরটা খুলে করকগুলো চেয়ার ও সোফা একদিনের জন্য সাজানো হয়েছিল।

ঝর্নাকার উৎসবোপলক্ষে ঝাড়বাতিটাও সন্ধ্যা হতেই জেলে দেওয়া হয়েছিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন সর্বাগ্রে তরুণীটি এবং তাঁর ঠিক পশ্চাতে আমি ও কিরীটী।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই চমকে উঠেছিলাম। ঘরের ঠিক মাঝখানে মেঝের ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে যে মৃতদেহটি তাকে দেখামাত্তই চিনতে আমার কষ্ট হয়নি।

সীতা!

শতদলের সেই রক্তবর্ণ কাশীরী শালটায় তখনও তার দেহ আব্রত।

পশ্চাত হতে প্রতিদেশে গুলি করা হয়েছে। গায়ের শাল ও জামা ভিজিয়ে রক্তধারা ঘরের মেঝেতে—সেদিনই পরিষ্কার করা পরিচ্ছন্ন মসৃণ পাথরের মেঝেতে ছাড়িয়ে জমাট বেঁধেছে।

মৃতদেহের চোখ দৃঢ়ে বিস্ফারিত। যেন ভয় ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন। হস্ত দৃঢ়ি প্রসারিত।

মৃত্যু বিশ্বয় যেন আমার বাক্যারোধ করেছিল। মৃত্যুটা একপাশে কাত হয়ে আছে। শতদলও আমাদের পাশেই নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়িয়ে নির্বাক। তার সমগ্র মৃত্যুখানা জুড়ে একটা অসহায় অতঙ্ক যেন ফুটে উঠেছে। চোখে

ভৌত প্রশ্নভরা দণ্ডিট।

কিরীটীও স্তৰ্য হয়ে মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে। তার পাশে ক্ষময় ঘোষাল। এবং রসময় ও কিরীটীর কাছ হতে বেশ কিছুটা ব্যবধান বাঁচিয়ে ভৌত নর-নারীর দল চিত্রার্পণের মতই নিস্তৰ্য দাঁড়িয়ে গা-থেঁষার্মেৰ্ষ করে। ঘরের মধ্যে পাথরের মতই জমাট একটা স্তৰ্যতা যেন থগথগ করছে।

বোধ হয় মিনাট চার-পাঁচ ঐভাবেই কেটে গেল।

কিরীটী এগিয়ে গেল সৰ্বপ্রথম মৃতদেহের খুব কাছে। খুঁকে নীচ হয়ে মৃতের অবশ শিথিল হাতটা তুলে আবার যেমনটি ছিল ঠিক সেইভাবে নামিয়ে রাখলে সন্তর্পণে আলগোছে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পঞ্চদেশে গুলি করা হয়েছে।

সীতা! সীতা খুন হল! অর্ধস্ফুট ভাবে কথাগুলো শতদলের কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃ হাতে মৃত্য ঢাকল শতদল।

বসন্ত শতদলবাবু বসন্ত। শতদলবাবুকে ধরে বাসিয়ে দিলাম একটা চেয়ারের উপর, নার্ভ হারাবেন না।

আপনাই দেখেছিলেন? আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? কিরীটী সেই তরুণীর দিকে তারিকয়ে প্রশ্ন করলে।

উনি মিস গৃহ। এখানকার উর্কিল শরৎবাবুর মেয়ে। জবাব দিলেন পাবেই দণ্ডায়মান প্রোটোব্যুক্তা একটি ভদ্রমহিলা।

দেখুন! এবারে কিরীটী সমবেত সমস্ত নরনারীকে সম্বোধন করে বললে, আপনারা সকলে এইভাবে এই ঘরে ভিড় করলে তো চলবে না। অবশ্য আপনাদের সকলের সঙ্গেই আমাদের কথা বলার প্রয়োজন হবে—তবে একে একে, প্রথক প্রথক ভাবে। কী বলেন রসময়বাবু? কিরীটী তার বন্ধব্য শেষ করলে শেষ মৃহৃত্তে থানা-ইনচার্জ রসময়বাবুর মুখের দিকে তারিকয়ে।

হ্যাঁ, আপনাদের আমার প্রয়োজন হবে।

থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষালকে সকলে চিনতেন না। কেউ কেউ যাঁরা চিনতেন, তাঁরাই বোধ হয় ইতিমধ্যে পাশাপাশি যাঁরা জানতেন না তাঁদের ফিস-ফিস করে জানিয়ে দিয়েছিলেন রসময় ঘোষালের সত্যিকারের পরিচয়টা। এবং কিরীটীকে রসময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দেখে তার সত্যিকারের পরিচয়টা না জেনেই বোধ হয় তাকেও ঐ পর্যায়ে ফেলে ওদের দৃজনার সম্পর্কেই হঠাত যেন সকলে বেশ একটু চগ্গল হয়ে ওঠে।

আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে প্রথমটায় সকলে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যে মৃহৃত্তে তারা বুঝতে পারলে এর মধ্যে থানা-প্রালিশও উপস্থিত, সমস্ত ঘটনার চেহারাটাই যেন বদলে গেল। প্রথমটায় যে গুরুত্ব এতক্ষণ আকস্মিকতার মধ্যে ঠিক প্রকাশ পায়নি, থানা ও প্রালিশের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে সেই গুরুত্ব যেন সহসা সুস্পষ্ট ও কঠিন হয়ে দেখা দিল। আকস্মিক বিমৃত্তার মধ্যে ফুটে উঠল একটা ভয়-ব্যাকুল চাগ্গল। সকলেই ভিতরে ভিতরে আবিলম্বে স্থানত্যাগের জন্য যেন চগ্গল ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

যুগপৎ নিঃশব্দে উপস্থিত সকলেরই মুখের দিকে তারিকয়ে কিরীটী নিঃসংশয়ে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারে। মৃদু হেসে যেন সকলকেই সাহস দেয়, আপনাদের ব্যস্ত হবার বা ভয় পাবার কোন কারণ নেই। সামান্য দৃ-চারাটে প্রশ্ন প্রয়োজনমত আপনাদের কাউকে কাউকে উনি রসময়বাবু ও আর্মি

জিজ্ঞাসা করব মাত্র। তার পরই আপনারা যে যার গ্রহে প্রত্যাবর্তন করবেন। কিছুক্ষণের জন্য বাইরের বারান্দায় আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমরা বেশীক্ষণ সময় নেব না। কেবল মিস গৃহ, আপনি ঘরে থাকুন।

দেখতে দেখতে ঘর খালি হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে এখন আমি, কিরীটী, থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষাল, শতদল-বাবু ও মিস গৃহ।

মিস গৃহ, মনে হচ্ছে আপনিই বোধ হয় সর্পথম আমাদের মধ্যে ঐ মৃতদেহ দেখেছেন?

কিরীটীর প্রশ্নে মিস গৃহ কিরীটীর মৃত্যুর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে বোবা-দ্রষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, কোন জবাব দেন না। মৃতদেহ দেখার পর আকর্ষিক ভাবে যে চাপ্পল্য তরঙ্গীর মনের মধ্যে জেগেছিল, তার কিছুমাত্র যেন এখন আর অবশিষ্ট নেই। একেবারে স্তৰ্য। বোবা হয়ে গিয়েছেন যেন তিনি।

আপনি নাচে এসেছিলেন কেন?

জলপিপাসা পেয়েছিল তাই এখারে এসেছিলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকেই,— মিস গৃহ আবার মৃতদেহের দিকে দ্রষ্টিপাত করে চূপ করে গেলেন।

কিরীটী বারেকের জন্য তার মাণিবন্ধে বাঁধা হাতবাড়ির দিকে তাকাল। পরে মৃদু কণ্ঠে বললে, তা এখন ঠিক নটা বেজে দশ মিনিট। আপনি তাহলে পৌনে নটা নাগাদ এ ঘরে এসেছিলেন!

তাই হবে।

সে সময় এ ঘরে আর কেউ ছিল না?

না।

নামবার সময় বাইরের বারান্দায় বা সিঁড়িতেও আর কারো সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

না।

আপনি জল খেতে নামবার আগে আগাগোড়া ছাদেই ছিলেন? একবারের জন্যও নাচে নামেননি?

না।

অতঃপর কিরীটী একে একে সকলকেই ডেকে তাদের গত এক ঘণ্টার গর্তিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল।

নবম জনকে প্রশ্ন করা হল। মধ্যবয়সী একজন ভদ্রমহিলা। তিনি জবাবে বললেন, রাত তখন আটটা আল্দাজ হবে, তিনি এ বাড়িতে আসেন। আসতে তাঁর একটু দেরিই হয়েছিল। এখানকার স্থানীয় স্কুলের তিনি একজন মিস্টেস। নাম মালিনী সেন। মিস। অবিবাহিত।

মিস সেন বললেন, সিঁড়ি দিয়ে সবে দোতলার বারান্দায় উঠেছি, হঠাৎ,— এখন মনে পড়ছে, দেখেছিলাম যেন—উনি ও আর একজন প্রৱৃষ্ট এই ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চকণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কিন্তু আমি তখন তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য করিনি। সোজা উপরে ছাদে উঠে ঘাই।

মিস সেনের কথা মৃহূর্তের জন্য লক্ষ্য করলাম শতদল যেন তাঁর দিকে অন্ধ তুলে তাকালেন।

সেই প্রৱৃষ্টি দেখতে কেমন বা তার পরিধানে কী পোশাক ছিল আপনার অনে আছে কি মিস সেন? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

ভাল করে ঠিক তো লক্ষ্য কৰিন, তবে মনে আছে ভদ্রলোকের বয়স খুব
বেশী হবে না। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাঢ়ি! লম্বা ও বেশ গাঁটাগোটা চেহারা!
পরিধানে বোধ হয় ফ্লুপ্যাট ও একটা হাফশাট ছিল।

তাঁদের কোন কথাবার্তা আপনার কানে গিয়েছিল?

না। তাঁর এত আস্তে কথাবার্তা বলছিলেন যে, তাঁদের কোন কথাই
আমি শুনতে পাইনি। তাছাড়া শুন্দের দিকে আমি তত নজরও তো দিইনি।

সামান্য ঔ সংবাদটুকু ছাড়া আর বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধানই
আর কারো কাছ হতে প্রশ্ন করে পাওয়া গেল না।

হঠাতে এমন সময় বাইরে হর্বিলাসের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, শতদল !
শতদল!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হর্বিলাস এসে কক্ষগুদ্যে প্রবেশ করলেন এবং কক্ষে
প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভূপাতিত একমাত্র কন্যার মৃতদেহটা জমাট রক্তের
মধ্যে দেখে হঠাতে যেন স্তৰ্য হয়ে পায়াগের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।
কারো মুখে একটি শব্দ পর্যন্ত নেই। নির্বাক করেকর্তা কঠিন ঘৃহৃত।

তারপর হঠাতে সেই স্তৰ্যতা ভঙ্গ হল, সীতা! সীতাকে মেরে ফেলেছে!
সীতা নেই! সীতা মারা গিয়েছে!

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে মৃত কন্যার শিররের সামনে হাঁটু ভেঙে বসে
পড়লেন হর্বিলাস। নিঃশব্দে একখানি হাত মৃত কন্যার হিমশীতল মাথার
ওপরে রেখে বার-দুই কেবল উচ্চারণ করলেন, সীতা! সীতা! সীতাই তুই
মরে গিয়েছিস মা!

সমস্ত কক্ষখানিন যেন এক অর্পণাত্মক বেদনায় ঐ কথা কর্ণটির মধ্যে গুরুরে
গুরুরে হাহাকার করে উঠল।

নিঃশব্দে হাতখানি মৃত কন্যার মাথার ওপরে বুলোছেন হর্বিলাস।
আমরা যেন স্তৰ্য বিমৃত। হঠাতে হর্বিলাস কিরীটীর মুখের দিকে তাকালে,
কী হবে কিরীটীবাবু! হিরণ এখনও কিছু জানে না। অবিনাশ আমাকে
খবর দিতেই তাড়াতাড়ি আমি উপরে ছুটে এসেছি। হিরণ রামাঘরে—সে এখনও
কিছু জানে না। তারপর হঠাতে যেন গিয়ে কতকটা যেন আঘাত ভাবেই
বললেন, জ্ঞানতাম। আমি জ্ঞানতাম এ লোভের দণ্ড! লোভের দণ্ড! এত বড়
মাশুল দেওয়া আমাদের বাকি ছিল বলেই হিরণ এ বাড়ি ছেড়ে যেতে চায়নি।
কিছুতেই তাকে মত করাতে পারিন।

বলতে বলতে আচমকা হর্বিলাস উঠে দাঁড়ালেন, না, না—এ আমি সহ্য
করতে পারছি না। এ আমি সহ্য করতে পারছি না! সীতা! সীতা!

টলতে টলতে হর্বিলাস কক্ষ হতে বের হয়ে গেলেন।

॥ ১২ ॥

একটা বেদনার বড় তুলে যেন প্রস্থানরত হর্বিলাসের কতকটা আঘোষ্ণির মত
উচ্চারিত কথাগুলো তাঁর পিছনে পিছনে মিলিয়ে গেল চাপা হাহাকারের মতই।

এবং আমাদের বিমৃত ভাবটা কাটবার আগে আচমকা জ্ঞান হারিয়ে শতদলের
শিথিল দেহটা চেয়ারের উপরেই ঢলে পড়ল। আমার আগেই কিরীটী ক্ষিপ-

গাততে শতদলের দিকে এগিয়ে এসে উৎকৃষ্টভাবে বললো, শতদলবাবু হঠাতে
বোধ হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন সুরুত। আঘ, ধৰ। ওঁকে ঐ সোফাটায় শুইয়ে
দিই—

আমি ও কিরীটী দুজনে ধরাধরি করে শতদলের জ্ঞানহীন দেহটা কোন-
অতে পাশের সোফাটায় শুইয়ে দিলাম। ঘন ঘন নিষ্পাস পড়েছে তখন শতদলের।
চোখ দুটো বোজা। মুখটা ফ্যাকাশে বিবর্ণ। ঘরের কোণে রাঙ্কিত কুঁজো থেকে
একটা গ্লাসে করে জল নিয়ে শতদলের চোখেমুখে জলের ছিটে দিতে লাগলাম।

কয়েক মিনিট শুশ্ৰাৰ্য্যা কৰিবার পৰই শতদল চোখ মেলে তাকাল। লম্বা
একটা নিষ্পাস টেনে নিল।

শুয়ে থাকুন শতদলবাবু। একটু বিশ্রাম নিন। আমিই বলি বাধা দিয়ে।

ইতিমধ্যে কিরীটী শতদলের শয়নকক্ষ হতে একটা সাদা চাদর এনে মৃত-
দেহটা দেকে দিয়েছিল। চোখের সামনেই রক্তস্তোত্র বৈভঙ্গ মৃতদেহটা যেন ক্রমেই
অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ আগেও যাকে ছাতের ওপরে শতদলের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি,
তারই নিষ্পাশ রক্তস্তোত্র দেহটা সামনে ঐ মেরুতে পড়ে আছে।

সামান্য এই দু-ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কখনই বা সে নিচে নেমে এল, আৱ কাৱ
হাতেই বা এমন নিষ্টুরভাবে নিহত হল? ঘৰ্ণাৰ্বৰ্তেৰ মতই প্ৰশংসনগুলো মনেৰ
মধ্যে আবৰ্ত্তিত হচ্ছে।

আৱ কখনই বা তাকে হত্যা কৱা হল? নিৱাই ঐ মেরুটিৰ পৈশাচিক
হত্যার ম্লে কী মৌটিভ (উদ্দেশ্য) আছে? ছাতের উপৰ থেকে অলঙ্ক্ষ্যে অলঙ্গ্য
মৃত্যুই যেন ওকে টেনে নিয়ে এসেছিল নিচে। কিন্তু হত্যা কৱলৈ কে? কে?
হত্যাকারী কে?

শৱীৱটাৰ মধ্যে কেমন যেন অস্থিৱ-অস্থিৱ কৱছে! শতদল ক্ষীণকণ্ঠে
বললৈ।

সুরুত, শতদলবাবুকে ওঁৰ ঘৰে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও। কিরীটী
আমাকে সন্মোধন কৱে বলে।

না, না, আমি একা থাকতে পাৱব না। অস্থিৱ উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বলে ওঁটে
শতদল, এখানেই আমি থাকব। শতদলেৰ সমস্ত মুখখোনা যেন ভয়ে পাঁশুটে
হয়ে গিয়েছে, অভাবনীয় আকৰ্ষণক আঘাতটা যেন খুবই লেগেছে।

তাহলে সোফাটাৰ ওপৱে ভাল কৱে শুয়ে পড়ুন। কিরীটী স্মৰকণ্ঠে
বলে।

একজন ডাক্তারকে ডাকলে হত না? কথাটা আমিই বলি।

সুৱৰ্ত মন্দ কথা বলেনি। কোন জানা-শোনা ভাল ডাক্তার আছে আপনাৰ
মিঃ ঘোষাল? প্ৰশ্ন কৱে কিরীটী।

আছেন। ডাঃ আদিতা চ্যাটোৱার্জী। সব চাইতে তাৰই এখানে ভাল প্যার্কটিস।
ছোটখাটো একটা নাৰ্সিং হোম মতও তাৰ আছে।

তাঁকে একটা খবৱ দেওয়া যায় না?

বিপন গেটেৰ বাইৱে plain dress-এ পাহাৰায় আছে, তাকেই আমি বলে
আসছি। মিঃ ঘোষাল বলেন।

সুৱৰ্ত, মিঃ ঘোষালেৰ সঙ্গে যা।

কিরীটীৰ মুখেৰ দিকে তাকালাম। বুৰুলাম একাকী শতদলেৰ সঙ্গে ও

কিছুক্ষণ থাকতে চায়। আমিও আর নিষ্ঠা না করে ঘোষালের দিকে তাকিয়ে
বললাম, চলুন মিঃ ঘোষাল।

সিংড়ির ঠিক শেষ ধাপের পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল অবিনাশ—এ বাড়ির
প্রাতান ভৃত্য।

সিংড়ির আলোর খানিকটা অবিনাশের মুখের একাংশে ত্যর্ক্তভাবে এসে
পড়েছে। আমাদের দেখে অবিনাশ তাড়াতাড়ি সরে গেল। মনে হল অবিনাশ
আমাদের সামিধ্য থেকে যেন পালিয়ে গেল। অভ্যাগতের দল সকলেই চলে
গিয়েছেন।

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে একটা অন্তর্ভুক্ত ভৌতিক স্তর্থতা যেন থমথম করছে।

টানা বারান্দার মাঝামাঝি আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সামনে ঘরের
খোলা দরজার সামনেই ইনভ্যালিড চেয়ারটার উপরে নিশ্চল পাথরের মত বসে
আছেন হিরণ্যরী দেবী। বারান্দায় বুলন্ট বার্তার আলো শুরু ওপর এসে
পড়েছে। সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে বিবর্ণ। প্রাণের চিহ্ন পর্যন্ত যেন সে
চোখে-মুখে নেই। হাত দৃঢ়ি শ্লথভাবে কোলের ওপরে ন্যস্ত। তাঁর নিত্যসহচর
উলের বল ও বুননটা কোলের ওপরে নেই।

আমাদের দৃঢ়নের পদশব্দেও কোনুপ স্পন্দন জাগল না যেন হিরণ্যরী
দেবীর মধ্যে। যেমন নিশ্চল পায়াণ-প্রতিমার মত স্তর্থ-অনড় বসেছিলেন ইন-
ভ্যালিড চেয়ারটার ওপর, ঠিক তেমনই বসে রাইলেন। চোখের দৃঢ়িট সামনের
দিকে নিবন্ধ।

আরো একটু এগিয়ে গেলাম ইনভ্যালিড চেয়ারে উপবিষ্ট হিরণ্যরী দেবীর
কাছে।

এবাবে নজরে পড়ল দৃঢ়ই চোখের কোল বেয়ে দৃঢ়ি অশ্রুর ধারা।
হিরণ্যরী দেবী কাঁদিছিলেন। তাঁর চোখে জল।

আমি আর অগ্রসর হলাম না। দেওয়াল ঘেঁষে একটা থামের আড়ালে গিয়ে
দাঁড়িয়ে কোন শব্দ না করে কেবল নিঃশব্দে চোখের ইঞ্জিতে ঘোষালকে এগিয়ে
যেতে বললাম। ঘোষাল চলে গেলেন বারান্দার অন্য প্রান্তে স্বারের দিকে।

হরবিলাস বোধ হয় এতক্ষণ ঘরের মধ্যেই ছিলেন, বের হয়ে এলেন।
নিঃশব্দে এগিয়ে এসে হিরণ্যরীর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা স্পৌর স্কন্ধের
ওপরে রাখলেন। মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, হিরণ!

তথাপি নিশ্চল স্তর্থ হিরণ্যরী। এতটুকু কম্পনও নেই। স্বামীর ডাক
যেন তাঁর কানে পেঁচাইয়ানি।

ঘরে চল হিরণ!

তথাপি হিরণ্যরীর দিক থেকে কোন সাড়া এল না। প্ৰবৰ্বৎ নিশ্চল স্তর্থ।
হিরণ! আবার মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন হরবিলাস।

স্বামী-স্পৌর এই শোকের মধ্যে নিজেকে কেবল যেন আমার বিৱৰত মনে
হতে লাগল। এমন সময় এখানে না থাকাই উচিত বোধ হয়। স্থানত্যাগ কৰাই
কৰ্তব্য।

আচমকা এমন সময় হিরণ্যরীর পাথরের মত স্তর্থ দেহটা ঝোঁক নড়ে উঠল।
হিরণ্যরী স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকালেন। নিষ্প্রাণ অর্থহীন দৃঢ়ি।
স্বামী ডাকলেও যেন কিছু বুঝতে পারেননি তিনি।

ঘলে চল।

সীতাকে কি ওরা নিয়ে গিয়েছে? ক্ষীণকষ্টে প্রশ্ন করলেন হিরণ্যয়ী।
ঘরে চল হিরণ। স্লিঙ্ক কষ্টে হরবিলাস কেবল বললেন।

তুমি দেখেছ? সতাই সীতা মরে গিয়েছে? মনে নেই তোমার, ছোট-
বেলায় ওর ফিটের ব্যামো ছিল! ফিট হয়নি তো? সত্যাই হয়তো ও মরোন,
ফিট হয়ে আছে। Smelling Salt-এর শিশটা নিয়ে যাও—
না, তুমি ঘরে চল।

না, ঘরে যাব না। এখান দিয়েই তো সীতাকে ওরা নিয়ে যাবে!

তা তো জানি না। ওসব কথা আর ভেবে কী হবে হিরণ? মনকে শক্ত
করা ছাড়া তো আর উপায় নেই।

কিরীটীবাবু, কোথায়?

উপরেই আছেন।

তিনি কি বললেন? তিনিও ধরতে পারলেন না কে আমার সীতাকে খুন
করল?

কথাগুলো বলতে বলতে হঠাত হিরণ্যয়ী দেবী চূপ করে রাইলেন, তারপর
আবার যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, সে ঠিক ধরতে পারবে, আমার সীতাকে
কে মেরেছে। সে ধরতে পারবে—পারবে।

ক্ষীণ পদশব্দ কানে এল।

চেয়ে দেখি ঘোষাল ফিরে আসছেন, আঁঘও আর বিলম্ব না করে পা টিপে
টিপে সোজা দোতলার সৰ্পিড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। সত্যাই ঐ শোকের
দ্রু যেন আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি, কিরীটী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে আপনমনে
পায়চারি করছে। মুখে পাইপ। শতদলবাবু সোফার ওপরে যেমন অর্ধশয়ান
অবস্থায় ছিল তেমনই আছে।

আমার পদশব্দে কিরীটী পায়চারি থামিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে
প্রশ্ন করল, ঘোষাল কই?

আসছেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোষাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ডাঙ্কারকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছেন?

হ্যাঁ। বিপন্নও সেই লোকটির কথা বললে মিঃ রায়।

কার কথা?

মিস সেন যে লোকটির কথা বলছিলেন! লোকটাকে বিপন্ন সদর দিয়ে
বের হয়ে যেতে দেখেছে। রাত তখন পৌনে নট হবে।

আসতে দেখেনি লোকটাকে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না। কেবল বের হয়ে যেতেই দেখেছে। তবে মিস সেন তার বেশভূষার
যে description দিয়েছেন তার সঙ্গে মিল নেই।

কি রূক্ষ?

গায়ে একটা কালো রঙের গ্রেট কোট ছিল, আর মাথায় একটা কালো রঙের
ফেল্ট ক্যাপ ছিল। ক্যাপটা ডানাদিকে একটু টেনে নামানো ছিল। চেহারার
বর্ণনায় মিল আছে। উচ্চ, লম্বা বলিষ্ঠ গড়ন। এবং সদর দিয়ে বের হয়ে
যাবার সময় সদরের আলোয় লোকটার মুখের একাংশ যা দেখতে পেয়েছিল,
বললে মুখে নাকি খোঁচা-খোঁচা দাঢ়ি ছিল, কিছুদিন যে লোকটা shave করেনি

বোঝা যায়।

ঘোষালের কথা শেষ হতেই কানে একটা কুকুরের গুরুগম্ভীর ডাক।

চমকে উঠেছিলাম প্রথমটাই, পরক্ষণেই মনে পড়ল সীতার কুকুরের ডাক। আজ সন্ধ্যায় এখানে লোক-সমাগমের জন্য সীতার কুকুরটাকে নিচের তলার একটা ঘরে চেন দিয়ে বেধে রাখা হয়েছিল।

বেউ ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে কুকুরটা একলাফে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল এবং সোজা এসে সীতার ভূপাতিত নিষ্প্রাণ হিমশীতল দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

সকলেই আমরা স্তন্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি আলসেসিয়ান প্রকাণ্ড কুকুরটার দিকে। স্থির দ্রষ্টিতে সীতার মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরটা।

ইঠাঁৎ কুকুরটা হাঁটি ভেঙে সীতার মৃতদেহের সামনে বসে পড়ল। তারপর মৃথটা সীতার গায়ের উপর রেখে কুই কুই শব্দ করতে লাগল।

কুকুরটা কাঁদছে।

আত বড় একটা জানোয়ার যে অমন করে তার প্রভুর জন্য কাঁদতে পারে, অমন করে তার শোক প্রকাশ করতে পারে, দেখে সত্যিই যেন বিস্ময়ের অবধি ছিল না। নির্বাক আমরা সকলেই। একটা জানোয়ারের শোকপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটাও যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

ঠিক এমান সময় হাঁপাতে হাঁপাতে খালি গায়েই হরিবিলাস ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর কুকুর বাঁধার মোটা শিকলটা।

কুকুরটা কিছুতেই তাঁর প্রভুর মৃতদেহের পাশ হতে নড়বে না। একপ্রকার জোর করেই গলার বকলসে শিকল এঁটে হরিবিলাস কুকুরটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন।

রাত প্রায় পৌনে বারোটায় ডাক্তার আদিত্য চ্যাটোজী^১ এলেন, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দশীনকের মত এলোমেলো কাঁচা-পাকা চূল। মিঃ ঘোষালই ডাঃ চ্যাটোর্জীর সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয়টা করিয়ে দিলেন এবং নিরালা^২র দৃষ্টিনাটাও সংক্ষেপে তাঁর গোচরীভূত করলেন।

ডাঃ চ্যাটোজী^১ ও খানকার অনেক দিনের বাসিন্দা। শহরেই প্র্যাকটিস করেন এবং নিজের একটি ছেটখাটো নার্স^২ হোমও আছে। মিঃ ঘোষালের মৃথে সমস্ত কাহিনী শুনে তিনি একেবারে স্তন্ধ হয়ে গেলেন। কেবল একবার মৃদুকণ্ঠে বললেন, How horrible!

আরও বললেন, এ গৃহ তাঁর পরিচিত, আগেও নাকি দ্রু-একবার এসেছেন এখানে শিল্পী রণধীর চৌধুরীকে দেখতে। এবং সীতাকেও তিনি চিনতেন। এই বাড়িতেই আলাপ হয়েছিল রণধীর চৌধুরীর জীবিতকালে।

কিরণ্টির অন্তর্বে শতদলকে ডাঃ চ্যাটোজী^১ পরিষ্কা করলেন। বললেন, Simple nervous shock! একটি স্টিমিউলেন্ট ও কটা দিন বিশ্রাম পেলেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

এমন সময় কিরণ্টি ডাঃ চ্যাটোজী¹কে অন্তর্বে জানাল, আমারও তাই মত ডাঃ চ্যাটোজী¹। এবং আমার ইচ্ছে, শতদলবাবুর উপর দিয়ে উপর্যুক্তির করেক দিন ধরে যে নার্ডাস স্টেন গিয়েছে তাতেই তিনি আজকের দৃষ্টিনাটায় একেবারে ব্রেকডাউন করেছেন, এ অবস্থায় আমার মনে হয়—ষদিও আমি ডাক্তার নই—ওর

କିଛିଦିନ ରେସ୍ଟ ନେବୋ ଅବଶ୍ୟଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ—complete bodily and mental rest ଏବଂ ଏଥାନେ ନୟ—ଅନ୍ୟ କୋନ ଜୀବଗାୟ—ସ୍ଥାନ-ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ଏଥିର ବିଶେଷ ପ୍ରୋଜନ । ଆପଣିନ କୀ ବଲେନ ଡାଃ ଚ୍ୟାଟୋଜ୍‌ର୍ ?

ଖୁବ ଭାଲ ହୁଏ ତାହଲେ ! You are right !

ଆପନାର ନାର୍ମିଂ ହୋମେ ସ୍ଵାଧୀନ ହୁଏ ନା ?

ଆମାର ନାର୍ମିଂ ହୋମେ ?

ହାଁ । ଆମାର ତୋ ମନେ ହୁଏ, ଓର ପକ୍ଷେ ଆପନାର ନାର୍ମିଂ ହୋମେ ସବ ଚାଇତେ ଭାଲ ଜୀବନ୍ତ ହେବ । ଆପନାର କେଯାରେଓ ଥାକବେଳ ଉନ୍ନ ଏବଂ strict order ଥାକବେ କେଉ ଯେଣ ଓର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ନା କରତେ ପାରେ ।

ବେଶ ତୋ । ତା ହତେ ପାରେ ।

କୋନ ସିଙ୍ଗଲ ରୂମ ଥାଲି ଆହେ କି ?

ତା ଆହେ ।

ତବେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଇ ଭାଲ । ଏଥିନ ଓରକେ ନିଯେ ସାଂଘାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହଲେ କରନ୍ତି ।

ବେଶ ତୋ, ଆମାର ଟମଟମ ଏନ୍ଦେଛି—ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଉନ୍ନ ଚଲନ୍ ।

ସେଇ ମତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଇ ହଲ । ଆମାର ଓପରେଇ କିରାଟୀଟି ଭାର ଦିଲ ଡାଃ ଚ୍ୟାଟୋଜ୍‌ର୍ ସଙ୍ଗେ ଶତଦଳବାବୁକେ ନିଯେ ଗିଯେ ଏକେବାରେ ନାର୍ମିଂ ହୋମେ ପୋଂଛେ ଦିଯେ ଆସାର ।

କିରାଟୀଟି ଓ ମିଃ ବୋଷାଲ ଥେକେ ଗେଲେନ ଶତଦଳବାବୁର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ ଦେଉୟା ହେବେ ନା ।

ଗତକାଳ ଥେକେ ଶତଦଳବାବୁ ଡାଃ ଚ୍ୟାଟୋଜ୍‌ର୍ ନାର୍ମିଂ ହୋମେଇ ଆଛେନ । ନାର୍ମିଂ ହୋମେ ସ୍ପିନ୍ଟ ଅର୍ଡାର ଦେଉୟା ଆହେ ଏକମାତ୍ର କିରାଟୀ ଓ ରସମଯବାବୁ ଛାଡ଼ା ଏବଂ ତାଁଦେର ବିନାନ୍ତର୍ମିତତେ କୋନ ଭିଜିଟାର୍ସକେଇ କୋନ ଉପଲକ୍ଷେ ଶତଦଳବାବୁର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ ଦେଉୟା ହେବେ ନା ।

ସୀତାର ଆକଞ୍ଚିକ ମୃତ୍ୟୁ ପର ହତେଇ କିରାଟୀକେ ଲଙ୍ଘ କରେଛିଲାମ ହଠାତ୍ ଯେନ ସେ ବେଜାଯା ଗମ୍ଭୀର ହେବେ ଉଠେଛେ । କି ଏକଟା ଚିଲ୍ତା ଯେନ ତାର ମଧ୍ୟେ ସ୍ଫୁରପାକ ଥାଛେ ।

ଆରୋ ଏକଦିନ ପରେ ଘଟନା । ହଠାତ୍ ନାର୍ମିଂ ହୋମ ଥେକେ ଏକଜନ ଲୋକ ସଂବାଦ ନିଯେ ଏଲ, ସମ୍ମୟାର କିଛି ପରେ ସନ୍ଟାଥାନେକ ଆଗେ ଥେକେ ଶତଦଳବାବୁ ନାକି ହଠାତ୍ ଅସ୍ତର୍ଥ ହେବେ ପଡ଼େଛେ ଏବଂ ଡାଃ ଚ୍ୟାଟୋଜ୍‌ର୍ ଅବିଲମ୍ବେ କିରାଟୀକେ ଏକବାର ନାର୍ମିଂ ହୋମେ ଯେତେ ବେଳେଛେ । ଡାଙ୍କାର ତାଁ ଟମଟମ ପାଠିରେ ଦିଯେଛେ ।

ଆମି ଓ କିରାଟୀ ଆର କାଳବିଲମ୍ବ ନା କରେ ତଥାନ ନାର୍ମିଂ ହୋମେ ସାବାର ଜଳ୍ଯ ଟମଟମେ ଉଠେ ବସଲାଯା ।

ଛୋଟୁ ଶହର । ହେଟେଲ ଥେକେ ପ୍ରାୟ ମାଇଲଖାନେକ ଦୂରେ ସେଟଶନେର କାହେ ଡାଃ ଚ୍ୟାଟୋଜ୍‌ର୍ ନାର୍ମିଂ ହୋମ । ପ୍ରାୟ ଏକବିରେ ଜୀଘର ଓପରେ ବାଗାନ, ଏକ-ମାନ୍ୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର-ଦେଇର ସୀମାନାର ମଧ୍ୟେ ଦୋତଲା ଏକଟା ବାଢ଼ି—ନାର୍ମିଂ ହୋମ । ବାଇରେ ଥେକେ ଏକମାତ୍ର ଗେଟ ଛାଡ଼ା ନାର୍ମିଂ ହୋମେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରା ଦୂଃସାଧ୍ୟ ବଲଲେଓ ଅଭ୍ୟାସ ହୁଏ ନା ।

ସୋଜା ଆମରା ଟମଟମ ଥେକେ ନେମେ ଦୋତଲାର କୋଣେ ଘରେ ସେଥାନେ ଶତଦଳ-ବାବୁ ଆଛେନ ସେଇ ଘରେ ଗିଯେ ପ୍ରବେଶ କରିଲାମ ।

ଶଯ୍ୟାର ଓପରେ ଶତଦଳବାବୁ ଶୁଣେ । ବୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଦରେ ଆବୃତ । ତୋଥେ

দুটি বোজা।

পাশে দাঁড়িয়ে ডাঃ চ্যাটার্জী^১ শতদলকে একটা ইনজেকশন দিচ্ছেন। পাশেই দাঁড়িয়ে একজন নার্স।

ইনজেকশন দেওয়া শেষ হলে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার নার্সের হাতে সিরিজেটা দিয়ে, চলুন আমার ঘরে। ভয় বোধ হয় কেটে গিয়েছে। ডাঃ চ্যাটার্জীর ঘরে এসে আমরা বসলাম।

কি ব্যাপার ডাঃ চ্যাটার্জী?

Morphia poisoning—কেউ বোধ হয় শতদলবাবুকে মরফিয়া খাইয়ে আরবার চেষ্টা করেছিল।

বলেন কি? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। হঠাৎ নার্স এসে ঠিক সময়মত আমায় খবরটা না দিলে বোধ হয় ঝুঁকা করা যেত না life। অতঃপর একটু থেমে বললেন, এখন তো দেখিছ সেদিন শুকে এখানে এনে ভালই করেছি।

কিন্তু কি করে সম্ভব হল? How it was done? প্রশ্ন করলাম আমি।

প্রথমটায় বুকতে পারিন। এখন বুকতে পারিছ দুপুরের দিকে কে একজন ডিজিটাস^২ দেখা করতে এসেছিল, কিন্তু দেখা করার আর্ডা^৩র না থাকায় নার্স দেখা করতে দেরিন। ভদ্রলোক কিছু ফ্লু ও একটা কাগজের বাক্সে কিছু মিঠাই রেখে ঘান শুকে দেবার জন্য। সেই মিঠাই খেয়েই নাকি—

হ্যাঁ। আচ্ছা ডাক্তার, আপনার সেই নার্স—যার হাতে সেই ভদ্রলোক ফ্লু ও মিঠাই দিয়ে গিয়েছিল, এখানে তাকে একবার ডাকতে পারেন? তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

নিশ্চয়ই।

ডাক্তার বেল বাজালেন। বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল, ডাঃ চ্যাটার্জী^৪ তাকে বললেন, নার্স সরলা মিশ্রকে ডেকে দিতে। নিচের ওয়াডে^৫ সরলা মিশ্র তখন ডিউটি করতে ছিল।

ভাল কথা ডাঃ চ্যাটার্জী, যে মিষ্টি খেয়ে শতদলবাবু অস্বস্থ হয়ে পড়েন তার কিছু অংশ এখনো বাকি আছে নিশ্চয়ই! কিরীটী ডাক্তারকে শুধায়।

হ্যাঁ, বোধ হয় গোটা দুই সন্দেশ খেয়েছিলেন—বাকিটা এখনো বাক্সেই আছে, রেখে দিয়েছি বাক্সটা সম্ভেত—, বলতে বলতে বসবার টেবিলের ডান-দিককার ডুয়ার চাবি দিয়ে খুলে ডুয়ারটা টেনে কাগজের একটা ফ্যাল্স চৌকো বাক্স বের করে দিলেন ডাঃ চ্যাটার্জী।

ফ্যাল্স কাগজের চৌকো বাক্স। বাক্সের উপরে চমৎকার একটা ডিজাইন ও দোকানের নাম লেখা—বান্ধব সুইট হোম। কাগজের বাক্সের উপর লেখা নামটা পড়তে পড়তে কিরীটী বললে, এ তো দেখিছ এখানকারই দোকান!

ডাক্তার জবাব দিলেন, হ্যাঁ, এখানকার বিখ্যাত মিষ্টান্নের দোকান। এদের কড়াপাকের সন্দেশ খুবই বিখ্যাত এবং খেতেও খুব ভাল।

বাক্সের ডালা খুলতেই দেখা গেল, গোটা-বারো সন্দেশ তখনও অবশিষ্ট আছে।

সরলা মিশ্র এসে কক্ষে প্রবেশ করল, আমাকে ডেকেছিলেন ডাঃ চ্যাটার্জী?

কে, সরলা? এস। আমি ঠিক নয়, ইনি। একে তুমি চেন না, বিখ্যাত চৌকো—কিরীটী রায়।

নমস্কার। সরলা হাত তুলে নমস্কার জানায়।

চৰিষ-পঁচিশ বছৰ বয়স হবে মিস মিশ্রে। বেশ গোলগাল চেহারা এবং
চোখে-মুখে বৃদ্ধির দীঁপ্তি আছে।

নমস্কার। আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই মিস মিশ্র।
কিৰীটী বললে।

বলুন!

৩২ কৈবল্যে অর্থাৎ শতদলবাবুর কাছে আজ যখন ভিজিটাৰ্স আসেন,
আপনি সে সময় নিচে ডিউটি ছিলেন শুনলাম।

হাঁ।

সময়টা আপনার মনে আছে কি?

হাঁ, সাড়ে তিনটে হবে।

বিনি এসেছিলেন তিনি দেখতে কেমন?

বাইশ-তেইশ বছৰে একজন সুন্দৰী সুবেশা মহিলা।

মহিলা!

হাঁ। তিনি শতদলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে বললাম পার্মিশন
নেই—তখন একথোকা গোলাপফুল ও একটি মিষ্টির বাল্ল দিয়ে আমায় অনুরোধ
জানান শতদলবাবুর ঘরে সেগুলো পেঁচে দিতে।

সঙ্গে তাঁর আর কেউ ছিল?

না।

তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন?

হয়তো চিনতে পারব, তবে চোখে কালো চশমা ছিল।

॥ ১৩ ॥

বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সের একজন সুন্দৰী সুবেশা মহিলা কিছু রঙলাল গোলাপ
ও এক বাল্ল মিষ্টি—কড়াপাকের সন্দেশ—সঙ্গে নিয়ে শতদলবাবুর সঙ্গে দেখা
করতে এসেছিলেন! চোখে তাঁর কালো লেন্সের চশমা ছিল অর্থাৎ সুস্পষ্টই
বোৰা যাচ্ছে, মহিলা যেই হোন না কেন, তিনি তাঁর মুখখানির স্পষ্ট পরিচয়টা
দিতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু তার চাইতেও মারাত্মক ব্যাপার, তাঁর দেওয়া মিষ্টি
খেয়েই শতদল অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি ডাঃ চ্যাটার্জী
এসে পড়ার কোনোতে শতদলকে সুস্থ করে তোলা হয়েছে। মৱফিন পয়েজনিং
কেস। শতদলকে মিষ্টির সঙ্গে মৱফিন দিয়ে কোশলে তাহলে হত্যা করারই
চেষ্টা করা হয়েছিল। আবার শতদলের প্রাণহরণের প্রচেষ্টা এবং এবারে ডাঃ
চ্যাটার্জী ঠিক সময়ে শতদলের অসুস্থতার সংবাদ না পেলে তাঁকে হয়তো
বাঁচানোই যেত না! পরিকল্পনাটি ও চৰকারাই বলতে হবে—মিষ্টির সঙ্গে
বিষপ্রয়োগ! কিন্তু কে সেই ভদ্রমহিলা?

ভাল কথা মিস মিশ্র, ভদ্রমহিলা তাঁর নাম বলেননি? আমি প্রশ্ন করি।

না। নাম তো কিছু তিনি বলেননি। তবে একটা মুখ-আঁটা নীল খামে
চিঠি দিয়েছিলেন ঐ সঙ্গে, শতদলবাবুর নাম উপরে লেখা। চিঠিটা দিয়ে
'বলেছিলেন, ঐ চিঠিটা দিলেই সব তিনি ব্ৰাতে পারবেন। আমি সেই চিঠি,

ফুল ও মিষ্টির বাজ্জটা এনে উপরের ইনচার্জ নাস' মিসেস মহান্তির হাতে দিই।
ও, তাহলে মিসেস মহান্তি তখন উপরে ডিউটি তে ছিলেন! কথ্যটা বলে
কিরীটী মিস মিথের মৃত্যের দিকে তাঁকিয়ে প্রশ্ন করে, মিসেস মহান্তি কি
এখন এখনে উপস্থিত আছেন? তাঁকে একটিবার অনুগ্রহ করে যদি এই ঘরে
ডেকে আনেন মিস মিত্র!

মিশনকার এখন off-duty হলেও বোধ হয় নাস' হোমেই আছে। দেখছি
যদি না বাইরে গিয়ে থাকে তো পাঠিয়ে দিছি!

মিস মিত্র ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী চেয়ারের ওপরে বসে অন্যমনস্ক ভাবে সম্মুখের চেবিলের উপর
থেকে একটা কাচের কাগজ চাপা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। চোখের দৃষ্টি
শিতায়ত। অন্যমন।

ব্যূরতে পারলাম, কোন একটা বিশেষ চিন্তা ঐ মৃহূর্তে তার মনের
অবগহনে আলোড়ন তুলেছে। কোন একটা সূত্রকে ধরবার চেষ্টা করছে কিন্তু
পারছে না। তাই তার দেহে ও মনে একটা শিথিল নিঞ্জিয়তা।

শতদলকে কেন্দ্র করে একটা দ্বৰ্বোধ্য রহস্য ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল—
সীতার আকস্মিক রহস্যজনক ম্ত্যু সেটাকে আরো জট পাকিয়ে তুলেছে।

ঘটনাগুলো যেন পরম্পরের সঙ্গে একান্তভাবেই বিচ্ছিন্ন। শতদলকে হত্যা
প্রচেষ্টার সঙ্গে সীতাকে নিষ্ঠারভাবে হত্যা করবার কী এমন কার্য-কারণ থাকতে
পারে ব্যূরতে পারছি না। ইত্যার মৌটিভ কী? শতদলকে হত্যা করবার তবু
একটা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সীতা নিহত হল কেন? কী উদ্দেশ্য নিহত
আছে তার হত্যার সঙ্গে? তবে কি দুটো ব্যাপারের সঙ্গে কোন পারস্পরিক
সম্পর্ক নেই? শতদলকে হত্যা-প্রচেষ্টা ও সীতাকে হত্যা করা—একের
উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্যের উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্কই নেই? ঘটনাচক্রে একটির
সঙ্গে অন্যটি জড়িয়ে গিয়েছে মাত্র?

বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজার ভারী নীল
রঙের পর্দাটা তুলে কক্ষে প্রবেশ করলেন ৩০/৩২ বৎসরের একটি নাস'।

ডষ্টের চ্যাটাজী'র, আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?

মিসেস মহান্তি! হ্যাঁ, আস্তুন। পরিচয় করিয়ে দিই, ইমি মিঃ রায়—
উনিই আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চান। ডাঃ চ্যাটাজী'ই মিসেস
মহান্তিকে আহবান জানালেন।

মৃত্যের দিকে চেয়ে কেবলমাত্র মৃথাবয়ব থেকে মিসেস মহান্তির বয়স
নিরূপণ করা কষ্ট। বেশ গোলগাল স্থাল চেহারা—চোখেমৃত্যে একটা সরল
নিরীহ বোকা বোকা ভাব।

মিসেস মহান্তি ডাঃ চ্যাটাজী'র কথায় কিরীটীর মৃত্যের দিকে তাঁকিয়েই
বারেকের জন্য দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন।

মিসেস মহান্তি, আপনি তো আজ উপরে ডিউটি তে ছিলেন?

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন মিসেস মহান্তি।

কেবিনে শতদলবাবু হঠাত অস্তুর্থ হয়ে পড়লে আপনি বোধ হয় ডষ্টের
চ্যাটাজী'কে সংবাদ পাঠান?

হ্যাঁ, সে সময় আমি ঘরে ছিলাম। মৃদুকষ্টে জবাব এল।

কিরীটী হঠাত সোজা হয়ে বসল, আপনি সেই সময় শতদলবাবুর কেবিনের

ମଧ୍ୟେଇ ଉପଚିଥତ ଛିଲେନ ?

ହଁ ।

ଆଗେ ଥାକତେଇ ଆପଣି କେବିନେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲେନ, ନା ଠିକ ଏ ସମର୍ପିତେ ଗିଯେ ଉପଚିଥତ ହେଲେଇଲେନ ?

ଶୁଣେ ବସେ ଗଜପ କରିଛିଲାମ । ସରଲା ଆମାକେ କିଛି ଗୋଲାପଫୁଲ, ଏକଟା ଚିଠି ଓ ଏକବାଜ୍ର ମିଣ୍ଡଟ ଏନେ ଦେଇ ଶତଦଳବାବୁକେ ଦେବାର ଜନ୍ୟ । ମେଘଲୋ ନିଯେ କେବିନେ ପେଣ୍ଠେ ଦିତେ ଗିରେଇଲାମ, କିନ୍ତୁ ଡାନ ଆମାକେ କଥାଯ କଥାଯ ଆଟକେ ରେଖେଇଲେନ ।

ଆପଣାର ସାମନେଇ ତାହିଲେ ଶତଦଳବାବୁ ମିଣ୍ଡଟ ଥାନ ?

ହଁ ।

ମିସେସ ମହାନ୍ତ, ସିଦ୍ଧ କିଛି ମନେ ନା କରେନ ତୋ in details ଆଜକେର ଘଟନାଟ ଆମାକେ ଖୁଲେ ବଲ୍ଲନ !

ଜିନିସଗୁଲୋ ନିଯେ ଶତଦଳବାବୁର କେବିନେ ଢାକତେଇ ତିନି ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେନ, ଓଗୁଲୋ କୀ ? ଆମ ଜିନିସଗୁଲୋ ତାଁର ହାତେ ଦିଯେ ସବ ବଲାମ । ତାରପର ବୈରିଯେ ଆସତେ ସାବ, ଶତଦଳବାବୁ ଆମାକେ ଡେକେ ବଲଲେନ, ସିସ୍ଟାର, ଏହି ଭାବେ ଏହି ଫୁଲଗୁଲୋ ଏକଟ୍ଟ ସାଜିଯେ ଦିନ ନା, please ! ଭାସେର ଫୁଲ ଯା ଛିଲ ମେଘଲୋ ତୁଲେ ନିଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଗୁଲୋ ସାଜିଯେ ଦିଛିଲାମ ସଥନ, ଶତଦଳବାବୁ ସେ-ସମୟ ଚିଠିଟି ପଡ଼ିଛିଲେନ । ତାରପରଇ ମିଣ୍ଡଟର ବାଙ୍ଗଟା ଖୁଲେ ବଲଲେନ, How lovely ! କଡ଼ାପାକେର ସନ୍ଦେଶ ! ବଲାତେ ବଲାତେଇ ଗୋଟା-ଦୁଇ ସନ୍ଦେଶ ମୁଖେ ପାରେ ଦିଲେନ । ଏବଂ ଆମାକେ ବଲଲେନ ଏକଗାସ ଜଳ ଦିତେ । ସରେର କୋଣାଯ କୁଣ୍ଠୋତେ ଜଳ ଛିଲ । ପିଲାସ ଜଳ ଭରେ ତାଁ ସାମନେ ନିଯେ ଦାଁଡ଼ାତେଇ ଦେଖ, ଶତଦଳବାବୁର ସମସ୍ତ ଚୋଥେ-ମୁଖେ ଯେଣ ଏକଟା ଆତକ । କୋନମତେ ଚୋକ ଗିଲାତେ ଗିଲାତେ ବଲଲେନ, ସିସ୍ଟାର, ଶୈଗ୍ରଗର ଡକ୍ଟର ଚାଟାଜୀଙ୍କେ ଖବର ଦିନ । ଆମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ମୟ ବୋଧ କରାଛ । Quick ! ଯାନ— । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପାଇଁ ଛାଟେ ଗିଯେ ଡକ୍ଟର ଚାଟାଜୀଙ୍କେ ଡେକେ ଆନି ।

ମହାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିଯେ ଗଭୀର ମନୋଯୋଗେର ସଙ୍ଗେ କିରୀଟୀ ନିଶ୍ଚଲଭାବେ ବସେ ମିସେସ ମହାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣତ କାହିନୀ ଶୁଣିଛି, ହଠାତେ ଯେନ ତାର ନିଶ୍ଚଳ ଦେହଟା ଏକଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍-ପଶ୍ଚାତ୍ ମଜାଗ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହେଲେ ଉଠିଲ । କିରୀଟୀର କ୍ଷଣପର୍ବର୍ତ୍ତ ଚିତ୍ତମତ ଚୋଥେର ତାରା ଦୁଟୀ ଯେନ ଆଚମକା ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଶିଖାର ମତ ଜରୁଲେ ଉଠିଲ । ଝକବକ କରେ ଉଠିଲୋ ଧାରାଲୋ ଛୁରିର ଫଲାର ମତ । କିରୀଟୀର ଏ ଦୃଷ୍ଟିକେ ଆମି ଚିନି । ସହସା ଉପରିବିଷ୍ଟ କିରୀଟୀ ଚେଯାର ଛେଡେ ଉଠିଲେ ସରେର ମଧ୍ୟେ ପାଯାଚାରି କରତେ ଶ୍ରବ କରେ । ଦୁଚାର ମିନିଟ୍ କେଟେ ଗେଲ ଏକଟା ଅଖଣ୍ଡ ନିଃତିର୍ବତ୍ତାର ମଧ୍ୟେ । ସରେର ଆମରା ବାକି ତିନଜନ ନିର୍ବାକ ହେଁ ଆଛି । ଆମ ଆର ଡକ୍ଟର ଚାଟାଜୀଙ୍କୁ ଉପରିବିଷ୍ଟ । ମିସେସ ମହାନ୍ତ ଆମାଦେର ସାମନେଇ ଦନ୍ତାଯାନ ।

ହଠାତେ ଆବାର କିରୀଟୀଇ ସରେର ନିଃତିର୍ବତ୍ତା ଭେଦ କରଲେ, ଡକ୍ଟର, ଏବାରେ ଆମରା ଶତଦଳବାବୁକେ କରିବଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରତେ ପାରି କି ?

ହଁ, ନିଶ୍ଚରାଇ । ଚଲ୍ଲନ ।

ସକଳେ ଆମରା କେବିନେ ଏସେ ପ୍ରବେଶ କରଲାମ ।

ଚକ୍ର ଦୂଟି ମୁଦ୍ରିତ । ଶତଦଳବାବୁ ଶ୍ୟାର ଓପରେ ଶୁଣେଇଲେନ । ଆମାଦେର ପଦଶବ୍ଦେ ଚୋଥ ମେଲେ ତାକାଲେନ । ଡାଃ ଚାଟାଜୀଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ଶତଦଳେର ପାଲ୍-ସଟା ଦେଖଲେନ, ଏଥନ ବେଶ ସ୍ମୃତ୍ୟ ବୋଧ କରଛେନ ତୋ ଶତଦଳବାବୁ ?

হাঁ, ধনবাদ। অতঃপর কিরীটীর মুখের দিকে তারিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কখন এলেন মিঃ রায়?

এই তো কিছুক্ষণ হল।

ডষ্ট্রে চাটোজী'র মুখে সব শুনেছেন বোধ হয়! There was another attempt! স্থিতক্ষণে শতদল বললে।

হ্যাঁ, শন্তলাম। ভয় পাবেন না মিঃ বোস—this is last! কিরীটীর কষ্টস্বরে অন্তুভূত একটা দৃঢ়তা।

আর কারো কানে সেটুকু না ধরা পড়লেও আমার শ্ববগেন্দ্রিয়কে সেটা ফাঁক দিতে পারে না।

সত্যি! ভাবতেই পার্মাণ সন্দেশের মধ্যে—

শতদলকে বাধা দিয়ে কিরীটী বললে, কে আপনাকে ফুল ও মিষ্টি পাঠিয়েছিল শতদলবাবু?

সত্যি কথা বলতে কি, মিঃ রায়, এতক্ষণে শূরে শূরে সেইটাই ভাৰ্বাছিলাম। আপনি তাকে চেনেন—রাগ্নু!

বছরের মতই যেন দৃঃ-অক্ষরের নামটি আমার কণ্ণে ধৰ্বন্ত হল, রাগ্নু!

কিরীটীর মুখের দিকে তারিয়ে দেখি সেও কম বিস্মিত হয়নি। এবং কষ্টস্বরেও তার সে বিস্ময়টুকু ধৰ্বন্ত হয়ে উঠল, রাগ্নু দেবী!

হ্যাঁ। এই দেখন না চিঠি—, বলে শ্বায়ার অশেপাশে চিঠিটা খঁজতে থাকে শতদল, চিঠি—চিঠিটা গেল কোথায়?

মিসেস মহান্তি এমন সময় এগিয়ে এলেন এবং বালিশের তলা থেকে নীল খাম সমেত খোলা চিঠিখানা বের করে শতদলের হাতে তুলে দিলেন, এই যে!

কিরীটী চিঠিটা শতদলের হাত থেকে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল। আমিও আরো এগিয়ে গেলাম। নীল রঙের পুরু লোটার-পেপারে রয়েল ব্রু কালিতে লেখা চিঠি।

মৃঙ্গোর ঘতো ঘৰবারে পর্যাকার হাতের গোটা অক্ষর। এবং হাতের লেখা দেখলে কোন পুরুষের নয়—মেয়ের বলেই মনে হয়। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

শতদল,

একান্ত ইচ্ছা থাকলেও তোমার সঙ্গে দেখা করবার উপায় নেই। কড়া হস্তুম কিরীটী রায়ের। নাসিৎ হোমে প্রবেশ নিষেধ। তুমি রস্তগোলাপ ভালবাস, তাই কিছু রস্তগোলাপ ও তোমার বাল্ধব মিষ্টান্ন ভাঙ্ডারের প্রয় কড়াপাকের সন্দেশ পাঠালাম। ভালবাসা নিও। 'রাগ্নু'।

চিঠিটি পড়ে ভাঁজ করতে করতে কিরীটী শতদলের দিকে তারিয়ে বললে, চিঠিটা আমার কাছে থাক শতদলবাবু।

বেশ।

কিরীটী চিঠিটা জামার পকেটে রেখে দিল, চলুন ডাঙ্কার। ঝঁকে আমদের বিশ্রাম দেওয়াই প্রয়োজন। উনি বিশ্রাম করুন।

আমরা সকলে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

ডাঙ্কারের কাছে বিদায় নিয়ে সির্পড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাতে কিরীটী ঘূরে দাঁড়িয়ে বললে, তুই এগো সুব্রত, আমি ডাঙ্কারকে একটা কথা বলে আসি!

কিরীটী আবার উপরে চলে গেল। মিনিট পনের বাদে কিরীটী ফিরে এল।

* * *
হোটেলে ফিরে এলাম। ডাক্তারের টমটমই আমাদের হোটেলে পেঁচে দিয়ে গেল।

কিরীটীর পকেটে যে নীল লেটার-প্যাডের কাগজে লেখা চিঠিটা ছিল, আমার মনের মধ্যে সবচেয়ে সেটাই অধিকার করে ছিল। চিঠিটা সম্পর্কে কিরীটী আর কোন উচ্চবাচ্য না করলেও আমি কিন্তু চিঠিটার কথা কোনমতই ভুলতে পারছিলাম না। আশা করেছিলাম, হোটেলে ফিরেই কিরীটী রাগুকে ডেকে নিশ্চয়ই চিঠিটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কিন্তু কিরীটী সৌদিক দিয়েই গেল না। সোজা ঘরে ঢুকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আমি বাইরের বারান্দায় একটা আরাম-কেদারার উপরে গা এলিয়ে দিলাম।

শীতের ঘনায়মান সন্ধ্যায় চারিদিক অস্পষ্ট। একটানা সমৃদ্ধগর্জন দূরের সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্য হতে কানে এসে প্রবেশ করছে। ইতিমধ্যেই হোটেলের ঘরে ঘরে আলো জরুলে উঠেছে।

কতক্ষণ অন্ধকারে চেয়ারটার ওপরে বসেছিলাম মনে নেই, হঠাতে রাগুর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল।

কে, স্বৱত্বাবৃত্ত নাকি ?

কে—ও মিস মিশ্ট !

অন্ধকারে চৃপ্তি করে বসে আছেন বৈ ?

না, এমনিই। বস্তুন।

রাগু পাশের চেয়ারটায় বসল।

উঃ, আজ অনেক ঘৰেছি। একা একা বেড়াতে যাব না বলে আপনাদের খুঁজতে এসেছিলাম। বেয়ারাটা বললে, বিকেলের দিকে টমটম করে আপনি আর মিঃ রায় শহরের দিকে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছিলেন ? রাগু জিজ্ঞাসা করে।

ডক্টর চ্যাটার্জীর নাস্রৎ হোমে।

শতদল কেমন আছে ? বেচারা একটু সামলাতে পেরেছে কি ?

হ্যাঁ। অদ্য কৌতুহলটাকে আর নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম আপনি তো আজ ফুল আর মিশ্টি পাঠিয়েছিলেন রাগু দেবী শতদলবাবুকে !

হ্যাঁ, পেয়েছে ?

শান্তকণ্ঠে উচ্চারিত রাগুর কথাটা যেন ঘুর্হতে একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে আমাকে একেবারে বিবশ করে দিল। কয়েক ঘুর্হত আমার ঘেন বাকাস্ফুর্তি হল না। আমি বোবা হয়ে গিয়েছি। অন্ধকারেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালাম রাগুর ঘুর্থের দিকে, কিন্তু অন্ধকারে রাগুর ঘুর্থখানা অস্পষ্ট একটা ছায়ার মত মনে হয়।

আপনিই তাহলে শতদলবাবুকে আজ ফুল আর মিশ্টি পাঠিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ, কিন্তু কেন বল্বুন তো ? উৎকণ্ঠা-মিশ্রিত কণ্ঠে রাগু প্রশ্ন করে।

সেই সন্দেশ খেয়ে শতদলবাবু হঠাতে অস্ত্রথ হয়ে পড়েছিলেন !

বলেন কি ?

হ্যাঁ, ডক্টর চ্যাটার্জীর ধারণা সেই সন্দেশের মধ্যে মরফিন ছিল।

মরফিন ! কী বলছেন যা-তা স্বৱত্বাবৃত্ত !

বললাম তো, ভাস্তুরের তাই বিশ্বাস। সন্দেশ আপনি কি নিজে হাতে কিনোছিলেন?

না।

তবে?

সন্দেশ হোটেলের বেয়ারাকে দিয়ে কিনিয়ে আনিয়েছিলাম।

আর ফ্লগুলো? অকস্মাত কিরীটীর কঠস্বর, শুনে আমি ও রাণু দৃজনেই ঘৃণ্গৎ পশ্চাতের অন্ধকারে ফিরে তাকালাম।

ইতিমধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কখন যে কিরীটী পশ্চাতের অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে এবং আমাদের পরম্পরের কথোপকথন শুনেছে, তার বিদ্যুত্ত টের পাইন। কয়েকটা ঘৃহৃত আমরা দৃজনেই চুপ করে থাক। কিরীটী প্রতীয়বার আবার প্রশ্ন করে, আর গোলাপ ফ্লগুলো?

ওগুলো শরৎবাবুর মেঝে মিস কবিতা গৃহে পাঠিয়েছিলেন।

মিস গৃহ—মানে সে-রাত্রে নিরালায় যার সঙ্গে আলাপ হল? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

কবিতা গৃহের সঙ্গে কি শতদলবাবুর পূর্ব-পরিচয় ছিল?

কবিতা আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড। শতদলের সঙ্গে কবিতার আমাদের বাড়িতেই আলাপ হয়।

হ্যাঁ।

পরের দিন প্রভাবে আমি ও কিরীটী রাণুকে সঙ্গে নিকে কবিতা গৃহের বাসায় গেলাম।

কবিতা ভিতরে ছিল। রাণুকে পাঠানো হল তাকে ডেকে আনবার জন্য। কিরীটী অবশ্য রাণুকে নিষেধ করে দিয়েছিল, পূর্বে কবিতাকে কোন কথা না বলতে।

একটু পরেই রাণুর সঙ্গে কবিতা বাইরের ঘরে এল। শরৎ উকিল ঐ সময় বাসায় না থাকায় আমাদের কথাবার্তা বলবার বিশেষ সূর্বিধাই হল।

দৃ-চারটে মামুলী কথাবার্তার পর কিরীটী ফ্লের প্রসঙ্গে এল।

আপনি কাল শতদলবাবুকে নাস্রিৎ হোমে গোলাপফুল পাঠিয়েছিলেন কবিতা দেবী?

হ্যাঁ। হাসপাতাল থেকে শতদলবাবুর কাছ হতে কাল সকালে একজন লোক এসে বললে, শতদলবাবু কিছু ফ্ল পাঠাতে বলেছেন—আমাদের বাগানের গোলাপ। এ-ও সে বলেছিল, ফ্লগুলো যেন আমি রাণুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই। তাই—

আশ্চর্য! লোকটা কী রকম দেখতে বল তো কবিতা? কথাটা বললে রাণু।

এখানকার স্থানীয় লোক বলেই মনে হয়। বোধ হয় নাস্রিৎ হোমেই কাজ করে। কবিতা জবাব দেয়, কালো ঢাঙ্গা লম্বা মত। একটু খণ্ডিয়ে চলে।

Exactly! সেই লোকটা কাল সকালে আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা করে বলে, শতদলবাবু কিছু কড়াপাকের সন্দেশ তাঁকে পাঠাতে বলেছেন। কথাগুলো বললে রাণু।

এবাবে কথা বললে কিরীটী, রাণু ও কৰিতা দৃজনকেই সম্বোধন করে, তাহলে আপনারা দৃজনেই সেই লোকটির মধ্যে সংবাদ পেয়েই ফ্ল আৰ ঝিঁটি নাসিৎ হোমে পাঠিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ। দৃজনেই একসঙ্গে জবাব দেয়।

বলাই বাহুল্য, অতঃপর শৰৎ উর্কলের বাসা থেকে সোজা আমরা রাণুকে নিয়েই নাসিৎ হোমে গেলাম। এবং ডাঙ্কার চাটোজী'কে সব বলে কিরীটী ডাঙ্কারের কাছে জানতে চাইলে, কৰিতা ও রাণু বৰ্ণিত ঐ ধৰনের বা চেহারার কোন লোক নাসিৎ হোমে আছে কিনা !

ডাঙ্কার শৰ্মনে তো বিস্মিত, কই, ও-ধৰনের চেহারার কোন লোকই তো আমার এখানে কাজ করে না ! চারজন সুইপার, দৃজন দারোয়ান ও দৃজন কুক। তাদের ডাকা হল, কিন্তু রাণু বললে, ওদের মধ্যে কেউ নয়।

কিরীটী আৰ আৰ্ম তখন শতদলের সঙ্গে দেখা কৱলাম।

তাকে প্ৰশ্ন কৱায় সে বিশ্বায়ে একেবাৰে হতভম্ব হয়ে গেল। বললে, সে কি ! সন্দেশ কড়াপাকেৰ আৰ্ম খেতে ভালবাসি সত্য এবং লাল গোলাপও আমার খুব প্ৰিয়, কিন্তু মনেৰ অবস্থা কদিন ধৰে আমার এমন চলছে যে, ওসব তুচ্ছ কথা ভাববাৰই অবকাশ পাইনি !

নাসিৎ হোম হতে বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। সত্যি কথা বলতে গেলে, মনেৰ মধ্যে কিছুটা হতাশা ও ঘনীভূত একটা বিশ্বায় নিয়েই।

হোটেলে আমাদেৱ প্ৰত্যাবৰ্তনেৰ জন্য যে আৱো বিশ্বায় অপেক্ষা কৱছে তা বুঝতে পাৰিনি। হোটেলেৰ বারান্দায় উঠতেই দৰ্দি, থানাৰ দারোগা রসময় ঘোষাল আমাদেৱ জন্য অনেকক্ষণ ধৰে অপেক্ষা কৱে বসে আছেন। আমাদেৱ দেখেই রসময় বললেন, এই যে কিরীটীবাবু, কোথায় ছিলেন ? কতক্ষণ ধৰে অপেক্ষা কৱছি !

ব্যাপার কী ? কিরীটী প্ৰশ্ন কৱে।

কাল রাত্ৰে যে 'নিৱালা'য় চোৱ এসেছিল !

'নিৱালা'য় চোৱ এসেছিল ?

হ্যাঁ, স্ট্ৰাইডও-ঘৰেৰ তালা ভেঙে চোৱ ঢুকেছিল—

কিরীটী কথাটা শুনে যেন বিদ্যুৎপ্ৰষ্টেৱ মত চংকে ওঠে, কী বললেন, স্ট্ৰাইডও-ঘৰে চোৱ ঢুকেছিল ?

হ্যাঁ।

কিছু চৰি গিয়েছে জানেন ?

তা তো বলতে পাৰি না, তবে অবিনাশেৱ হাত দিয়ে হৰিলাস ঘোষ চিঠি পাঠিয়েছেন। এই সেই চিঠি।

রসময় ঘোষাল একটা চিঠি কিরীটীৰ দিকে এগিয়ে দিলেন।

॥ ১৪ ॥

কিরীটী হাত বাঢ়িয়ে থানা-অফিসাৱ রসময় ঘোষালেৰ প্ৰসাৰিত হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে চোখেৰ সামনে মেলে ধৱল।

আমিও কোতুহল দমন করতে না পেরে পশ্চাত্য দিক হতে ঘৃঙ্খকে কিরীটীর হস্তধৃত খোলা চিঠিটাই দ্রষ্টিপাত করলাম।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। হরবিলাস ঘোষ লিখেছেন থানা-অফিসার রসময় ঘোষালকে সম্বোধন করে।

থানা ইনচার্জ শ্রীরসময় ঘোষাল সমীপেষ্য,

সীবনয় নিবেদন, দারোগাবাবু, আপনাকে জানানো কর্তব্য বলিয়া জানাইতেছি—গতকাল রাত্রে নিরালায় চোর আসিয়াছিল এবং চোর কিছু চৰি করিয়া গিয়াছে কিনা বলিতে পারি না ; তবে ন্বিতলের স্ট্যাডিও-ঘরের ও শতদলের ঘরের তালা দ্রুটি ভগ্ন অবস্থায় দরজার কড়ার সঙ্গে ঝুলিতেছে দেখিতে পাই এবং উভয় ঘরের দরজাই খোলা ছিল। শতদলের ঘর হইতে কোন মূল্যবান কিছু চৰি গিয়াছে কিনা বলিতে পারি না। কারণ ইতিপূর্বে তার ঘরে আমি প্রবেশ করি নাই এবং সে-ঘরে তাহার মূল্যবান কিছু ছিল কিনা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এ ব্যাপারে কোন কিছু করণীয় থাকিলে করিতে পারেন। আর একটা কথা—এই সন্তানের শেষেই আমি ও আমার স্ত্রী এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাই। নমস্কার।

ইতি : হরবিলাস ঘোষ

কিরীটী চিঠিটা একবার মাত্র পড়ে রসময় ঘোষালের হাতে প্রত্যপূর্ণ করল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে রসময় কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, যাবেন নার্ক একবার নিরালায় ?

হ্যাঁ, যেতে হবে বৈকি। চলুন, এখন না হয় একবার ঘৰে আসা যাক !

এখন যাবেন ?

হ্যাঁ—না, আর একটু দৰি করাই ভাল।

রাণ্ডও এতক্ষণ আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে এবারে ঘন্থর পায়ে উপরের সিঁড়ির দিকে চলে গোল।

আমরা তো প্রস্তুত হয়েই ছিলাম সকলে ‘নিরালায় যাবার জন্য। রাস্তার নেমে সম্মতিক্রিনারের পথ ধরে পাহাড়ের দিকে চলতে শুরু করলাম। রসময় ঘোষালের সঙ্গে যে লাল পাগড়ি এসেছিল সেও আমাদের অনন্সরণ করে। শীতের রোদ আরামদায়ক হলেও এখনো বেশ কনকনে। কষ্টকর মনে হয়। বেলা প্রায় পৌনে এগারোটা হবে।

এখনো সম্মন্দেশ স্নানার্থীদের ভিড় করেনি। বহু প্রৱুষ-নারী বালক-বালিকা যব-ক-ঘৃবতী হৈ-চৈ করে সম্মন্দেশের জলে লাফালার্ফি ঝাঁপাঝার্ফি করছে। তাদের উল্লাস কানে আসে। নিঃশব্দে কিরীটী ও রসময় ঘোষাল পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। ওদের পশ্চাতে আমি। ‘নিরালায় স্ট্যাডিও-ঘরে বা শতদলের ঘরে এমন কী ছিল যার জন্য কাল রাত্রে চোরের আবিভাৰ্ব হল ! শতদলের ঘরে তবু কিছু থাকতে পারে, কিন্তু স্ট্যাডিও-ঘরে কেবল কতকগুলো ছাঁবি আৱ স্ট্যাচ ! খেয়ালী ধনী আটিচেটৰ বাড়ি—স্ট্যাডিও-ঘরের মধ্যে কোন গুপ্ত কক্ষ বা আলমারি বা চোরা জায়গা ছিল না তো ? ছিল না তো তার মধ্যে এমন কোন মূল্যবান বস্তু, যার জন্য চোরের উপন্দুব হয়েছিল গতরাত্রে ? ইতিপূর্বেও রাত্রে ‘নিরালায় যার আবিভাৰ্ব ঘটেছিল একবার, সে শতদলের প্রাণহরণের চেষ্টা করেছিল এবং ন্বিতায়বারের উদ্দেশ্যাটা ঠিক পরিস্ফুট না হলেও সীতার বুকুরটাকে জখম করে গিয়েছিল !

হঠাতে আবার সীতার কথা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

সীতা !

মনে হয় সে বৃক্ষ মরেনি। নিষ্ঠুরভাবে অদৃশ্য আততায়ীর হাতে পিস্তলের বুলেটে নিহত হয়নি। সে যেন এখনো মনে হয় ‘নিরালা’তেই আছে। এই শাঙ্খ—গেলেই দেখা হবে! শ্যামাঙ্গী অপরাজিতার মত ঢলচলে ঘেরেটি। মৃতির পাতাগুলো যেন জৰুজৰুল করছে।

মরে গিয়েছে—চোখের সামনে তার রক্তাঞ্চ মৃতদেহটা অসাড় অসহায় অবস্থায় ঘৰের মেঝের ওপরে কাপেটে আমরা সকলেই পড়ে থাকতে দেখেছি। মৃতদেহের অবস্থায়—ভিতর থেকে রিভলভারের বুলেটও পাওয়া গিয়েছে, তবু মনে হচ্ছে মরেনি সে, এখনো বেঁচে আছে!

কেন এমন হয়?

কিন্তু কে অমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলে ঘেরেটিকে, আর কী উদ্দেশ্যেই বা হত্যা করলে? সীতার কুকুর টাইগার যে-রাত্রে জখম হয়, সে-রাত্রেও আততায়ী সীতাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। আচমকা কুকুরটা সামনে পড়ায় শেষ পর্যন্ত তাকেই জখম করে পালিয়ে যায়। হঠাতে রসময়ের কথা কানে এল, রসময় কিরীটীকে প্রশ্ন করছেন, সকালবেলাতেই কোথায় গিয়েছিলেন মিঃ রায়?

শরৎবাবু উর্কলের বাসায় তাঁর মেয়ে কৰিতা গৃহৰ সঙ্গে দেখা করতে।

হঠাতে?

নার্সিং হোমে ফুল-সন্দেশ তারই পরামর্শমত শতদলবাবুকে রাণু দেবী পাঠিয়েছিলেন!

তার মানে? বিস্মিত রসময় কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

তার মানে ঐটাই সব ও শেষ নয়। ওটা তো প্রদীপের আলো। অলো জৰুলাবার ইতিহাস আরো পশ্চাতে। সে আর এক ভগ্নদৃত-সংবাদ! কিরীটী মৃদু হাস্যসহকারে জবাব দেয়।

ভগ্নদৃত-সংবাদটি আবার কী!

কে এক খোঁড়া দ্রুত শতদলবাবুর পরিচিত কৰিতা দেবীকে এসে জানায়, শতদলবাবু নাকি অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন তাঁকে যেন কিছু লাল গোলাপ নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যে কারণেই হোক, কৰিতা দেবী নিজে ফুলটা না পাঠিয়ে ফুলগুলো রাণু দেবীকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানায়। রাণু দেবী সেই ফুলই শুধু নয়—ঐ সঙ্গে মিছিট যোগ করে দেন, অর্থাৎ কিছু কড়াপাকের সন্দেশ দিয়ে আসেন।

ঐ হোটেলের বেয়ারাদের মধ্যেই তাহলে কেউ একজন সন্দেশ কিনে এনে দিয়েছিল?

হ্যাঁ। কিন্তু ঘোষাল সাহেব, জল সেখানেও গভীর। অনুসন্ধানে জেনেছি রামকানাই নামে এক বেয়ারাই সন্দেশ কিনে এনে দিয়েছিল এবং রাণু দেবী স্বয়ং সন্দেশ ও ফুল নার্সিং হোমে পেঁচে দিয়ে আসেন।

রাণু দেবীকে আপানি ঐ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেননি?

স্বীকৃত গতরাত্বে করেছিল। দ্রু-একটা আর্দ্ধও করেছি, কিন্তু যে মৎস্যটি গভীর জলে থেকে ল্যাজের ঝাপটা মেরেছেন, সে তো রাণু দেবী নন! রাণু দেবীর বৃদ্ধি ও চিন্তারও অগোচরে। কিন্তু তিনি যত গভীরেই থাকুন, তাঁর ল্যাজের আঁশ আমার চোখে পড়েছে।

বলেন কী! কাটকে সন্দেহ—

হাঁ, অধিকারে আলো দেখতে পাওয়া গিয়েছে ঘোষাল সাহেব। কিন্তু মাঝ
একটি জায়গায় স্থ এসে একটা জট পার্কয়ে রয়েছে। সেই জটটি খুলতে
পারলেই সব বোঝা থাবে।

কিরীটীর কথায় বিস্মিত আমিও কয় হইনি। কিরীটী তাহলে সমাধানে
প্রায় পেশে গিয়েছে! 'নিরালা'-রহস্য ছীমাংসার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে!

বলতে বলতে কিরীটী থেমে গিয়েছিল। যতটুকু কিরীটী এইভাব বললে,
তার চাইতে একটি কথাও বেশী এখন আর সে বলবে না, এও আমার জানা।
তাই সে ঐ পর্যন্ত বলে থেমে গেল, কিন্তু কিরীটীর চারিশের সঙ্গে রসময়
ঘোষালের সমাক পরিচয় নেই, তাই তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, লোকটি কে?

দৃ-একদিনের মধ্যেই জানতে পারবেন! গম্ভীর কণ্ঠে কিরীটীর সংক্ষিপ্ত
জবাব শোনা গেল।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের গুরুত্ব স্থান 'নিরালা'র গেটে পেশে গিয়ে-
ছিলাম। সেই দিকেই কিরীটী রসময়ের দ্রষ্ট আকর্ষণ করলে, চলুন দেখা
যাক 'নিরালা' কী বলে!

দরজা বন্ধ ছিল।

বন্ধ দরজার একপাশে দরজা খোলবার জন্য ভিতরে সাংকেতিক ঘণ্টার
সঙ্গে বুলুন্ত সংযুক্ত দাঁড়িটার প্রান্ত ধরে কিরীটী বার-দ্বাই টান দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে
হৱিলাস।

আসুন। হৱিলাস আমাদের আহবান জানানোন।

হৱিলাস এগিয়ে চললেন, পশ্চাতে রসময় ঘোষাল, আমি ও কিরীটী।
সর্বশেষে সঙ্গের সেই কনস্টেবলটি।

সীতার মতুর প্রায় পাঁচদিন পরে 'নিরালায়' এসে আমরা প্রবেশ করলাম।
হঠাতে নজরে পড়ল, হৱিলাস যেন ডান পাটা একটু টেনে টেনে চলেছেন মন্ত্রে
ভাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটীর কণ্ঠস্বর শুনলাম।

ডান পায়ে আপনার কী হল হৱিলাসবাবু?

চলতে চলতেই হৱিলাস জবাব দিলেন, কয়েক দিন আগে বাগানে কাজ
করবার সময় পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। সেটাই পেকে গিয়ে—নচেৎ নিজেই
আপনাদের কাছে যেতাম।

কাঁটা ফুটেছিল! কিরীটী পাল্টা প্রশ্ন করে।

কিরীটীর প্রশ্নের জবাবে হৱিলাস কী জবাব দিতেন জানি না, কিন্তু
জবাব দেবার পূর্বেই কথা বললেন রসময় ঘোষাল।

কানিন বাঢ়ি থেকে তাহলে বের হন্নি বলুন!

না, মেঝেটা বুকটা একেবারে ভেঙে দিয়ে গিয়েছে। অশ্রুমুখ হয়ে এল
হৱিলাসের কণ্ঠস্বর।

কিন্তু আপনি মিথ্যা কথা বলছেন হৱিলাসবাবু! কঠিন কণ্ঠে বললেন
এবারে রসময় ঘোষাল কথাগুলো।

মিথ্যা কথা বলছি! প্রশ্নটা যেন পাল্টা উচ্চারণ করে ঘুরে দাঁড়ালেন
হৱিলাস রসময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

চোখ দৃঢ়ে তাঁর অন্ধভূত একটা দীর্ঘিপ্রতি ঝকঝক করছে কিসের এক প্রত্যাশায়।

আমরাও নির্বাক।

হ্যাঁ, মিথ্যা বলেছেন। বলতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ পরশ্ব সকালে বাজারে একটা ঘৃত্যারে দোকানের সামনে আপনাকে আর্মি দেখেছি। দোকান থেকে আপনি বের হয়ে আসছেন, হাতে আপনার একটা প্যাকেট ছিল।

শ্বেতপুর্বে যে বিস্ময় ও চাপা একটা ক্ষেত্র হরিবিলাসের মুখ্যানার ওপরে থমথমে হয়ে উঠেছিল, মৃহৃত্তে যেন সেটা মেঘমুক্ত চাঁদের মত নির্মল হাস্য-দীর্ঘিপ্রতি বলমল করে উঠল। স্মিতকণ্ঠে হরিবিলাস এবারে বললেন, ভুল দেখেছেন দারোগা সাহেব! আর্মি নয়—এই পাঁচদিন বাড়ি থেকে এক পা-ও আর্মি বের হইনি কোথাও!

স্পষ্ট দিনের আলোয় স্পষ্টই দেখেছি হরিবিলাসবাবু! ভুল হতে পারে না।

পারে বৈকি। ভুল তো আমরা কত সময়েই করি। বিশেষ করে দেখার ভুল—দেখবার ভুল!

হরিবিলাসের শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়, যেন কোন একটি শিশুকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে কিছু বোঝাচ্ছেন। কিরীটীর দিকে একবার বক্রদ্বিত্তে না তাকিয়ে পারলাম না। কিন্তু সে-মুখ যেন পায়াগে কুণ্ডে তোলা। কোথায়ও এতটুকুও উজেজনা বা দীর্ঘিপ্রতি নেই। এতটুকু আগ্রহের চিহ্ন পর্যন্তও যেন ওর মুখের ভাবে চোখের দ্রষ্টিতে নেই।

দেখবার ভুল! আপনি বলছেন দেখবার ভুল? রসময় ঘোষালের স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে যেন এবারে একটা প্রলিসী কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

তা ছাড়া আর কী বলি বলুন! চারদিন পায়ের যন্ত্রণায় পায়ের পাতা ফেলতে পারি নি, নিজে বসে হট ফোমেশ্টশন দিয়েছি—আজই সবেমাত্র একটু ধা হাঁটা-চলা শুরু করোছি। আর আপনি কিনা দেখলেন আমায় বাজারে!

হরিবিলাসবাবু, শাক দিয়ে মাছ চাকবার মিথ্যা চেষ্টা করছেন! পনের বছর এই প্রলিস লাইনে চাকরি করছি। অত সহজে আমাদের দ্রষ্টিপ্রম হয় না। আপনি সাপ নিয়ে খেলা করছিলেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, গতকাল হঠাত নাসি-হোমে শতদলবাবু কড়াপাকের সন্দেশ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—

মৃহৃত্তে যেন রসময় ঘোষালের কথাটা শুনে হরিবিলাসের কোতুকোজ্বাসিত উজ্জবল মুখ্যান নিষ্পত্ত হয়ে গেল। হরিবিলাসের মুখের চেহারার হঠাত পরিবর্তন আমার দ্রষ্টিতেও এড়ায় না, কিন্তু হরিবিলাস ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। মৃদু, উৎকঠার্মাণ্যপ্রতি কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তাই নাকি? সন্দেশ খেয়ে হঠাত অসুস্থ হয়ে পড়ল কেন?

কারণ সে সন্দেশের মধ্যে বিষ ছিল!

বিষ! একটা আর্ত শব্দের মতই হরিবিলাসের কণ্ঠ হতে কথাটা উচ্চারিত হল।

হ্যাঁ, বিষ। মরফিন।

হরিবিলাস স্থির আচ্ছল দ্রষ্টিতে কয়েকটা মৃহৃত্তে তাকিয়ে রইলেন ঘোষালের মুখের দিকে।

রসময় ঘোষালের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভুক্ত দ্রষ্টিও হরিবিলাসের দৃষ্টি চোখের প্রতি অপলক হয়ে আছে। চারজোড়া চোখের দ্রষ্টি যেন পরস্পরকে লোহন

করছে।

আপনি কী বলতে চান ঘোষাল সাহেব?

শতদলবাবুকে নাস্রিং হোমে লাল গোলাপ ও কড়াপাকের সন্দেশ পাঠাতে হবে, আপনিই কৰিতা দেবীকে অনুরোধটা জানিয়ে এসেছিলেন গত পরশ্ব, কোন এক সময়, তাই নয় কি?

একেবারে স্পষ্টাস্পষ্ট মুখের ওপরে অভিযোগ। একেবারে সম্ভুত-ব্যবহৃত আহবান। আবার কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কঠিন স্তর্থতা।

ওঁ, আপনি এতক্ষণ ধরে তাহলে এই কথাটাই আমাকে বলতে চাইছিলেন ঘোষাল সাহেব! হরবিলাসের শার্লত-গুণ্ডীর কণ্ঠস্বরে যেন একটা অস্পষ্ট ব্যঙ্গের হৃল উদ্যত হয়ে ওঠে।

রসময় কোন জবাব দেন না। কেবল স্থিরদৃঢ়িতে ঘোষালের মুখের দিকে তাঁকিয়ে থাকেন।

আপনার অনুমান তাহলে আমিই শতদলকে সন্দেশের মধ্যে বিষ দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলাম? হরবিলাসই দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ। যতক্ষণ না বলছেন কেন আপনি গত পরশ্ব সকালে বাজারে গিয়ে-ছিলেন এবং ওষুধের দোকানে ঢুকেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আমি সন্দেহ করব।

কিন্তু শতদলকে মেরে আমার লাভ কী ঘোষাল সাহেব?

মারবার কথা তো এর মধ্যে উঠছে না হরবিলাসবাবু! এতক্ষণে কিরীটী কথা বলে, আপনার ঐ সময়ে সৌদিন বাজারে উপর্যুক্তিটাই শুনে মনে সন্দেহ আনছে কতকগুলো ব্যাপারে।

কিন্তু সেইটাই তো মিথ্যা!

মিথ্যা নয়। কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা যেন বজ্জ্বল মত ধৰ্বনত হল, উনি ঠিকই বলেছেন।

তার মানে? মিনামনে গলায় হরবিলাস কথাটা বললেন।

আপনার ডান হাতের আংটির প্রবাল পাথরটা কই?

প্রবাল পাথর! বিস্ময়ে যেন স্তর্ম্ভত হরবিলাস।

হ্যাঁ, প্রবালটা! কোথায় সেটা? দেখুন তো হাতের আঙ্গুলের আংটিটা আপনার!

তাই তো! পাথরটা? চোখের সামনে ডান হাতটা তুলে আংটিটার দিকে তাকালেন হরবিলাস।

সত্যি হরবিলাসের হাতের আঙ্গুলের আংটিটার পাথরটানেই!

লক্ষ্যও করেননি হরবিলাসবাবু, যে, আংটির পাথরটা আপনি ইতিমধ্যে হারিয়েছেন! যাক, এই নিন পাথরটা—, বলতে বলতে কিরীটী জামার পকেটে হাত চালিয়ে একটি বড় মটরের দানার মত প্রবাল পাথর বের করে হাতের পাতায় পাথরটা নিয়ে এগিয়ে ধরলে হরবিলাসের সামনে। দেখুন এটাই আপনার অঙ্গাত হারানো প্রবাল। দেখুন ঠিক আংটিটার বসে থাবে।

সত্যি হরবিলাসেরই আংটির পাথর সেটা।

সকলেই আমরা বিস্মিত ও নির্বাক। অক্ষমাং অন্ধকার কক্ষের মধ্যে যেন রৌদ্রালোক এসে পড়েছে। কিরীটী আবার বলে, পাথরটা আজই সকালে শরৎ-বাবু উর্কিলের বাসার বৈঠকখানায় কুড়িয়ে পেরেছি হরবিলাসবাবু। একটু আগে

ରସମୟବାବୁ ସଥନ ଆପନାକେ ଗତ ପରଶ୍ର ସକଳେ ବାଜାରେ ଦେଖେଛେ ବଲେ ଜେରା କରଛିଲେନ, ହଠାତ୍ ଆପନାର ହାତେର ଆଙ୍ଗୁଲେର ଆଂଟିଟାର ପ୍ରତି ଆମାର ନଜର ପଡ଼େ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମାର ମନେ ହୁଏ, ଏହି ପାଥରଟାଇ ଇଂଟିପୁବ୍ରେ ଆପନାର ଆଙ୍ଗୁଲେର ଆଂଟିଟେ ବସାନୋ ଆମି ଦେଖେଛି । ଏକେବାରେ ସାଧାରଣ ଯୋଗ—ଦ୍ୱାୟେ ଦ୍ୱାୟେ ଚାର । ଏଥନ ଆର ନିଶ୍ଚଯାଇ ଅସବୀକାର କରବେନ ନା ହରବିଲାସବାବୁ ସେ ଆପନି ଏତକ୍ଷଣ ସା ବଲଛିଲେନ ତା ସତ୍ୟ ନୟ !

ହରବିଲାସ ଏକେବାରେ ନିର୍ବାକ । ସ୍ତର୍ଧ ନିଶ୍ଚଳ । ପ୍ରାଣ୍ହୀନ ପାୟାଗମର୍ତ୍ତର ମତ ଦାଢ଼ିଯେ ।

ଏବାରେ ବଲତେ ବାଧା ନେଇ ନିଶ୍ଚଯାଇ ହରବିଲାସବାବୁ, କେନ ଗତ ପରଶ୍ର ସକଳେ ଆପନି ବାଜାରେ ଗିଯେଇଲେନ ଆର କେନିଇ ବା କରିବା ଦେବୀର ବାଡ଼ିତେ ଗିଯେ ଶତଦଳକେ ଫୁଲ ଓ ସନ୍ଦେଶ ପାଠୀବାର ଜନ୍ୟ ବଲେ ଏସେଇଲେନ ! ଝାଁଜିଯେ ଉଠିଲେନ ବ୍ୟଙ୍ଗେ ରସମୟ ଘୋଷାଳ ।

କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାକ ହରବିଲାସ । ଟୁ ଶର୍କଟି ବେର ହୁଏ ନା ମୁଖ ଦିଯେ ।

କୌ, ଚୁପ କରେ କେନ ? ଜବାବ ଦିନ ?

ଆମାର କିଛି ବଲବାର ନେଇ ଦାରୋଗା ସାହେବ । ଆପନାର ସା ଖୁଶ କରତେ ପାରେନ ।

ଆମାର ପ୍ରଶ୍ନର ଆପନି ଜବାବ ଦେବେନ ନା ?

ନା ।

ବେଶ, ତାହଲେ ଶତଦଳବାବୁକେ ସନ୍ଦେଶେର ମଧ୍ୟେ ବିଷ ମିଶ୍ଯାଇ ହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଜନ୍ୟ ଆପନାକେ ଆମି ଆରେସ୍ଟ କରତେ ବାଧ୍ୟ ହାଇଁ । କାନ୍ଦୁ ସିଂ !

ବେଶ, ଆପନାର ଯେମନ ଅଭିରୂପ୍ତ । ବଲଲେନ ଶାନ୍ତଭାବେ ହରବିଲାସ ।

କାନ୍ଦୁ ସିଂ ଏଗିଯେ ଏଲ ଜୁତୋର ମଚମଚ ଶବ୍ଦ ତୁଲେ ।

ବାବୁକେ ଥାନାଯ ନିଯେ ଗିଯେ ହାଜତମରେ ରାଥ । ରସମୟ ବଲଲେନ ।

ଦାଢ଼ାନ !

ନାରୀକିଞ୍ଚିଟ ଶୁଣେ ସକଳେଇ ଆମରା ଏକସଙ୍ଗେ ଫିରେ ତାକାଲାମ ।

ଇଂତମଧ୍ୟେ କଥନ ଏକସମୟ ନିଃଶବ୍ଦେ ଆମାଦେର ପଶଚାତେ ହିରଣ୍ୟମୀ ଦେବୀ ତାର ଇନଭାର୍ଯାଳିଡ ଚୟାର ଚାଲିଯେ ନିଯେ ଏସେଇନ ତା ଟେରେ ପାଇନ ।

ଆମାର ସ୍ବାମୀକେ ଆରେସ୍ଟ କରିବାର ଆଗେ ଆମାର କିଛି ବନ୍ଦୋ ଆଛେ କିରୀଟୀବାବୁ ! ହିରଣ୍ୟମୀ ଦେବୀ ଶାନ୍ତକଟେଟେ ବଲଲେନ ।

॥ ୧୫ ॥

ହିରଣ୍ୟମୀ ଦେବୀର କଂଠସରଟା ଯେନ ମୁହଁତେ ଏକଟା ମୋଚଡ ଦିଯେ ଆମାଦେର ସକଳେର ମନିଇ ତାର ଦିକେ ଆକର୍ଷଣ କରଲ । ତାର ଦ୍ୱାୟେର ବ୍ୟାପ ଉତ୍କିଞ୍ଚିତ ଦ୍ୱାୟେ କିରୀଟୀର ଦ୍ୱାୟେର ଓପରେ ନିବନ୍ଧନ । ସମ୍ଭବ ମୁହଁଥେ ଏକଟା ଗଭୀର ଉତ୍ତେଜନା ଯେନ ଥମଥମ କରଛେ । ଦ୍ୱାୟେର ମୁହଁଟ ଯେନ ଉପରିବିଶ୍ଵାସ ଇନଭାର୍ଯାଳିଡ ଚୟାରଟାର ହାତଲ ଦ୍ୱାୟେର ଓପରେ ଲୋହ-କଠିନ ଭାବେ ଚେପେ ବସେ ଆଛେ ।

କୟେକଟା ମୁହଁତ୍ କାରୋ କଟ୍ ହତେ କୋନ ଶବ୍ଦ ବେର ହଲ ନା । ହରବିଲାସକେ କ୍ଷେତ୍ର କରେ କ୍ଷଣପୁବ୍ରେ ସେ ସଙ୍ଗଟମୟ ପରାମିଶ୍ରତିର ଉଦ୍ଭବ ହରେଇଲ, ହିରଣ୍ୟମୀ ଦେବୀର ଆକମ୍ପିକ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ନାଟକୀୟ ଉତ୍ସ ସେଟାକେ ଯେନ ଆରୋ ରହିଥେନ କରେ ତୁଲଲ । ଏକମାତ୍ର କିରୀଟୀ ଛାଡ଼ା ଆମରା ଉପର୍ତ୍ତିତ ଦେଖାନେ ସକଳେଇ ହିରଣ୍ୟମୀ

দেবীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। নিস্তর্থতা ভঙ্গ করল কিরীটী। পকেট হতে সোনার সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট দূই ওষ্ঠের বন্ধনীতে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করবার জন্য ফস করে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জবালাল। এবং প্রজন্মিত কাঠিটা ফড় দিয়ে নির্বিয়ে ফেলে দিতে দিতে শান্ত কঢ়ে বললে, আপনার কিছু বলবার থাকলে নিশ্চয় আমরা শুনব হিরণ্যরী দেবী। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো শোনা যাবে না। চলুন আপনার ঘরে চলুন!

আমরা সকলে অতঃপর কিরীটীর আহবানেই যেন কতকটা হিরণ্যরী দেবীর ঘরে গিয়ে চুকলাম।

সেই ঘর। ঠিক তেমনি ভাবে ঘরের সমস্ত জানালাগুলো বর্ণ। ঘরের দেওয়ালে সেই পাশাপাশি দুটি নারীর অয়েল-পেন্টিং, দেখলে মনে হয় যেন একই জনের দুটি প্রতিকৃতি। যে ফটো দুটি সম্পর্কে কয়েকদিন পূর্বে কিরীটী হিরণ্যরী দেবীকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, কার ছবি তিনি জানেন না। এ কথাও মনে পড়ল, তার উত্তরে কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করেছিল গুরু, শতদলবাবুর মা হিরণ্যরী দেবীর ভাইবি কিনা? জবাবে হিরণ্যরী দেবী বলেছিলেন, হ্যাঁ।

বলুন হিরণ্যরী দেবী, আপনার কী বলবার আছে? কিরীটীই বলে হিরণ্যরী দেবীকে।

আপনার অনুমান ভুল। আমার স্বামী শতদলকে হত্যা করবার কোন চেষ্টাই করে নি।

কিন্তু আপনার স্বামী যে গত পরশু সকালে বাজারে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে কাবিতা দেবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন এ কথাও ঠিক, জবাবে বলে কিরীটী।

গত পরশু উনি বাজারে গিয়েছিলেন সত্যি, তবে—

হঠাতে এমন সময় বাধা দিলেন হরবিলাস। এতক্ষণ তিনি চূপ করেই ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, না হিরণ, চুপ কর। কোন কথাই তোমায় বলতে হবে না। মিঃ ঘোষাল, আপনি আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন চলুন, আমি প্রস্তুত!

তুমি থাম, আমাকে বলতে দাও। কতকটা যেন ধমকের সুরেই হিরণ্যরী তাঁর স্বামীকে থামিয়ে দিলেন।

কিন্তু আজ হরবিলাস যেন স্তৰীর কার্ত্তৃত্বে বাধা মানলেন না। জোর গলায় বলে উঠলেন, কেন—কেন যিথে একটা কেলেঙ্কারি করছ হিরণ! যে গেছে সে তো ফিরবে না! চলুন না মিঃ ঘোষাল, কেন দৰ্দি করছেন? চলুন না, কোথায় নিয়ে যাবেন আমায়!

না, না—আমাকে বলতে দাও। পাশাশের মত গুরুভার হয়ে আমার বুকের মধ্যে চেপে বসেছে। এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না—আর আমি সহ্য করতে পারছি না—, উত্তেজনার আবেগে হিরণ্যরী দেবীর কণ্ঠস্বর রূপ্ত্ব হয়ে এল।

হিরণ—হিরণ, চূপ করো—ভুলে যাও! ভুলে যাও ওসব কথা। মিনাতিতে করণ হয়ে ওঠে হরবিলাসের কণ্ঠস্বর।

শুনুন মিঃ রায়, সীতাকে আমি—হ্যাঁ, মা হয়ে আমিই তাকে হত্যা

করেছি।

হিরণ—হিরণ! চিংকার করে ওঠে হর্বিলাস, কী বলছ তুমি পাগলের
মত?

হিরণ্যয়ী দেবীর কথায় ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে
আমরা সকলেই নির্বাক।

হ্যাঁ, আমি। আমিই সীতাকে হত্যা করেছি। আর যে আক্রোশের বশে
সীতাকে আমি হত্যা করেছি, সেই আক্রোশের বশেই শতদলকেও আমি হত্যা
করতে চেয়েছিলাম। আমার স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ ব্যাপারে তাঁর কোন
হাত নেই। আরেষ্ট যদি করতে হয় কাউকে, আমাকেই করুন। আমিই
দোষী। সমস্ত দোষ আমারই। কাঞ্চায় গলার স্বর বৃজে এল হিরণ্যয়ী
দেবীর।

না, না—মিঃ রায়, হিরণ নির্দোষ। দোষী আমিই। সীতাকে আমিই
হত্যা করেছি। বাধা দিলেন হর্বিলাস।

থাম তো তুমি, আমাকে বলতে দাও! চিরাচারত হিরণ্যয়ী যেন আবার
জেগে উঠলেন। সেই আধিপতালোভী নারী। নিজস্ব স্বকীয়তায়, নিজস্ব
অহিমকার। স্ত্রীর তর্জনে হর্বিলাস একেবারে বিস্ময়ে গেলেন। কয়েক
মুহূর্ত আগেকার তাঁর কষ্টার্জিত পৌরুষ যেন একটিমাত্র তর্জনে ভেঙে চুপসে
গেল। তবু শেষবারের মত বুরুষ স্ত্রীকে নিরস্ত করবার চেষ্টায় ক্ষীণ মিনতি-
ভরা কণ্ঠে বললেন, যা চক্রে-বৃক্ষে গিয়েছে, সেই অতীতকে দিনের আলোয়
টেনে এনে কী লাভ আর হিরণ!

না, আমাদের যদি শাস্তি পেতেই হয়, সব কথাই বলে থাব। কারণ আমি
জানি, এখানে এমন একজন আছেন যাঁর দণ্ডিত সামনে সতাকে একটা আবরণ
দিয়ে কেউ ঢেকে রাখতে পারবে না, বলতে বলতে হিরণ্যয়ী দেবী বারেকের
জন্য কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

আর কেউ ঘরের মধ্যে উপস্থিত হিরণ্যয়ী দেবীর শেষের কথাগুচ্ছের
তাৎপর্য সমাক উপর্যুক্ত করতে না পারলেও আমি পারলাম।

কিরীটীবাবু, সব কথাই আমি বলব। কিন্তু বলবার আগে একমাত্র
আপনি ও ইচ্ছা করলে স্বীকৃত ব্যতীত আর সকলকে, এমন কি আমার
স্বামীকেও অনুগ্রহ করে এ ঘর থেকে যেতে বলুন।

হিরণ্যয়ী দেবীর অনুরোধ কিরীটী চোখের ইঁতিগতে বাঁকি সকলকে ঘর
ছেড়ে যেতে বলল। এবং সকলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ঘরের মধ্যে রইলাম আমি, কিরীটী ও হিরণ্যয়ী দেবী।

ঘরের মধ্যে একটা অস্তুত সত্ত্বতা বিরাজ করছে, আর সেই সত্ত্বতার
বৃক্ষ চিরে অদ্বারে চৈবিলের ওপর রাঙ্কিত টাইম্পসটা কেবল একটানা টিক-টিক
শব্দ করে চলেছে।

হিরণ্যয়ী দেবীর অনুরোধে সকলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেও কিন্তু কয়েকটা
মুহূর্ত হিরণ্যয়ী কোন কথাই বলতে পারলেন না। মাথাটা বৃক্ষের কাছে
ঝুকে পড়েছে। স্তুত্য অনড় পাষাণ-প্রতিমার মত বসে আছেন হিরণ্যয়ী দেবী
ইন্ড্যালিড চেয়ারটার ওপরে।

সামনেই দ্রুট চেয়ারে আমি আর কিরীটী বসে।

হিরণ্যয়ী একসময় মুখ তুলে কারো দিকে না তাকিয়েই বলতে শুনুন

করলেন। এবং বলবার সঙ্গে সঙ্গে কোলের উপর থেকে এতক্ষণ পরে উলের
বুননটা তুলে নিয়ে দুই হাতে বুনে চললেন।

শিল্পী রংধীর চৌধুরী তাঁর পিতা লক্ষ্মপাতি শশাঙ্কশেখের চৌধুরীর
একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন। পূর্ববঙ্গে শুধু জমি-জমাই নয়, ব্যাঙেও মজুত
ছিল শশাঙ্ক চৌধুরীর লক্ষ্মাধিক টাকা, তিন-চার পুরুষ ধরে অজিত বিশ্ব।
শশাঙ্ক ছিলেন যেমন হিসাবী তের্মান অর্থগুরু। আর তাঁর একমাত্র ছেলে
রংধীর হল ঠিক উল্লেটো। যেমন খেয়ালী তের্মান দিলদারয়া স্বভাবের। অক্ষে
বয়সেই শশাঙ্ক চৌধুরীর স্ত্রী জগত্তারগীর মৃত্যু হয়। লোকিক ভাবে তিনি
আর প্রিতীয়াবার বিবাহ না করলেও তাঁর এক বিধবা শালী জানদা তাঁর গৃহে
ছিল। তাকে তিনি এনেছিলেন অস্মৃত স্ত্রীর সেবা-শুশ্রাব করতে, কারণ
মৃত্যুর আগে বৎসর-চারেক জগত্তারগী নিদারণ পক্ষাঘাত রোগে একপ্রকার
শয্যাশায়িরনী ছিলেন। সেই জানদারই গড়ে জন্ম হল হিরণ্যাবী। লোকে
হিরণ্যাবীকে জগত্তারগীর সন্তান জানলেও আসলে তার জন্ম জানদারই গড়ে।
রংধীর আর হিরণ্যাবী মাত্র তিন বৎসরের ছোট-বড় ছিল এবং রংধীর বহুদিন
পর্যন্ত জানতে পারেনি হিরণ্যাবী তাঁর মায়ের পেটের বোন নয়। জানতে পারে
তাঁর পিতার মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে। কিন্তু সে-কথা পরে। শশাঙ্ক জীবিত-
কালেই হিরণ্যাবীর খুব অল্প বয়সেই হরিবিলাসের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে যান।
শশাঙ্কের মৃত্যুর সময় হিরণ্যাবী কাছে ছিলেন না। তবে তাঁর মৃত্যুর মাস-দুই
পূর্বে পিতার লিখিত এক চিঠিতে হিরণ্যাবী জানতে পেরেছিলেন, শশাঙ্কের
তাঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমান দুই ভাগে রংধীর ও হিরণ্যাবীকে
ভাগ করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর হিরণ্যাবী যখন পিতৃগ্রহে
এলেন এবং কথায় কথায় একদিন পিতার অধৰে সম্পত্তির দাবি তুললেন,
রংধীর হা-হা করে হেসে উঠলেন।

সম্পত্তি! সম্পত্তি কিসের? কী তুই বলছিস হিরু!

ঠিক বলছি। বাবার সম্পত্তিতে আমদের দুজনের সমান অধিকারই আছে,
কারণ—

কারণটা বলেই ফেল তাহলে শৰ্ণিন!

কারণ তুমিও যেমন বাবার সন্তান, আর্মি তের্মান তাঁর সন্তান।

সন্তান! হ্যাঁ, তা বটে। তবে অবৈধ সন্তান।

দাদা! তীক্ষ্ণ চিংকার করে ওঠেন হিরণ্যাবী দেবী।

হ্যাঁ। আইন বলে, জারজ সন্তানের পিতৃসম্পত্তির ওপরে কোন অধিকার
বা দাবিই থাকতে পারে না।

দাদা!

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। তোমার মা অর্থাৎ আমার বিধবা মাসী—বাবার সাঙ্গে
তাঁর যা-ই সম্পর্ক থাক, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যু বা আইনসম্বিধাবে বাবা
তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা বা অধিকার দেননি এবং তিনি এখনো জীবিত। তাঁকে
ডেকে শুধালেই সমস্ত কিছু জানতে পারবে।

রাগে, ঘৃণা লজ্জা ও অপমানে হিরণ্যাবীর সর্বাঙ্গ তখন ধরথর করে
কঁপছে। চেঁচামোচ বা ঝগড়া করবারও উপায় নেই। স্বামী হরিবিলাস তখন
নাচে। হরিবিলাস যদি সব কথা শুনতে পায়, তাঁর বিবাহিত-জীবন সেখানেই
শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু তার আগে মা—হ্যাঁ, মাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। পাশের ঘরে গেলেন হিরণ্যয়ী। জ্ঞানদা দেবী পাশের ঘরেই ছিলেন। শুভ থান-পরিহিত জ্ঞানদা দাঁড়িয়েছিলেন প্রস্তরমূর্তির মত ঘরের জানালার সামনে। মেয়ে এসে ডাকলে, মাসী! চিরদিন যে ডাকে অভ্যন্ত সেই মাসী ডাকেই ডাকল সে।

জ্ঞানদার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অবশ্য হিরণ্যয়ীর বুকতে বাকি ছিল না, পাশের ঘর হতে তার ও রণধীরের ক্ষণপূর্বের কথাবার্তা সমস্তই তাঁর কানে এসেছ। সব কিছুই তিনি শনেছেন।

মাসী!

এবারে জ্ঞানদা মেয়ের ডাকে ফিরে দাঁড়িলেন।

দুই ক্ষুর কোণ বেয়ে নিঃশব্দ ধারার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সেই পাশাগের মত স্তন্ত্র মৃত্তি। সেই নিঃশব্দ অশ্রুধারা মৃহৃত্তে যেন একটা চৰম হাহাকারে হিরণ্যয়ীর বুকের মধ্যে এসে আছড়ে পড়ল।

হ্যাঁ হিরণ, সব—সব সত্তা। তুই এই অভাগিনীরই কলঙ্কের ফুল। বলতে বলতে জ্ঞানদা দুই হাতে বোধ করি নিজের দৃঃসহ লজ্জাটকে ঢাকবার জন্যই মৃত্থ ঢাকলেন।

হিরণ্যয়ী নির্বাক।

জ্ঞানদা এগিয়ে আসিছিলেন দুই হাতে মেয়েকে বুকে নেবার জন্য, কিন্তু পাগলের মত ক্ষিপ্তকষ্টে চিংকার করে উঠলেন হিরণ্যয়ী, না, না—তুমি আমায় ছঁয়ো না। তুমি আমার কেউ নও। আমি তোমার কেউ নই।... কলঙ্কিনি! রাক্ষসী! বলতে বলতে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হড়মড় করে পা পিছলে গড়তে গড়তে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল হিরণ্যয়ী।

সেই পড়ে গিয়ে পিঠের শিরদাঁড়ায় প্রচণ্ড আঘাত লাগল। তিন মাস শয়ায় পড়ে রইলাম। স্বস্থ হলাম, কিন্তু—

কিন্তু জন্মের মত আপনার শিরদাঁড়ার হাড় নষ্ট হয়ে গিয়ে একটা কুঁজের মত হয়ে গেল! কথাটা বললে কিরীটী।

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জান'লন কী করে?

কারণ প্রথম দিন আপনার দুই পা ও কোমরের গঠন থেকেই ব্যোহিলাম, আপনি যা বলেছিলেন paralysis-এ আপনি ভগছেন সেটা সত্ত্ব নয়। কোমরে বা পায়ে আপনার কোন রোগ নেই। ইন্ড্যালিড চেয়ারের আপনি ডেক নিয়েছেন অনা কোন কারণে। এবং স্বিতীয় দিনেই আমার দিঙ্গিতে আপনার পিঠের কঁজটা ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং ব্যোহিলাম ঐ কারণেই নিজের বিকল দেহটাকে ঢেকে রাখবার জন্য আপনি সর্বদা ইন্ড্যালিড চেয়ারে বসে থাকেন।

ঠিক তাই। দীর্ঘদিন ধরে ইন্ড্যালিড চেয়ার ব্যবহার করে করে এখন এটা অভ্যন্ত দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা বলছিলাম—

হিরণ্যয়ী দেবী তাঁর অসমাপ্ত কাহিনী আবার শুন, করলেন ঃ

হিরণ্যয়ী কিন্তু তবু পিতসম্পত্তির লোভ দমন করতে পারলেন না। রণধীরের কাছে বাপের লেখা চিঠিটার কথা উল্লেখ করলেন।

বাবার চিঠির স্বারাই আমি প্রমাণ করব বাবার সম্পত্তির অর্ধেক আমার!

তা করতে পার, তবে ঐ সময় এ কথাও আমি কোটে প্রকাশ করব— তোমার সত্যকার পরিচয়। তার চাইতে আমি যা বলি তাই করো।

কি ?

বিশ হাজার টাকা তোমাকে আমি নগদ দেব। আর আমার উইলে provision রেখে যাব, তোমার ও আমার সন্তান আমার সম্পত্তি সমান ভাগে পাবে।

কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস কি ! যদি তুমি তোমার কথা না রাখ ?
লিখে দিচ্ছি—

বেশ, তাহলে রাজী আছি।

কিন্তু চিঠির মধ্যে এই শর্তও থাকবে, কোনভাবে ঐ চিঠি যদি আমার ম্তুর প্রবে প্রকাশ পায় তো ঐ condition নাকচ হয়ে যাবে। রাজী আছ তাতে ?

রাজী।

সেই ভাবেই রণধীর একখানা চিঠি লিখে দিলেন।

নগদ কুড়ি হাজার টাকা ও চিঠি নিয়ে হিরণ্যরী ফিরে গেলেন স্বামীকে নিয়ে কলকাতায়। একেবারে রিস্তহস্তে ফিরে যাওয়ার চাইতে তবু কিছু পাওয়া গেল।

তার পর দীর্ঘ ষোল বৎসর দ্রুজনে আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। তবে হিরণ্যরী শৈনোছিলেন, রণধীর তাঁর স্ত্রীর ম্তুর পর তাঁর দ্রুই যমজ কন্যা বনলতা ও সোমলতাকে নিয়ে নিরালায় এসে বসবাস করছেন।

কিরীটী আবার এইখানে বাধা দিল, এ ছবি দ্রুটি তাহলে তাদেরই ?

হ্যাঁ, বনলতা আর সোমলতা দ্রুই বোন। দাদারই হাতে অঁকা ছবি।

তবে যে আপনি সেদিনকার আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, বনলতা আর সোমলতা একে অন্য হতে চার-পাঁচ বছরের ছোট-বড় ? মিথ্যা বলেছিলেন বলুন ?

হ্যাঁ।

॥ ১৬ ॥

আমি তাকিয়ে ছিলাম দেওয়ালে টাঙানো পাশাপাশি অয়েল-পেন্টিং দুটোর দিকে।

সোমলতা আর বনলতা শিল্পী রণধীর চৌধুরীর দ্রুই যেয়ে। টুইন—যমজ বোন। এবং ওদেরই একজনের ছেলে শতদল। কিন্তু শতদল কার ছেলে —বনলতার না সোমলতার ! শশাঙ্ক চৌধুরীর ছেলে রণধীর চৌধুরী আর হিরণ্যরী দেবী।

হিরণ্যরী দেবীর মুখের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে আরো যেন তাঁর কিছু বলার আছে, কিন্তু তিনি যেন বলতে পারছেন না। চোখের দৃষ্টি ঘূরিয়ে কিরীটীর দিকে তাকালাম। গভীর কোন চিন্তার মধ্যে ও ডুবে আছে। হস্ত-ধ্বনি জবলত সিগারেট নিঃশব্দে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। কোন একটা বিশেষ চিন্তাই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু সেটা কী ? হিরণ্যরী দেবী বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে কী এমন সে পেল চিন্তার খোরাক ? শতদল-রহস্য-কাহিনীর কোন স্তুতি কি সে খুঁজে পেল ? একটু

আগে রাস্তায় আসতে কিরীটী বলেছিল, অন্ধকারে সে আলো দেখতে পেয়েছে। মাঝ একটি জাহাগীয় সুন্দর এসে জট পাকিয়ে রয়েছে। সেই জটটি খুলতে পারলেই সব বোঝা যাবে। হিরণ্যায়ী দেবী বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে কি সেই সংগ্রটিই ও খুঁজে পেল? আমি তো কই কিছুই এখনো ভেবে পাচ্ছ না! কেন শতদলবাবুর প্রাণের ওপরে এমানি বার বার প্রচেষ্টা হল? আর কেই বা তাঁকে বার বার হত্যা করবার চেষ্টা করছে?

আচমকা কিরীটীর কণ্ঠস্বরে চিন্তাসূত্র ছিঁড় হয়ে গেল।

এইটুকুই কি আপনার বলবার ছিল হিরণ্যায়ী দেবী? আর কি কিছুই আপনার বলবার নেই? কিরীটীর দৃঢ়কর শার্ণত দ্রষ্ট সম্মুখে উপর্যবেক্ষণ হিরণ্যায়ী দেবীর মুখের ওপরে স্থিরনিবন্ধন।

আঁ! হিরণ্যায়ী যেন চমকে উঠলেন।

আপনার কি বলবার আর কিছুই নেই?

না। ক্ষীণকষ্টে উচ্চারিত হল একটিমাত্র শব্দ।

আপনি তো কই এখনো বললেন না, আপনার স্বামী কর্বিতা দেবীর বাড়তে কেন গিয়েছিলেন?

আমি যতদ্বার জানি আমার স্বামী এ দুদিন মোটে বাড়ি থেকে বেরই হননি।

হ্যাঁ, আপনার জানিত-ভাবে বের হননি এটা বিশ্বাস করি, কিন্তু তিনি যে গিয়েছিলেন এটাও ঠিক। কারণ দৈবঙ্কমে তাঁর হাতের আঁটির পাথরটা সেখানে খসে পড়ে গিয়েই, সেখানে যে তিনি গিয়েছিলেন সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে হিরণ্যায়ী দেবী! এক্ষেত্রে অস্বীকার করেও তো উপায় নেই। দৈবই যে প্রতিক্রিয়া!

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমার স্বামীর শতদলকে হত্যা করবার কোন কারণই নেই এবং তিনি তা করবার চেষ্টাও করেননি।

আমি বিশ্বাস করি হিরণ্যায়ী দেবী, হরবিলাসবাবু সে কাজ করেননি কিন্তু তিনি যে শরৎবাবুর বাসায় গিয়েছিলেন, যে কোন কারণেই হোক—সেটা আমার স্থিরবিশ্বাস। এবং অনুমান স্বীকৃত আমার যথ্য না হয় তো হরবিলাস-বাবু, আপনার জাতসারেই সেখানে গিয়েছিলেন!

কিরীটীর স্পষ্টসম্পত্তি অভিযোগেও হিরণ্যায়ী দেবী নিঃশব্দে বসে রইলেন। কোন সাড়া দিলেন না।

আমার কি বিশ্বাস জানেন হিরণ্যায়ী দেবী! কিরীটী আবার কথা বললে।

হিরণ্যায়ী কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

দ্রুতপেই মিঃ ঘোষ কর্বিতা দেবীর ওখানে গিয়েছিলেন। এবং সে-কথা কর্বিতা দেবীর কাছ হতে বের করতে আমায় বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না। কিন্তু আমি চাই আপনাই সব কথা আমাকে খুলে বলুন।

আমি কিছু জানি না। হিরণ্যায়ী দেবীর সমস্ত মুখখানা যেন পাথরের মত কঠিন মনে হয়।

তাহলে একান্ত দৃঢ়খের সঙ্গেই আমি বলতে বাধা হচ্ছি, এর পর আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর আমাদের শিবতীয় পথ থাকবে না!

কিন্তু আপনি নিজের মুখেই তো একটু আগে বললেন যে, আমার স্বামী শতদলকে হত্যা করবার প্রচেষ্টার ব্যাপারে নির্দেশ?

তা বলেছি। তবে তাঁকে ঘরে যে সন্দেহ জমে উঠেছে, সেটা যতক্ষণ না পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তাঁকে মুক্তি দেওয়াও তো সম্ভব নয়। আপনিই বলুন না! শূন্দন হিরণ্যারী দেবী, আমি জানি এ সব কিছুর মূলে কে—

বিদ্যুৎ-চমকের মতই হিরণ্যারী কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন, আপনি—আপনি জানেন?

হ্যাঁ, জানি।

তবে—তবে আপনি তাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

ব্যস্ত হবেন না। সময় হলে আপনা হতেই তাকে হাজতে গিয়ে ঢুকতে হবে।

কিন্তু—

আপনার কাছে আমি যা জানতে চাইছি বলুন!

কি বলব?

বলুন কেন সেদিন আমাদের কাছে আপনি যিথ্যা কথা বলেছিলেন যে, স্বর্গত রংধনীর চৌধুরীর প্রিতীয় মেরেটির কথা আপনি কিছু জানেন না? সোমলতা আর বনলতা—তাদের সমস্ত কথা এখনো আপনি বলেননি!

বনলতা আর সোমলতা দুজনেই মারা গেছে—

শতদলবাবু কার ছেলে?

সোমার।

আর বনলতার স্বামীই বা কে? আর তার সন্তান কটি?

বনলতার স্বামীর নাম ডঃ শ্যামাচরণ সরকার।

হিরণ্যারী দেবী কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর সমস্ত সন্তা যেন সহসা বিদ্যুৎ-স্পষ্টের মত সজাগ হয়ে ওঠে। উদ্গ্ৰীব ব্যাকুল কপ্টে প্রশ্ন করে, কী—কী বললেন?

ডঃ শ্যামাচরণ সরকার—বনলতার স্বামী।

কোন্ শ্যামাচরণ সরকার? অধ্যাপক ডঃ শ্যামাচরণ সরকার কি?

হ্যাঁ।

কিরীটীর চোখে-মুখে ক্ষণপ্রদৰ্শে যে উভেজনা দেখা দিয়েছিল, সেটা যেন আবার নিভে এল। সে প্রিতীয় প্রশ্ন করলে, তাহলে—তাহলে হরবিলাসবাবু কৰিবতা দেবীর ওখানে গিয়েছিলেন কেন?

আপনাকে তো আমি বললাম, আমার স্বামী সেখানে ঘানানি! এবং কৰিবতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও নেই।

তা হতে পারে না। Simply absurd! একেবারে অসম্ভব। নিশ্চয়ই হরবিলাসবাবু কৰিবতা দেবীর ওখানে গিয়েছিলেন। এবং তিনি শতদলবাবুকে নার্সিং হোষে ফুল ও মিণ্ট পাঠাতে বলেও এসেছিলেন, এ-ও সত্যি। কিন্তু এইটাই বোঝা যাচ্ছে না, কেন—কেন তিনি ও-কথা কৰিবতা দেবীকে বলতে গেলেন? তারপর একটু থেমে কতকটা আঘাত ভাবেই বললে, আর আমার অনুমান যদি যিথ্যা হয় তাহলে,—কিরীটী শেষের কথাগুলো খুব ধীরে যেন উচ্চারণ করল এবং পরক্ষণেই হিরণ্যারী দেবীর মুখের দিকে তাঁকিয়ে প্রশ্ন করলে, আপনার স্বামীর হাতের আংটিটা কত দিন গুঁর হাতে আছে বলতে পারেন?

তা দশ-বারো বছর তো হবেই।

বলতে পারেন আপনার স্বামীর হাতের আংটিটার পাথরটা—যেটা তাঁর আংটিতেই আছ, শেষবারে কবে আপনার নজরে পড়েছিল ?

সীতার মৃত্যুর আগের দিনও আংটির পাথরটা ঠিক ছিল—যেন দেখেছি বলেই মনে হয়।

তাহলে আর কি হবে ! চল সুন্দর, ওঠা যাক। আমার দিকে তাকিয়ে কিরীটী বলল।

কিরীটীই প্রথমে কক্ষত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয় এবং আমিও উঠে দাঁড়াই।

আমাদের কক্ষত্যাগ করতে উদ্যত দেখে ব্যাকুল কঠে হিরণ্যায়ী বলে ওঠেন, 'কিন্তু আমার স্বামী ?

কিরীটী ঘূরে দাঁড়িয়ে শান্তকঠে বললে, আংটির পাথরের ব্যাপারটা ঘতক্ষণ না মীমাংসিত হচ্ছে, আপনার স্বামীকে হাজতে নজরবন্দী থাকতেই হবে হিরণ্যায়ী দেবী। আমি দণ্ডিত !

বিনা দোষে আমার স্বামীকে হাজত-বাস করতেই হবে ?

দোষের কথা তো এখানে নয়, সন্দেহক্রমে—

অতঃপর হরিবিলাসকে সঙ্গে নিয়েই আমরা 'নিরালা' থেকে বের হয়ে এলাম। পথে বের হয়ে কিরীটীর নির্দেশক্রমে দুজন সেপাইয়ের হেপাজতে হরিবিলাসকে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে কিরীটী ঘোষাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন, আর একবার শরৎ উকিলের বাসাটা ঘূরে যাওয়া যাক !

এখনি ? বেলা অনেক হয়েছে, সন্ধ্যার দিকে গেলে হত না ? প্রশ্নটা করলেন থানা-অফিসার রসময় ঘোষাল।

না, শুভস্য শীষ্ম্ব। কিরীটীর কণ্ঠস্বরে অস্তুত একটা দ্রুতা প্রকাশ পায়।

শহরের পথে চলতে চলতে আমি একটা কথা কিরীটীকে না স্মরণ করিয়ে দিয়ে পারলাম না, 'নিরালা'র উপরের ঘর—যার তালা ভাঙা ছিল, সে ঘর দেখা হল না !

কিরীটী ম্দুরকঠে বললে, বাস্ততার কী আছে ? দেখলেই হবে !

বেলা তখন প্রায় একটা হবে।

মধ্যাহ্ন-স্মৃতি মাথার উপরে প্রচণ্ড তাপ বর্ণ করছে। কিরীটীর দ্রুত পদ-বিক্ষেপ দেখে মনে হচ্ছিল, মনে মন সে যেন বিশেষ কোন একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চলেছে। বারবারই লক্ষ্য করেছি, কিরীটী যখন কোন একটা জটিল ব্যাপারে মীমাংসার কাছাকাছি অসে, তার চালচলন কথাবার্তা এমনি দ্রুত ও ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। তার অত্যন্ত ধীর-স্মিথর ভাব যেন সহসা অত্যন্ত চগ্নি হয়ে ওঠে।

ঠিক দ্বিপ্রহরে ঐদিন দিবত্তীয়বার আবার আমাদের তাঁর ওখানে আসতে দেখে কবিতা দেবী বেশ যেন কিছুটা বিস্মিতই হন।

শরৎবাবু বাসায় ছিলেন না, একটু আগে আদালতে বের হয়ে গিয়েছেন।

কবিতা দেবী আমাদের বসতে বললেন।

আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসতে হল কবিতা দেবী ! কিরীটীই কথা শুনুন করে।

না, না—এর মধ্যে বিরক্তির আর কী আছে !

ঘোষাল সাহেব হরিবিলাসবাবুকে শতদলবাবুর হত্যা-প্রচেষ্টার ব্যাপারে

অ্যারেস্ট করেছেন কিছুক্ষণ আগে—

সে কি! হরবিলাসবাবু—

হ্যাঁ, তবে তাঁর মুক্তির ব্যাপারটা নির্ভর করছে আপনার evidence-এর ওপরে।

আমার evidence-এর ওপরে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি তো আপনার কথা কিছুই বলতে পারছি না মিঃ রায়!

হরবিলাসবাবু বলতে চান যে, তিনি আপনার কাছে গত পরশ এসে শতদলবাবুকে ফুল ও সল্দেশ পাঠাতে বলেননি, অথচ ঘোষাল সাহেবের ধারণা তিনিই এসেছিলেন! কিরীটী জবাব দিল।

কিন্তু আমি তো বলিন যে হরবিলাসবাবু এসেছেন! একটা যোক গিলে করিতা জবাব দেন।

তিনি যদি না-ই এসে থাকবেন, তাহলে তাঁর হাতের আংটির পাথরটা আজ সকালে আপনার এই ঘরে কুড়িয়ে পাওয়া গেল কি করে? কথাটা বললেন ঘোষাল।

আংটির পাথর কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে এই ঘরে?

হ্যাঁ।

কে পেয়েছেন?

মিঃ রায়।

সত্যি! কথাটা বলে করিতা সপ্রশ্ন দ্রষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ।

কই দেখি সে পাথরটা?

কিরীটী একান্ত নির্বিকার ভাবেই যেন জামার পকেট হতে হাত ঢুকিয়ে প্রবাল পাথরটা বের করে করিতার চোখের সামনে ধরল।

আশচর্য! এই তো—এটা তো আমার আংটির পাথরটা! কাল কখন আংটি থেকে পড়ে গিয়েছে, খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আপনার আংটির পাথর! কই, আপনার আংটিটা কই?

আংট হতে পাথরটা পড়ে যাওয়ায় আজ সকালেই বাস্তু তুলে রেখেছি।

দয়া করে আংটিটা আনবেন কি?

নিশ্চয়ই। কিরীটীকে আর স্বিতীয় প্রশ্নের সময় না দিয়ে করিতা উঠে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাথরহীন একটা আংটি নিয়ে এল।

এই দেখুন!

কিরীটী আংটিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে আড়চোখে একবার করিতার দিকে তাকিয়ে বললে, কিন্তু এ আংটিটা তো আপনার হাতের আঙুলে fit করবার কথা নয় করিতা দেবৈ! এটা কার আংটি?

কেন, আমার?

উহুু! কই পৱন তো!

এবারে করিতা দেবৈ যেন একটু বিমৃঢ় হয়ে পড়েন। একটু বিহুল। হতচকিত।—অবিশ্য আংটিটা একটু আঙুলে আমার বড়ই হয়—

তাই তো বলছিলাম, সার্জি করে বলুন তো আংটিটা কার ?

আমারই ।

না, কেউ নিচ্ছেই আপনাকে আংটিটা দিয়েছেন ! তাই নয় কি করিবতা দেবী ?

হাঁ ! নিম্নকণ্ঠে জবাব দিলেন করিবতা ।

কে—কে দিয়েছেন ?

ক্ষমা করবেন কিরীটীবাবু, ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিগত ।

হ্যাঁ ।

অতঃপর কিরীটী কিছু ক্ষণ স্থত্ব হয়ে থাকে ।

পরশু কে আপনাকে এসে বলেছিল, শতদলবাবুকে ফুল ও সন্দেশ পাঠাতে নাসিৎ হোমে ?

তাকে চিনি না, দৈর্ঘ্যনি কখনো ।

দেখতে কেমন ?

বয়েস পশ্চাশের নীচে হবে বলে মনে হয় না । অন্ধে দাঁড়ি-গোঁফ ছিল । একটু খুঁড়িয়ে হাঁটাছিল ।

নাম কিছু বলোনি ?

না, জিজ্ঞাসা করিবানি ।

কেথা হতে আসছে তা বলোনি ?

হাঁ, বলেছিল নাসিৎ হোম থেকেই । সেখানেই নাকি কাজ করে ।

আচ্ছা করিবতা দেবী, বিখ্যাত সুইমার কুমারেশ সরকারের নাম শনেছেন ?

কিরীটীর আচমকা বিষয়াল্পতরে গিয়ে সম্পূর্ণ ঐ নতুন প্রশ্নে করিবতা প্রথমটা বোধ হয় একটু কেমন বিষয়ে বিহুল হয়ে পড়ে এবং ক্ষণকাল কিরীটীর অন্ধের দিকে তাকিয়ে থাকে ।

তারপর কিরীটীর অন্ধের দিকে তাকিয়েই জবাব দেয়, নাম শনেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় নেই ।

কিরীটী এরপর আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আচ্ছা তাহলে চালি । নমস্কার ।

হোটেল প্রত্যাগমন করে আহাৱাদিৰ পৱ কিরীটী ঘৰেৱ মধ্যে একটা আৱামকেদারীয় শৰ্যে চোখ বুজল ।

আমি একটা বাংলা বই নিয়ে শব্দ্যায় আশ্রয় নিলাম । সারা সকাল হাঁটা-হাঁটিৰ ক্লান্তিতে কখন দু-চোখেৰ পাতা বুজে এসোছিল টেৱ পাইনি ।

ঘূৰ ভাঙল একেবাৰে সন্ধ্যায় দিকে । তাড়াতাড়ি শব্দ্যায় ওপৱে উঠে বসতেই নজৰে পড়ল কিরীটী নিঃশব্দ অঙ্গথৰ পদে ঘৰেৱ মধ্যে পায়চাৰি কৱাহে । এবং হাতে তাৰ শতদলবাবুৰ নিকট হতে চেৱে নিয়ে আসা বলগাঁওৰ চিহ্নাঙ্কিত চিঠিটা ।

চা খেয়েছিস ? প্ৰশ্ন কৱলাম ।

বাবাঃ, ঘূৰ ভাঙল তোৱ ?

হাঁ ! ঘূৰ ঘূৰিয়েছি নাকি ?

না, মাত্ৰ সাড়ে তিন ঘণ্টা ! চল, চা খেয়ে একটু বেৱলো থাক ।

আগে শব্দ্যা হতে উঠে সুইচ টিপে আলোটা জৱললাম । তারপর বেৱিয়ে গিয়ে বেয়াৱাকে ঢায়েৱ অৰ্ডাৰ দিয়ে ফিৱে এসে দৈৰ্ঘ্য, চেয়াৱটাৰ উপৱে

উপবেশন করে সেই চিত্রাঙ্গিকত হিজাবিজি-মার্ক চিঠিটা কিরীটী গভীর
মনোযোগ সহকারে দেখছে।

ব্যাপার কি তোর বল্ল তো কিরীটী? চিঠিটার মর্মান্ধারের প্রতিজ্ঞা
নিয়েছিস নাকি?

মর্মান্ধার হয়ে গিয়েছে এবং 'নিরালা'র রহস্যের উপরেও কাল প্রতুষেই
ঘবনিকাপাত!

সার্ত্তি?

হ্যাঁ।

চা-পান করে দুজনে হোটেল থেকে বের হলাম।

পথে নেমে কিরীটী বললে, চল্ একবার ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে দেখা
করে আসি।

ঘোষাল সাহেব থানাতে ছিলেন না। কাছে-পিঠেই নাকি কোথায় এন-
কোয়ারিতে গিয়েছেন। এ, এস, আই, রাম্বিকঙ্কর ওয়া ছিলেন। খসখস
করে কাগজ ও পেন দিয়ে একটা চিঠি লিখে চিঠিটা থামের মধ্যে পুরে সেটা
ওবার হাতে দিয়ে আমরা থানা হতে বের হয়ে এলাম। বৰ্বৰতে পার্বাছ কিরীটীর
বাইরের শান্ত ভাবটা ঘুর্খোশ মাত্র। ভিতরে তার যে ঝড় চলেছে সেটাকে সে
চাপা দিতে পারছে না। এবং রহস্যের মীমাংসার শেষ ধাপে এসে পেঁচেছে
বলেই নিজেকে সে যথাসাধ্য চেঁটা করছে বাইরে ধীর ও শান্ত রাখার জন্য।

শান্তকের মত নিজেকে ও এখন গৃহিণীর রেখেছে। হাজার খোঁচাখুঁচি
করলেও এখন ও মৃদু খুলবে না। এ যেন ওর রহস্যের মীমাংসার শেষ
চৌকাঠের সামনে এসে নিঃশব্দে শক্তিসংগ্রহ করা। ঘণ্টাখানেক প্রায় সময়ের
কিনারে কাটিয়ে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। এবং হোটেলে
পেঁচেছেই আমাকে কোন কথার অবকাশ মাত্র না দিয়ে কিরীটী দোতলার দিকে
চলে গেল।

আমি দ্বিপ্রহরের অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসটা নিয়ে চেয়ারে বসলাম।

উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে একেবারে তুবে গিয়েছিলাম, হোটেলের
ওয়েটারের ডাকে খেয়াল হল।

সার, আপনাদের থানা কি ঘরে দিয়ে থাব?

খানা! হ্যাঁ, নিয়ে এস।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সাড়ে নটা। আশ্চর্য! এখনো কিরীটী
ফিরল না? উঠে ডাকতে যাব, কিরীটী এসে ঘরে প্রবেশ করল।

এতক্ষণ কোথায় ছিল?

সময়ের ধারে রাণু দেবীর সঙ্গে গল্প করছিলাম।

এতক্ষণ ধরে কি এগুল গল্প করছিল?

গল্প নয়, শুনছিলাম। এক প্রেমের জটিল উপাখ্যান।

কার—রাণুর?

হ্যাঁ—তা নয় তো কি হিরণ্যারী দেবীর!

ওয়েটার প্রতে করে খানা সাজিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

খানা খাবার পর কিরীটী চেয়ারে শুয়ে একটা সিগারে অঁগিসংযোগ করল।

শয়নের ঘোগড় করছি, কিরীটীর কথায় ফিরে তাকালাম, "উহু, এখন
নয়।"

তার মানে ?

এখন একবার বেরুতে হবে।

এত রাতে আবার কোথায় ধাবি ?

‘নিরালায়।

॥ ১৭ ॥

কালো অন্ধকার রাত।

সমন্দের কিনারা দিয়ে হেঁটে চলেছি দৃজনে ‘নিরালা’র দিকে।

ডাইনে অন্ধকারে গজর্মান সমন্দ ঘেন কি এক মর্ভভাঙ্গ যাতনায় আছাড়ি-পিছাড়ি করছে।

‘নিরালা’র সামনে এসে যখন পেঁচলাম হাতঘাড়ির দিকে তাকিয়ে দৈখ রাত প্রায় সোয়া এগারটা।

কিরীটী কিন্তু ‘নিরালা’র সম্মুখ দিক দিয়ে না প্রবেশ করে পশ্চাতের দিকে এগিয়ে চলল। প্রায় দেড়মান্ধ সমান উঁচু প্রাচীর দড়ির মইয়ের সাহায্যে প্রথমে কিরীটী ও পশ্চাতে আঁধি টপকে ‘নিরালা’র পশ্চাতে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

জমাট অন্ধকারে বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকাটা একটা স্তুপের মত মনে হয়।

‘নিরালা’র মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছে কিরীটী, কিন্তু কেন, সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছ না ! কী তার মতলব ?

বাগানের চারিদিকে অষঙ্ক-বর্ধিত জঙ্গল। অন্য কিছুর না থাক্, সাপের ভয়ও তো আছে !

প্রথম দিনের সেই সীতার সতর্কবাণী ঘনে পড়ে। ‘নিরালায় ভয়ানক সাপের উপন্থু।

শুধু কি তাই ? সীতার কুকুর টাইগার ! কে জানে সেই মৃত্যুসদশ্য আলসৈস্যান কুকুরটা ছাড়া আছে কিনা ? সীতার মৃত্যুখানা ঘেন কিছুতেই ভুলতে পারিব না। কেবলই ঘুরে-ফিরে মনে পড়ে সেই মৃত্যুখানা। সন্তপ্তণে পা ফেলে ফেলে অন্ধকারে এগুচ্ছ কিরীটীর পিছু পিছু।

কী কুক্ষণেই যে সমন্দের ধারে হাওয়া বদলাতে এসেচলাম ওর প্রোচনায় পড়ে !

গৈত্রক প্রাণটা শেষ পর্যন্ত বেঘোরে না হারাতে হয় !

কোন প্রশ্ন যে করব ওকে তারও কি জো আছে ? এখনি হয়তো খীঁচিয়ে উঠবে। নচে বোবা হয়ে থাকবে। হঠাৎ একটা খস-খস শব্দ কানে এল।

চকিতে কিরীটী আমাকে ঝৈঝি আকর্ষণ করে একটা বোপের মধ্যে টেনে বসে পড়ল। আবছা আলো-অন্ধকারে শ্যেনদৃষ্টি ঘেলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। কিছুক্ষণ প্রবে আকাশে একফালি চাঁদ জেগেছে। ক্ষীণ অস্পষ্ট সেই চাঁদের আলো আশপাশের গাছপালার উপরে প্রতিফলিত হয়ে অন্তু একটা আলো-ছায়ার সংষ্টি করেছে।

খুব স্পষ্ট না হলেও দেখতে কষ্ট হয় না। ঢাঙ্গ-মত একটা ছায়া অন্ধকারে

‘নিরালা’র পশ্চাতের বারান্দায় দেখা গেল। বারান্দা দিয়ে লোকটা পা টিপে টিপে এই দিকেই আসছে।

আরো একটা কাছে এলে দেখলাম, লোকটার দুই হাতে ধরা প্রকাণ্ড একটা কি বস্তু!

কিরীটীর দিকে তাকালাম। তার শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন পড়ছে না। স্থির অপলক দ্রষ্টব্যে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে।

কে লোকটা? হাতে ওর ধরাই বা কী?

আরো একটা এগিয়ে আসতেই এবাবে বুঝতে কষ্ট হল না, লোকটার হাতে ধরা বস্তুটি কী? প্রকাণ্ড একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি। ছবির ফ্রেমে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে চিক্কিচ করছে। এবং লোকটাকেও এবাবে চিনতে কষ্ট হল না। এ বাড়ির সেই বোবা-কালা ভুখনা! কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ভুখনা ছবিটা নিয়ে?

চাপা স্বরে আস্তে আস্তে কিরীটীকে সম্বাধন করে বললাম, ভুখনা!

হাঁ, চৃপ!

ভুখনা ছবিটা নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল বাগানের মধ্যেই। বাগানের দক্ষিণ কোণে একটা প্রশস্ত খাউগাছ, তার নীচে এসে দাঁড়াল ভুখনা এবং ছবিটা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

চাঁদের অঙ্গুষ্ঠ আলোয় পরিষ্কার না হলেও আমরা সবই দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম পাশের বোপ থেকে আর একটি ছায়ামূর্তি বের হয়ে এল। ছায়ামূর্তির সর্বাঙ্গ একটা কালো কাপড়ে ঢাকা। মুখে বাঁধা একটা কালো রূমাল, সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে আব্রত ছায়ামূর্তি ভুখনাকে চাপা স্বরে কী যেন বললে।

ওদের ব্যবধান আমাদের থেকে প্রায় হাত-আল্টেক হওয়ায় বুঝতে পারলাম না কী কথা বললে!

কিন্তু ও কি? ভুখনা ও ছায়ামূর্তির ঠিক পশ্চাতে গুটি গুটি পা ফেলে তৃতীয় আর একজন এগিয়ে আসছে। এসব কী ব্যাপার!

অতি সতর্কতার সঙ্গে পিছন থেকে তৃতীয় আগন্তুক এগিয়ে আসলেও, কালো কাপড়ে আব্রত ছায়ামূর্তির অতি সতর্ক শ্রবণেশ্বরকে ফাঁকি দিতে পারেনি। মহুর্তে চোখের পলকে কাপড়ে আব্রত ছায়ামূর্তি ঘরে দাঁড়ায় ও আধো-আলো আধো-অন্ধকারে একটা অগ্রবালক বলসে ঘটে ও সেই সঙ্গে শোনা যায় পিঙ্কলের আওয়াজ—দৃঢ়্যম! সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা অক্ষুণ্ণ আর্ট চিক্কার।

সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত এত আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল যে, প্রথমটাই আমরা হতচক্ষিত ও বিষ্ণু হয়ে পড়েছিলাম কয়েক মহুর্তের জন্যে।

কেমন করে যে কী ঘটে গেল যেন বুঝতেই পারলাম না।

থেরাল হতেই দেখি, কিরীটী লাফিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আর্মি ও ক্ষিপ্রগতিতে তার পশ্চাঞ্চাবন করলাম।

কিন্তু অকুম্হানে পেঁচে দেখি, ভুখনা বা সেই কালো কাপড়ে আব্রত ছায়ামূর্তির সেখানে চিহ্নাত্তও নেই। কেবল কে একজন সৃষ্টি-পর্বাহিত ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতটা চেপে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে ব্যল্পাকাতর শব্দ করছে।

উপরিষ্ঠ লোকটির উপরে কিরীটীর হস্তধৃত টর্চের তীব্র একটা আলোর-

রশ্মি গিয়ে পড়ল ও সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী প্রশ্ন করে, কে? এ কি কুমারেশ
সরকার!

কুমারেশ সরকার! আমিও বিস্মিত দ্রষ্টিতে তাকালাম।

কে আপনি? অশ্রুগাক্তিষ্ঠ কুমারেশ সরকার প্রশ্ন করেন কিরীটীকে।

আমি কিরীটী। কোথায় গুলি লাগল? দেখি! কিরীটী এগিয়ে গেল।

গুলি করবার আগেই চট করে হেলে পড়েছিলাম ডান দিকে। গুলিটা বাঁ
হাতের পাতায় লেগেছে। একটুর জন্য শরতানটাকে ধরতে পারলাম না, উঃ!

দেখি হাতটা? কিরীটী এগিয়ে গিয়ে কুমারেশ সরকারের গুলিবিষ্ণ আহত
রক্তস্তু বাঁ হাতটা টর্চের আলোয় পরীক্ষা করতে লাগল। পরীক্ষা করে বললে,
না, গুলি pierce করে বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু woundটার তো এখনি একটা
ব্যবস্থা করা দরকার! ব্লেট-উন্ড—neglect করা ষায় না। আমার রুমালটা
অপরিষ্কার। সুরক্ষা, তোর কাছে পরিষ্কার রুমাল আছে।

কুমারেশ বললেন, দেখুন আমার শার্টের ভিতরের পকেটে কাচা রুমাল
আছে, বের করুন!

কুমারেশের বৃক্ষপকেট হতে পরিষ্কার রুমালটা বের করে কিরীটী
কুমারেশের আহত হাতটা বেঁধে দিল।

কিন্তু লোকগুলো যে পালিয়ে গেল! কুমারেশ বলেন।

পালাবে আর কোথায়? নিজের জালে নিজেই আটকে পড়েছে। অন্যের
সাংশ্রেণ গুপ্তধনের প্রতি লোভ একবার জন্মালে সে লোভ সংবরণ করা বড়
দুঃসাধ্য মিঃ সরকার! তাড়াতাড়িতে প্রাণভয়ে সেই বস্তুটিকেই তাঁদের এখানে
ফেলে পালাতে হয়েছে থখন, এ জায়গা ছেড়ে তারা বর্তমানে খুব বেশী দূরে
ঘৰে না। না জেনে আগন্তুম হাত দিলে হাত পোড়েই। সেটাই আগন্তুমের ধর্ম।
সে পোড়া হাত খুঁজে বের করতে আমাদের আর খুব বেশী বেগ পেতে হবে
না। কিন্তু কালো কাপড়ে আব্দত মণ্ডিটিকে অন্তত আপনার তো চেনা উচিত
ছিল মিঃ সরকার, চিনতেই পারলেন না?

না। ভূখনাকে চিনেছিলাম, কিন্তু—

যাক, চলুন আপনার হাতের ক্ষতস্থানটির সর্বাঙ্গে একটা ব্যবস্থা করা
প্রয়োজন। চলুন দেখি উপরের তলায় শতদলবাবুর ঘরে, যদি কোন ঔষধপত্র
থাকে! বলতে বলতে কিরীটী আমার দিকে চেয়ে তার বক্ষব্য শেষ করল,
ছবিটা একা নিয়ে যেতে পারব না?

কেন পারব না! চল—

আগে আগে কিরীটী ও কুমারেশ সরকার ও পশ্চাতে আমি ছবিটা তুলে
নিয়ে অগ্রসর হলাম। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যেতে হঠাৎ নজরে পড়ল হিরণ্যয়ী
দেবীর ঘরের ডেজানো স্বারপথের ঈষৎ ফাঁক দিয়ে ঘূর্দ একটা আলোর
ইশারা।

আশ্চর্য, হিরণ্যয়ী দেবীর ঘরে এখনো আলো জ্বলছে! বলতে বলতে
সর্বাঙ্গে কিরীটী ও পশ্চাতে আমরা দুজনে এগিয়ে গেলাম।

ডেজানো দরজার ঈষৎ ফাঁক দিয়ে বারেকের জন্য কিরীটী দ্রষ্টিপাত্ত করেই
দরজাটা খুলে ফেললে। খোলা স্বারপথে কক্ষের অভ্যন্তর আমাদের দ্রষ্টি-
গোচর হল এবং থমকে দাঁড়ালাম। নিশচল পাশাশ-প্রতিমার মতই ইন্ড্যালিস্ট
চেয়ারটির উপরে স্থির আচ্ছল বসে আছেন হিরণ্যয়ী দেবী।

দ্রষ্ট তাঁর ঘাঁটিতে নিবন্ধ।

আর সামনেই পায়ের নীচে একরাশ পোড়া কাগজ।

সর্প্পথমে কিরীটী ও পশ্চাতে আর্ম ও কুমারেশ সরকার ছবিটা ঘরের বাইরে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

ঘরের বাতাসে একটা কাগজপোড়া কট্ৰ গন্ধ এবং তখনও পাতলা একটা ধোঁয়ার পর্দা ঘরের মধ্যে ভাসছে।

আমরা যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম তা যেন হিরণ্যয়ী দেবী টেরই পেলেন না। নিজের মধ্যে এমন গভীর ভাবে নিমগ্ন যে তিনজনের আমাদের কক্ষের মধ্যে প্রবেশের ব্যাপারটা পর্যন্ত তাঁর সমাধিগ্রস্ত মৌনতাকে এতটুকু নাড়াও দিতে পারলে না।

আরো কাছে এঁগয়ে গেলাম।

তবু আশৰ্য্য, হিরণ্যয়ী দেবীর কোন সাড়া-শব্দ নেই! নিষ্ঠত্ব, নিষ্ঠুপ।
হিরণ্যয়ী দেবী! মৃদুকণ্ঠে কিরীটী ডাকল।

না, তবু সাড়া নেই।

হিরণ্যয়ী দেবী! শুনছেন? ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই এবারে কিরীটী ডাক দিল।
এবারে মৃখ তুলে তাকালেন হিরণ্যয়ী দেবী।

ঘরের আলোয় হিরণ্যয়ী দেবীর মৃখের দিকে তাকালাম। মড়ার মত
ফ্যাকশে রক্তহীন মৃখ। আর দুই চোখের দ্রষ্টিও যেন ঘষা কঁচের মত নিশ্চল
প্রাণহীন।

কিরীটী আবার ডাকল, হিরণ্যয়ী দেবী!

ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন হিরণ্যয়ী দেবী। কোন সড়া-শব্দই
দেন না।

সর্প্প হারানোর এক মর্মাণ্ডিক বেদনা যেন হিরণ্যয়ী দেবীর মৃখখানিতে
ছাড়িয়ে পড়েছে।

সামনের ঐ ভস্মস্তুপের মত যেন তাঁরও সব কিছু আজ শেষ হয়ে
গিয়েছে।

হঠাতে কথা বলেন হিরণ্যয়ী দেবী, সব পুরুষে ফেলেছি মিঃ রায়! সীতার
শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুও পুরুষে ফেলেছি! কিন্তু কই, তবু তো তাকে ভুলাত
পারছি না? কিছুতেই তো মন থেকে তাকে মুছে ফেলতে পারাছি না?

যে গিয়েছে তার কথা আর মিথ্যে ভেবে কী ল ভ বলুন হিরণ্যয়ী দেবী!
বাকি জীবনটা এমনি করেই তার স্মৃতি বার বার আপনার মনের মধ্যে এসে
উদয় হবেই। ভেবেছেন কি তার চিঠিপত্রগুলো পুরুষে ফেললেই তার স্মৃতির
হাত হতে আপনি রেহাই পাবেন! তা আপনি পাবেন না। বরং যে রহস্য এতকাল
আপনার কাছে অঙ্গীকৃত ছিল, তার বাস্তু ঘেঁটে তার চিঠিপত্রগুলো পড়ে—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, হিরণ্যয়ী দেবী চাকতে কিরীটীর মৃখের
দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি—আপনি সেসব কথা কেমন করে জানলেন
মিঃ রায়!

আপনি না জানলেও আর্ম জানতাম হিরণ্যয়ী দেবী, আপনার মেয়ে
সীতার মনটা কোথায় পড়ে আছে! আরও একটা কথা আপনি হয়তো
জানেন না!

কী?

যে ভালবাসার মধ্যে সীতা নিজেকে অমনি নিঃস্ব করে বিকিয়ে দিয়েছিল
সেই ভালবাসাই কালসাপ হয়ে তার বুকে মৃত্যু-ছোবল হেনেছে, অথচ বেচারী
সে কথা তার শেষ মৃত্যুর্তে স্বাগতে ভাবতে পারেন!

কিরীটীবাবু? আত্ম চিংকারের মতই ডাকটা শোনার হিরণ্যায়ীর কণ্ঠে।

হ্যাঁ, হিরণ্যায়ী দেবী। একটা দিকই আপনার নজরে পড়েছে। মালাটাই
আপনি দেখেছেন কিন্তু সেই মালার মধ্যেই যে ছিল দংশ্টা কীট সেটা আপনার
নজরে পড়েনি!

আঘ—আমার যে সব গোলমাল হয়ে থাচ্ছ মিঃ রায়! এ সব আপনি কি
বলছেন?

সময় আর তো নেই হিরণ্যায়ী দেবী। এখনি একবার আমাকে নার্সং
হোমে যেতে হবে। কুমারেশবাবুর হাতে গুলি লেগেছে। একটা dressing-এর
বিশেষ প্রয়োজন।

কুমারেশ!

হ্যাঁ। দেখুন একে চিনতে পারছেন কিনা?

এতক্ষণ কিরীটী কুমারেশ সরকারকে আড়াল করে দাঁড়িয়েই কথাবার্তা
চালাচ্ছিল। এবারে সরে দাঁড়াল।

কে?

চিনতে পারছেন না? বনলতা দেবী ও অধ্যাপক ডঃ শ্যামচরণ সরকারের
একমাত্র ছেলে কুমারেশ সরকার!

সে কি! তবে যে শুনেছিলাম—

কি শুনেছিলেন? তার কোন পাতাই পাওয়া থাচ্ছে না, তাই না?

হ্যাঁ।

তার জবাব অবিশ্য উনিই সঠিক দিতে পারবেন। আচ্ছা এবারে আমরা
চল হিরণ্যায়ী দেবী।

আমরা দৃঢ়নে কিরীটীর পিছু পিছু দুরজার দিকে অগ্সর হতেই কিরীটী
হঠাতে আবার ঘূরে দাঁড়িয়ে বললে, হ্যাঁ, একটা ছবি আপনার জিম্মায় রেখে
থেতে চাই হিরণ্যায়ী দেবী। স্বীকৃত, ছবিটা খুর কাছেই রেখে যাও। আমার
দিকে তাকিয়ে কিরীটী তার বক্তব্য শেষ করল।

ছবি, কিসের ছবি?

আঘ ততক্ষণে ঘরের বাইরে গিয়ে ছবিটা এনে হিরণ্যায়ী দেবীর পায়ের
সামনে দিলাম। ছবিটা দেখে হিরণ্যায়ী দেবী সাবস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী!
এ ছবিটা দাদার স্টেডিও-ঘরে ছিল না?

হ্যাঁ। আর যত বিপ্রাট এই ছবিটা নিয়েই। এইটা চৰি কুরবার মতলবেই
গতরাতে এ বাড়তে চোরের আবির্ভাৰ ঘটেছিল।

এই ছবিটা চৰি কৰতে? কী বলছেন আপনি মিঃ রায়?

হ্যাঁ, বললাম তো। “নিরালা”-রহস্যের মূলে এই ছবিটাই।

তবে—তবে আমার মেয়ে সীতাকে—

প্রাণ দিতে হল কেন, তাই না আপনার জিঞ্জাসা হিরণ্যায়ী দেবী? একান্ত
অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবেই আপনার মেয়ে হত্যাকারীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে-
ছিল, তাই তাকে প্রাণ দিতে হল। কিন্তু আমার আর দোরি করা তো চলবে
না—ওদিকে সময় বয়ে থাচ্ছে।

একটা কথা মিঃ রায়—

বলুন।

আমার স্বামী—

সে কথার জবাব তো আজ সকালেই দিয়ে দিয়েছি হিরণ্যরী দেবী!

আমরা সকলে অতঃপর নিরালা থেকে বের হয়ে এলাম।

হাতঘাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রাত দুটো বেজে গিয়েছে।

॥ ১৪ ॥

রাস্তায় পোঁছে হনহন করে হাঁটতে শুরু করে আঘি আর কুমারেশবাবু তাকে
অনুসরণ করিব।

কিরীটীর শেষের কথাগুলো সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়েছে।

অথচ আশ্চর্য! বার বার ঐ কথাটাই মনে হচ্ছিল। এই দিকটা একবারও
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি কেন? আগামোড়া ঘটনাটা একটিবারও ঐ দিক
দিয়ে আর্মি বিশ্লেষণ করে দেখিনি কেন?

তাড়াতাড়ি একটু পা চালিয়ে আয় স্বত! কুমারেশবাবুর উন্ডটা dress
করাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিরীটী চলতে চলতেই আমাকে একবার তাড়া দিল।

নাসির হোমে পোঁছে দেখি, সেখানে আবার বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
ডাঃ চ্যাটার্জী নিজেই একজন ভৃত্যের সঙ্গে কী যেন কথা বলছিলেন।

আমাদের প্রবেশ করতে দেখে বলে উঠলেন, এই যে মিঃ রায়! আবার
শতদলবাবুর life-এর ওপরে another attempt হয়েছে। ওকেই আপনার
কাছে পাঠাচ্ছিলাম।

ডাঃ চ্যাটার্জীর কণ্ঠস্বরে একরাশ উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে।

কিন্তু প্রত্যন্তে কিরীটীর কণ্ঠস্বরে কোনোরূপ উৎকণ্ঠাই প্রকাশ পেল
না। অত্যন্ত শান্ত ও নিরুৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আবার হয়েছিল বুঝি?
হ্যাঁ।

এবারেও poison, না বলোঁট!

সেই পূর্বের মতই মরফিন হাইড্রোক্লোর—

হ্যাঁ। চলুন দেখা যাক।

এবারেও ঠিক সময়মত ব্যাপারটা জানতে পারায় কোনংতে ভদ্রলোককে
বাঁচানো গিয়েছে। কিন্তু আর না শাই। ও ঝঞ্চাট আর আমার নাসির হোমে
রাখতে সাহস হচ্ছে না, মিঃ রায়, আপনারা অন্য ব্যবস্থা করুন।

তব নেই ডক্টর চ্যাটার্জী, হত্যাকারীর ইটাই last show! খেলা তার
ফুরিয়েছে, কিন্তু এবারেও কি কড়াপাকের সন্দেশ নাকি?

না, এবারে আরও serious—

কি রকম?

হাসপাতালের দেওয়া দুধ পান করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন।

হ্যাঁ। তা দুধটা দিয়ে এসেছিল কে কেবিনে?

নাসই। সে বললে, রাত দশটায় দুধ নিয়ে এসে শতদলবাবুর কেবিনে ঢুকে

দেখে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘরের আলো নির্বিয়ে শতদলবাবু ঘুমোছেন—
তাই আর তাঁকে বিরস্ত না করে দুধটা মাথার ধারে হোল্ডিসিন ক্যাবার্ডের ওপরে
একটা কাচের প্লেট দিয়ে ঢেকে রেখে কেবিন থেকে বের হয়ে আসে।

তারপর? কিরীটী পূর্ববৎ নিরাসস্ত ভাবেই প্রশ্ন করে।

তারপর রাত ষথন দেড়টা, নার্স বদলির সময় নতুন ডিউটি-নার্স ঝণকা
গৃহ শতদলবাবুর কেবিনের সামনে দিয়ে ষেতে ষেতে একটা অস্পষ্ট গোঙানির
শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করে আলো জেবলে দেখে, শতদল
শ্বাস উপরে গোঁ-গোঁ করছে। তাড়াতাড়ি আমাকে খবর দেয়, আমি ছেটে
যাই—

এখন কেমন আছেন?

এখন একটু ভাল।

হ্যাঁ। তাল কথা ডাঃ চ্যাটজার্স, কুমারেশবাবুর হাতটা জখম হয়েছে, একটু
দেখে ব্যবস্থা করে দিন—

নিশ্চয়ই। কিন্তু—

সব বলব আপনাকে। আগে হাতটা পরীক্ষা করে ব্যবস্থা করুন—আমরা
ততক্ষণ শতদলবাবুর সঙ্গে একটিবার দেখা করে আসি। কথাগুলো বলতে
বলতে আরো একটু ডাঃ চ্যাটজার্স দিকে এগিয়ে গিয়ে নিম্নকণ্ঠে কিরীটী
তাঁকে যেন কী নির্দেশ দিল, তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, চল
সুন্দর!

* * *

নিজীরের মত শতদলবাবু তার নির্দিষ্ট কেবিনের মধ্যে শয্যায় শূরে ছিল।
মাথার সামনে একজন নার্স একটা ট্র্যান্স উপর বসে ছিল। আমাদের দৃজনকে
হরে প্রবেশ করতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

কিরীটী চোখের ইঞ্জিতে নার্সকে কক্ষত্যাগ করতে বললে।

নিঃশব্দে নার্স কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

কিরীটী অতঃপর শয্যার সামনে এগিয়ে গিয়ে ক্ষণকাল শয্যায় শায়িত
নিজীর শতদলের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর এগিয়ে গিয়ে উদ্যানের দিকে খোলা জানলাটার সামনে নিঃশব্দে
দাঁড়াল। এবং জানলাপথে ঝুকে কী যেন দেখতে লাগল বাইরে।

এমন সময় শতদলবাবু চোখ মেলে তাকাল এবং ক্ষণিককণ্ঠে ডাকল, নার্স!

আমি নার্সকে ডাকতে ঘাঁচলাম, কিন্তু কিরীটী চোখের ইঞ্জিতে আমাকে
নিম্নে করে শয্যার কাছে এগিয়ে এল।

শতদলবাবু!

কে?

আমি কিরীটী, কেমন আছেন?

মিঃ রায় এসেছেন! আবার আমার life-এর ওপরে attempt নিয়েছিল!

তাই তো শুনলাম।

এবার দৃধের সঙ্গে—

হ্যাঁ, বড় কাঁচা কাজ করে ফেলেছে।

কাঁচা কাজ!

হ্যাঁ। আর সেই জন্মেই সে আমার চোখে ধরাও পড়ে গিয়েছে।

ধরা পড়েছে ! শতদলবাবুর কষ্টে বিস্ময়।

হ্যাঁ, শতদলবাবু ! জানেন একটা কথা, আপনি যে রণধীর চৌধুরীর চিঠিটা
আমাকে দিয়েছিলেন—তার মর্মার্থ আমি উন্ধার করতে পেরেছি।

চিঠি !

হ্যাঁ, মনে নেই আপনার ? যে চিঠিটা আপনার কাছ থেকে আমি চেয়ে
নিয়েছিলাম ?

ও—

আর সেই চিঠির মর্মার্থারের সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারীও আমার চোখের
সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হত্যাকারী ?

হ্যাঁ—সীতাকে যে হত্যা করেছে। চিঠিটা শিল্পীর একটা অস্তুত খেয়ালই
বলতে হবে ! আর আপনার কথাই ঠিক শতদলবাবু। ঐ চিঠিটাই রণধীর
চৌধুরীর উইল !

আমি তো আপনাকে সেই দিনই বলেছিলাম, কিন্তু দিদিমা মানতে
চানন—

ভুল করেছিলেন তিনি।

আমি আর নিজের কৌতুহলকে দমন করতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম
কিরীটীকে, সত্য তুই চিঠিটার মর্মার্থার করতে পেরেছিস কিরীটী ?

হ্যাঁ রে। চিঠিটার প্রত্যেকটি লাইলেন পাশে পাশে যে সাংকেতিক অঙ্ক
বসানো আছে সেইটাই চিঠিটার মর্মার্থারের সংকেত। এই দেখ পড়। বলতে
বলতে চিঠিটা পকেট হতে বের করে কিরীটী আমার হাতে দিয়ে বললে, মোটা-
মুটি চিঠিটায় বলেছে বটে, ‘নিরালা’ বাড়ি ও তার ঘাবতীর সব কিছু আমাদের
শতদলবাবুই পাবেন—তবে তার মধ্যে আরো একটা নির্দেশ আছে, সেটা হচ্ছে
ঐ সাংকেতিক অঙ্কগুলোর মধ্যে। অঙ্ক অনুসারে প্রত্যেক লাইনের সমান-
সংখ্যক কথাগুলো নিলে তার অর্থ এই দাঁড়ায়—

নির্দেশঃ ‘আমার মতুর পর স্ট্রিঙগুলে প্রাপ্তামহের ছবির স্বত্ত্ব
কুমারেশের হইবে ?

কী বলছেন আপনি মিঃ রায় ? শতদল বলে ওঠে।

হ্যাঁ শতদলবাবু। আমার কথা যে মিথ্যা নয় এই চিঠিটাই তার প্রমাণ দেবে
এবং ‘নিরালা’ ও তার ঘাবতীর ঘাবতীর সম্পত্তি আপনি পেলেও, রণধীর
চৌধুরীর প্রাপ্তামহের ছবিটা কুমারেশ সরকারই পাবেন।

কুমারেশ সরকার !

হ্যাঁ, কুমারেশ সরকার। তিনিও আজ এখানে উপস্থিত !

কুমারেশ ! কুমারেশকে তাহলে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ?

নিশ্চয়ই। ঐ যে—

ঠিক সেই সময় ডাঃ চ্যাটজার্সির সঙ্গে সঙ্গে কুমারেশ সরকার হাতে ব্যান্ডেজ
বাঁধা অবস্থায় কেবিনের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

কুমারেশবাবু, let us hear your story ! আপনি কেমন করে হঠাত
উধাৰ হয়ে গিয়েছিলেন, আৱ কোথায়ই বা এতদিন বল্দী হয়ে ছিলেন কেমন
করে ?

বিস্মিত কুমারেশ সরকার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন,

আপনি সে কথা কী করে জানলেন মিঃ রায় ?

অন্ধমান। অন্ধমানের ওপর নিত করেই জেনেছি মিঃ সরকার। এখন তো ব্যবতে পারছেন, অন্ধমান আমার ভুল হয়নি ! Now let us have the story ! কিরীটী বললে—

আশ্চর্য মিঃ রায়, সার্ত্য আগাগোড়া ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে একটা দুর্বোধ্যের ঘটই মনে হয়। মনে হয় সবটাই যেন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একটা দৃঢ়স্বপ্ন। তবু বলছি শূন্য। কুমারেশ সরকার তাঁর কাহিনী শুনু করলেন : আপনি হয়তো জানেন না মিঃ রায়, শিল্পী রণধীর চৌধুরীর আমি দোহিতা হলেও তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল না। আমার মাকে তিনি ত্যাজ্য করেছিলেন। আমরাও অর্থাৎ আমার মা-বাবা বা আমি কোনদিন তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবারই চেষ্টা করিন। সেই দাদুর কাছ হতে তাঁর ঘৃত্যুর মাসখানেক আগে একটা আবোল-ভাবোল লেখা চিরবিচিত্র চিঠি পেলাম। আশ্চর্যই হয়েছিলাম। এবং চিঠিটার মাথাম্বুজ কিছু ব্যবতে পার্নি বলে সে চিঠিটা ড্রঃ যারের মধ্যেই অবহেলায় পড়ে ছিল, তারপর সাত-আট মাস পরে হঠাৎ হরিবলাস দাদুর একখানা চিঠি পেলাম—

হরিবলাসবাবুর চিঠি ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। চিঠিতে তিনি লেখেন, অবিলম্বে কোন বিশেষ অথচ গোপনীয় ব্যাপারের জন্য যেন চিঠি পাওয়া মাত্রই এখনে এসে তাঁর সঙ্গে নিরালায় সাক্ষাৎ করি। অন্যথায় আমার নাকি সম্ভু ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। চিঠিতে এ-ও লেখা ছিল, যাবার আগে তাঁকে যেন আমি পত্র দিয়ে জানাই কবে যাচ্ছি।

হ্যাঁ। তারপর ?

চিঠি পেয়ে আমি এখনে আসব কিনা ভাবছি, এমন সময় রাণুর একখানা চিঠি পাই। সেও আমাকে দার্জিলিং থেকে লিখেছে দ্বি-এক দিনের মধ্যেই তারা এখনে আসছে। তখন চিন্তার করলাম এখনে আসব। মনে মনে যে একটা কৌতুহল হয়নি তাও নয়। যা হোক, এখনে এসে পেঁচুলাম রাত্রের ঝেলে এবং বলাই বাহুল্য, আগে হরিবলাস দাদুকে চিঠিও দিলাম। কুমারেশ থামলেন।

থামলেন কেন ? বলুন—শেষ করুন। কিরীটী তাঁগদ দের।

স্টেশনে নেমে বাইরে আসতেই একজন ঢাঙ্গামত লোক এগিয়ে এসে আমাকে প্রশ্ন করল, আমার নাম কুমারেশ সরকার কিনা এবং আমি কলকাতা হতেই আসছি কিনা। জ্বাবে আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে সে বললে সে ‘নিরালা’র হরিবলাসবাবুর লোক। আমাকে সে নিতে এসেছে। একটা ট্যাক্সি স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিল। তার মধ্যে তার কথামত উঠে বসতেই অন্ধকারে ট্যাক্সির ঘণ্টে থেকেই কে যেন মাথায় আমার অতর্কিংতে আঘাত হানল। সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান ফিরে আসবার পর দোর্খি, ছোট্ট একটা ঘরে আমি বল্দী। পরে জেনেছিলাম সেটা ‘নিরালা’র পিছনে জঙ্গলাকীর্ণ বাগানের মধ্যের আউটহাউস—

একটা কথা মিঃ সরকার, আপনি চেঁচারেচি করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেননি কেন বল্দী অবস্থায় ?

সেও এক বিচিত্র ব্যাপার। ঢাঙ্গা লোকটা আমাকে শাসিয়েছিল, তারা নাকি

চিঠি দিয়ে আমার রস্তাপের রোগী বৃক্ষ অধ্যাপক বাপকেও নাকি আমারই মত এখনে ধরে এনে অন্য একটা ধরে আটকে রেখেছে। আমি যদি চেঁচমেচি করি বা গোলমাল করি তারা আমার বৃক্ষ বাপকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে সম্ভবের জলে ভাসিয়ে দেবে। আর যদি চুপচাপ থাকি তো এক মাস বাদে ছেড়ে দেবে। বাবাকে যে আমি কতখানি ভালবাসি ঐ শয়তানরা জানত বোধ হয়। বাধ্য হয়েই তাই আমাকে কতকটা ঐ বল্দী জীবন মেনে নিতে হয়েছিল। একটিমাত্র জানালা ছিল ঘরের। সেই জানালাপথে সেই ঢাঙ্গ লোকটা প্রত্যহ এসে আমাকে খাবার দিয়ে যেত রাত্রে একবার করে। বৰ্ণী অবস্থায় আমার কেবলই ঘূর্ম পেত।

Is it?

হ্যাঁ, কেবলই ঘূর্ম পেত। উপব্রূত্ত আহার না পেয়ে এদিকে ঝমেই দ্বৰ্বল হয়েও পড়েছিলাম।

আপনি টেরও পান্নি মিঃ সরকার—খাদ্যের সঙ্গে মরফিয়া দিয়ে আপনাকে ঘূর্ম পাড়াত আর উপব্রূত্ত পরিমাণ আহার না দিয়ে ঝমে আপনাকে দ্বৰ্বল করে ফেলেছিল! কিরীটী বললে।

পরে বুরতে পেরেছিলাম সব।

তারপর?

তারপর যে রাতে সীতা মারা যায়—সেই দিন বিকেলের দিকে ঐ উদ্যানের মধ্যে ঘূরতে ঘূরতে সে একসময় ঐ outhouse-এর কাছাকাছি গিয়ে হঠাতে আমাকে দেখতে পায় এবং সীতাই আমাকে উদ্ধার করে এইদিন সন্ধ্যার দিকে। এবং আমাকে সে অবিলম্বে এখান থেকে চলে যেতে বলে। কারণ, তার বাপ ব্যাপারটা জানতে পারলে নাকি আমাকে হত্যা করবে। আমিও তার নির্দেশমত চলে যাই, কিন্তু পথে গিয়ে মনে হয় শতদলকে সব ব্যাপারটা জানানো উচিত। সঙ্গে সঙ্গে নিরালায় ফিরে আসি। সির্পিড় দিয়ে দোতলায় উঠে সামনেই সীতার দেখা পাই। সে তখন ছাদ থেকে নীচে নেমে আসছে। সীতা আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বসবার ধরে টেনে নিয়ে যায়।

সে আমাকে বলে, এ কী! আবার আপনি এখনে এসেছেন কেন? একটা সর্বনাশ না করে আপনি ছাড়বেন না দেখিছি! বাবা নীচে আছেন এখন, যদি তাঁর চোখে পড়ে যান?

শতদলের সঙ্গে একবার আমি দেখা করতে চাই। তুমি একবার যেমন করে হোক শতদলকে এই ঘরে ডেকে নিয়ে এস।

কিন্তু—

না, তার সঙ্গে দেখা না করে আমি যাব না। আমি বললাম সীতাকে। কিন্তু কথা আমার শেষ হল না, ঠিক এমনি সময় দরজার ও-পাশ থেকে একটা গুলির আওয়াজ এল ও সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ট চিংকার করে সীতা মাটিতে পড়ে গেল। আমিও আকস্মিক সেই ব্যাপারে ভয়ে বিহুবল হয়ে পড়েছিলাম। এবং ঐ মৃহুতেই সেখান থেকে পালালাম। পালাই যখন তখন সির্পিড় দিয়ে কে যেন একটি মহিলা ছাদ থেকে নেমে আসছিল। সে বোধ হয় আমাকে দেখে ফেলেছিল—

হ্যাঁ, শরৎ গৃহের মেঝে কবিতা গৃহ। কিরীটী বললে, কিন্তু সে-রাতে ভয়ে আপনি যদি অমন করে হঠাত না পালিয়ে যেতেন তো আজ রাত্রে আপনাকে গুলি খেতে হত না। তবু ভাগ্য বলতে হবে যে, গুলিটা আপনার হাতের

উপর দিয়েই গিয়েছে। শাক, শেষ কর্তৃন আপনার কথা।

নিরালা থেকেও আর্মি পালাইম। কিন্তু এখান থেকে যেতে পারলাম না। কটা দিন আঘাগোপন করে বেড়িয়েছি আর বাপারটা বুরবার চেষ্টা করেছি—কৰ্ণ হল। হঠাৎ সীতাকে কে গুলি করে মারল? এমন সময় হরিবলাস দাদু অ্যারেস্ট হয়েছেন আজ সকালে শূন্তে পেলাম। তখন ঠিক করলাম সীতার মা হিরণ্যরাজীদের সঙ্গে দেখা করব। এবং তাঁকে সব ব্যাপারটা খুলে বলব। কিন্তু সদর গেট দিয়ে নিরালা চুক্তে সাহস হল না, সদরে প্রদলিস মোতায়েন দেখে। একটা বাঁশ ঘোগাড় করে পোলভল্টের সাহায্যে প্রাচীর টপকে নিরালার পিছনের বাগানে প্রবেশ করলাম। তারপর এগুচ্ছ—

এই সময় কিরীটী বাধা দিল, দেখলেন ভুখনা ও কালো কাপড়ে সর্বশে আব্রত ছায়ামূর্তিকে বাগানের মধ্যে—তাই না?

হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে ছিল সোকটাকে পিছন থেকে গিয়ে জাপটে ধরব, কিন্তু তার আগেই সে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে—

গুলি করে! কিন্তু he missed the chance! এবং হত্যাকারী জানতে না যে তার আগেই বাগানে প্রবেশ করে একটা ঘোপের মধ্যে অন্তিম রে আর্মি আর সুরক্ষিত আঘাগোপন করে আছি!

ঘোষাল-সাহেব এই সময় এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ব্যাপার কি কিরীটীবাবু! এত জরুরী তলব কেন? ঘোষাল প্রশ্ন করেন।

এই যে আস্ত ঘোষাল সাহেব। আপনার নিরালা ও সীতা-হত্যা রহস্যের মীমাংসা হয়েছে। কিরীটী আহবান জানাল ঘোষালকে।

সত্তা!

হ্যাঁ।

কিন্তু ইনি—ইনি কে?

বিখ্যাত চেপার্টসম্যান আমাদের কুমারেশ সরকার।

নমস্কার। তা উনি—

ঘটনাটে উনিই তো যত অনর্থের মূল! কিরীটী জবাব দেয়।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়? প্রশ্নটা করল শতদল।

হ্যাঁ। বর্তমান রহস্যের উনিই নিউক্লিয়স! শুকে কেন্দ্র করেই সব কিছু ঘটেছে!

তার মানে?

তার মানেটা আপনার চাইতেও কারো বেশী জানবার কথা নয় শতদল-বাবু। গম্ভীর কিরীটীর কঠস্বর।

আর্মি!

হ্যাঁ আপনি। চমৎকার খেলা খেলেছেন শতদলবাবু, কিন্তু বড়ের চালে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন—তাতেই কিন্তু মাত হয়ে গিয়েছেন!

আপনি—

শতদলবাবু, আর্মি কিরীটী রায়।

মিঃ রায়! ঘোষাল সাহেব সপ্রশ্ন দ্রষ্টিতে তাকান কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ মিঃ ঘোষাল, উনি—আমাদের শতদল বোসই এই নাটকের প্রধান চারিত্ব।

সকল রহস্যের মেঘনাদ। সীতা দেবীর হত্যাকারী।

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল।

‘নিরালা’তেই আগরা সকলে উপস্থিত ছিলাম—আমি, হিরণ্যায়ী দেবী, হর্বিলাস, কুমারেশ, রাণু, কৰিতা গৃহ ও ঘোষাল। এবং ঘোষাল সাহেবের অনুরোধেই কিরীটী নিরালা ও সীতার হত্যা-রহস্য সর্বিস্তারে বর্ণনা করল পরের দিন।

খেয়ালী শিল্পী রণধীর চৌধুরীর নিজের কন্যা বনলতা অধ্যাপক শ্যামাচরণ সরকারকে তাঁর অমতে ভালবেসে অসবর্ণ বিবাহ করায় ত্যাগ করলেও কন্যাকে তিনি কোন দিনই ভুলতে পারেননি এবং যদিও কন্যার জীবিতকালে কন্যা বনলতার কোন দিন মৃত্যুদর্শন করেননি, কন্যার মৃত্যুর পর ও নিজের মৃত্যুর প্রভে বোধ হয় পিতার মনে অনুশোচনা এসেছিল। ফলে তাঁর সাতিকারের যে সম্পদ ছিল, কতকগুলো বহু মূল্যবান জুয়েল, সেগুলো তাঁরই হাতে অংকিত প্রাপ্তিমহের অয়েল-পেণ্টিংটার ফ্রেমের মধ্যে কৌশলে ভরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেগুলো তাঁর মতো কন্যার একমাত্র পুরু কুমারেশবাবুকে কেই দিয়ে যান উইল করে। অবশ্য শিল্পীর খেয়ালী মন তাঁর, তাই উইলটাকে একটা বিচিত্র চিঠির মত করে রেখে গিয়েছিলেন এবং তার একটি কংপ নিরালার সিল্ডুকে রেখে অন্য একটি কাপ ডাকে কুমারেশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে অবশ্য একটা কথা উঠতে পারে, জুয়েলগুলো কুমারেশবাবুকেই যদি তাঁর দেবার ইচ্ছে ছিল—খোলাখুলিভাবেই তো একটা চিঠিতে সেকথা কুমারেশবাবুকে জানিয়ে যেতে পারতেন বা দিয়ে যেতে পারতেন। তবু যে কেন তা না করে অমন একটা কৌতুক করে রেখে গিয়েছিলেন তা তিনিই জানতেন। তবে মনে হয়, এও তাঁর খেয়ালী মনের একটা বিচিত্র খেয়াল ভিন্ন কিছু নয়। যা হোক, রণধীর চৌধুরীর মৃত্যুর পর শতদলবাবু এখানে ‘নিরালা’য় এসে ঐ চিঠির সরল মানে অনুযায়ীই সমস্ত সম্পত্তি নিজের হাতে নেন। চিঠিটার অপ্রকাশ্য সাংকেতিক অর্থটা তিনি প্রথমে ধরতে পারেননি। তারপর হিরণ্যায়ী দেবীর সঙ্গে যখন সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়, তখন হয়তো হিরণ্যায়ী দেবীকে শতদল ঐ চিঠিটা দেখায়। তৌক্ষ্য বৃদ্ধিমতী হিরণ্যায়ী দেবী চিঠিটা পড়ে মনে মনে সন্দেহযুক্ত হয়ে ওঠেন। এবং খুব সম্ভবত ঐ চিঠিটার কথা ভাবতে ভাবতে কোন এক মুহূর্তে চিঠির সাংকেতিক রহস্যটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এবং তিনি কোন সময়ে হয়তো শতদলকে কিছু বলেন। এই গেল প্রথম পর্ব বা অধ্যায়। এবারে আসব আমি রহস্যের প্রতীয়া অধ্যায়ে। শতদল যে মুহূর্তে জানতে পারলে চিঠির আসল রহস্য, মনে মনে তার প্ল্যান ঠিক করে নিল। হর্বিলাসের নামে বেনাম চিঠি দিয়ে ভুখনার সাহায্যে প্রথমেই কুমারেশবাবুকে এনে ‘নিরালা’র বাগানের মধ্যে secluded outhouse-এ বন্দী করে ধীরে ধীরে মরফিয়ার addict করে তুলতে লাগল ও সেই সঙ্গে অপর্যাপ্ত আহার দিয়ে দুর্বল করে ফেলতে লাগল। তার ইচ্ছা ছিল হয়তো চট করে কুমারেশকে হত্যা না করে ধীরে ধীরে তাকে morphia-র নেশা ধরিয়ে cripple করে ফেলবে এবং পরে হয়তো প্রয়োজনমত স্বয়েগ বুঝে একেবারে শেষ করে ফেলতেও কষ্ট পেতে হবে না। প্রতীয়া

অধ্যায়ে এই তার প্রথম খেলা। নিবৃত্তীয় খেলা শুরু হল হরবিলাস ও হিরণ্যায়ী দেবীর উপরে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে তাঁদেরও নিজের পথ থেকে সরাবো। ঘটনাচক্রে এই সময় আমি ও সুরত এখানে এলাম এবং এখানকার স্থানীয় সংবাদপত্রে আমার এখানে আগমনের সংবাদ পেয়ে আমাকেও এই ঘটনার মধ্যে ঢেনে এনে নিজেকে আরও safe করবার অভিলব করলে। আমার সঙ্গে চাকুর পরিচয় না থাকলেও সংবাদপত্রের মারফৎ আমার চেহারা ও আমার পরিচয় শতদলের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। এবং এখানে এসে যে হোটেলে উঠেছি সেও শতদলের পূর্বাহ্নেই জানা ছিল। একটা নাটকীয় কৌতুকের মধ্যে দিয়ে নিজে যেন আচমকা কোন অদ্ভ্য আততায়ীর হাতে পিস্তলের গুলিতে আহত হয়েছে এই রকম pose নিয়ে শতদল আমার সামনে এসে আবির্ভূত হয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের পরিচয় ঘটাল। প্রথমটায় frankly বলতে গেলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে যখন তালিয়ে ভাবি, তখনই সর্বপ্রথম আমার মনে সন্দেহ জাগে। শতদলের life-এর উপরে তিন-চারবার attempt হয়েছে—একবার হোটেলের সামনে গুলি করে, একবার নিরালার পথে পাথর গড়াবার গল্প বলে, একবার শরনঘরে ছাঁবির তার কেটে, একবার নিজের ঘরে রিভলবার ছুঁড়ে আলোর চিমনি ভেঙে—সে আমার কাছে প্রশংসন করতে চেয়েছে ব্যাপারটা। প্রতিবারই ব্যাপারগুলো আমি প্রথমে genuine ভেবেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ব্যক্তি মনের মধ্যে আমার সবদাই খচ-খচ করে অদ্ভ্য কাঁটার মত বিধৃণেছে—why at all somebody should be after his life? কেন কেউ তাকে হত্যা করতে চাইবে? কী মোটিভ—কী উদ্দেশ্য, এবং এই সঙ্গে আরো একটা ব্যক্তি মনের মধ্যে এসে আমার উদয় হয়েছে—হত্যার attemptগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাঁক আছে। একটা বা দুটো attempt ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু বার বার চার বার কেন attempt বিফল হবে? শেষবারের attempt-এর পর যে মুহূর্তে গ্রি ধরনের অসামঞ্জস্যটা আমার মনকে আকর্ষণ করল, সেই মুহূর্ত হতেই মন আমার সজাগ হয়ে উঠেছে। কঠিন বিশ্লেষণে ঘৃষ্ণি ও নিরঙুশ বিচারে ঘটনাগুলোকে চিন্তা করতে শুরু করলাম এবং চিন্তা করতে গিয়ে একই জায়গায় এসে বারবার শুরু করলাম এবং চিন্তা করতে গিয়ে একই জায়গায় এসে বার বার থেমে যেতে হল আমাকে। ব্যাপারটা ব্যুক্তিহীন। এলোমেলো। তারপরই তৃতীয় অধ্যায়ে আর্মি আসব : শতদল ও সীতার ব্যাপারে। সীতা ভালবেসেছিল সমস্ত প্রাণ দিয়ে শতদলকে কিন্তু শতদল চাইছিল রাণকে। রাণু ভালবাসে আবার শতদলকে নয়, কুমারেশকে। অর্থ অনর্থ তো ছিলই সঙ্গে এসে যোগ দিল প্রেমের ব্যাপার। একটা জটিল পরিস্থিতির হল উচ্চব। শতদল চায় রাণকে, রাণ চায় কুমারেশকে, সীতা চায় শতদলকে। আবার শতদল চায় কুমারেশের ন্যায্য পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে। কুমারেশই হল এক শতদলের পথের কাঁটা দুই দিক দিয়ে। একা রায়ে রক্ষা নেই তাতে সুগ্রীব দোসর! আকাঙ্ক্ষিতা নারী ও আকাঙ্ক্ষিত অর্থ। অতএব কুমারেশকে সরাতে পারলেই দুর্দিক পরিষ্কার শতদলের। কাজেই কুমারেশের উপরেই পড়ল শতদলের বত আক্রোশ। শতদল আটবাট বেঁধে আসবে অবতীর্ণ হল। শতদলের বৃল্পির প্রশংসাই করতাম যদি না বড়ের চালে দুটো মারাত্মক ভুল করে নিজে মাত হয়ে না যেত শেষ পর্যন্ত! এক নম্বর ভুল সে করলে, কুমারেশকে হত্যা না করে এনে বল্দী

করে রেখে—কারণ তাতে করে সীতাকে হত্যা করতে হত না। সীতা কুমারেশের কথা জনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই তাই হতভাগিনীকে সরাতে হল ইহজগৎ হতে। আর সেইটেই হল শতদলের দ্বিতীয় মারাষ্টক ভুল—অর্থাৎ সীতাকে হত্যা করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা হয়ে গেল। আমি বুঝলাম সকল রহস্যের মেঘনাদ কে! সীতাকে হত্যা করবার প্র্ব-মৃহৃত্তে নিজের লাল রঙের শালটা সীতার গায়ে দিয়ে ব্যাপারটা শতদল এমন করে সাজাতে চেয়েছিল, যাতে করে লোকের ধারণা হয় আসলে হত্যাকারী শতদলকেই হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু আলোয়ানের ব্যাপারে ভুল করে সীতাকে হত্যা করে ফেলেছে! সীতার হত্যা একটা pure accident ভিত্তি কিছুই নয়! বলতে বলতে কিরীটী থামল।

হাতের পাইপটা কখন একসময় নিবে গিয়েছিল। সেটায় আবার আঘি-সংযোগ করে কিরীটী তার অসমাপ্ত কাহিনী শুরু করলে।

এবারে আমি আসব চতুর্থ অধ্যায়ে। রাণু দেবীর সহাধ্যায়ী কর্বিতা দেবী, রাণুদের কলকাতার বাসাতেই শতদলের সঙ্গে কর্বিতা দেবীর পরিচয় হয়। এবং কর্বিতা দেবীর মনে সেই পরিচয়টা গাঢ় হয়ে উঠে ভালবাসায় পরিণত হয়। প্রথম victim সীতা ও দ্বিতীয় victim হলেন কর্বিতা দেবী।

কর্বিতা দেবীর দিকে তাকালাম। মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে তাঁর।

কিরীটী বলে চলে, টের পেলাম আঘি ব্যাপারটা একটি প্রবাল পাথর থেকে।

হিরণ্যায়ী দেবী এবার কথা বললেন, সেদিন আপনাকে আমি বলিনি মিঃ রায়, একই ধরনের প্রবাল পাথর দেওয়া দুটি আংটি ছিল বাবার! একটি দাদা নিয়েছিল, অন্যটি আঘি নিয়েছিলাম। আমার আংটিটা আমার স্বামীকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম—আর দ্বিতীয়টি রণধীর চৌধুরীর মৃত্যুর পর শতদলের হাতে থায়। পরে আমার মনে পড়ে, শতদলের হাতে প্রথম দিন আংটিটা দেখেছিলাম। এবং সেইটেই বোধ হয় শতদল কর্বিতা দেবীকে দেয়। কেমন তাই না কর্বিতা দেবী?

কর্বিতা গৃহ মদ্ভাবে ঘাড় নাড়লেন।

এবং সেই জন্যই পাথরটা কর্বিতা দেবীর বাইরের ঘরে কুড়িয়ে পাওয়ায় ও পরে কর্বিতা দেবীর আংটির পাথরটা হারানোর সংবাদে কর্বিতা দেবী যখন আংটিটা এনে আমাকে দেখালেন, চাকতে আমার সব কথা মনে পড়ে গেল। ও সেই সঙ্গে কর্বিতা দেবী ও শতদলের relationটা চোখের উপরে আমার স্পষ্ট হয়ে উঠল। বুঝলাম কর্বিতা দেবীও শতদলের ফাঁদে পা দিয়ে মজেছেন। ডন জ্বরান শতদল! ধাক, আবার প্র্বের কথায় ফিরে থাই। সীতাকে হত্যা করবার পরই আমি সাবধান হলাম। শতদলকে আর free রাখতে সাহস হল না। নাসিৎ হোমে নিয়ে চোখে চোখে রাখলাম—so that he might not play any more dirty tricks। কিন্তু এবারে কর্বিতা দেবী হলেন তার সহায়। নাসিৎ হোমের ব্যাপারগুলো সব কর্বিতা দেবীর সাহায্যেই ঘটে। কর্বিতা দেবীর বাড়তে সন্দেশ ও ফুল নাসিৎ হোমে পাঠাবার জন্য কেউ সংবাদ দেয়ান তাঁকে। A made-up story কর্বিতা দেবীর! শতদলের পরামর্শমতই কর্বিতা দেবী যা করবার করেছেন। এদিকে শতদল নাসিৎ হোমে বন্দী থাকতে থাকতে অঙ্গীর হয়ে উঠেছিল, কারণ কুমারেশ একবার যখন ছাড়া পেয়েছে সমস্ত

planটাই তার বানচাল হয়ে যেতে পারে যে-কোন ম্হৃত্তে। সে ভয়ও ছিল, তাই ভুখনার সাহায্যে ফটো চৰি করে রাতারাতি এখান হতে সরে পড়াবার ঘতলব ছিল! নার্স-ই হোমের জানালাপথে ধূতি ঝুলিয়ে তার সাহায্যে নেমে গিয়ে নিরালায় থায়। নার্স দুধ নিয়ে যখন তার কেবিনে থায় শতদল আলো নির্বিয়ে তখন ঘুমের ভান করেছে। এবং নার্স চলে থাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেবিন তাগ করে। কিন্তু ধর্মের কল নড়ে উঠল বাতাসে—ভাগ্যচক্রে সব গেল ভেস্টে, বাধ্য হয়েই তাকে তাই ছবিটা ফেলে কেবিনে ফিরে আসতে হল। এবং আবার করতে হল অভিনয়—তার উপরে আর-একবার attempt হয়েছে। কিন্তু তখন বস্ত দোর হয়ে গিয়েছে। রঙের খেলার আগেই ড্রপ পড়েছে!

ঘোষাল সাহেব প্রশ্ন করলেন, কিন্তু শতদলবাবুই যে সব কিছুর মণ্ডে জানলেন কী করে যিঃ রায় সর্বপ্রথম?

বললাম তো। সীতা নিহত হবার পরই। তার আগে পর্বতও সম্মেহটা দৃঢ় হতে পারেন। ভাসা-ভাসা অবস্থাতেই মনের মধ্যে ছিল। সে রাতে সর্বস্কশ্মই আমার দৃজনের ওপরে নজর ছিল, একজন সীতা ও অন্যজন শতদল। সীতা ছাদ থেকে নেমে যাওয়ার পরই কিছুক্ষণ বাদে শতদলকে আঁঘি নীচে যেতে দেখেছি এবং ঠিক তার পশ্চাতেই দেখেছিলাম নীচে যেতে কৰিতা দেবীকে। কৰিতা দেবীর চিংকারেই আমাদের সকলের দৃঢ়ত আকর্ষিত হয়, সীতার হতার ব্যাপারটা কৰিতা দেবী সবটা না জানলেও যে অনেক কিছুই জানেন, সেটা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই সে রাতে ব্যৱেছিলাম। তখনি মনে হয় কৰিতা দেবী কাউকে shield করছেন deliberately! কিন্তু কাকে? হঠাতে চাকিতে একটা কথা ঐ সঙ্গে মনে হয়, কৰিতা দেবী শতদলকেই shield করছেন না তো! ভাবতে গিয়ে দেখলাম সেটাই সম্ভব। সেটাই স্বাভাবিক। আর তখন সম্মেহ রইল না। ব্যৱলাম এ খেলা শতদলেরই। ইঁতমধ্যে রঞ্জীরের চিংচির কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই শতদলকে দোষী ব্যৱতে পেরেও, strong একটা motive খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কৰিতা দেবীর বাড়ি থেকে ফিরবার পথে আংটির পাথর-রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটা আর একবার গোড়া থেকে নতুন করে ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল চিংচির কথা। হোটেলে ফিরেই চিংচির নিয়ে বসলাম। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই সব স্পষ্ট হয়ে গেল, দূরে দূরে চার অংক মিলে গেল। তখনি ব্যৱলাম, গত রাতে ছবিটা চৰি করবার চেষ্টা করে যখন হত্যাকারী সফল হয়নি, আর একবার সে সম্ভবত ঐ রাতেই attempt নেবে। সঙ্গে সঙ্গে ‘নিরালা’য় গিয়ে হানা দিলাম এবং অনুমান যে আমার মিথ্যা হয়নি তার প্রমাণও পাওয়া গেল হাতে হাতে। কিরীটী তার কথা শেষ করল।

দিন-দুই বাদে ফিরবার পথে ট্রেনের কামরায় কিরীটী বলছিল, হিরণ্যায়ী দেবীর কথাই ঘূরে-ফিরে মনে পড়ছে সুব্রত। একমাত্র মেয়ে সীতার ম্তুটা সত্যিই বড় মর্মান্তিক হয়েছে তাঁর কাছে, ঘুণাক্ষরেও তিনি সম্মেহ করেননি কখনো যে সীতা শতদলকে ভালবাসে। এবং সেটাই যখন প্রকাশ পেল, তাঁর মুখের দিকে তখন যদি তৃৰ্য তাকাতে দেখতে কি সর্বস্ব হারানোর বেদনাই না তাঁর মুখের ওপরে ফুটে উঠেছিল। একেই বলে মর্মান্তিক বিয়োগান্ত ব্যাপার। যে সম্পত্তির লোভে তিনি ‘নিরালা’ অঁকড়ে পড়েছিলেন সে সম্পত্তি ও তাঁর ইস্তগত হল না, ঐ সঙ্গে হারাতে হল মর্মান্তিক দৃঃখ ও লজ্জার মধ্যে

ଦିଯ়ে একমাত্র কন্যাকেও। ଶତଦଳ୍ପା ଶନ୍ତ ହାତେ ଚନ୍ଦ ଦଶ୍ଟର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା
କରଛେ, ହିରଣ୍ୟାରୀକେଓ ଫିରେ ସେତେ ହଲ ଶନ୍ତ ହାତେ। ସୀତାକେ ଶନ୍ତ ହାତେ
ବିଦାୟ ନିତେ ହଲ, କରିବତା ଫିରେ ଗେଲ ଶନ୍ତ ହାତେ। ରଙ୍ଗଧୀର ଚାଁଧିରୀର ଏତ
ସାଥେର 'ନିରାଳା'—ତାଓ ପଡ଼େ ରଇଲ ଶନ୍ତା, କୁମାରେଶ ବା ରାଗ୍ନ କୋନାଦିନଇ ହସତୋ
ଓଥାନେ ପା ଦେବେ ନା। ହିରଣ୍ୟାରୀ ଓ ହରାବିଲାସ ତୋ ଦେବେନଇ ନା।

କଥା ଶେଷ କରେ କିରାଟୀ ପାଇପଟା ଘୁମ୍ବୁ ତୁଲେ ନିଲ ।

ଟ୍ରେନ ଛଟେ ଚଲେଛେ କଲକାତା ଅଭିଭୂତେ ।

বৌরাণীর বিল

www.boirboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

প্রথম আয়াটের নববর্ষ।

কলকাতা শহরে বৰ্ষাটা এবাবে বেশ দোরি করেই নেমেছে। তাপদণ্ড ধৰিয়াই যেন জলস্নান করে জুড়িয়ে গিয়েছে। মেঘলা ভিজে আকাশে সম্ম্যার তরল অশ্বকার যেন ঘন হয়ে চাপ বেঁধে উঠেছে। ঘরের মধ্যে কিৰীটী আৰ সতজিং ঘৰখোমুখি দৃঢ়জনে দৃঢ়টো সোফাৰ ওপৱে বসে। সতজিং তাৰ বস্ত্ৰ শেষ কৱে এনেছে তখন; দীৰ্ঘ উনিশ বছৱেৰ ব্যবধানে দৃঢ়টো হত্যা। প্ৰথমটি স্থাৰ্মী, উনিশ বৎসৱ পৱে তাৰ স্বামী। এবং দৃঢ়ট হত্যারই অকুশ্মান বৌৱাণীৰ বিলেৰ মধ্যে সেই স্বীপ। স্বীপটিৰ মধ্যে আছে একটি বিৱাব কুটিৱ—তাৰ চাৰপাশে ফুলেৱ বাগান। স্বীপটিকে ওখানকাৱ লোকেৱা 'নলন কানল' বলে।

আৱো আশচৰ্য্য কি জানেন মিঃ রায়! নলন কানলেৰ মধ্যে একটি শাখা-প্ৰশাখা বকুল বৃক্ষ আছে, সেই বকুল বৃক্ষেৰ তলাতেই দৃঢ়ট মৃতদেহ পাওয়া যাব।

কিৰীটী মৃদু স্বৱে বলে, Queer coincidence!

তাই। জবাব দেয় সতজিং।

কিৰীটী ঘৰেৰ মধ্যে জয়াট বেঁধে ওঠা আৰছা আলো-আৰাবেৰ দিকে তাৰিকে আৱ একবাৱ সতজিংতেৰ বৰ্ণত কাহিনীটা প্ৰথম থেকে ভাবতে শুনুৰ কৰে।

মৃতুঞ্জয় চৌধুৱী আৱ ইহজগতে নেই। তিনি নিহত।

পিতা মৃতুঞ্জয় চৌধুৱীৰ নিহত হওয়াৰ সংবাদটা কল্যা সৰিবতাকে যেন একেবাৱে কয়েক মৃহৃত্তেৰ জন্য অসাড় ও পঙ্গু কৱে দিল। ক্ষণপৰ্বতে পাওয়া তাৱার্তাটা হাতেৰ মুঠোৱে মধ্যে ধৰে হস্টেলেৰ কমনৱুমেৰ বারান্দায় অসহায় স্থাপন মত দাঁড়িয়ে থাকে সৰিবতা।

আজই মাত্ৰ কলেজেৰ প্ৰীগ্ৰেমেৰ ছুটিৰ বন্ধ হলো।

কাল রাত্ৰে ষ্টেনে সৰিবতা বাঁড়ি ঘাৰে, দুপূৰে সে বাবাকে একটা তাৱও কৰে দিয়েছে তাৰ যান্ত্ৰাৰ সংবাদ দিয়ে। কয়েকটা আৰশাকীয়া জিনিসপত্ৰ কিনিবাৰ জন্য মাকেটে গিয়েছিল সৰিবতা, হস্টেলে ফিরে আসতেই হস্টেলেৰ দারোয়ান তাৱটা তাৰ হাতে দিল। একট আশচৰ্য্যই হয়ে গিয়েছিল সৰিবতা হঠাৎ এসময় একটি তাৰ পেৱে। হঠাৎ তাৰ এলো কেন? ভয়ে ও সংশয়ে তাৱটা খুলো পড়তেই মৃহৃত্তে যেন সৰিবতা একটা বৈদ্যুতিক তৱশ্গাঘাতে একেবাৱে অসাড় হয়ে গিয়েছে।

তাৱটা কৱেছেন নায়েব কাকা বসন্ত সেন। মৰ্মঘাতী তাৱ।

Baboomahashaya Killed! Come Sharp!

Naeb-Kaka—Basanta

নায়েব কাকা যে ওকে তাৱ কৱেছেন ওৱ তাৱটা যাওয়াৰ আগেই, তাৱ প্ৰেৱণেৰ সময়টা দেখেই সৰিবতা সেটা বুৰতে পাৱে।

বিষ্ণু হতচকিত ভাৱটা কতকটা সামলে নিৱে সৰিবতা তাৱ হাতঘাঁড়িটাৱ

দিকে তাকাল ; সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা তখন সবেমাত্র। ইচ্ছা করলে এবং কিছু-ক্ষণের মধ্যে রওনা হতে পারলেই তো অনায়াসেই সে আজকের রাত্রের ট্রেনটাই ধরতে পারে। ট্রেন তো সেই রাত সাড়ে নটায়। এখনো পুরো দুটো ঘণ্টা সময় ওর হাতে আছে। হ্যাঁ, যেমন করেই হোক আজকের রাত্রের ট্রেনটাই ওকে ধরতে হবে। সর্বিতা সহসা যেন জোর করেই মনের ও দেহের অসহায়, বিচ্ছু পঙ্গু অবস্থাটাকে ঝেড়ে ফেলে, আর শব্দহৃত মাঝ দৈরি না করে বারান্দাটা পার হয়ে সোজা দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। এবং সিঁড়ি অতিক্রম করে সোজা একেবারে এসে দোতলার বারান্দার শেষপ্রান্তে ইলেক্ট্র স্ট্রাপারিন্টেনডেণ্ট মিসেস্ ব্যানার্জীর ভেজানো স্বারের সামনে এসে দরজার গায়ে মৃদু আঘাত করল।

মিসেস্ ব্যানার্জী ঘরের মধ্যেই ছিলেন, মৃদুকণ্ঠে আহবান জানালেন, কে, ভিতরে এসো।

সর্বিতা দরজা ঠেলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল।

সর্বিতার চোখমধ্যের দিকে তার্কিয়ে মিসেস্ ব্যানার্জী যেন বেশ একটু বিচ্ছিন্ন হন, ব্যাপার কি সর্বিতা ! কি হয়েছে ? অসুখ করেনি তো ?

নিঃশব্দে কোন কথা না বলে সর্বিতা ক্ষণপূর্বে পাওয়া তারটা মিসেস্ ব্যানার্জীর দিকে এগিয়ে দিল।

বিচ্ছিন্ন মিসেস্ ব্যানার্জী রুম্ব নিঃশ্বাসে তারটা পড়ে সর্বিতার মধ্যের দিকে তাকালেন, কখন পেলে এ তার ?

এই কিছুক্ষণ আগে দারোয়ান দিল—

হ্যাঁ !

আগিয়ে আজকের রাত্রের গাড়িতেই যেতে চাই মিসেস্ ব্যানার্জী !

আজ রাত্রের গাড়িতেই যাবে, ক'টা গাড়ি জান কিছু ?

হ্যাঁ, জানি।

বেশ, পার তো যাও।

সর্বিতা আর স্বৰূপ না করে স্ট্রাপারিন্টেনডেণ্টের ঘর হতে নিষ্কান্ত হয়ে গেল।

কোনমতে একটা স্ট্রাইকেসের মধ্যে কিছু জামা-কাপড় নিয়ে একটা ট্যারি ডার্কিয়ে সর্বিতা ট্যারি-ড্রাইভারকে বললে, শিয়ালদহ স্টেশন !

একটা সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটে সর্বিতা খুন ট্রেনের একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরায় এসে উঠে বসল, গাড়ি ছাড়তে তখন আর মাঝ মিনিট সাতেক বাকি।

গাড়িতে সে ছাড়াও আরো চারজন থাট্টী ছিল।

একটা বার্থ খালি।

একটু পরে সে বার্থটাও একজন অল্পবয়সী ধূক গাড়ি ছাড়বার ঠিক মিনিট চারেক আগে এসে অধিকার করল।

গাড়ি ছাড়ল।

একটা গুমোট গরমে এতক্ষণ কামরাটা যেন ঝলসে ঘাঁচল, গাড়ি ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে চলমান গাড়ির খোলা জানালা-পথে একটা তৃপ্তির পরশ দিয়ে গেল।

স্টেশন ইয়ার্ডের আলোগুলো ঝঁঝে একটা দুটো করে গাড়ির ক্ষমবর্ধমান

গতির সঙ্গে পিছয়ে পড়ছে।

হারিয়ে যাচ্ছে আলোগুলো পশ্চাতের অন্ধকারে একটি দৃষ্টি করে।

জ্যৈষ্ঠের একেবারে গোড়ার দিক। এবারে একদিনের জন্যও কালৈশেখাৰ্হী
এখনও দেখা দেয়নি কে জানে কেন!

সেই সম্ম্য থেকেই আকাশে মেঘ করে আছে, একটা থমথমে ভাব।

সৰিতা গাড়ির খোলা জানলা-পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে
এককণ যেন শ্বাস নেবার অবকাশ পায়।

ভাল করে একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করে সমগ্র ব্যাপারটা আগাগোড়া।

ম্ভূজয় চৌধুরী—তার বাবা। এই প্ৰথৰ্বীতে তার একমাত্ৰ আশ্রয়স্থল
আৱ ইহজগতে নেই।

বাড়ি গিৱে পেঁচৰাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেউঁড়ি পাৱ হয়েই কাছারী-বাড়িৰ
দালানে তাৰ সেই সৌম্য প্ৰশান্ত চেহৰাটা আৱ চোখে পড়বে না।

সন্দেহ মধুৱ সেই হাসি দিয়ে কেউ আৱ অভ্যৰ্থনা জানাবে না, পথে কোন
কষ্ট হয়নি তো মা! গাড়ি ঠিক সময়ে স্টেশনে পেঁচৰেছিল?

প্ৰত্যেকবাৰ ছুটিতে বাবাৰ পৱ প্ৰথম দৰ্শনে কেউ আৱ বলবে না, তুই
হাতমদৰ্থ ধৰে চা খা, আৰু এখনি আসছি সবু।

ও আৱ কাউকে প্ৰত্যন্তৱে আল্দাৱ-ভৱা কণ্ঠে বলবে না, দৰিৱ কৱো না
বাবা, এখনি এসো কিন্তু। তুমি এলে তবে দৰ্জনে একসঙ্গে বসে চা খাবো।
অনেক কথা আছে তোমাৰ সঙ্গে কিন্তু—

না রে না। আসছি, তুই যা—

এগিয়ে যেতে পিছন থেকে আৱ ও শুনতে পাবে না বাবাৰ গলা, বসন্ত,
আজ আমাকে ছুটিং দাও। নকাইচকাই এসেছে, আজ ওৱ অনাবে আমাৰ ছুটি।

ওকে আদৱ করে বাবা নকাইচকাই বলে ডাকেন।

নকাইচকাই ওৱ আদৱেৰ ডাক।

ওৱ চাৱ বছৰ বয়সে মা মাৱা গিয়েছেন। বাবাৰ কাছেই ও মানুষ। মাকে
ওৱ কিছুই মনে নেই।

বাবাৰ শোবাৰ ঘৰে শিয়াৱেৰ ধাৱে মায়েৰ এনলার্জড় ফটোটাৰ দিকে কত-
বাৱ ও অনেকক্ষণ ধাৱে তাকিয়ে থেকেছে, কিন্তু কিছুই মনে কৱতে পাৱোন।
মা! মায়েৰ স্মৃতিটা এমন অস্পষ্ট!

মা-বাপ বলতে ঈ একজনকেই চিৱদিন জেনে এসেছে।

কি শান্ত চিৱতেৰ মানুষ ওৱ বাবা! লোকে বলত অজাতশত্ৰু।

অত্যন্ত কড়া প্ৰকৃতিৰ জৰিদাৱ হলেও কাউকে একটা চড়া বা উঁচু কথা
বলেননি। উদাহৰ শিশুৰ মত প্ৰকৃতি তাৱ বাপেৰ। কে শত্ৰুতা কৱে হত্যা
কৱলে, নায়েৰ কাকা বসন্তবাৰু তাৱ বিশেষ কিছুই জানানন, কেবল টেলিগ্ৰামে
লিখেছেন:

Baboo Mahashaya killed! Come sharp!

Killed! নিহত!

কে-ই বা তাঁকে হত্যা কৱলে এবং কেনই বা তাঁকে হত্যা কৱলে!

ব্যাপারটা আগাগোড়া কিছুই যেন এখনো সৰিতা বুঝে উঠতে পাৱছে না।

মেল টেন।

এখন বেশ জোরেই চলেছে। লোহার চাকার একমেয়ে ঘটাং ঘটাং শব্দটা প্রবণকে পীড়িত করে তোলে।

আকাশে ইতিমধ্যে একসময় কখন মেঘটা বেশ চাপ বেঁধে ঘন হয়ে উঠেছে।

হঠাতে করেকটা বড় বড় বৃষ্টির ফোটা ওর চোখেমুখে এসে পড়তেই ওর চমক ভাঙল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের সোনালী আলোয় মেঘাবৃত আকাশটা যেন বলকিয়ে উঠেছে।

সুবিতা ঘুরে বসে গাড়ির কামরার মধ্যে দ্রুতিপাত করল।

উপরের দুটো বার্থ ও নিচের দুটো বার্থ অধিকার করে ইতিমধ্যে কখন একসময় চারজন যাত্রী নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে।

দ্বিজন তারা এখনো কেবল জেগে।

সে ও সর্বশেষের আগভুক যাত্রী সেই তরুণ যুবকটি। যুবকটির সঙ্গে কেবলমাত্র একটি মাঝারি আকারের চামড়ার স্টকেস ও হোল্ডলে বাঁধা একটি বেঁড়ি।

বেঁড়িটা এখনো সে খোলেনি। তাই গায়ে হেলান দিয়ে স্টকেসটার উপরে জুতোসমেত পা দুটো তুলে দিয়ে কামরার আলোয় গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি একটা মোটা ইংরাজী বই পড়ছে।

সুবিতা কতকটা অন্যমনস্কভাবেই তার ঠিক সামনেয় মধ্যকার বাথে উপরিষ্ঠ, পাঠ্রত একমাত্র জাগ্রত তরুণ সহ্যাদ্রীটির দিকে তাকাল।

বছর সাতাশ-আটাশ হয়ত বয়স হবে ওর।

দোহারা লম্বা গড়ন।

চোখেমুখে অর্থাৎ মূখের গঠনে একটা অভ্যন্তর তীক্ষ্ণতা যেন ফুটে বের হয়।

তেলহীন রুক্ষ লম্বা চুলগুলো কামরার মধ্যস্থিত ফ্যানের হাওয়ায় কপালের উপর এসে থেকে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বাঁ গালের উপরে একটা দীর্ঘ গভীর ক্ষতিচ্ছ।

হঠাতে ভদ্রলোকের বাথের উপরে রাঙ্কিত চামড়ার স্টকেসটার উপরে নজর পড়ল সুবিতার।

সত্যজিৎ রায়, রেঙ্গুন।

বাংলায় লেখা সত্যজিৎ রায়, রেঙ্গুন।

রেঙ্গুন! সত্যজিৎ রায়! কথা দুটির মধ্যে কোথায় যেন একটা পরিচয়ের ইঙ্গিত রয়েছে।

থুব দেশী দিনের কথা নয়। মাত্র বৎসরখানেক আগের কথা।

বাবার মুখে ইদানীং অনেকবার রেঙ্গুনে অবস্থিত ঐ নার্টির উজ্জ্বল শুনেছে।

বাবার ছোটবেলার বন্ধু সত্যজিৎ রায়ের একমাত্র ছেলে, সত্যজিৎ রায়।

বিলেত-ফ্রেরত ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্জিনীয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে আবার বাবার কথা মনে পড়ে যায়। বাবা নিহত হয়েছেন। বাবা নিহত হয়েছেন কেবল এই কথাটাই ও নায়েব কাকার তারবাতার্য জেনেছে, তার চাইতে বেশী কিছুই ও জানতে পারেন এখনো পর্যন্ত।

নিজের চিন্তার মধ্যেই সুবিতা আবার তালিয়ে গিয়েছিল, হঠাতে অপরিচিত

কষ্টের সম্বোধনে চমকে মৃথ তুলে তাকাল।

রাত বারোটা বাজে, ঘুমোবেন না? প্রশ্নকারী সম্মতুরের মধ্যকার বাথে
উপরিষ্ঠ ঘুবক।

হ্যাঁ। মদ্দ কষ্টে জবাব দেয় সর্বিতা।

কিন্তু আপনার তো দেখছি সঙ্গে কোন বেডং পর্যন্ত নেই! ঘুবক
স্থিতভাবে ওর মৃথের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে আবার।

সত্য! এতক্ষণে সর্বিতার খেয়াল হয়। তাড়াতাড়িতে বেডংটা পর্যন্ত
সঙ্গে আনেনি সর্বিতা।

অবিশ্য আপনার যদি কোন আপন্তি না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে যা
বেডং আছে সেটা শেয়ার করে নিতে পারি—

না না, তার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি—

আপনি ইয়ত ভাবছেন আমাকে আপনি বিরুত করবেন! কিন্তু মোটেই
তা নয় মিস্—

আমার নাম সর্বিতা চৌধুরী।

কতদ্র ধাবেন আপনি মিস্ চৌধুরী?

সর্বিতা তার গন্তব্যস্থানের কথা বলতেই ঘুবক সর্বসময়ে বলে ওঠে,
আশচর্য! আমিও তো একই জায়গার যাত্রী। আপনি কি মতুজয় চৌধুরীর—

হ্যাঁ। আমি তাঁর মেয়ে—, বলতে বলতে সহসা এতক্ষণে সর্বিতার দ্বারাখের
দ্রষ্ট অশ্রুবাপ্তে ঝাপসা হয়ে আসে নিজের অজ্ঞাতেই।

নিরুৎস্থ অন্তর-বেদনায় এতক্ষণ সর্বিতা ভিতরে ভিতরে গুমরে মরছিল।
সেই সম্ম্যায় পিতার নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া থেকে এই পর্যন্ত একফোটা
অশ্রু তার চোখ দিয়ে পড়েনি।

সহসা সত্যজিৎ রায়ের প্রশ্নে দে বে মতুজয় চৌধুরীরই কন্যা এই পরিচয়
দিতে গিয়ে তার চোখের পাতা দ্বারা অশ্রুজলে ভিজে গেল।

সত্যজিৎ অবাক বিস্ময়ে সর্বিতার মৃথের দিকে তাকিয়ে ছিল।

পিতার পরিচয় দিতে গিয়ে হঠাতে তার দ্বারাখের পাতা অশ্রুভারে টলমল
করে উঠলো কেন ও ঠিক ব্ৰহ্মে উঠতে পারছিল না।

আমার নামটা আপনি শুনেছেন কিনা মিস্ চৌধুরী জানি না, আমার
বাবা সত্যজুষ রায় আপনার বাবা মতুজয় চৌধুরীর বাল্যবধূ। আপনার
বাবার আমলগত পেয়েই আমি বৰ্মণ থেকে আপনাদের ওখানে যাচ্ছি।

সর্বিতা কি জবাব দেবে ব্ৰহ্মে উঠতে পারে না। নিঃশব্দে সত্যজিৎের
মৃথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এ একপক্ষে ভালই হলো। গন্তব্যস্থানে পেঁচতে পেঁচতে আমাদের কাল
প্রায় শ্বিপ্রহর হবে। দীর্ঘ পথে আপনাকে সঙ্গী পেয়ে মন্দ হলো না। পথের
একদুর্ঘেঁয়েমিটা অনেকটা সহ্য হবে। সত্যি, কি আশচর্য যোগাযোগ দেখুন!
বলতে বলতে মদ্দ হাসে সত্যজিৎ।

সহসা একসময় সত্যজিৎ লক্ষ্য করে, তার এতগুলো কথার জবাবে একটি
কথাও বলেনি এতক্ষণ সর্বিতা। একতরফা সেই কেবল এতক্ষণ বক্বক করে
চলেছে।

এবং শব্দু তাই নয়, যদি দেখবার তার না ভুল হয়ে থাকে তো সর্বিতার
চোখে সুস্পষ্ট অশ্রু আভাসও লক্ষ্য করেছে।

নিজের কৌতুহলকে আর দমন করতে পারে না সত্যজিৎ। এবং কোন প্রকার ইতস্তত না করে সোজাসুজিই প্রশ্ন করলে, মাফ করবেন মিস চৌধুরী, একটা কথা না বলে আর থাকতে পারছ না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে বিশেষ রূপ চিন্তিত ও অন্যমনস্ক আপনি। পরস্পরের পরিচয় থেকে যখন জানা গেছে এতদিন আমাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও পরিচয়ের দাবী একটা উভয়েই আমরা উভয়ের কাছে করতে পারি, সেই পরিচয়ের দাবীতেই জিজ্ঞাসা করছি কথাটা। আশা করি মনে কিছু করবেন না।

না। আপনি হস্ত জানেন না মিঃ রায়, অতি বড় একটা দ্রুসংবাদ পেয়েই আমি এই ছেনে দেশের বাড়িতে যাচ্ছি—

দ্রুসংবাদ! বিস্মিত কণ্ঠে সত্যজিৎ প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। আমার বাবা, মৃত্যুজয় চৌধুরী, হঠাৎ নিহত হয়েছেন।

নিহত হয়েছেন! মৃদু কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে বিস্ময়বিম্ফারিত চক্ষে সত্যজিৎ তাকিয়ে থাকে সর্বিতার মুখের দিকে।

হ্যাঁ।

আর একটু স্পষ্ট করে বলুন মিস চৌধুরী, আমি যে আপনার কথা কিছুই বুঝে উঠতে পারছ না।

এর চাইতে শেষী আমিও কিছুই জানি না মিঃ রায়। বস্তু কাকা তার করে কেবলমাত্র ঐট্রকুই আমায় জানিয়ে যেতে লিখেছেন।

কিন্তু—

আমি নিজেও এতক্ষণ ধরে ভেবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছ না, কেমন করে এত বড় দুর্ঘটনাটা সম্ভব হলো! আমার অজ্ঞাতশত্রু বাপকে কে হত্যা করতে পারে!

বাইরে থেকে একজন মানুষকে সব সময় সম্পূর্ণভাবে বিচার করা চলে না সর্বিতা দেবী। তাছাড়া আপনার বাবার মত অতি বড় একটা জীবন্দারী চলাতে গেলে নিজের অজ্ঞাতেই দ্রুতেকজন শহুর সংগঠ করা এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু সে-সব কথা পরে ভাবলেও চলতে পারে। সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে এখন তিনি নিহত হয়েছেন। এবং এক্ষেত্রে আমি বা আপনি সে ব্যাপারে কতদুর কি করতে পারি—

আমরা আর কি করতে পারি বা পারবো! কতকটা যেন হতাশাই সর্বিতার কণ্ঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নিচ্ছয়ই। আমাদের দ্রুজনেরই অনেক কিছুই করণীয় আছে। আপনার পিতা এবং আমার পিতা বাল্যবন্ধু। আগে চলুন সেখানে পেঁচাই, তারপর সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিয়ে দেশেন করেই হোক এ হত্যা-রহস্যের মীমাংসা করবারও তো অন্তত একটা চেষ্টা করতে পারি।

সত্যজিতের কথাটা সর্বিতা যেন ঠিক হ্রদয়গম করে উঠতে পারে না।

ও বুঝে উঠতে পারে না, ওরা দ্রুজনে ওখানে গিয়ে পেঁচাই বা কি করে তার পিতার হত্যা-রহস্যের মীমাংসা করতে পারে।

কিন্তু অদ্বৰ্দ্ধ ভাবিষ্যাতে তার পিতার মৃত্যু-রহস্যের মীমাংসা হোক বা না হোক, পথের মাঝাধানে সত্যজিতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং তার সরস মধ্যে কথাবার্তায় পিতার হত্যা-সংবাদে যে অসহনীয় দ্রুত তাকে একেবারে বিমৃঢ় ও অসহায় করে ফেলেছিল তা থেকে ও যেন কতকটা সাম্ভন্ন পায়।

অন্তত তার দুঃখের ভাগীদার ষে নিঃসম্পকৰ্ম হলেও একজন আছে, এ কথাটা জেনেও যেন ও মনের মধ্যে অনেকটা সান্ত্বনা পায়। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়।

॥ ২ ॥

নায়েব বসন্তবাবু নিজেই স্টেশনে এসেছিলেন সর্বিতা তার পেয়েই রওনা হবে এই আশা করে।

বসন্তবাবুর বয়স ষাটের কোঠা প্রায় পার হতে চললেও বার্ধক্য এখনো তাঁকে খুব বেশী কাবু করতে পারেন।

চুলগুলো পেকে একেবারে সাদা হয়ে গেলেও শরীরের গঠন ও কাষ-ক্ষমতার মধ্যে কোথায়ও এতটুকু বার্ধক্যের ছায়া পড়েন এখনো! তাঁর পেশল উচ্চ লম্বা দেহের গঠন দেখলে মনে হয় দেহে এখনও তাঁর প্রচুর ক্ষমতা। এখনো তিনি দশ-পনের মাইল পথ অনায়াসে হেঁটে চলে যেতে পারেন।

লাঠি হাতে পেলে এখনো দুঁজন লোকের মহড়া অনায়াসেই নিতে পারেন।

বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে চাকরিতে তিনি এসে ঢুকে-ছিলেন, আজ দীর্ঘ বিয়ালিশ বছর এই জর্মিদারীতে তিনি চাকরি করছেন।

এই চৌধুরী-বাড়িতে তাঁর একটা ঘৃণ কেটে গেল।

জর্মিদার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী বয়সে তাঁর চাইতে বছর তিনিক মাত্র বড় ছিলেন।

একটু বেশী বয়সেই মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের প্রায় বছর দশেক বাদে সর্বিতা রজ্ব হয়।

সর্বিতার ধখন চার বছর বয়স তখন সর্বিতা মা হেমপ্রভা মারা যান।

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আর বিবাহ করেননি।

বসন্তবাবু অকৃতদার। এবং যতদূর তাঁর সম্পর্কে জানা যায়, গ্রিসংসারে তাঁর সত্যিকারের আপনার বলতে কেউ নেই এবং কোনদিন কেউ তাঁর আত্মীয়-স্বজন আছে বলেও তিনি স্বীকার করেন না।

দীর্ঘ বিয়ালিশ বছরের মধ্যে মাত্র বারচারেক তিনি তীর্থগ্রামের নাম করে মাস-দুই করে ছুটি নিয়ে বাইরে গিয়েছেন।

ঐ চারবার ছাড়া কেউ তাঁকে কোনদিন ঐ জায়গা ছেড়ে একটা দিনের জন্যও বাইরে যেতে দেখেনি।

মত বড় বিপদই হোক—বিপদে ভেঙে পড়া বা বিমৃঢ় হয়ে পড়ার মত গোক নন বসন্তবাবু।

সর্বিতা ও সত্যজিৎকে পাশাপাশি ট্রেন থেকে নেমে আসতে দেখে বসন্তবাবু আর অগ্রসর না হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

তৈক্ষ্য দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে ছিলেন সত্যজিৎের দিকে।

সত্যজিৎ কিন্তু নিজেই এগিয়ে এসে নিজের পরিচয়টা দিল, আর্মি রেঞ্জারের সত্যজুষগবাবুর ছেলে সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ সম্পর্কে সকল ব্যাপার জানা থাকলেও ইতিপূর্বে বসন্তবাবু সত্যজিৎকে দেখেননি।

নিরাসস্ত কঢ়ে বললেন, এসো। তোমার আসবার কথা ছিল আমি বাবুর মৃত্যুই শূনেছিলাম।

অতঃপর সর্বতার দিকে ফিরে তাঁকয়ে সঙ্গে হে বললেন, চলো মা, বাইরে টমটম দাঁড়িয়ে আছে।

মালপত্র সামান্য যা সঙ্গে ছিল সহিস লছমনের সাহায্যে টমটমের পিছনে তুলে দিয়ে তিনজন পাশাপাশি টমটমে উঠে বসলেন।

বসন্তবাবু নিজেই টমটম হাঁকয়ে নিয়ে এসেছেন।

জয়গাটা আধা শহর আধা গ্রামের মত।

বেলা প্রায় পড়ে এলো।

আজ গাঁড়িটা প্রায় ঘণ্টা আড়াই লেট ছিল।

নিঃশেষিত দ্বিপ্রহরের স্লান বিধুর আলোয় উঁচু কাঁচা ঘাঁটির সড়কের দুপাশের গাছপালা, গহন্তের ক্ষেতখামার, ঘরবাড়গুলো কেমন যেন বিচ্ছয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।

সারাটা দিনের অসহ্য প্রীত্মের রৌদ্রতাপে সব কিছু যেন খলসে গিয়েছে বলে মনে হয়। বসন্তবাবু একধারে বসে নিঃশব্দে টমটম চালাচ্ছেন, অন্য পাশে ওরা সর্বিতা ও সত্তজিৎ নিঃশব্দে বসে আছে গা ঘেঁষে পাশাপাশি।

তিনজনের কারো মৃত্যুই কোন কথা নেই।

স্টেশন থেকে বর্তমান জিমিদারবাড়ি প্রায় দীর্ঘ পাঁচ মাইল পথ হবে।

স্টেশন থেকে প্রায় মাইলখালেক দূরে ছোট শহরটি গড়ে উঠেছে হাজার দশক লোকজন নিয়ে, জিমিদারের বর্তমান বাসভবন শহর থেকেও প্রায় তিন মাইল দূরে নির্জন একটা বিলের ধারে।

বর্তমান জিমিদারদের বাসভবনের আশেপাশে কোন বসতবাটি নেই।

প্রথম দিকে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী বাপের আমলের পুরাতন যে জিমিদার বাটি একটা ছিল তাতেই বাস করতেন।

প্রমোদভবনে এসে বসবাস করছিলেন তাও আজ দীর্ঘ উনিশ বৎসর হয়ে গেল।

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর পূর্বপুরুষেরা বছরের কিছুটা সময় এই দ্বৱ্বতী নিরালা প্রমোদভবনে এসে আনন্দ ও শুভ্রতা করে কাটিয়ে যেতেন মাত্র।

প্রমোদভবনের ব্যবহারটা ক্ষমে ক্ষমে আসতে থাকে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর পিতার আমল থেকেই।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর প্রমোদভবন অবাবহার্য হয়ে পড়ে থাকবার পর আবার একদা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী প্রমোদভবনের সংস্কার সাধন করে পুরাতন পৈতৃক আমলের জিমিদার-বাটি থেকে অসুস্থা স্তৰী হেমপ্রভা ও একমাত্র চার বৎসরের কন্যা সর্বিতাকে নিয়ে কিছুকাল বাস করবেন বলে এসেছিলেন। কিন্তু প্রমোদভবনে আসবার চারাদিনের মধ্যেই হেমপ্রভা অক্ষম্যাং অত্যন্ত অসুস্থা হয়ে পড়ায় অসুস্থা স্তৰীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন এবং ফিরে এসে পুরাতন জিমিদার-ভবনে গিয়ে উঠলেও একটা বেলাও সেখানে কাটাতে পারলেন না।

হেমপ্রভা সহস্র শ্রান্তি-বিজড়িত বিরাট প্রাসাদের কক্ষগুলো দিবারাত্রি থেনে মৃত্যুঞ্জয়কে পর্যাপ্ত ও ব্যাধিত করে ভুলতে লাগল। সন্ধ্যার দিকেই আবার পালিয়ে এলেন ঐ দিনই র্তানি পুরাতন জিমিদার-ভবন ত্যাগ করে প্রমোদ-

ভবনেই।

সর্বিতার বাল্য ও শৈশব ত্রি প্রমোদভবনে কেটেছে।

জর্মিদারী আর মতুঝয় চৌধুরীর চাল ও পাটের ব্যবসা ছিল।

সর্বিতাঙ্গ বিরাট প্রাসাদটা জুড়ে মতুঝয় তাঁর কাছারী করলেন।

প্রতাহ ট্যাটমে চড়ে নিব্রহরের আহারাদির পর মতুঝয় প্রৱাতন প্রাসাদে আসতেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে সমস্ত কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করে, ব্যবস্থা-পত্র করে রাখে একেবারে ফিরতেন।

ঘোড়ার গলার ঘণ্টিটা ঠুঁ ঠুঁ করে সায়াহবেলার মন্থর বাতাসে ছাড়িয়ে পড়েছিল।

বৈশাখের করুণ রিস্তা।

আজও আকাশের পর্ণচম প্রান্তে মেঘের ইশারা দেখা দিয়েছে। গতকালের মত এবং আজও হয়ত কালবৈশাখী দেখা দিতে পারে।

ক্রমে আদালত, স্কুলবাড়ি, বাজার ছাড়িয়ে ট্যাটম শহরকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলে।

এর পর মাঝখনে সরু কাঁচামাটির অপ্রশংস্য সড়ক এবং দুপাশে চূর্ণ ভূমি।

শহর ছাড়িয়ে প্রায় মাইল দূরে গেলে বৌরাণীর বিল।

বৌরাণীর বিলের ধার দিয়ে প্রায় সোয়া ক্লোষটাক পথ এগিয়ে গেলে রাস্তাটা যেন বিলের জলের মধ্যে গিয়ে দৃঢ়ত বাড়িয়ে ঝাঁপড়ে পড়েছে হঠাত।

বিলের মধ্যেই দোতলা পাকা ইটের গাঁথুনি বাঁড়িটাই প্রমোদভবন, বর্তমান জর্মিদারের বসতবাটি।

প্রমোদভবনে পেঁচতে পেঁচতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সহিসের হাতে ঘোড়ার লাগাম তুলে দিয়ে বস্তবাবু ট্যাটম থেকে নেমে ওদের দৃঢ়নকেও নামতে বললেন।

সামনেই একটা টানা প্রকাণ্ড বারান্দা রেলিং দিয়ে ঘেরা।

বারান্দার বোলানো বাতিটা জেবলে দেওয়া হয়েছে। বাইরে বাতাস ছেড়ে, বাতিটা দুলছে বাতাসে।

সর্বিতা প্রমোদভবনের দিকে তাঁকরে স্তৰ্থ হয়ে যেন হঠাত দাঁড়িয়ে থার।

সন্ধ্যায় তরল অধিকারে সমগ্র প্রমোদভবনের উপরে যেন একটা বিশাদের করুণ ছায়া নেমে এসেছে।

ক্রমেই বাতাসের বেগ বাড়ছে।

সকলে এসে বাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

তোমার হাতমধ্য ধূয়ে একটু বিশ্রাম করো মা—আমি ততক্ষণ হাতে-মুখে একজুড়ে জল দিয়ে আহিংকটা সেরেই আসছি।

সারাটা পথ একেবারে কঠিন মৌনবৃত্ত অবলম্বন করে থেকে এই সর্বপ্রথম বসন্তবাবু ওদের সঙ্গে কথা বললেন।

এবং ওদের জবাবের কোনরূপ প্রতীক্ষা মাছও না করে সোজা তাঁর মহলের দিকে চলে গেলেন।

বনমালী ও কানাইয়ের মা।

বনমালী চৌধুরী-বাড়ির বহুদিনকার প্রৱাতন ভৃত্য।

আর দাসী কানাইয়ের মা ও চৌধুরী-বাড়িতে আছে—তাও আজ পর্ণিশ

বছর হবে বৈক।

কানাইয়ের মা-ই কোলি-পঞ্চে করে সর্বিতাকে মানুষ করেছে

বনমালী আর কানাইয়ের মা দৃজনেই একসঙ্গে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল।
বনমালীর হাতে একটা লণ্ঠন।

কানাইয়ের মা ঘরের মধ্যে ঢুকেই সর্বিতাকে লক্ষ্য করে বোধ হয় কাঁদতে
যাচ্ছল, কিন্তু সহসা সর্বিতার পাশে সত্যজিৎকে দেখে সে অতি কঢ়ে নিজেকে
সামলে নিল।

বনমালীর চোখেও জল আসছিল, সেও কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে
সর্বিতাকেই সম্বোধন করে ভাঙা গলায় বললে, ভিতরে চল দীর্ঘমগ্নি।

হাঁ, আপনি যান সর্বিতা দেবী, হাত-মুখ ধূরে একটু বিশ্রাম করুন গে।
আমি এই ঘরেই বসছি ততক্ষণ—

আপনিও আসুন সত্যজিৎবাবু। বলে কানাইয়ের মার দিকে ফিরে তাকিয়ে
বললে, কানাইয়ের মা, দোতলায় আমার পশের ঘরটাতেই এই বাবুর থাকবার
ব্যবস্থা করে দাও। বনমালী, তুমও যাও—ঘরটা কানাইয়ের মাকে সঙ্গে নিয়ে
তাড়াতাড়ি একটু গুরুছয়ে দাও গে।

সত্যজিৎ বাধা দেয়, আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন সর্বিতা দেবী। ওসব
হবে খন।

বাবা থাকলে কোন কিছুর জন্মেই অবিশ্য আমাকে ভাবতে হতো না
সত্যজিৎবাবু। বলতে বলতে সর্বিতার চোখের কোল দৃঢ়ো জলে চকচক করে
ওঠে।

রাত বোধ করি দুশটা হবে। কিছুক্ষণ আগে কালবৈশাখীর একপশলা
ঝড়জল হয়ে গিয়েছে। খোলা জানালা-পথে ঝিরঝির করে জলে ভেজা ঠাণ্ডা
হাওয়া আসছে ঘরের মধ্যে।

সর্বিতার কক্ষের মধ্যেই বসন্তবাবু, সত্যজিৎ ও সর্বিতা তিনজনে বসে
কথা হচ্ছিল।

ঘরের এক কোণে কাঠের একটা ত্রিপয়ের উপরে সবুজ ঘেরাটোপ দেওয়া
কেরোসিনের টেবিল-বাতিটা কমানো, মদুভাবে জললছে। বাতির শিখাটা ইচ্ছে
করে কঁঠিয়ে রাখা হয়েছে। মদ আলোয় কক্ষের মধ্যে একটা আলোছায়ার
স্বন্দন যেন গড়ে উঠেছে।

বসন্তবাবু বলছিলেনঃ

ব্যাপারটা শুধু আশ্চর্যই নয়, রহস্যময়! পরশুরাম সকালে বৌরাণীর
বিলের মধ্যে নন্দনকাননে বকুল গাছটার তলায় চৌধুরী মশাইয়ের মতদেহটা
যখন আবিষ্কৃত হলো—

সত্যজিৎ বাধা দিল, মতদেহ প্রথম কে আবিষ্কার করে?

আমি। আমিই প্রথমে মতদেহ দেখতে পাই। সাধারণত চৌধুরী মশাইয়ের
ইদানীং মাসখানেক ধরে শরীর একটু খারাপ যাওয়ায় বেলা করেই ঘূর থেকে
উঠেছিলেন।

তাহলৈও সাতটার মধ্যেই তিনি শয্যাত্যাগ করতেন। পরশু সকালে আটটা
বেলা পর্যন্তও যখন চৌধুরী মশাই শয়নঘর থেকে বের হলেন না, বনমালীই
চৌধুরী মশাইকে ডাকতে গিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে

ঘর খালি। ঘরের মধ্যে কেউ নেই। বনমালী এদিক বাড়ির মধ্যে খেঁজা-খুঁজি করে আগাকে সংবাদ দেয়। আগী তো আশ্চর্যই হলাম বনমালীর কথা শুনে। কারণ এত সকালবেলা বেড়ানো বা বাড়ি থেকে কোথাও বের হওয়া তো তাঁর কোন দিনই অভ্যাস নেই। যাহোক সমস্ত বাড়িটা খেঁজেপেতেও যখন তাঁকে পেলাগ্য না তখন বাড়ির চারপাশে খেঁজাখুঁজি শুরু করলাম। তারপর আমই খেঁজতে খেঁজতে তাঁর মতদেহ বৌরাগাঁৰ বিলের মধ্যে নলদন কাননে গিয়ে দেখতে পেলাম।

কি অবস্থায় দেখলেন? সত্যজিৎ প্রশ্ন করল আবার।

দেখলাম বুল গাছতলায় দেহটা লম্বালম্ব হয়ে পড়ে আছে। পরিধানে সেই আগের দিনেরই ধূতিটা, খালি গায়ে একটা মৃগার চাদর জড়ানো। এক পায়ে চাঁচটা আছে, অন্য পায়ের চাঁচটা একটু দ্রুত দ্রুত পড়ে আছে।

মতদেহে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল? সত্যজিৎ আবার প্রশ্ন করে।

না, তেমন কোন বিশেষ আঘাতের চিহ্নই দেহের কোথাও ছিল না, তবে নাকে ও মুখে রঞ্জিত্বপ্রাপ্ত ফেনা জমে ছিল।

আপনার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে তাঁকে কেউ বোধ হয় throttle—শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। তাই কি?

সত্যজিৎের প্রশ্নে তার মুখের দিকে তাকালেন বসন্তবাবু এবং বললেন, এখানকার সরকারী ডাক্তারের তাই অভিমত। মতদেহ ময়না-তদন্তের ফলে নাকি তাঁকে শ্বাসরোধ করেই হত্যা করা হয়েছে, এইটাই প্রচারণ হয়।

সত্যজিৎ তাকাল বসন্তবাবুর মুখের দিকে।

সর্বিতা নিজের অঙ্গাতেই একটা অর্ধফুট আর্টকাতর শব্দ করে ওঠে।

বসন্তবাবুর ব্লকখানা কাঁপিয়েও একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল।

বললেন, মতদেহ কালই প্রত্যুষে সৎকার করা হবে।

কথাটা যেন কোনমতে জানিয়ে দিয়ে নিজের দায় থেকে মুক্তি পেলেন বসন্তবাবু।

পাষাণের ভারের মত যে ব্যথাটা এ দুদিন তাঁর বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল, সর্বিতার কাছে সব খুলে বলবার পর থেকে যেন কতকটা লাঘব বোধ করলেন।

আচ্ছা নায়েব মশাই, এই মত্ত্যরহস্য তদন্ত করে কোন কিছুই কি আপনারা জানতে পারেননি?

না। কিছুই আজ পর্যন্ত জানতে পারা যায়নি। দারোগা সাহেব এ বাড়ির চাকর-বাকর বিদ্রোহী সহিস সকলকেই যতদূর সম্ভব জেরা করেছেন, কিন্তু—

বনমালী ও কানাইয়ের মা ছাড়া এ বাড়িতে আর কারা আছে?

আমি, সরকার বামলোচন, দারোয়ান বোটন সিং, সহিস লছমন, ঠাকুর শিবদাস—

এরা কেউ কিছু বলতে পারলে না?

না।

এরা সকলেই বিশ্বাসযোগ্য?

হ্যাঁ, তা বৈকি। অনেকদিন ধরেই তো ওরা এ বাড়িতে কাজ করছে। তাছাড়া চৌধুরী মশাইকে গলা টিপে হত্যা করে এদের কারই বা কি জ্ঞান

হতে পারে !

লাভালাভের কথাটা কি অত সহজেই বিচার করা চলে নায়েবমশাই ? মানুষের লাভক্ষণ্ঠির তুলাদণ্ডিট এত স্ক্ষয় ভারবেষম্যেই এদিক-ওদিক হয় যে ভাবতে গেলে যেন অনেক সময় বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। অবশ্য আপানি আমার চাইতে অনেক বেশী প্রবণ ও বিচক্ষণ—, শেষের দিকের কথা কটা সত্যজিৎ যেন কতকটা ইচ্ছে করেই যোগ করে দেয় নিজের বস্ত্বের সঙ্গে ; কারণ সত্যজিৎ কথা বলতেই লক্ষ্য করেছিল শুরু শেষের কথাগুলি শুনে, বসন্তবাবুর মুখের রেখায় একটা চাপা বিরাস্ত ভাব যেন সম্পত্ত হয়ে উঠেছে !

সত্যজিতের শেষের কথাগুলোতেও কিন্তু বসন্তবাবুর মুখের বিরাস্ত ভাবটা গেল না। এবং সত্যজিতের কথার উন্নরে তিনি যখন কথা বললেন, তাঁর কঠস্বরে একটা বিরাস্তির আভাস স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছিল, তোমার কথাটা যে মিথ্যে তা আরু বলাই না সত্যজিৎ। তবে এ বাড়িতে যারা আজ ৮/১০ বছর ধরে কাজ করছে তাদের সম্পর্কে আর যে যাই ধারণা করাক না কেন, আমি জানি অন্ততঃ তারা সকল প্রকার সন্দেহেরই অতীত।

নিশ্চয়ই তো। কিন্তু এটাও আপানি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে probability-র বা সম্ভাবনার দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে এক্ষেত্রে একটা কথা আমরা না ভেবে পারাই না যে, চৌধুরী মশাইয়ের হত্যার ব্যাপারে সব কিছু বিবেচনা করে দেখতে গেলে একটা কথা আমাদের স্বতই মনে হবে এ বাড়িতে ঐ সময় যে বা যারা ছিল তাদের মধ্যে কেউই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ যায় না বা যেতে পারে না।

সহসা বসন্তবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সত্যজিতের কথার জবাব মাত্রও না দিয়ে এবং সোজা একেবারে সর্বিতার মুখের দিকে তাঁকয়ে বললেন, রাত অনেক হয়েছে মা, কাল সারা রাত ট্রেনে জেগে এসেছো, এবারে শুরে পড়। আর্মি ও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত—আমি শূতে চললাম।

বসন্তবাবু সোজা ঘর থেকে চলে গেলেন।

তখন তাঁর পায়ের চাটিজুতোর শব্দটা সির্পি-পথে মিলিয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই হঠাৎ কথার মধ্যে একপ্রকার জোর করেই যেন প্র্ণালী টেনে দিয়ে বসন্তবাবু ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সত্যজিৎ যেন নিজেই অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

এ বাড়ির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি সে। তাছাড়া বসন্তবাবু এই পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট তো বটেই, এ পরিবারের একজন পরম হিতৈষীও বটে। বলতে গেলে একাদিক থেকে এ পরিবারের আঝায়ৈরও অধিক বসন্তবাবু। এবং সেদিক দিয়ে সর্বিতার পিতার হত্যার ব্যাপার নিয়ে এরূপ স্পষ্টভাবে মতামত প্রকাশ করাটা হয়ত তার উচিত হয়নি।

বসন্তবাবুর চাটির শব্দটা তখন মিলিয়ে যাওয়ার পরও সত্যজিৎ ও সর্বিতা

কেউই কোন কথা বললে না কিছুক্ষণ ধরে।

দুঃজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

সত্যজিৎ মনে মনে ভাবছিল হয়ত সর্বিতাও তার কথায়বার্তায় অসন্তুষ্ট হয়েছে।

তাই সে ভাবছিল কিভাবে সমস্ত পরিস্থিতিটাকে সহজ করে আনা যেতে পারে।

ইঠাং এমন সময় সর্বিতার ডাকে সত্যজিৎ মৃখ তুলে তাকাল।

সত্যজিৎবাবু!

বলুন? সাধারে সত্যজিৎ সর্বিতার মুখের দিকে তাকাল।

একটা কথা আপনাকে আর্মি বলে রাখ। যে বা যারা আমার দেবতার মত বাপকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে তাকে বা তাদের আর্মি কোনমতেই ক্ষমা করব না এবং এই নিষ্ঠুর হত্যা-রহস্যের মীমাংসার জন্য ধত্প্রকার চেটা সম্ভব সবই আর্মি করব। তার জন্য বাবার জর্মিদারীর শেষ কপর্দকটি পর্যন্তও যদি আমাকে ব্যয় করতে হয় তাতেও আর্মি পশ্চাংপদ হবো না।

ঠিক এমনিটিই আর্মি আশা করেছিলাম সর্বিতা দেবী আপনার কাছ থেকে। দেখুন আপনার বুকবার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে। যে দেনহময় পিতাকে আপনি হারিয়েছেন, হাজারবার চোখের জল ফেলে বুক চাপড়ে কাঁদলে বা হাহুতাশ করলেও আর তাঁকে জীবিত ফিরে পাওয়া যাবে না। এবং এও আমরা সকলেই জানি মা বাপ কারো চিরাদিন বেঁচে থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে সে যন্ত্রিকে মেনে নিয়েও চুপ করে থাকতে আমরা পারব না, কারণ তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়। নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আর সেই কারণেই যেমন করে যে উপায় হোক এই হত্যা-রহস্য আপনাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে। আর্মি সুনিশ্চিত যে এর মধ্যে কোন foul play রয়েছে।

সর্বিতার মনের মধ্যেও একটা প্রতিজ্ঞা সত্যজিতের কথায় ঝুঁমে ঝুঁমে দানা বেঁধে উঠছিল। বাপকে সে আর ফিরে পাবে না ঠিকই। কিন্তু সেও সহজে নির্ণিত হবে না। পিতার হত্যাকারীকে সে খঁজে বের করবেই। কিন্তু কোন পথ ধরে সে এই রহস্যের মীমাংসার অগ্রসর হবে?

,ইঠাং সে সত্যজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা সত্যজিৎবাবু, আপনার কি সাত্য-সাত্যই মনে হয় এ বাঁড়তে যারা উপর্যুক্ত ছিল তাদের মধ্যেই কেউ—

কথাটা যেন কেন সর্বিতা শেষ করতে পারে না। সপ্রশ্ন দৃঢ়িতে তাকিয়ে থাকে সর্বিতা সত্যজিতের মুখের দিকে।

চারিদিক ভেবে দেখতে গেলে ওদের কাউকেই তো আমরা সন্দেহের তালিকা থেকে বর্তমানে বাদ দিতে পারছি না সর্বিতা দেবী! কথাটা আপনিই চিন্তা করে দেখুন না!

কিন্তু—

অবশ্য এও ঠিক যে, এ কথা ধরে নিছ্ছ বলেই যে তাঁদের মধ্যেই কেউ একজন এক্ষেত্রে হত্যাকারী সুনিশ্চিতভাবে তাও তো নয়। কিন্তু যাক সে কথা, এদিকে রাত অনেক হল। আজকের মত আপনি বিশ্রাম নিন গিয়ে। কাল এদিককার কাজ মিটে গেলে আর্মি এখানকার থানার দারোগার সঙ্গে একটিবার দেখা করব। তাঁর কাছে হয়ত আরো অনেক কিছুই আমরা জানতে পারব

সৰিতা দেবী—

কিন্তু তিনি যদি আপনাকে সাহায্য না করেন ?

সেও আমি ভেবে দেখেছি ; পৰ্লিসের লোকদের আমি জানি তো । পথ
আমাদেরও আছে সেক্ষেত্ৰে—

কি ? সৰিতা তাকায় সত্যজিতের মুখের দিকে ।

কলকাতার সি. ডি. র স্বৰূপ রায়কে আমার এক বন্ধু চেনে । শুধু চেনে
নয়, স্বৰূপবাবু তার বিশেষ বন্ধুত্ব বটে । কাল সকালেই তাঁকে সব কথা
জানিয়ে চিঠি দিতে আমি চাই । অবিশ্য এতে যদি আপনার আপন্তি না
থাকে—

আপন্তি ! কেন আপন্তি থাকবে ? নিশ্চয়ই তাঁকে আপনি চিঠি
লিখবেন ।

বেশ, তবে সেই কথাই রাইল ।

এরপর পরস্পর পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে সত্যজিৎ সৰিতার কক্ষ হজে
বের হয়ে এল ।

রাত্রি প্রায় দেড়টা । সত্যজিতের চোখে ঘুৰ আসছিল না ।

ঘরের মধ্যে গরমও খুব বেশী । দরজা খুলে ঘরের সংলগ্ন ছাতে এসে
দাঁড়াল সত্যজিৎ । সন্ধ্যার কালবৈশাখীর ছায়ামগ্নও আর এখন আকাশের
কোথাও অবিশ্বিষ্ট নেই । তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদও আকাশে অস্তিমিতপ্রায় ।
রাত্রির কালো আকাশটা তারায় যেন ছেয়ে আছে । ছাতটা বেশ ঠাণ্ডা ।
অস্তিমিতপ্রায় চাঁদের ক্ষীণ আলো সমস্ত প্রকৃত জুড়ে যেন পাতলা একটা
পর্দার মত থিরাথির করে কঁপছে ।

ছাতের চারিপাশে প্রায় বৃক্ষ-সমান উচ্চ প্রাচীর । প্রাচীরের গা ঘেঁষে
দাঁড়াল সত্যজিৎ । প্রমোদভবনের তিনি দিক বৌরাণীর বিল বেঞ্চেন করে
রেখেছে । খুব প্রশস্ত বিল, এপার-ওপার নজর চলে না ।

স্তিমিত চলন্তালোকে বিলের কালো জলে যেন অন্তুত একটা চাপা রহস্য
ঘনিয়ে উঠেছে । বিলের এপারে ঝাউগাছের সারি । ঝাউয়ের সরু চিকন
পাতাগুলো হাওয়ার দূলে দূলে যেন একটা চাপা কাঙ্ঘা কঁদছে ।

জনমানবের বস্তি থেকে অনেক দূরে নির্জন এই বৌরাণীর বিলের ধারে
এই জর্মদারের কোন পৰ্বপূরুষ যিনি এই প্রমোদভবন তৈরী করেছিলেন,
কালের অদৃশ্য কালো হাত তাঁকে নিশ্চহভাবে গ্রাস করতে পারেনি—অতীতের
সাক্ষী হয়ে আজও সে দৰ্ঢ়িয়ে আছে ।

কত রজনীর প্রমোদ-বিলাসের কত কাহিনী না জানি এই প্রমোদভবনের
কক্ষে কক্ষে অশ্রুত আনন্দ বেদনায় গুমেরে উঠেছে ।

যারা একদা এই ভবনের কক্ষে কক্ষে বিলাস আনন্দ করে গিয়েছে তারা কি
এখানকার স্মৃতি ভুলতে পেরেছে ? অদেহী অশীরীর দল আজও হয়ত প্রতি
রাতে এখানে এসে ভিড় করে দাঁড়ায় পাশাপার্শ হাত-ধরাধরি করে ।

আসুন জমায় । কাঙ্ঘা-হাঁসির দোল দোলানো অতীত স্মৃতির প্রস্থাগুলো
উল্টে যায় হয়ত ।

কালো আকাশের বুকে চাঁদ হারিয়ে গিয়েছে ।

সত্যজিৎ কক্ষের দিকে এগিয়ে চলল। ঘরের ভেজানো দরজাটার সামনে
এসে কিন্তু সত্যজিৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল! ঘরের মধ্যে স্পষ্ট পদশব্দ।

সত্যজিৎ কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে।

শুধু পদশব্দ কি! সেই সঙ্গে যেন আসছে একটা মিষ্টি ন্যূনের
আওয়াজ।

অত্যন্ত শুধু পর্দাবক্ষেপে কে যেন হাঁটছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনের
মিষ্টি আওয়াজ রংগু-বন্ধু রংগু-বন্ধু। ধীরে অতি সন্তর্পণে দরজার কবাট
দুটো দ্বিতীয় ফাঁক করতেই সঙ্গে সঙ্গে যেন পদশব্দ ও ন্যূনের ধর্বনি বাতাসে
মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল শুভ্রত্তে।

ঘরের আলোটা কমানোই ছিল। অন্তুত একটা আলো-অঁধারিতে ঘরটা
রহস্যময়।

কিন্তু কোথায় কে! ঘর শূন্য, কেউ নেই।

ভারী আশৰ্বৎ তো! সত্যজিৎ যেন বেশ বিস্মিতই হয়। ঘরের ওপাশের
অন্য দরজাটা হা হা করছে খোলা।

বিস্মিত সত্যজিৎ খোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল, সামনেই একটা ছোট
অলিন্দ মত, তারপরই নেমে গেছে অন্ধকার সিঁড়ি নিচের দিকে।

কোথায় গিয়েছে এই সিঁড়ি?

কোন্ ঘন অন্ধকারের রহস্যের মধ্যে এই সিঁড়িপথ গিয়ে মিশেছে কে
জানে?

একটু পূর্বে এই ঘরের মধ্যে যে পদশব্দ, যে ন্যূনের ধর্বনি শোনা
গিয়েছিল সেই কি এই সিঁড়ি-পথ দিয়েই অদ্শ্য হয়ে গেল?

সত্যজিৎ শুভ্রত্তের জন্য সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, তারপর
ঘরের মধ্যে আবার প্রবেশ করে স্লটকেস থেকে টর্চটা নিয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে
দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়।

প্রথম সিঁড়ির উপর পা দিতেই সত্যজিৎ তার সমস্ত শরীরে যেন একটা
অহেতুক শিহরণ অন্তুত করে।

কে যেন তার কানে কানে অশ্রুত সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেঃ কোথায়
চলেছ সত্যজিৎ?

নাগিনীর মায়ায় ভুলো না।

নাগিনী!

তা হোক, তবু সত্যজিৎ এগিয়ে যাবে।

সত্যজিৎ এগিয়ে চলল।

ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করে সত্যজিৎ নেমে চলল।

সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে এসে পেঁচেছে, সহসা আবার কানে এসে বাজল
যেন সেই মিষ্টি ন্যূনের ধর্বনি।

অন্ধকারে কে যেন পায়ের ন্যূনের রংগু-বন্ধু বাঁজিয়ে এগিয়ে চলেছে।

অদ্শ্য অশরীরী কোন মায়াবিনী যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ন্যূন-
সংকেতে সম্ভুতের ঐ নিশ্চিন্ত রহস্যময় অন্ধকার থেকে।

নিজের অঙ্গাতেই সত্যজিৎ সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এ কি সত্য কোন মায়াবিনীর মায়া, না তারই শোনবার ভুল!

সবিতার চোখেও ঘূর্ম আসছিল না। চোখ দুঁটো যেন জলালা করছে।

সবিতা তার শিয়রের কাছের জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল, হাত দিয়ে
ঠেলে খুলে দিল জানালার কবাট দুঁটো।

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল অন্ধকার আকাশের দিকে।

দীর্ঘ ছ মাস পরে সে বাড়তে এল অথচ যার স্নেহসিঙ্গ মধুর ডাকটি
শোনবার জন্য তার বিদেশে সমস্ত অল্পর ত্রুষ্ট হয়ে থাকে সেই স্নেহময়
পিতা আজ তার কোথায়?

আর কেউ আদর করে ডাকবে না সার্ব মা আমার। বিদেশ যাত্রাকালে আর
কেউ তার মাথায় হাতটি রেখে স্নেহসিঙ্গ কঢ়ে বলবে না, গিয়েই কিন্তু চিঠি
দিস মা। ভুলস না যেন তোর বুঢ়ো বাপ আবার ছুটি হলে একদিন তুই ফিরে
আসবি সেই দিনটির আশায় দিন গুলছে এখানে বসে একলাটি।

ওর নাকি যখন চার বছর বয়স তখন মা মারা যান।

ভাল করে সঠিকভাবে জানে না বটে তবে কানাঘুঁঝোয় শুনেছিল এক-
দিন ওর মার মৃত্যুর সঙ্গেও যেন কি একটা রহস্য জড়িয়ে আছে।

অবশ্য সে সম্পর্কে কোন দিনই তার মনে কখনো অকারণ কোতুহল দেখা
দেয়নি।

বাবাও তার মার সম্পর্কে কখনো কোন কথা বলেননি এবং তারও কোন
দিন বাবাকে মার কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি।

সাত বছর বয়সের সময় ও দেশ ছেড়ে কলকাতার বোর্ডিংয়ে গিয়ে থেকে
পড়াশুনা শুরু করেছে।

আজ পনের বৎসর সে কলকাতাতেই আছে। কেবল বৎসরে দুর্ব্বার
ছুটিতে মাসখানেকের জন্য এখানে এসে থেকে গিয়েছে, তাও প্রতি ছুটিতেই
যে এসেছে তা নয়।

মধ্যে মধ্যে ছুটিতে একিক-ওদিক বেড়াতেও গিয়েছে। দুর্খানা ঘরের
পরের ঘরটাতেই বাবা শুতেন।

কি এক দৰ্ম্মবার আকর্ষণ ওকে যেন সেই ঘরটার দিকেই টানতে থাকে।

নিজের ঘর থেকে বের হয়ে একটা মোমবাতি জেবলে নিয়ে নিঃশব্দ পদ-
সংগ্রহে এগিয়ে চলল সবিতা সেই ঘরটার দিকে।

ঘরের দরজা ভেজানোই ছিল। বাঁ হাতে ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল।

ঘরটা আজ শূন্য। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাবার ব্যবহৃত প্রত্যেকটি জিনিস
থেখানকারটি যেমন তেমনই আছে।

একধারে ঘরের প্রকান্ড সেই কারুকার্যমণ্ডিত মেহগানি কাঠের পালকের
উপর এখনও তেমনি শয্যাটি বিস্তৃত।

মাথার ধারে চৌকির উপরে দেওয়ালে সেই লোহার সিল্কটি তেমনই আছে
বসানো।

শয্যার ঠিক শিয়রে মাথার উপরে দেওয়ালে টাঙানো মায়ের এনলার্জড
তৈলচিপ্পটি। ঘরের দক্ষিণ কোণে আয়না-বসানো কাঠের আলমারিটা। তারই
পাশে কাপড়ের আলনা।

আলনায় এখনো বাবার ব্যবহৃত ধূতি, চাদর ও জামা রাখা রয়েছে।

পূর্ব কোণে লিখবার টেবিলটি ও বসবার চেয়ারটি। এবং তারই পাশে
বেতের আরাম কেদারাটা ও তার পাশে বাবার নিত্যব্যবহার গড়গড়াটা।

ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟାନ୍ତରେ ସରେର ଏହିକ ଓଦିକ ତାକାତେ ତାକାତେ ହଠାତ୍
ସାଧିତାର ନଜରେ ପଡ଼ିଲା, ତାର ଓ ବାବାର ଫଟୋଟୋ ଦେଓଯାଲେ ପାଶାପାଶ ଟାଙ୍ଗନୋ ।

ହାତେର ମୋହବାର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଛ୍ଵସ କରେ ତୁଲେ ଧରେ ମୋହବାର୍ତ୍ତର ଆଲୋଯ ବାବାର
ଫଟୋଟୋର ଦିକେ କିଛୁକଣ ତାକିଯେ ରଖିଲ ସାବତା ।

ଚାରିଦିନରେ ବାବାର ସେଇ ସ୍ମୃଦର ହାର୍ସଟି ଓଷ୍ଠପ୍ରାଳେତ ସେଇ ସଜୀବ ବଲେଇ ଛବିର
ମଧ୍ୟେ ମନେ ହୁଏ ଏଥିନୋ ।

ସହସା ଚୋଥେର କୋଲ ଦୂର୍ଚ୍ଛି ଜଲେ ଛଲଛଲ କରେ ଓଠେ ।

ବାବା ! ସାତ୍ୟ କି ତୁମ ଆର ନେଇ ! ଆର କି ସାତ୍ୟାଇ ଏ ଜୀବନେ କୋନ ଦିନଓ
ତୋମାର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ପାବ ନା !

କୋଥାଯ ଗେଲେ ତୁମ ଏମିନ କରେ ଆମାୟ ନା ଜୀବିରେ ?

ସାତ୍ୟାଇ କି କେଉ ତୋମାକେ ହତ୍ୟା କରଲ ?

ବଲେ ଦାଓ ବାବା ! ତାଇ ସଦି ହୁଏ, ଆମି ତୋମାର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ।

ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇ ଆମି, ସେ ତୋମାକେ ହତ୍ୟା କରେଛେ କୋନୋମତେଇ ତାକେ
ଆମ ନିଷ୍କର୍ତ୍ତା ଦେବ ନା ।

ପ୍ରତିଶୋଧ ଆମି ନେବ ! ନେବ ! ନେବ !

ସତ୍ୟଜିଂ ହାତେର ଟର୍ଚେର ବୋତାମଟା ଟିପେ ଆଲୋଟା ଜାଲାଲ । ସମ୍ମୁଖେର
ଅନ୍ଧକାରେ ହସ୍ତଧତ୍ ଟର୍ଚେର ଆଲୋର ରଞ୍ଜଟା ଛାଡିଯେ ଗେଲ । ଏକଟା ଅପ୍ରଶନ୍ତ ସରନ୍
ଗଲିପଥ ସମ୍ମୁଖେ ! ସତ୍ୟଜିଂ ହାତେର ଟର୍ଚେର ଆଲୋ ଫେଲେ ଫେଲେ ଦେଖିଲ ପଥଟା
ବୈଶ ଲମ୍ବା । ଏଗିଯେ ଗେଲ ସତ୍ୟଜିଂ ଆଲୋ ଫେଲିଲେ ଫେଲିଲେ ସେଇ ଅପ୍ରଶନ୍ତ
ଗଲିପଥେ ।

ଆଶର୍ଯ୍ୟ ! ଚାରିଦିକେଇ ସେଇ ଦେଓଯାଲ ପଥ ରୋଧ କରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ, କୋଥାଓ
କୋନ ନିର୍ଗମନେର ପଥଇ ନେଇ ।

ଅନ୍ଧ ଗଲିପଥ ।

ତାର ସର ଥିକେ ବେର ହେଁ ସିର୍ପିଡ଼ ଦିଯେ ନେମେ କେଉ ସେ ଏହି ଗଲିର ମଧ୍ୟେ ଏମେ
ଅନ୍ୟକୋଥାଓ ଅଦ୍ଦ୍ୟ ହେଁ ଘାବେ ତାରଓ କୋନ ରାଙ୍ଗତା ନେଇ । ତବେ ?

ସବହି କି ତାହଲେ ତାର ଭ୍ରମ !

କେଉ ତାର ସରେ ଘାରିନ ବା କେଉ ନ୍ଯପୁର ପାରେ ହେଁଟେ ଘାରିନ !

କିନ୍ତୁ ଏକଟା ବ୍ୟାପାର ସତ୍ୟଜିଂ କୋନୋମତେଇ ସେଇ ବୁଝେ ଉଠିଲେ ପାରେ ନା,
ସଦି ଏହି ଗଲିପଥ ଦିଯେ ଅନ୍ୟ କୋଥାଓ ନିଷ୍କର୍ମଗେର କୋନ ରାଙ୍ଗତା ନାହିଁ ଥାକେ ତବେ
ଏହି ଗୋପନ ସିର୍ପିଡ଼-ପଥ ଓ ଏହି ଗଲି-ପଥରେ ତାଙ୍ଗପର୍ଦ୍ଦ କି ?

ଅନାବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚଯାଇ ଏ ଗଲିର ପଥ ତୈରୀ କରା ହୁରିନ ।

ନିଶ୍ଚଯାଇ ଏହି ଗଲି-ପଥ ଥିକେ ଅନ୍ୟ କୋନ ସରେ ବା ବାଇରେ ଘାବାର କୋନ ପଥ
ବା ଦ୍ୱାରା ଆଛେ ସେଇ ନଜରେ ପଡ଼ିଛେ ନା ।

କୋନ ଗୁପ୍ତ-ପଥ ବା ଗୁପ୍ତ-ଦ୍ୱାର !

ସତ୍ୟଜିଂ ଆବାର ଆଲୋ ଫେଲେ ଫେଲେ ଚାରିଦିକକାର ଦେଓଯାଲେ ଅନ୍ସମ୍ଭାନ
କରିଲେ ଲାଗଲ ।

ଦେଓଯାଲେର ଗାଯେ ଠିକେ ଠିକେ ଦେଖିଲେ ଲାଗଲ ।

କିନ୍ତୁ ଆଶର୍ଯ୍ୟ ! କୋନ କିଛିରଇ ହାଦିସ ଓ ପେଲ ନା । ବହୁକଣ ଦାଁଡ଼ିଯେ
ଥିକେ ପ୍ରଶ୍ନାତ ସେଇ ନ୍ଯପୁରର ଶବ୍ଦର ଆର କଇ ଓ ଶୁଣିଲେ ପେଲ ନା ।

କତକଟା ସେଇ ବିଫଳମନୋରଥ ହେଁଇ ସତ୍ୟଜିଂ ତାର ସରେ ଆବାର ଫିରେ ଏଲ

এবং সিঁড়িপথের সঙ্গে সংযুক্ত দরজা বন্ধ করে দিল শিকল তুলে।

॥ ৪ ॥

পরের দিন সত্যজিতের ঘৰ্ম ভাঙল অনেক বেলায় সুবিতার ডাকে।

সত্যজিতবাবু উঠুন! নায়েব কাকা নিচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, দারোগাবাবু নার্কি এসেছেন!

লজ্জিত সত্যজিত চোখ রংগড়াতে রংগড়াতে শয়া হতে উঠে নেমে দাঁড়াল। খোলা জানালা-পথে প্রভাতী রৌদ্র এসে সমস্ত কক্ষটা আলোয় ঝলমল করছে।

সুবিতার পরিধানে একটা সাধারণ মিলের কালোপাঢ় শার্ড। রক্ষ তৈলহীন চুলের রাশ বৃক্কে পিঠে ছাঁড়িয়ে আছে।

যেন একখানি পরিপূর্ণ বিষাদের সকরণ প্রতিচ্ছবি।

কানাইয়ের মাকে এই ঘরে আপনার চা দিতে বলেছি। দোতলার বাথরুমেই জল আছে, হাত মুখ ধূয়ে আস্তন।

পায়ে জুতোটা গলাতে গলাতে সত্যজিত বললে, আপনি চা খাবেন না! না।

কেন, আপনার কি চা খাওয়া অভ্যাস নেই?

আছে। তবে—, সকরণ বিষণ্ণ হাসি সুবিতার ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে ওঠে।

সহসা সত্যজিতের মনে পড়ে যায়, তিনিদিন পিতার মৃত্যুতে সুবিতাকে নিয়মপালন করতে হবে।

গত প্রত্যুষেও ছেনে চা-পান করোন।

লজ্জিত সত্যজিত তাড়াতাড়ি বাইরে বাথরুমের দিকে চলে যায়—যেন ঘটনাটাকে কতকটা সহজ করে দেবার জন্যই।

নায়েব বসন্তবাবু ওদের অপেক্ষাতেই বাইরের ঘরে একটা চেয়ারের ওপর বসে অন্য একটি চেয়ারের পাশের উপরিভূত থানার দারোগা লক্ষ্মীকান্তবাবুর সঙ্গে নিম্নস্থরে কি সব কথাবার্তা বলছিলেন।

দারোগা লক্ষ্মীকান্ত সাহার বয়স চাঁচলের উধৰ্ব নয়; বয়স যাই হোক মাথার সবটুকু জুড়ে বিস্তীর্ণ একটি টাক। কেবল পশ্চাতে ঘাড়ের দিকে সামান্য যা চুল আছে তার মধ্যে বেশীর ভাগই পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

নাদুসন্দুদস নাড়ুগোপাল প্যাটান্মের চেহারা। মুখখানা বর্তুলাকার, ছড়ানো নাসিকা, ওপরের ওষ্ঠটি স্বাভাবিক রকমের পুরু।

লক্ষ্মীকান্তের মস্তকের চুলের অপ্রতুলতার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করবার জন্যই হয়ত সর্বাঙ্গে লোমের প্রাচুর্য।

লক্ষ্মীকান্ত দারোগা সুবিতার একেবারে অপরিচিত নয়, কারণ ইতিপূর্বে দু-একবার এই বাড়িতেই চৌধুরী মশাই বেঁচে থাকতে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।

সুবিতা ও সত্যজিতকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বসন্তবাবুই সর্বপ্রথমে সুবিতাকে আহবান জানালেন, এস মা! এই চেয়ারটায় বস। লক্ষ্মীকান্তবাবু অনেকক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন—তিনিদিন হয়ে গেল, আর তো বাসি ভাড়া এর্মান করে রাখা যায় না—

ওঁ কথাটা শেষ করলেন লক্ষ্মীকান্ত দারোগা, হাঁ সুবিতা দেবী, কেবল

আপনি যাতে আপনার পিতাঠাকুরকে একটিবার শেষবারের মত—

তার আর কোন প্রয়োজন নেই নায়েব কাকা। মৃতদেহ সৎকারের আয়োজন করাম।

কিন্তু তুমি একবার—

সে সৎকারের সময়েই হবে। আপনি আর দীর করবেন না।

সাবিতার কণ্ঠস্বর ক্লান্ত ও নিস্তেজ হলেও যেন একটা দ্রুতায় সুস্পষ্ট মনে হয়।

বেশ। তাহলে আমি সব ওদিককার যোগাড়যন্ত করি গে। আচ্ছা লক্ষ্মীকান্তবাবু, আমি তাহলে—

হ্যাঁ আসুন। সাবিতা দেবীর সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে, সে-গুলো ইতিমধ্যে সেরে নিই।

বসন্তবাবু আর অপেক্ষা করলেন না, কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

বসন্তবাবু কক্ষ হতে চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ ধরে যেন ঘরের মধ্যে একটা নিস্তর্থতা বিরাজ করে।

লক্ষ্মীকান্তবাবু, সাবিতা ও সত্যজিৎ কারো মুখেই কোন কথা নেই।

ঠিক কি ভাবে বঙ্গবাটা শুন্বু করলে নেহাত অশোভন বা পীড়াদায়ক হবে না সেই কথাটাই লক্ষ্মীকান্ত চিন্তা করতে থাকেন বোধ হয়।

এমন সময় সাবিতাই শুন্বু করে, ইনি সত্যজিৎ রায়, বাবার ছোটবেলার বন্ধুর ছেলে। আমাদের আঘাতীয়ের মতই। বাবাই গুঁকে আসবার জন্য নিম্নলিঙ্গ করেছিলেন। এ'র উপর্যুক্তিতে আমরা সকল প্রকার আলোচনাই করতে পারি লক্ষ্মীকান্তবাবু।

ও। মৃদুভাবে প্রত্যন্তের দিলেন লক্ষ্মীকান্ত।

হ্যাঁ, এবাবে আপনি আপনার আমাকে যে প্রশ্ন তা করতে প্রেরণ।

একস্কিউজ মি ফর এ মিনিট লক্ষ্মীকান্তবাবু—ইফ্ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড,—সহসা কথার মাঝখানে লক্ষ্মীকান্তকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই সত্যজিৎ বলে ওঠে, অপনাকে আমি দ্বি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

নিশ্চয়ই। বলুন কি জিজ্ঞাসা করতে চান?

লক্ষ্মীকান্ত পূর্ণ দ্রষ্টিতে সকৌতুকে তাকালেন প্রশ্নকারী সত্যজিতের মুখের দিকে।

আপনাদের ধারণাও বটে এবং শুনলাম ময়না তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, চোধুরী মশাইকে কেউ না কেউ হত্যাই করেছে, তাই না?

হ্যাঁ। শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

আচ্ছা যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল তার আশেপাশে বা চোধুরী মশায়ের দেহে ও জামাকাপড়ে এমন কোন চিহ্ন কি পাওয়া গিয়েছে—অবশ্য একমাত্র ময়না-তদন্তের ফলাফল ছাড়া যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাঁকে শ্বাস-রোধ করেই হত্যা করা হয়েছে?

লক্ষ্মীকান্ত দারোগা এই সব খন-জখমের তদন্ত কুড়ি বছর ধরে করছেন।

বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ও কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু সত্যজিৎ যেভাবে তাঁকে প্রশ্নটা করল ঠিক এই ধরণের প্রশ্ন যে ঐরকম জায়গা

থেকে শুনতে পাবেন এ যেন তাঁর স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

বিস্মিত লক্ষ্মীকান্ত কিছুক্ষণ প্রশ্নকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি ঠিক কি জানতে চান সত্যজিতবাবু?

জানতে চাই কি কি কারণে আপনারা এক্ষেত্রে যে চৌধুরী মশাইকে শ্বাস-রোধ করেই হত্যা করা হয়েছে বলে সিদ্ধার্থসম্ভাস্ত হয়েছেন, অবশ্য ময়না-তদন্তের রিপোর্ট ছাড়া—

ময়না-তদন্তে যথন শ্বাসরোধ করা হয়েছে বলেই প্রমাণিত হয়েছে, তখন আবার কি প্রয়োজন বলুন?

তা বটে! আচ্ছা চৌধুরী মশাইয়ের গলায় কোন দাগ বা চিহ্ন কি ছিল ধার ম্বারা প্রমাণিত হয় যে তাঁকে—

না, এমন কোন চিহ্নই তাঁর গলায় ছিল না।

মৃতদেহের গায়ে কোন জামা ছিল না শুনেছি—

না, একটা চাদর জড়ানো ছিল মাত্র।

কোন struggle বা ধন্তার্থস্তির চিহ্ন তাঁর গায়ে পরিধেয় বস্তে ছিল না? না।

যেখানে মৃতদেহ পাওয়া যায় সেই আশেপাশের জরিতে কোন চিহ্ন বা— না, তাও ছিল না।

কোন পদচিহ্ন?

না।

আচ্ছা শুনেছি একপাটি জন্মতো মৃতদেহের পায়েই ছিল, আর অন্য পাটি জন্মতো কিছুদূরে ঘাসের উপরে পড়েছিল?

তাই।

হঁ। আচ্ছা মনে করুন শ্বাসরোধ করেই যদি তাঁকে হত্যা করা হয়ে থাকে—তাহলে সেই শ্বাসরোধের ব্যাপারটা কোথায় সংঘটিত হয়েছিল? মানে সেইখানেই যেখানে মৃতদেহ পাওয়া যায়, না অন্য কোথায়ও বলে আপনাদের ধারণা?

এ তো সহজেই অনুমান করা যায়, নিশ্চয়ই সেই নন্দনকাননেই!

কেন বলুন তো?

লক্ষ্মীকান্ত এবারে যেন সত্যজিতের প্রশ্নে বেশ একটু বিরক্ত হয়েছেন তাঁর কষ্টস্বরেই বোঝা গেল, তা ছাড়া আর কি! নইলে কি আপনার ধারণা শ্বাসরোধ করে তাঁকে হত্যা করে, হত্যাকারী শেষে মৃতদেহটা ঐ দীর্ঘ পথ বহন করে নিয়ে গিয়েছে বোকার মত!

সম্ভবত সেটা হয়ত হত্যাকারী করেন, কারণ সেটা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে আপনাদের রিপোর্ট শুনে মনে হচ্ছে সেই নন্দনকাননেই যে চৌধুরী মশাইকে হত্যা করা হয়েছে সেটাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না।

কেন বলুন তো? একটা ব্যঙ্গ ও তাছিল্য-মিগ্রাত কৌতুহলের সঙ্গেই যেনে লক্ষ্মীকান্ত সত্যজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

কারণটা হয়ত চট্ট করে আপনাকে এখন বুঝিয়ে বলতে পারছি না লক্ষ্মীকান্তবাবু, তবে সাধারণ বৰ্ণিত থাকে আমরা common sense বলি তা থেকে মনে হয় মৃতদেহ ও তার আশেপাশের যে বর্ণনা আপনারা দিচ্ছেন তাতে করে বরং উল্টোটাই মনে হয়—হত্যা করবার পর মৃতদেহ সেখানে নিয়ে গিয়ে

ফেলে রাখা হয়েছে।

এবাবে লক্ষ্যীকান্ত হেসে ফেললেন, চমৎকার ঘূর্ণিঃ আপনার মশাই! কে এমন আহাম্বক আছে বলুন যে হত্যা করবার পর মৃতদেহটাকে অতখানি risk নিয়ে ঐ নন্দনকাননের মধ্যে গিয়ে ফেলে রেখে আসবে? কাজ হাসিল করবার পর অকুস্থান থেকে খুনী ষত তাড়াতাঢ়ি গা-চাকা দিয়ে সরে যেতে পারে তাই সে যাই এবং সেটাই এয়াবৎকাল স্বাভাবিক বলে জেনে এসেছি মশাই। এ লাইনে একটা জীবনই তো কেটে গেল।

আপনার ও-কথার মধ্যে ঘূর্ণিঃ আছে বৈক লক্ষ্যীকান্তবাবু, তবে কি জানেন, আপনিও হয়ত শুনে থাকবেন, এমনও বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, যে ধরনের risk-এর কথা আপনি বলছেন সেই ধরনের প্রচলন risk থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেরই বশবতীঁ হয়ে অনেক সময় হত্যাকারী হত্যা করবার পর অকুস্থান হতে মৃতদেহ টেনে বা বহন করে নিয়ে গিয়ে দ্বৰবতীঁ কোন স্থানে ফেলে রেখে এসেছে।

দেখুন মশাই, আপনার সঙ্গে অত চুলচেরা তর্ক-বিচার করবার মত পর্যাপ্ত সময় আমার হাতে বর্তমানে নেই। আমি case-এর investigation-এর জন্য সাবিতা দেবীকে করেকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই একটু private-এ—

সুস্পষ্ট বিরক্তি ও করকটা তাছিলাই যেন ঘরে পড়ল লক্ষ্যীকান্তর কণ্ঠস্বরে এবাবে।

কিন্তু সত্যজিৎ কোন জবাব দেবার প্রবেই সাবিতা বলে উঠল, আমাকে যা আপনি জিজ্ঞাসা করতে চান লক্ষ্যীকান্তবাবু ওঁর সামনেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আপনাকে তো একটু আগেই আমি বলেছি—উনি বাবার বধ্যপুত্র ও আমাদের আত্মীয়েরই মত।

না না—তার কোন প্রয়োজন নেই সাবিতা দেবী। বেশ তো, উনি যখন বিশেষ করে private-এ আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান, আমি না হয়ে পাশের ঘরেই কিছুক্ষণের জন্য—

সত্যজিৎ উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু সাবিতার দ্রুত সংবত কণ্ঠস্বরে সহসা ও ফিরে দাঁড়াল, না, আপনি যাবেন না মিঃ রায়। এই ঘরেই থাকুন। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে দিন আপনার উপর্যুক্তিতেই উনি কি জানতে চান—

সত্যজিৎ ও লক্ষ্যীকান্তবাবু দ্রুজনেই যেন বেশ একটু সাবিতার আচরণে ও কণ্ঠস্বরে বিশ্বাস হয়ে একই সময়ে ঘৃণ্গপৎ সাবিতার ঘূর্খের দিকে তাকায়।

সাবিতা তার অর্ধসমাপ্ত কথাটা শেষ করে বলে, হ্যাঁ, যেহেতু বাবার এই হত্যা-রহস্যের মীমাংসার জন্য ওঁর সাহায্য ও সহানুভূতিও যেমন আমার প্রয়োজন তেমনি আপনার সাহায্য ও সহানুভূতিও আমার প্রয়োজন এবং সেই কারণেই আমি চাই গোড়া থেকেই যেন আমাদের তিনজনের মধ্যে একটা সহজ বোঝাপড়া থাকে।

ও! তা বেশ। সত্যজিৎবাবু, আপনিও তাহলে বসুন।

প্রবের মতই বিরক্তি-বিশ্বাস কণ্ঠে লক্ষ্যীকান্ত বলে ওঠেন।

সত্যজিৎ আবার প্রবের আসনটিতে বসে পড়ল।

শুনুন লক্ষ্যীকান্তবাবু, আপনি জানেন আমার টাকার অভাব নেই। বাবার এই হত্যা-রহস্যের মীমাংসার জন্য আপনাদের ত্যাগের কোন বিশেষ অভিজ্ঞ ও

নামকরা ব্যক্তিকেও যদি চান আনতে পারেন, তার ঘাবতীয় খরচও আমি দেব।

বেশ তো। আনল্দের কথা। তবে এক্ষেত্রে তাতেও কোন সুরাহা হবে বলে তো আমার মনে হয় না!

কেন বলুন তো? প্রশ্নটা করে সত্যজিৎ।

আমারও তো মশাই বিশ বছরের অভিজ্ঞতা এ লাইনে। খনীর ধরা-ছেঁয়াও পাবেন না।

ধরা-ছেঁয়াও পাব না?

পাবেন কি করে! আমার যতদ্ব মনে হয় খনী এক্ষেত্রে কোন বাইরের লোক। এ বাড়ির তো কেউ নয়ই, এ শহরেরও কেউ নয়। এ বিষয়ে আমি একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত—

কেন বলুন তো?

কারণ আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে ঘাবতীয় সকলের জ্বামবন্দি নিয়ে এটা অন্ততঃ ব্যবহৃতে পেরেছি, হত্যাকারী এখানকার কেউ নয়।

আপনি তাহলে বলতে চান বাইরের কেউ? প্রশ্ন করে সত্যজিৎ!

নিশ্চয়ই।

কিন্তু উদ্দেশ্য?

তা উদ্দেশ্যও একটা আছে বৈকি। গম্ভীর স্বরে প্রত্যন্তর দেন লক্ষ্মীকান্ত-বাবু।

আপনি ধরতে পেরেছেন নাকি কিছু?

সেটা অবশ্য ভেবে দেখতে হবে।

বিশ বছরের অভিজ্ঞতার উপরে ভিস্ত করে লক্ষ্মীকান্তর অকাট্য যন্ত্রে বহুর শূন্যে সত্যজিৎ মনে মনে কৌতুক অনুভব না করে পারে না। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। সকৌতুকে চেয়ে থাকে লক্ষ্মীকান্তর মুখের দিকে।

অতঃপর লক্ষ্মীকান্ত সর্বিতাকে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলি করতে লাগলেন।

আচ্ছা সর্বিতা দেবী, আপনি বলতে পারেন, আপনার পিতার আজীয়-স্বজনের মধ্যে এমন কেউ আছে কিনা যার সঙ্গে আপনার বাবার শপুত্র ছিল?

না।

কেন বলুন তো—

কারণ বাবার পিতৃবংশের দিক থেকে তাঁর কোন আজীয়-স্বজন ছিল বলে জানি না। বাবা ঠাকুর্দাৰ একমাত্র ছিলেন।

আপনার পিতার একটি ভগ্নী ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা—

পিসিমা আমার জন্মের পূর্বেই মারা যান শুনেছি। তাঁর একমাত্র পুত্র শুনেছি বর্মা না মালয় কোথায় ডাঙ্কারী করেন। তাঁকে জীবনে দেখিওনি কখনো, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হবারও কোন সৌভাগ্য হয়নি। আর বাবার মাতৃবংশে শুনেছি বাবার দুই মামা বাবার চাইতে বয়সে ছেট, এখনও বেঁচে আছেন, বিক্রমপুরের ওদিকে কোথায় জমিদার। তাঁদের সঙ্গেও আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

হ্যাঁ। আচ্ছা দেখুন, জমিদারী ও ব্যবসা চালাতে গেলে বহু লোকের

সঙ্গে শগ্নতা ইচ্ছা না থাকলেও হয়ে যায় জানি তো—এখন ব্যক্তিবিশেষের
কথা—

না, সেরকম শগ্নত বাবার কেউ কোন দিন ছিল বলে জানি না।

ভাল করে ভোবে বলুন সর্বতা দেবী, এমনও হতে পারে আপনি জানেন
না!

আমার বাবাকে আমি খুব ভালভাবেই জানতাম।

কিন্তু আমি তো শুনেছি আপনি আপনার সাত বছর বয়স থেকেই বিদেশে।

কেবল মধ্যে মধ্যে ছুটিতে যা এখানে আসতেন।

তাহলেও আমি তাঁকে খুব ভাল করেই জানতাম।

ও! তাহলে এবাবে আমি উঠব।

আসুন।

লক্ষ্মীকান্ত বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

শংশান হতে ফিরে সর্বতা স্নান সেরে তার নিজের ঘরে শয়ার উপরে গা এলিয়ে
পড়েছিল। সমস্ত শরীরে একটা ক্লান্ত অবস্থতা।

কানাইয়ের মা এক গ্লাস সরবৎ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

দিদিমণি, এই সরবৎকু খেয়ে নাও দেখি—

ওই টেবিলের উপর রেখে যা কানাইয়ের মা।

না। এই সরবৎকু তুঃ খেয়ে নাও।

বিরক্ত করিস না। যা বলছি তাই শোন। সত্যজিতবুকে চা-জলখাবার
দিয়েছিস?

হ্যাঁ, তৈরী হয়ে গেছে, এবাব দেব।

তোদের দিয়ে কোন কাজ হয় না। আগে কোথায় তাঁকে চা-জলখাবার
দিবি, তা নয় আমার জন্য সরবৎ নিয়ে এসেছিস!

লজ্জিত কানাইয়ের মা সরবতের স্লাসটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে
সত্যজিতকে চা-জলখাবার দেবার জন্য ঘর হতে বের হয়ে গেল।

সত্যজিত তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে জানালার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে
বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপ্পটি করে বসেছিল।

বনমালী ঘরের মধ্যে সেজ্ বাঁতিটা জরিলয়ে দিয়ে গিয়েছে বটে তবে
আলোর শিখাটা কমানো।

খাবারের প্লেট ও চায়ের কাপ হাতে কানাইয়ের মা ঘরের মধ্যে এসে
টুকল, বাবু!

কে?

চা এনেছি বাবু।

তোমার দিদিমণিকে কিছু খেতে দিয়েছিলে কানাইয়ের মা?

হ্যাঁ, সরবৎ দিয়ে এসেছি।

খাবারের প্লেটটা ও চায়ের কাপ পাশের একটা চোকির উপরে নামিয়ে রেখে
কানাইয়ের মা ঘর হতে বের হয়ে যাবার জন্য উদ্যত হল।

সত্যজিৎ ডাকল, কানাইয়ের মা !

সত্যজিতের ডাকে কানাইয়ের মা ফিরে দাঁড়াল।

ওইখানে এসে বসো কানাইয়ের মা । তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে ।

সত্যজিতের আহবানে কানাইয়ের মা তার সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে ।

ওইখানে বসো ।

কানাইয়ের মা মাটিতেই বসল ।

চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে চূম্বক দিতে দিতে বললে, তুমি তো এ দাঁড়িতে অনেক দিন আছ শুনলাম, প্রদরনো লোক—

দিদিমণির এককুড়ি তিন বছর বয়স হল । তা ধর না গো—তারও দু'বছর আগে থেকে এ বাড়িতে আর্মি আছি বাবু । প্রদরনো নোক বইকি ।

আর দিদিমণিও তো শুনোছি তোমাই কোলের্পষ্টে মানুষ ।

তা ছাড়া আর কার ? আমারই কোলের্পষ্টে দিদিমণি মানুষ হল তো !

আছ্ছা কানাইয়ের মা, তোমাদের দিদিমণির বাবা মানে কস্তাবাবু, তুমি তো জান তাকে কেউ খুন করেছে—

আহা ! আর বোলোনি গো বাবু, মেয়েটার কি দুঃখের কপাল ! ওর মা—আহা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-ঠাকুরুণ ছিলেন গো—স্বগ্রেণ দেবী, মেয়েটার চার বছর বয়সের সময় অঘোরে মারা গেল এই হত্তচাড়া বাড়িতেই । কস্তাবাবুও এই বাড়িতেই মারা গেল অঘোরে । এই বাড়িটাই অলুক্ষণে বাবু—

তোমার দিদিমণির মাও এই বাড়িতেই মারা গিয়েছিলেন নাকি ?

তাছাড়া আর কি ! এই বাড়িতেই তো !

কি হয়ে মারা যান তিনি ?

কাউকে বোলোনি বাবু । কেউ জানে না । কস্তাবাবুর মানা ছিল, এতদিন কাউকে বলিনি—

তোমার দিদিমণি জানে না ?

না । এক কস্তাবাবু জানতেন—আর জানতাম আর্মি—

সত্যজিৎ কেুত্তহলে উদ্গ্ৰীব হয়ে ওঠে ।

সৰিতাৱ মার মৃত্যুৱ মধ্যেও তাহলে একটা রহস্য রয়ে গিয়েছে ! কেবল জৰিমদাৰ মৃত্যুঞ্জয় চৌধুৱীৱই রহস্যময় মৃত্যু ঘটেনি, উনিশ বছর আগে সৰিতাৱ মার মৃত্যুৱ ব্যাপারেও এম্বিন কোন রহস্য ছিল । এবং শুধু তাই নয়, উভয়েৱই মৃত্যু একই বাড়িতে ঘটেছে ।

কানাইয়ের মা অনেক কথা জানে । হয়ত সেসব কথা জানতে পারলে বৰ্তমান রহস্যৰ উপরে অনেকখানি আলোকসম্পাদ হবে ।

সব গুছিয়ে কোশলে কানাইয়ের মার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে ।

কানাইয়ের মার কয়েকটি কথাতেই সত্যজিৎ বুৰোছিল, মেয়েমানুষ হয়েও এতকাল একমাত্র জৰিমদাৰ মৃত্যুঞ্জয় চৌধুৱীৱ ভয়েই হয়ত কানাইয়ের মা যেসব গোপন কথা এতকাল কারো কাছে মন খোলসা করে বলতে সাহস পায়নি, অথচ ভিতৰে ভিতৰে যে কথাগুলো তার স্বাভাৱিক নাৱীমনেৰ বৃত্তিতে কারো কাছে উগৱে দেবাৰ জন্য ছট্টফট করেছে—সত্যজিতেৰ কাছে তাৰই কিছু হয়ত হঠাৎ বলে ফেলেছে ।

সত্তজিতের ধারণা যে মিথ্যে নয় সেটা সে পরম্পরাতে ব্যবহৃতে পারে কানাইয়ের মায়ের পরবর্তী কথায়, অনেক কথা বলে ফেনন্ট বাবু। কাউকে আবার যেন বলোন। কস্তুরীবু আজ আর বেচে নেই বটে তবে ধর্মের ভয় তো আছে গো।

তা তো নিশ্চয়ই। তোমার কোন ভয় নেই কানাইয়ের মা। আমি সব শুনেছি, তুমি এদের কত বড় আপনার লোক। দিদিমণির তুমি মায়ের সমান। দিদিমণি বলছিল তুমি তো তার মায়ের মতই—

তা বইক বাবু! আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে কানাইয়ের মা। হাজার হলেও নারীর ঘন তো। সত্তজিতের কথাগুলো তার নারীচিত্তের ঠিক জায়গাটিতেই গিয়ে থা দিয়েছে।

আমিও তো তাই বলি কানাইয়ের মা। পেটে ধরলেই কি কেবল মা হয়! দেখো তোমরা যাই বল, অপঘাতে বাবুর ম্যাত্যু হয়েছে, আমার কিন্তু ধারণা এ কোন দৃষ্টি লোকের কাজ—

বাইরে এমন সময় বনমালীর কঠস্বর শোনা গেল, অ কানাইয়ের মা, সত্তজিতের মুখের দিকে।

হ্যাঁ। সব তোমাকে আমি বলব কিন্তু তার আগে তোমার কাছ থেকে আমার কতকগুলো কথা জানা দরকার।

আমি কি জানি বাবু—

আজ রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর একবার আসতে পার কানাইয়ের মা এ ঘরে? আমি আর তোমার দিদিমণি থাকব। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তা আর পারবোন কেন, আসবোঁখন।

বাইরে এমন সময় বনমালীর কঠস্বর শোনা গেল, অ কানাইয়ের মা; কুষ্টে গেলি—

মুখপোড়া বনমালী মিনষে আবার চেঁচাতে নেগেছে, যাই বাবু—

বাল অ কানাইয়ের মা, কানের মাথাটি থেয়ে বসে আছিস নাকি! রাঁ-টি কাড়িছিসনি কেল রে বড়ী—

বলতে বলতে ঘরের মধ্যে বনমালীর আবির্ভাব, এই যে তৃ ইথানটিতে বসে। ঠাকুর যে উদিকে চেঁচায়ে মরছে। রাজ্ঞাবজ্ঞা হবেক, না হবেকনি—

যাচ্ছ, যাচ্ছ—চল।

কানাইয়ের মা বনমালীকে সঙ্গে করে নিয়েই ঘর হতে বের হয়ে গেল।

সর্বিতা এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল, সত্তজিতবাবু—

আসুন সর্বিতা দেবী।

কানাইয়ের মা বুঝি বকরবকর করে আপনাকে বিরক্ত করছিল?

সত্তজিত সর্বিতার কথায় মৃদু হাসল, না, বরং আমিই তাকে দিয়ে কথা বলাচ্ছিলাম।

অমন কাজটিও করবেন না। একবার বকতে শুনুন করলে ও আর থামতে চায় না।

বসুন মিস চৌধুরী।

সর্বিতা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সত্তজিতের মুখোমুখি উপবেশন করল।

আপনি হয়ত জানেন না মিস চৌধুরী, অনেক সময় অবাক্তর বাজে কথার মধ্যে থেকেই কাজের ও প্রয়োজনীয় কথা খুঁজে পাওয়া যায়।

କିନ୍ତୁ ଓର ସେ ଶୋଲ ଆନାର ମଧ୍ୟେ ସାଡ଼େ ପନ୍ଥେର ଆନା କଥାଇ ଅବାଞ୍ଚତର !

ତା ହୋକ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଭାଲ ।

କି କରେ ସ୍ଵଲୋନ ?

ଶୁଣ୍ଡନ ମିସ ଚୌଧୁରୀ, ଓକେ ଆଜ ରାତେ ଏ ସରେ ଆସତେ ବଲେଛି । ଆରୋ
ବଲେଛି, ଆମି ଓ ଆପନି ଏ ସରେ ଥାକବ ।

କେନେ ବଲୁନ ତୋ ?

ଆଜ୍ଞା ଆପନିଙ୍କ ଆପନାର ମାଯେର ମୃତ୍ୟୁ-ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କେ କିଛି ଜାନେନ ?

ବିଷ୍ମରେର ସଙ୍ଗେ ସବିତା ସତ୍ୟଜିତେର ମୃଦୂର ଦିକେ ତାକାଯ, କେନ, ଏ କଥା
ଜିଜ୍ଞାସା କରଛେନ କେନ ହଠାତ ? କାନାଇୟେର ମା କିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କେ ବଲୁଛିଲ
ନାକି ?

ନା, କିଛି ବଲେନ ବଟେ ତବେ ଆମାର ମନେ ହୟ କାନାଇୟେର ମା ହୟତ କିଛି
ଜାନେ ।

ସବିତା ପ୍ରଥମଟାଯ ଏକଟ୍ ଇତ୍ସତ କରେ, ତାରପର ବଲେ, ହ୍ୟା । ଆମିଓ ଏକବାର
ଛୋଟବୋଲାଯ କାନାଘୁଷୋଯ ମାଯେର ମୃତ୍ୟୁର ସଙ୍ଗେ କି ଏକଟା ରହସ୍ୟ ଜାଡିଯେ ଆଛେ
ଶୁଣେଛିଲାମ ବଟେ, ତବେ details କିଛିଇ ଜୀନ ନା । କିନ୍ତୁ କାନାଇୟେର ମା ସେ
କଥା ଜାନବେ କି କରେ—

ସତ୍ୟଜିତ ତଥନ ଏକଟ୍ ପ୍ରବେର୍ କାନାଇୟେର ମାର ସଙ୍ଗେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତ ହୋଇଛି,
ମବ ବିଶଦଭାବେ ଖୁଲେ ବଲଲେ ।

ସବିତା ନିଃଶବ୍ଦେ ସବ ଶୁଣେ ଗେଲ ।

ତାଇ ଆମି ଠିକ କରେଛି, ସତ୍ୟତା ପାରି ପ୍ରଫଳ କରେ ଓର କାହିଁ ଥେକେ ଆମାଦେର
ଜେନେ ନିତେ ହବେ । ଆରୋ ଏକଟା କଥା, ଆପନାର ମାଓ ନାକି ଏହି ବାର୍ଡିତେଇ
ମାରା ଯାନ !

କହି, ସେ କଥା ତୋ ଆମି ଶୁଣିନି ?

ଶୁଣିଲେଓ ହୟତ ଆପନାର ମନେ ନେଇ । ଏକେବାରେ ଛୋଟ୍ଟାଇ ତୋ ଛିଲେନ
ଆପନିଙ୍କ ତଥନ ।

ଆପନାର କି ମନେ ହୟ ସତ୍ୟଜିତବାବୁ, ଏ ରହସ୍ୟର ଆପନି ମୀମାଂସା କରତେ
ପାରବେନ ?

ଆମାର କି ଧାରଣା ଜାନେନ ମିସ ଚୌଧୁରୀ ? ମାନୁଷେର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନେଇ ।
ମାନୁଷଙ୍କ ସାଧାରଣ ହତ୍ୟା କରେ ଥାକେ ତାଙ୍କେ ତବେ ମାନୁଷଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକେ ଖୁଜେ ବେର
କରତେ ପାରେ । ମାନୁଷଙ୍କ problem ତୈରୀ କରେ, ଆବାର ମାନୁଷଙ୍କ ସେଟ୍ ସୋଲ୍ୟ
କରେ ।

ଦୀର୍ଘ ଉନିଶ ବହର ଧରେ କାନାଇୟେର ମା ସେ କଥାଗୁଲୋ ଏକମାତ୍ର ଚୌଧୁରୀ
ମଶାଯେର ଭୟେ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଜମା ରେଖେ ଦିଯେଛିଲ, ସେଗୁଲୋ ସତ୍ୟଜିତ ଓ ସବିତାର
କାହିଁ ବଲତେ ପେରେ ଯେନ ହାଁଫ ଛେଡ଼େ ବାଁଚିଲ । ଦୀର୍ଘ ଉନିଶ ବହର ଆଗେକାର
କାହିଁନାହିଁ ।

ସବିତାର ମା ହେମଜତାର ଶରୀରଟା କିଛି ଦିନ ଧରେ ଭାଲ ସାଇଛିଲ ନା ।

ତାଇ ଶ୍ରୀ ହେମପ୍ରଭା, ଛୋଟ ଚାର ବହରେର ମେ଱େ ସବିତା ଓ କାନାଇୟେର ମାକେ
ନିଯେ ପ୍ରମୋଦଭବନେ ଏକ ମାସେର ଜେନେ ବିଶ୍ରାମ ନିତେ ଏଲେନ ମୃତ୍ୟୁଜ୍ଞଙ୍କ ଚୌଧୁରୀ ।

ଚାରାଦିକେ ଖୋଲା-ମେଲା ବିଲେର ହାଓଯା, ନିର୍ଜନତା ଶ୍ରୀର ମନ ଓ ଶରୀରେର
ଉପରେ ଏକଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାବେ ଏହିଟାଇ ଭେବେଛିଲେନ ମୃତ୍ୟୁଜ୍ଞ ।

শহর থেকে দূরে নির্জন এই বিলের ধারে যেন অবারিত ঘৃষ্ণুর একটা কোমল স্পর্শ।

প্রমোদভবনের তিনি দিক ধীরে দেড়মানুষ সমান উচ্চ প্রাচীর।

বায়ুর তাড়নায় বিলের জল প্রাচীরের গায়ে ছলছলাই করে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

প্রমোদভবনের পশ্চাতের স্বার খুললোই চোখে পড়ে প্রায় শাদুই গজ দূরে একটা ছোট দ্বীপের মত। প্রমোদভবন থেকে সেই দ্বীপে যাওয়ার জন্য সেগুন, শালকাঠ ও পাথর বিলের মধ্যে ফেলে একটা রাস্তা তৈরী করা হয়েছে।

রাস্তাটা অপ্রশস্ত—দুর্তিনজনের বেশী লোক একত্রে পাশাপাশি হাঁটতে পারে না।

দ্বীপটা শিভুজাকার। দ্বীপের মধ্যে ছোট বড় নানাজাতীয় বৃক্ষ যেন একটা অরণ্যস্থতা এনেছে। দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে একটি চমৎকার পাথরের তৈরী একতলা ছোট বাড়ি। বাড়ির মধ্যে খানতিনেক ঘর মাঝারি আকারের। বাড়িটার চতুর্পার্শে দেশী-বিদেশী নানাজাতীয় ফুলের গাছ।

বহুবিদ্যের অয়ঙ্ক-বৰ্ধিত হয়ে এখন সম্পূর্ণ বাগানটি একটা যেন ঘন জঙগলে পরিণত হয়েছে।

আপনি মনেই এখন ফুল ফোটে, ফুল ঝরে, আগাছা বেড়ে চলে।

দীর্ঘকালের অয়ঙ্কে বাড়িটার ঘরের জানালা-কবাটগুলো জীৱণ ও ধৰ্সনপ্রায়।

দিবারাত্রি বাতাসে মচ্ছচ্ছ খট্খট শব্দ করে।

জৰিদার বাটি থেকে প্রায় তিনি মাইল দূরে ছিল এক দিগন্তপ্রসারী বিল। এই বিলের যোগাযোগ ছিল একেবারে পক্ষার সঙ্গে।

চারপুরুষ আগে করালীপ্রসন্ন চৌধুরী তাঁর প্রয়তনা রাণী কাণ্ডন-মালার জন্যে ঐ বিলের মধ্যে পাথর ফেলে এক প্রমোদভবন গড়ে তোলেন। এবং বিলের মধ্যেই পাথর ফেলে মাটি ঢেলে তৈরী করেন এক নকল দ্বীপ। ফল-ফুলের গাছগাছড়া লাগিয়ে দ্বীপের প্রাণসঞ্চার করেন।

নির্মাণ করেন দ্বীপের মধ্যস্থলে একটি সুরঘ্য ছোট বিশ্রামভবন। তার চারপাশে দিগন্দেশ হতে নার্নাবিধ, আকার, গন্ধ ও বৰ্ণ-বৈচিত্র্যের ফুলের গাছ এনে রচনা করেন এক উদ্যান; তারই নাম দেন নন্দনকানন।

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী যখন তাঁর স্ত্রী হেমপ্রভাকে নিয়ে প্রমোদভবনে এলেন, বহুবিদ্যের অবহেলায় ও অব্যবহার্যে এবং কালের নিষ্ঠার আঘাতে আঘাতে প্রমোদভবন জীৱণ ভগ্নপ্রায় এবং দ্বীপের মধ্যে নন্দনকানন জঙগলাকীৰ্ণ ও ভীষণ কালনাগের আবাসস্থল হয়ে উঠেছে।

প্রমোদভবনকে যথাসাধ্য মেরামত ও সংস্কার করে নিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

অল্পদিনের মধ্যেই হেমপ্রভার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি দেখা গেল। কিন্তু নিষ্ঠার ভীষণত্ব যা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর জন্যে অলঙ্কে অপেক্ষা করছিল, জীৱনের সুধার পূর্ণ প্রাপ্তিকে সহসা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

দাসী কালাইয়ের মা ও সবিতাকে নিয়ে রংগা হেমপ্রভা একটি কক্ষে শুতেন। পাশের ঘরেই শয়ন করতেন মৃত্যুঞ্জয়।

কানাইয়ের মার নিদ্রারোগটা চিরাদিনই বেশী। একদিন সকালে কানাইয়ের মার ডাকাডাকি ও চেচামেচাতে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ঘূর্ম ভেঙে জানলেন হেমপ্রভাকে বাড়ির মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

হৃতদম্পত্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন, শয়ার উপরে তখনও চার বছরের শিশুকন্যা সর্বিতা অথবারে ঘূর্মরে আছে।

মাকে যে তার পাওয়া যাচ্ছে না, কিছুই তার সে জানে না।
বাড়ির অন্যান্য ভৃত্যা—তখনও সকলে ঘূর্ম ভেঙে ওঠেন।

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী যেন পাগলের মত হয়ে গেলেন।

কোথায় গেল হেমপ্রভা কাউকে কিছু না জানিয়ে! তাঁদের দীর্ঘ দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের প্রতিটি দিনরাত্রির ইতিহাসকে তম তম করে অনুসন্ধান করেও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী হেমপ্রভার আকর্ষণিক অন্তর্ধানের কোন কারণ বা যীঘাংসা খুঁজে পেলেন না।

কোনাদিনের জন্যও তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এতটুকু ভুল বোঝাবৰ্ধী বা মনোমালিন্যের কারণ ঘটেন যাতে করে সহসা এর্বিনভাবে হেমপ্রভা কাউকে কিছু না জানিয়ে গৃহত্যাগ (?) করতে পারে।

হেমপ্রভাকে যে পাওয়া যাচ্ছে না, একমাত্র কানাইয়ের মা ও তিনি নিজে ছাড়া তৃতীয় আর কেউ জানে না।

কানাইয়ের মাকে নিজের ঘরে ডেকে এনে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ঘরের দরজায় খিল তুলে দিলেন।

শোন্ কানাইয়ের মা, তোর মাকে যে পাওয়া যাচ্ছে না একথা যেন কেউ না জানতে পারে। একমাত্র তুই ও আর্মি ছাড়া তৃতীয় কেউ জানে না। ধূণাক্ষরেও একথা কেউ কোনাদিন যদি জানতে পারে তবে তোকে জ্যুন্ত নলদন-কাননে ঘাটির তলায় কবর দেব।

কানাইয়ের মা থরথর করে কঁপছিল। গলাটা তার শুরুকয়ে গিয়েছে, কোনমতে একটা ঢোক গিলে শুরু নিম্নকণ্ঠে বললে, মরে গেলেও কেউ জানতে পারবে না বাব—

মনে থাকে যেন। হ্যাঁ দেখ, আজই রাতে আর্মি সর্বিতাকে নিয়ে কাশী যাব। তুইও আমার সঙ্গে যাবি। নিচের ঠাকুর চাকর কেউ যেন ওপরে না আসে। বর্লাব তোর মার কাল রাত থেকে অস্তুখের খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে। থা—

বাড়ির সকলেই জানল গত রাত থেকে হেমপ্রভা হঠাত অসুস্থ হয়ে পড়ার এখন খুব খারাপ অবস্থা চলছে। আজ রাতেই জর্মিদারবাবু অসুস্থা স্ত্রী, কন্যা সর্বিতা ও কানাইয়ের মাকে সঙ্গে নিয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাচ্ছেন।

স্ত্রীর অস্তুখের সংবাদ দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী রাত এগারোটায় স্টেশনে থাবার জন্যে দুর্খানা পালিকর ব্যবস্থা করতে বললেন নায়েবকে। রাত দুঁটোর গাড়িতে তিনি সম্মুখীক কলকাতায় যাবেন।

নায়েব বসন্ত সেনকে আদেশ দিয়েই মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আবার দোতলায় চলে গেলেন।

সমস্ত দিন বাড়িটা অসহ্য নিষ্ঠব্যতায় থরথম করতে লাগল।

যেন একটা ভয়াবহ সতর্কবাণী বাড়ির লোকজনদের বিভীষিকার অত

বিবে রইল।

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে কোথাও প্রতিটুকু কোন শব্দ নেই, এমন কি ছোট
মেয়ে সর্বিতার কঠিন্মূরটা পর্যন্ত একবারের জন্যে শোনা গেল না।

নিচের তলায় ঠাকুর চাকর দাসীর দল কেবল সপ্রশ্ন দ্রষ্টিতে এ ওর মুখ
চাওয়াচাওয়া করতে লাগল।

রাত এগারোটার সময় একখানা পাল্কি বেহারারা উপরে নিয়ে গেল এবং
আধ ঘণ্টা বাদে কাহার-বাহিত কবাট-বন্ধ করা পাল্কির পিছনে পিছনে ঘূর্ণন্ত
সর্বিতাকে বুকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী নেমে এলেন এবং তাঁর পশ্চাতে নেমে
এল কানাইয়ের মা।

কানাইয়ের মা সর্বিতাকে নিয়ে অন্য খালি পাল্কিটায় গিয়ে উঠে বসল।
ঘোড়ায় জিন দেওয়া ছিল।

নিঃশব্দে রান্তির অন্ধকারে পাল্কি দুটো প্রমোদভবনের গেট দিয়ে বের হয়ে
গেল।

পশ্চাতে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে পাল্কি দুটোকে অনুসরণ করলেন
জমিদার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।

মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত রাতের কালো আকাশ কেমন বোবা দ্রষ্টিতে
তারিয়ে রইল, আর বৌরাণীর বিলের ধারে ধারে ঝাউগাছগুলো নিঃশব্দে
অন্ধকারে সকরূপ একটা দীর্ঘবাস যেন সেই বোবা আকাশের গায়ে ছাড়িয়ে
দিতে লাগল।

চারদিন বাদে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী আবার কন্যা সর্বিতা ও কানাইয়ের মাকে
নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। এবং এসে উঠলেন আবার প্রমোদভবনেই।

লোকে জানল কলকাতাতেই হেমপ্রভার মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু ঐ চারদিনের মধ্যেই অঙ্গুত পরিবর্তন হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর।
তাঁর মাথার অর্ধেকের বেশী চূল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে, আর তাঁর দুঃ-
চোখের কোলে পড়েছে গাঢ় কালো একটা রেখা।

সারাটা রাত মৃত্যুঞ্জয় ঘূর্মাল না।

নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে ভূতের মত প্রমোদভবনের কক্ষে কক্ষে ছাতে ও
বারান্দার অলিঙ্গে ঘূরে ঘূরে বেড়ান।

দিন দুই বাদে কি খেয়াল হতে ভোররাতের দিকে হাঁটিতে হাঁটিতে নন্দন-
কাননের দিকে চললেন প্রমোদভবনের খিড়কির দরজাটা খুলে।

বহুদিন মানুষের পায়ের ছাপ এখানে পড়েন।

জঙ্গলে আকীর্ণ চারিদিক। পা ফেলা যায় না।

হঠাতে সেই নন্দনকাননের মধ্যে ঘূরতে ঘূরতে প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের
তলায় এসে হঠাতে ভূত দেখার মতই যেন চমকে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঠিক
সামনেই বকুল গাছটার তলায় ঘাসের উপরে পড়ে আছে হেমপ্রভা
মৃতদেহটা।

ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে দেহটা। এই সাতদিনে পচে দেহটা একটা ফুলেও
উঠেছে।

পরিধানে এখনো সেই সাতদিন আগেকার চওড়া লালপাড় শাঁড়িটা।

চিরাদিন চওড়া লালপাড় শাঁড়ি পরতেই হেমপ্রভা ভালবাসতেন।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে মৃত্যুঞ্জয় কতক্ষণ যে ঐখানে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর শব্দেহের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মনে নেই।

শোক দণ্ডখ বেদনা সকল অনুভূতি যেন বন্ধের মধ্যে জমে পাথর হয়ে গিয়েছে।

সহসা একটা খস্খস্ শব্দে চমকে ফিরে তাকালেন মৃত্যুঞ্জয়। ঠিক পশ্চাতে হাত-চারেকের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে কানাইয়ের মা।

কানাইয়ের মা তুই এখানে? কঠিন একটা উষ্মার ভাব মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে বরে পড়ে।

কানাইয়ের মা কোন জবাব দিতে পারে না।

নিঃশব্দে মাথা নিচু করে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে।

কানাইয়ের মা ও হেমপ্রভার মতদেহটা দেখতে পেয়েছিল।

সতাই কানাইয়ের মা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত।

হেমপ্রভাই তাঁর বাপের বাড়ি থেকে অপেবয়সী বিধবা সদ্যপ্রত্যহারা কানাইয়ের মাকে খাস দাসী করে নিয়ে এসেছিলেন।

কলকাতা থেকে ফিরে রাতে যখন অত বড় বাড়িটার মধ্যে নিঃশব্দে একা একা ছায়ার মত মৃত্যুঞ্জয় ঘূরে বেড়াতেন, অলঙ্ক্ষে থেকে সদাসতর্ক দ্রিণি দিয়ে কানাইয়ের মা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর উপরে নজর রাখছিল। মৃত্যুঞ্জয় যে তাঁর স্ত্রী হেমপ্রভাকে কত গভীরভাবে ভালবাসতেন কানাইয়ের মা তা জানত। এবং সেই কারণেই হেমপ্রভার এই আকস্মাকভাবে অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনের মধ্যে যে কত নিদারণ আঘাত হেনেছে তাও সে বুঝেছিল।

স্ত্রীর শোকে মনের ঝোঁকে মৃত্যুঞ্জয় হস্তাঙ্গ-আত্মহত্যা বা ঐ ধরনের কিছু করে ফেলেন এই ভয়েই কানাইয়ের মা সুদা-সতর্কার্য্যাল্টিতে মৃত্যুঞ্জয়কে দিবারাত্রি অলঙ্ক্ষে থেকে ছায়ার মত অনুসরণ করছিল।

এবং ঐভাবে অনুসরণ করতে করতে তোরঝাপ্তে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর পিছু পিছু নলনকাননে এসেছিল সে।

হেমপ্রভার মতদেহ ঐভাবে নলনকাননের বকুলতলায় দেখে সেও কম বিস্মিত হয়নি।

বল, কেন তুই এখানে এসেছিস?

আবার রুক্ষকঠিন কঠে প্রশ্ন করলেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।

কানাইয়ের মা তখন অকপটে প্রতুর কাছে সব কথা খুলে বললে।

মৃত্যুঞ্জয় এর পর আর কিছু বলতে পারলেন না কানাইয়ের মাকে। কানাইয়ের মা যে তাঁর প্রতি গভীর মমতাবশেই ঐখানে ঐভাবে তাঁকে অনুসরণ করে এসেছে জানতে পেরে কেন যেন তাঁর অন্তরটা সিন্ধু হয়ে এল।

ঐদিনই গভীর রাত্রে নিজ হাতে বকুলতলাতেই মাটি খুঁড়ে কানাইয়ের মার সাহায্যে মৃত্যুঞ্জয় শেষকৃত্যাটুকু পালন করলেন মৃত্যুঞ্জয়।

কানাইয়ের মা ভিন্ন আর নিবিতীয় কোন প্রাণীই ঐ ব্যাপারটা জানতে পারল না।

এবং সেই দিন থেকেই মৃত্যুঞ্জয় সর্বতার সমস্ত ভাব কানাইয়ের মার

হাতেই তুলে দিলেন।

আর কানাইয়ের মাকে বিশেষ করে সাবধান করে দিলেন লোকে যেমন জেনেছে যে হেমপ্রভাৰ কলকাতাতেই রোগের মৃত্যু হয়েছে তাই যেন জানে, এর বেশী কেউ যেন কিছু না জানতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় জৰ্মদার-ভবনে আর ফিরে গেলেন না।

প্রমোদভবনকেই আরো ভাল করে সংস্কার করে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দিলেন।

আর কেউ না জানলেও কানাইয়ের মা জনত, প্রায়ই গভীর রাতে জৰ্মদার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী নন্দনকাননে গিয়ে অন্ধকারে বকুলতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান।

প্রিয়তমা স্তৰীকে যেখানকার মাটিতে শেষ শয়ানে শুইয়ে রেখেছিলেন, সেখানকার মাটিই যেন তাঁকে অন্ধকার নিষ্পত্তি রাতে হাতছানি দিয়ে ডাকত।

এ খবর আর কেউ জানে না বাবু একমাত্র আমি ছাড়া। বলে চূপ করল কানাইয়ের মা।

সাবতার চোখের কোল দুটো ছলছল করছিল জলে ভরে গিয়ে।

তার মাঝের মৃত্যুর সকরূপ কাহিনী তাকে যেন নির্বাক করে দিয়েছে।

এদিকে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ॥

রাত্রিশেষের ঠাণ্ডা হাওয়া বিরোধে করে খোলা জানলা-পথে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করছিল।

কানাইয়ের মার কণ্ঠনঃস্তু বেদনাক্তিট কাহিনী যেন সমগ্র কক্ষটা জড়ড়ে জমাট বেঁধে আছে এখনো!

অন্ততঃ বোঝা যাচ্ছে, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর হত্যার ব্যাপারে একটা মৃত্যু বড় রহস্য।

॥ ৬ ॥

সত্যজিৎই প্রথমে নিম্নলিখিত ভঙ্গ করে কথা বললে, চৌধুরী মশাইয়ের মৃত্যু দেহও এই বকুলতলাতেই পাওয়া গেছে, তাই না?

হ্যাঁ।

এবং মৃতদেহ প্রথমে দেখতে পান বসন্তবাবুই না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা কানাইয়ের মা, তোমার মার মৃত্যু ও তোমার বাবুর মৃত্যু এ দুটো ব্যাপার তোমার কি বলে মনে হয়?

আজে দাদাবাবু, আমি তো বলেছিই আমার মনে হয় এ দুটোই কোন অপদেবতার কাজ।

কেন বল তো?

কানাইয়ের মা অতঃপর কেমন যেন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে।

কি যেন বলতে চায়, অথচ ঠিক বলতে সাহস পাচ্ছে না। সঙ্কোচ বোধ করছে।

বল না কি বলতে চাও? কেন তোমার মনে হয় এ অপদেবতার কাজ?

দেখতেন দাদাৰাবু, এ বাড়িটাই ভাল না !
বাড়িটা ভাল না ?

আজ্জে ! আমি অনেকদিন টোৱ পেয়েছি এ বাড়িটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন
অপদেবতা ভৱ কৰে আছে —

অপদেবতা ভৱ কৰে আছে ? কি পাগলেৰ মত যা-তা বকছ কানাইয়েৰ
মা !

হ্যাঁ বাবু, ঠিকই বলোছি। মানা রকমেৰ শব্দ রাত্ৰে অনেক সময় এ বাড়িতে
শোনা যায়। অনেক রাত্ৰে ঘৃণুৱেৰ শব্দও শুনোৰ্ছি।

চৰকতে সত্যজিতেৰ প্ৰথম রাধিৰ কথা মনে পড়ে যায়।

সেই মিষ্টি ন্যূনৱেৰ আওয়াজ ! সেই ন্যূনৱেৰ আওয়াজকে অনুসৰণ
কৰে তাৰ সিঁড়িপথে নিচে নেমে যাওয়া !

সেও তো জাগ্রত অবস্থাতেই সুস্পষ্ট সেই ন্যূনৱেৰ আওয়াজ
শুনোছিল !

সে কাউকে দেখতে পাৱনি বটে তবে স্পষ্ট কি সে শোনোনি কে যেন ন্যূনৱ
পায়ে তাৰ ঘৰেৰ মধ্যে চলে বেড়াছিল !

তাৰপৰ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গৈল, মিলিয়ে গৈল একটু একটু কৰে সেই
ন্যূনৱেৰ মিষ্টি আওয়াজ !

তাছাড়া তাৰ ঘৰেৰ ওপাশেৰ দৰজাটাও তো খোলা দেখতে পেয়েছিল।

তবে কি কানাইয়েৰ মা যা বলছে তাই ঠিক ? সত্য এ বাড়িতে কোন
অপদেবতা আছে ?

রাত্ৰেৰ অন্ধকাৰে চাৰিদিক নিৰুম হয়ে এলে, সবাই গাঢ় ঘৰমেৰ মধ্যে
তলিয়ে গেলে অশৱীৱী কেউ এ বাড়িৰ কক্ষে কক্ষে অলিন্দে প্ৰাণগণে সিঁড়ি-
পথে ন্যূনৱ পায়ে দিয়ে ঘৰে ঘৰে বেড়ায় !

এই বাড়ি ছেড়ে যায়নি ! সেই নাকি আজও নিষ্ঠুৰতাৰে ঘৰে
ঘৰে বেড়ায় !

বৌৱাণী ! বৌৱাণী আবাৰ কে ? কথাটা বলে বিস্মিত সপ্রশ্ন দাঙ্গিতে
তাকায় সত্যজিৎ কানাইয়েৰ মাৰ দিকে।

তাৰ জাননি ! বৌৱাণীৰ নামেই তো এই এত বড় বাড়ি তৈৱী হয়েছিল
গো। ঐ বিলেৰ জলেই তো বৌৱাণী ভূবে ঘৱেছিল গো। তাই তো লোকে
ঐ বিলকে আজও বলে বৌৱাণীৰ বিল !

এবাৰে সত্যজিৎ সপ্রশ্ন দাঙ্গিতে তাকায় সৰিবতাৰ দিকে।

সৰিবতাই এবাৰে অনুচ্ছাৰিত প্ৰশ্নৰ যেন জবাৰ দেয়, হ্যাঁ। আমিও
শুনোৰ্ছি বটে। তবে আমি কখনো কোন আওয়াজ বা শব্দ নিজেৰ কানে শুনোৰ্নি।

আপনার বাবাৰ কাছে কোনদিন কিছু এ সম্পর্কে শুনেছেন মিস চৌধুৱী ?

না। বাবা আমাকে কখনো কোনদিন আমাদেৱ বংশেৰ কোন কথা বা গল্প
বলেননি। বৱাবৱৰই লক্ষ্য কৰেছি, বাবা যেন ওসব ব্যাপারে অস্তুত একটা সংৰক্ষ
যোৰ্কা কৰে চলতেন। বহুদিন ঘনে পড়ে, বাবাকে দেওয়ালে টাঙানো মাৰ
এনেলাঞ্জড ফটোটাৰ সামনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কিন্তু একটা
দিনেৰ জন্মেও বাবা আমাৰ সঙ্গে মাৰ কোন কথাই আলোচনা কৰেননি। এখন
অবশ্য বুবতে পাৱছি কেন তা কৰেননি।

ରାତ୍ରି ଶେଷ ହୟେ ପ୍ରବୈଦିଗଲେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋର ରକ୍ତମ ଇଶାରା ସେନ ଦେଖା ଦିଯେଛେ ।

ଖୋଲା ଜାନଳା-ପଥେ ସେଇ ରକ୍ତମ ଆଲୋର ଆଭାସ ସେନ ଓଦେର ଅନ୍ତରକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମେ ଚପଣ୍ଡ କରେ ଗେଲ ।

କାନାଇରେ ମାକେ ବିଦାୟ ଦିଯେ ସତାର୍ଜିତ ସବିତାକେଓ ସେନ ଏକପକାର ଠେଲେଇ ତାର ସରେ ପାଠିଯେ ଦିଲେ, ଅନ୍ତତଃ କିଛିକ୍ଷଣେର ଜନ୍ୟ ବିଶ୍ଵାମ ନିତେ ।

ସାରାଟା ରାତ୍ରି ଜାଗରଣେର ପର ସତାର୍ଜିତେର ନିଜେର ଚୋଥ ଦୂରେ ଦୂରେ ଜବାଲା କରିଛିଲ । ସେ ଛାଦେ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାଳ ।

ଚାପା ଲାଲଚେ ଆଲୋଯ ସମ୍ମତ ପ୍ରକୃତ ସେନ ସାରା ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରକେ ଅର୍ତ୍ତକ୍ରମ କରେ ରକ୍ତମ ଚକ୍ର ମେଲେ ସବେ ତାକାଛେ ।

ପ୍ରଭାତୀ ବାୟୁତରଙ୍ଗେ ବିଲେର ବୁକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଟେଟଗୁଲୋ ଛନ୍ଦେର ଆଲପନା ବୁନେ ଚଲେଛେ ।

ଦୂରେ ନଜରେ ପଡ଼ିଲ ସେଇ ଘ୍ରୀପଟା ।

ଦୂର ଥେକେ ଘ୍ରୀପେର ଗାଛପାଲାଗୁଲୋ ତଥନେ ଥୁବ ଚପଣ୍ଡ ମନେ ହୟ ନା । ସେନ ଏକଟା ଅଚପଣ୍ଡତାର କୁରାଶାଯ ଘୋମଟା ଟେନେ ରହସ୍ୟେ ଘନୀଭୂତ ହୟେ ଆଛେ ।

ଏ ଘ୍ରୀପେର ମଧ୍ୟେଇ ଏକଦିନ ରହସ୍ୟଜନକଭାବେ ସବିତାର ମାଯେର ମୃତ୍ୟୁ ହରେଛିଲ, ଆବାର ଦୀର୍ଘ ଉନିଶ ବହର ବାଦେ ଏ ଘ୍ରୀପେର ମଧ୍ୟେଇ ଏକଦା ପ୍ରତ୍ୟସେ ପାଓଯା ଗେଲ ସବିତାର ପିତା ମୃତ୍ୟୁଜୟ ଚୌଥୁରୀର ମୃତ୍ୟୁଦେହ ।

ଉନିଶ ବହର ପ୍ରବେ ସେ ହତ୍ୟାକାନ୍ତ (?) ସଂଘଟିତ ହରେଛିଲ ଏବଂ ଉନିଶ ବହର ପରେ ମାତ୍ର କରେକାଦିନ ଆଗେ ସେ ହତ୍ୟାକାନ୍ତ ସଂଘଟିତ ହଇ, ଆଛେ କି ତାର ମଧ୍ୟେ କୋନ ଯୋଗାଯୋଗ ! ଦୂର୍ବିତ ହତ୍ୟାକାନ୍ତରେ ଏକି ସ୍ତରେ ଗାଁଥା, ନା ଏକେରେ ମଧ୍ୟେ ଅନୋର କୋନ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ !

କ୍ଷଣପ୍ରବେ କାନାଇରେ ମାର ବର୍ଣ୍ଣତ ଅତୀତେର ସ୍ଵଦୀର୍ଘ କାହିନୀ ହତେ ଏହିଟ୍ରକୁ ଅନ୍ତତଃ ବୋବା ସାଚେ, ମୃତ୍ୟୁଜୟ ଚୌଥୁରୀର ହତ୍ୟାର ବ୍ୟାପାରେ ଏକଟା ମୁକ୍ତ ବଡ ରହସ୍ୟ ଜାରିଯେ ଆଛେ ଏବଂ ସେ ରହସ୍ୟର ମୂଳଟା ହୟତ ବହୁଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତରିତ ।

କିମ୍ବୁ କେ କରବେ ସେଇ ଅତୀତେର ସବିନିକାକେ ଉତୋଳନ ?

କେମନ କରେ ଉଦ୍ୟାଟିତ ହବେ ସତାଇ କୋନ ଅତୀତ ରହସ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଏଇ ହତ୍ୟାକାନ୍ତର ମୂଳେ ଥାକେଇ, ସେଇ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରରୋଜନୀୟ ସତ୍ୟାକୁ !

ଅତୀତେର କଥା କାନାଇଯେର ମା ଯତ୍ତକୁ ଜାନତ ବଲେଛେ ।

ଆର ଏ ବାଢ଼ିତେ ବହୁଦିନକାର ପ୍ରାତିମନ ଲୋକ କେ ଆଛେ ? ବନମାଳୀ । ଆର ଆଛେନ ଏଦେର ନାଯେବ ବସନ୍ତ ମେନ ।

କିମ୍ବୁ ବସନ୍ତ ମେନର ମୁଖ ଥେକେ କି କୋନ କଥା ବେର କରା ଯାବେ ?

ବିଶେଷ କରେ ପରଶ୍ର ରାତ୍ରେର ଆଲୋଚନାର ବ୍ୟାପାରେ ତିନି ସେନ ଏକଟା ତାର ଉପରେ ଅମଲ୍ତୁଷ୍ଟି ହରେଛେନ ବଲେ ଓର ଧାରଣା ।

ଏକ୍ଷେତ୍ରେ କୋନ କଥାଇ ହୟତ ତିନି ବଲେବେନ ନା ।

କିମ୍ବୁ କେନିଇ ବା ବଲେବେନ ନା, ପରକ୍ଷଣେଇ ମନେ ହୟ କଥାଟା ସତାର୍ଜିତେର, ତାର ଉପରେ ଅମଲ୍ତୁଷ୍ଟ ହରେଛେନ ତୋ କି !

ମୃତ୍ୟୁଜୟ ଚୌଥୁରୀର ହତ୍ୟାର ବ୍ୟାପାରେ ତାର ତୋ କମ interest ଥାକବାର କଥା ନାହିଁ । ଆର କେବଳ interest ବା କେନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ତୋ ଏକଟା ଆଛେ । ଏବଂ ସବ କିଛିର ଉପରେ ନାଯେବ ବସନ୍ତ ମେନର ଏ ବାଢ଼ିର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ପର୍କଟା !

ଆସ୍ତାନୀ ବନ୍ଦୁ ବା ଅଭିଭାବକ ବଲତେ ସବିତା ଦେବୀର ଏକମାତ୍ର ଉନିଇ—ବସନ୍ତ

সেন।

নিকটতম আঘাতের পর্যায়েই আজ উনি সবিতা দেবীর পড়েছেন।

হ্যাঁ, তাঁকেই আরো ভাল করে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে অতীতের কোন কথা যা হয়ত একমাত্র উনি ব্যতীত আর কেউই জানেন না।

তাছাড়া একবার ঘূরে দেখে আসতে হবে বৌরাণীর বিলের ঐ ঘৰীপট। ঐ ঘৰীপটই হচ্ছে অবস্থান।

মনের মধ্যে সহসা কেমন যেন একটা অন্তুত প্রেরণা ঐ মহৃত্তেই অন্তুত করে সত্যজিৎ। বৌরাণীর বিলের ঐ ঘৰীপটা যেন অন্তুত ভাবেই ওর মনকে আকর্ষণ করতে থাকে।

সত্যজিৎ আর দেরী করে না।

মস্ত বড় একটা প্রাণগণ পার হয়ে একটা সরু অন্ধকার অলিপ্ত মত, সেই অলিন্দেরই শেষপ্রান্তে যে দরজাটা সেটা খুলতেই সত্যজিতের চোখে পড়ল, বিলের জলে বড় বড় পাথর ফেলে, মাটি ও কাঁকর বিছিয়ে পায়ে চলা রাস্তাটা বরাবর ঘৰীপের সঙ্গে গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে।

এটি যেন প্রমোদভবন ও ঘৰীপের সংযুক্ত একটি সেতু।

রাস্তাটি জল থেকে মাত্র হাতখানেক উঁচু।

বড় বড় পাথর দিয়ে বাঁধানো, দুর্দিকটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে জলের মধ্যে নেমে গিয়েছে।

দীর্ঘ কয় বৎসরের জলের স্পর্শে পাথরগুলোর বুকে সবুজ শ্যাওলার একটা আস্তরণ পড়েছে। যেন সবুজ মথমলের একখানা কাপেটকে কে বিছিয়ে দিয়েছে রাস্তাটার দুধারে।

এই জায়গাটায় বিলের জল খুব গভীর বলে মনে হয় না। কাকচক্র মত পরিষ্কার জল যেন টলটল করছে।

রাস্তাটার দুপাশে বড় বড় বুনো ঘাস গজিয়েছে, আর তার মধ্যে মধ্যে একপ্রকার জলজ কঁটালতা।

ছোট্ট ছোট্ট লাল ফুল সেই কঁটা লতায় ফুটে আছে। ঘন সবুজের মধ্যে সেই লাল ফুলগুলো যেন রক্তপ্রবালের মত জলছে।

সত্যজিৎ পথ অর্তক্রম করে ঘৰীপে এসে উঠল। শিভুজাকার ঘৰীপট।

পথটা এসে যেখানে ঘৰীপটায় শেষ হয়েছে, সেই ঘূর্থেই একটা আমলকী গাছ, ডোরের আলো আমলকী গাছের চিকণ পাতার উপরে বড় যেন পিছলিয়ে ঘাছে।

একটা দোয়েল আমলকী গাছটার ডালে বসে শিস্ দিচ্ছে।

সামনেই ডানহাতে একটা বাঁশঝাড়। বাতাসে বাঁশঝাড়টা আল্দেলিত হয়ে কট্কট্ শব্দ তুলছে।

ঘৰীপের মধ্যে পায়ে-চলা একটা পথ ছিল বটে এককালে, তবে এখন বহু-দিনের ষষ্ঠি ও সংস্কারের অভাবে খুঁজে পাওয়া দুর্কর। ঘন আগছায় সে পথের আর চিহ্নমাটও খুঁজে পাওয়া যায় না।

চারিদিকে ঘন সীমবেশিত গাছপালা অন্তুত একটা আলোছায়ার রহস্য দিয়ে দেরা। মধ্যে মধ্যে বায়ুর তাড়নায় বৃক্ষের পত্র ডালপালা আল্দেলিত হয়ে রহস্যময় এক শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করছে।

মনে হয় কারা যেন চাপা গলায় ফিস্ফিস্ক করে কি বলতে চাই।

অন্তুত একটা শিহরণ সর্বাঙ্গে অন্তর্ভব করে সত্যজিৎ।

অস্পষ্ট অনুচ্ছারিত কার সাবধান-বাণী যেন বলছে, এগিয়ো না! এগিয়ো না! ওখানে মৃত্যু! ওখানে বিভীষিকা!

তবু এগিয়ে চলে সত্যজিৎ।

আরো কিছুটা অগ্রসর হবার পর গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে নজরে পড়ে ঘৰীপের মধ্যস্থত বিরাম কুটীর।

কুটীরের ঠিক পশ্চাতেই একটা প্রকাণ্ড বকুল বক্ষের তলায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সত্যজিৎ।

এই সেই বকুল বক্ষ।

এরই তলায় উনিশ বছর আগে একদিন নিরুদ্ধিষ্ট হেমপ্রভার গালিত মৃতদেহটা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর মৃতদেহটা দেখতে পেরে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে।

আর দীর্ঘ উনিশ বছর পরে মাত্র সার্তাদিন আগে এই বকুল বক্ষের তলাতেই নায়ের বস্তি সেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনিও কি বিস্ময়ে নির্বাক হয়েছিলেন?

আশ্চর্য! উনিশ বছরের হলেও এই একই বক্ষতলে স্বামী ও স্ত্রীর মৃত্যু আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাগের কি নিষ্ঠার নির্মম পরিহাস!

য়ান্না-তদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর শ্বাসরোধ করে মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।

পরিষ্কার সহজ কথায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

কে হত্যা করল এমন করে স্বামী ও স্ত্রী—মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ও হেমপ্রভাকে।

একই লোকের হাতে কি স্বামী-স্ত্রী দ্বন্দ্বনই নিহত হয়েছেন!

কিন্তু এই বা কেমন? একই দিনে তো সেই সময় দ্বন্দ্বকেই হত্যা করা চলতে পারত?

একজনকে হত্যা করবার পর দীর্ঘ উনিশ বছরের ব্যবধানে আর একজনকে হত্যা করবার কারণটা কি! প্রয়োজন কি ছিল এই দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে প্রতীক্ষা করবার!

তবে কি একই হত্যাকারী দ্বন্দ্বকে হত্যা করেন? দ্বন্দ্ব হত্যাকারী দ্বন্দ্বকে হত্যা করেছে? হত্যাকারী দ্বন্দ্ব!

হত্যার কারণ উভয় ক্ষেত্রেই কি এক, না বিভিন্ন! বিভিন্ন কারণ হলেও অকুস্থান সেই বকুল বক্ষতল হল কেন?

একটার পর একটা চিল্টা সত্যজিতের মাথার মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগল।

দ্বন্দ্ব হত্যাই একই সূত্রে গাঁথা, না একটির সঙ্গ অন্যটির আদৌ কোন সম্পর্ক নেই! সম্পূর্ণ বিভিন্ন! কেবল ঘটনাচক্রে দ্বন্দ্ব হত্যাকান্দের মধ্যে একটা অন্তুত পারস্পর্য এসে গিয়েছে গ্রাম!

জট পার্কিয়ে গিয়েছে দ্বন্দ্ব হত্যা-রহস্য একত্র।

হত্যা-রহস্য দ্বন্দ্ব যতই পাক খেয়ে খেয়ে জট পার্কিয়ে তোলে, সত্যজিতের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা জিদ চেপে যায়।

ମୀମାଂସା ସତଇ ସନ୍ଦର୍ଭପରାହତ ବଲେ ମନେ ହୁଯ, ମନେର ମଧ୍ୟେ ତତି ସେଣ
ଆରୋ ତୀର କରେ ଓ ଏକଟା ରହିଥେର ହାତଛାନି ଅନୁଭବ କରେ ।

କାନାଇଯେର ମା ସେ ବଲତେ ଚାଯ ଏର ମଧ୍ୟେ କୋନ ଅପଦେବତାର କାନ୍ଦକାରଥାନା
ଆଛେ, ତା ଓ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ନା ଏବଂ ଯଣ୍ଡି ଦିଇସି ମାନତେ ପାରେ ନା ।

ଅଶିକ୍ଷତା କାନାଇଯେର ମାର କାହେ ଯେଠା ସମ୍ଭବପର ବଲେ ମନେ ହୁଯେଛେ,
ସତ୍ୟଜିତର କାହେ ସେଠା ଏକେବାରେ ସମ୍ଭବପର ବଲେ ମନେ ହୁଯ ନା ।

ମନେ ହୁଯ ଏକଟିବାର କଳାକାତାଯ ସେତେ ପାରଲେ ବୋଧ ହୁଯ ଭାଲ ହତୋ । ସେଥାନେ
ଗିଯେ କୋନ ଭାଲ ଡିଟେକ୍-ଟିଭେର ସନ୍ଧାନ କରେ ତାକେ ସାଦି ଏଇ କାଙ୍ଗ୍ରେସ କରା
ସେତ, ହୃଦ ସହଜେଇ ଏଇ ରହିଥେର ମୀମାଂସାଯ ପେଣ୍ଟନୋ ସେତ ।

ଭାବତେ ଭାବତେ ସତ୍ୟଜିଂ ମ୍ବୈପେର ମଧ୍ୟେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାତେ ଥାକେ ।

ମ୍ବୈପେର ମଧ୍ୟେ ସେ ବିରାମ କୁଟୀର, ସେଠା ଏକଟା ଏକତଳା ପାକା ବାଢ଼ି ।

ରୌଦ୍ର ବ୍ରଣ୍ଟି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରେ ବାଡ଼ିଟାକେ ପ୍ଲାଟିଯେଛେ ଓ ଭିରିଯେଛେ । ବାଡ଼ିଟାର
ଆସିଲ ରଂ କବେ ପ୍ଲାଟ୍ ବାଲସେ ଧୂରେ ମୁଛେ ଗିଯେଛେ ।

ଦେଉଯାଲେର ଗାରେ ଛାଦର କାର୍ନିଶ୍ରେ ଧରେଛେ ଫାଟିଲ ଆର ସେଇ ଫାଟିଲେର ମଧ୍ୟେ
ନିର୍ବିବାଦେ ବେଡ଼େ ଉଠେଛେ ବଟ-ଅଶସ୍ତେର ଗାଛଗୁଲୋ ।

ଜାନଲାର କବାଟଗୁଲୋ କୋନଟା କବଜାର ସଞ୍ଗେ ବୁଲିଛେ, କୋନଟାର ଏକଟା
ପାଞ୍ଚ ବନ୍ଧ କରା, କୋନଟାର ଦ୍ୱାଟେ ପାଞ୍ଚାଇ ହା-ହା-କରିଛେ ଖୋଲା । ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ
ହାଓୟାର ମାରିଚ-ଧରା କବଜାର କାଁଚ କାଁଚ ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଯାଏ । ରଂ ଚଟେ ଗିଯେଛେ ।

ଚାରିଦିକେଇ ଏକଟା ହତନ୍ତି ଅଯନ୍ତା ଅବହେଲାର ଛାବି ।

ବାଡ଼ିଟାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ଵ ଏକକାଳେ ସେ ଚମକାର ଏକଟି ଫୁଲେର ବାଗାନ ଛିଲ,
ବିଗତ ଦିନେର ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ସ୍ରଣ୍ଗର କ୍ଷରିକଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଆଜଓ ଚାରିଦିକେ ଛାଡ଼ିଲେ
ଆଛେ, ଦୈନ୍ୟ ଅବହେଲାଯ ବୁନୋ ଆଗାହାୟ ସମାକୀଣ ହରେ ।

ସେଇ ଗୋଲାପ, ଗନ୍ଧରାଜ, ସଂଇ, ଚାମେଲୀର ସମାରୋହ କାଁଟାଲତା ଓ ବୁନୋ
ଫୁଲେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତତାର ଲଙ୍ଘାଯ ସେବନ ମୁଖ ଢକେଛେ ।

ଏହି ହୃଦ ସେଇ ଚୌଥୁରୀଦେର ନଳନକାନ ।

ଚୌଥୁରୀବାଡ଼ିର ଆଦିରଣ୍ଣ ବିଲାସିନୀ ବଧୁଦେର ଅଲକ୍ଷରାଗରଙ୍ଗିତ ଚରଗେର
ନ୍ତପରିନିକବଣେ ଅତିତେ ହୃଦ ଏକଦିନ ଏଇ ନଳନକାନନ ଶବ୍ଦମୁଖୀରିତ ହରେ ଉଠିଲ ।

ଅନ୍ତଃପରେର ସଲଙ୍ଗ ବଧୁଟି ହୃଦ ଏଥାନେ ଆପନ ଖେଳାଳ-ଥୁଣିତେ ଅବାଧ
ମୁହଁନ୍ଦ ଗାତିତେ ଘୁରେ ବେଡ଼ିଲେବେଳେ ।

କଥିନୋ ହୃଦ କୋନ ଫୁଲଗାହେର ସାମନେ ଦାଁଢିଯେ ଡାଳ ଥେକେ ଫୁଲଟି ଛିପେ
ଆପନ କବରିତେ ଲାଲାଭରେ ଗୁଜେ ଦିଇଲେ ।

ଆଜ ତାରା କୋଥାଯ ?

ଏହି ଭଗ୍ନ ବିରାମ କୁଟୀରେର କଷ୍ଟର ବାୟୁତରଙ୍ଗେ କି ତାଦେର ଦୀର୍ଘବାସ ଶୋନା
ଯାଏ ?

ସମ୍ମର୍ଥେ ଛୋଟ ଅପରିସର ଏକଟି ବାରାନ୍ଦା ଏବଂ ବାରାନ୍ଦାର ସାମନେଇ ପର ପର
ତିନିଥାନା ସର ।

ପର ପର ତିନିଟି ଘରେର ମଧ୍ୟେଇ ଗିଯେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ ସତ୍ୟଜିଂ । ଘରେର ମେରେତେ
ଏକପର୍ଦା ଧୂଲୋ ଜମେ ଆଛେ । କତାଦିନ ଏଥାନେ ମାନ୍ୟରେ ପଦ୍ମଚିହ୍ନ ପଡ଼େନି କେ
ଜାନେ !

কথাটা সত্যজিৎ গ্রন্থের সকলবেলায় চা-পান করতে করতে সর্বিতার কাছে বললে, আপনার যদি কোন আপনি না থাকে মিস্ চোধুরী, তাহলে কলকাতার একজন ভাল ডিটেকটিভকে এনগেজ করে আসি এ ব্যাপারে !

আমিও গত রাত থেকে ঐ কথাই ভাৰছিলাম সত্যজিৎবাবু। কিন্তু নায়েবকাকাকে কি একটিবাৰ জিজ্ঞাসা কৰে তাৰ মতামত নেওয়া উচিত নহ ?

সত্যজিৎ সর্বিতার প্রশ্নেৱ জবাবে বলতে ঘাঁচছিল, নিশ্চয়ই। তাঁকে অবশ্যই একবাৰ জিজ্ঞাসা কৰতে হবে বৈকি, কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই ঘৰেৱ দৱজাৰ উপৰে নায়েবমশাইঝেৱ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কিসেৱ ঘতামত মা সৰি ?

উভয়েই চমকে ফিরে তাকাল।

পারে হৰিগেৱ চামড়াৰ চিটাঙ্গতো থাকা সত্ত্বেও ইতিমধ্যে কখন একসময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নায়েব বসন্ত সেন একবাৰে ঘৰেৱ ঘধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং ওদেৱ পৰস্পৰেৱ আলোচনার শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়েছেন, এৱা টেরও পায়ানি।

এই বে নায়েবকাকা, আসুন ! সৰিতাই আহবান জানাল।

কৰ্ত্তাৰ শ্রাদ্ধেৱ যোগাড় তো এবাৰে দেখতে হয়, সেই ব্যাপারেই একটা পৰামৰ্শ কৰিবাৰ জন্য তোমার কাছে আসছিলাম মা। কিন্তু একটা আগে কি যেন মতামতেৱ কথা বলিছিলে মা !

সৰিতা সত্যজিতেৱ ঘুৰেৱ দিকে একবাৰ পলকেৱ জন্য দণ্ডিষ্পাত কৰে।

তাৰপৰ একটা ইতস্ততঃ কৰে বলে, বলছিলাম নায়েবকাকা, বাবাৰ এই মতুৱাৰ কথাটা—একটা ইতস্ততঃ কৰে সৰিতা আবাৰ বলে, ব্যাপারটাকে আমৱা এত সহজে ভুলে বাব কেন ?

কিন্তু মা এক্ষেত্ৰে আমাদেৱ আৱ কৰিবাৰ বা কি আছে ? দারোগাবাবুৰ সঙ্গে তুমি এখানে এসে পেঁচৰাব পূৰ্বেও অনেক পৰামৰ্শ কৰেছি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা অস্পষ্ট ধৰ্মীয়াৰ মত মনে হয়। কোন দিক দিয়ে কোন স্ত্ৰেৱই সন্ধান আমৱা পাচ্ছি না, অন্তত বাব সাহায্যে একটা অনুসন্ধান কৰা যেতে পাৰে।

স্ত্ৰী হস্তত আমৱা আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু এসব ব্যাপারে যোগ ব্যাস্তও তো আছেন। তাৰা চেষ্টা কৰলে—

সৰিতাৰ কথায় বিস্মিত দণ্ডিতে তাকালেন নায়েব বসন্ত সেন ওৱ ঘুৰেৱ দিকে।

হ্যাঁ নায়েবকাকা, ভাৰছি কলকাতা থেকে একজন সন্দৰ্ভ ডিটেক্টিভ এনে— ডিটেক্টিভ।

হ্যাঁ, ডিটেক্টিভ। আপনি কি বলেন ?

সৰিতাৰ প্ৰস্তাৱে বসন্ত সেনেৱ চোখেমুখে একটা সূচন্ত বিৱৰণিৱ মেখা যেন দেখা দিয়ে পৰক্ষণেই মিলিয়ে যায়।

একবাৰ আড়চোখে বসন্ত সেন সত্যজিতেৱ দিকেও তাকালেন।

বেশ তো মা। তোমাৰ যদি তাই ইচ্ছা হয়—

তাহলে সত্যজিৎবাবু, আপনি আজই কলকাতায় চলে যান। একজন ভাল

দেখে ডিটেকটিভ একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

নায়েব বসন্ত সেন কিছুক্ষণ চূপ করে বসে রইলেন, তারপর হঠাত ঘেন গা-ছাড়া দিয়ে গলাটা থাকারি দিয়ে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, ভাল কথা মা, তোমার মামাবাবু নিয়ানন্দ সান্যাল মশাই এখানে আসছেন দুর্চার দিনের মধ্যেই। আমাকেও একটা চিঠি দিয়েছেন, আর এই নও তোমারও একটা চিঠি আছে।

বসন্ত সেন একটা খাম এগিয়ে দিলেন সর্বিতার দিকে।

মামাবাবু! মামাবাবু আসছেন? সর্বিতার মনে পড়ে নিয়ানন্দ সান্যালকে। মধ্যে মধ্যে কলকাতায় এসে ওর হস্টেলে ওর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং এখানেও এসেছেন। তার মা হেমপ্রভার দুরসম্পর্কীয় পিসতুত ভাই। আপন মায়ের পেটের ভাই নয়। ওর মায়ের মত্ত্যুর আগে মধ্যে মধ্যে এ বাড়তে আসতেন। কানাইয়ের মার মুখেই শোনা, তার মা নাকি ঐ সান্যাল-বাড়তেই মানুষ। ছোটবেলায় মা-বাপ মারা যাওয়ায় ঐ মামাবাবুর মার কাছেই নাকি মা মানুষ হয়েছে এবং ঐ সান্যাল-বাড়ি থেকেই মার বিবাহ হয়।

পরবর্তীকালে নিয়ানন্দ সান্যাল চার্কারিব্যাপদেশে পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

তবে দূর পাঞ্জাবে ঢলে গেলেও মামাবাবুর সঙ্গে ওদের সম্পর্ক বা যোগাযোগটা ছিন হয়নি, এমন কি তার মায়ের মত্ত্যুর পরও। কারণ বলতে গেলে তার মায়ের দিক দিয়ে একমাত্র আঘাতীয় ঐ নিয়ানন্দ সান্যালই ছিলেন বেঁচে। দুরসম্পর্কীয় ভাই বোন হলেও সেই শিশুকাল হতে একই গৃহে পাশাপাশি মানুষ হওয়ার দর্শন ও মায়ের ইহজগতে আর আপনার জন বলতে নিবৃত্তীয় কেউ না থাকায় নিয়ানন্দ সান্যাল অর্থাৎ তার ঐ মামাবাবুর মায়ের পরমাপ্তীয়ই কেউ না থাকায় নিয়ানন্দ সান্যাল অর্থাৎ তার ঐ মামাবাবু মায়ের পরমাপ্তীয়ই

লোকটিও চৰৎকার। বাঙালীর মধ্যে চচৰাচৰ অমন চৰৎকার দেহসোংগ্রহ বড় একটা চোখে পড়ে না। টকটকে উজ্জ্বল গায়ের বৰ্ণ। খড়েগর মত নাসিক। চোখ দুঁটো কি হাসাময়! একমত্ত্ব দাঢ়ি।

ইদানীঁ চূল দাঢ়ি সব প্রায় পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। কারণে অকারণে হা-হা করে প্রাণ খুলে হাসেন।

একমাত্র মাথায় শ্বেতশূল কেশ ও দাঢ়ি ছাড়া বৰুবার উপায় নেই লোকটার বয়স হয়েছে।

বয়সে তাঁর বাবার মতই।

দিন কুড়ি আগেও কলকাতায় কি একটা কাজে হঠাত এসেছিলেন একদিনের জন্য, তবু ওর সঙ্গে দেখা করতে ভোলেনৰ্ন।

বলেছিলেন এবাবে পরীক্ষা হয়ে গেলে ওর বাবাকে বলে কিছুদিনের জন্য ঝঁর কর্মস্থল লুধিয়ানায় ওকে নিয়ে যাবেন। সেখানে ওরই প্রায় সমবয়সী ঝঁর একটি মেয়ে আছে—নাম তার কল্যাণী। অবশ্য কল্যাণীকে আজ পর্যন্ত সে দেখেনি।

বসন্ত সেন বললেন, তাহলে আমি উঠি মা। সত্যজিতের যাবার ব্যবস্থা দেখি গে।

সর্বিতা নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বললে, হ্যাঁ, তাই যান নায়েব কাকা।

বসন্ত সেন বিদায় নিয়ে ঘর হতে বের হয়ে গেলেন।

সর্বিতা নিত্যানন্দ সান্যালের চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল।

নিত্যানন্দ সান্যালের চিঠিটা সংক্ষিপ্ত।

কল্যাণীয়া মা সর্বিতা,

সংবাদপত্র মাঝক তোমার পিতার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে
বিস্মিত ও মর্মাহত হইয়াছি। একাকিনী নিশ্চয়ই তুমি
বিশেষ বিপদে ও অস্থিরিধার পড়িয়াছ। তোমার বর্তমান
অবস্থা আর্মি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। শ্রীশ্রী
দয়াময় দীনবন্ধু তোমাকে সহসা ইভাবে কেন যে বিপদ-
গ্রস্ত করলেন ব্যবিতে পারিতেছি না। প্রভুর লীলা বোধ
সত্তাই ভার। যাহা হউক চিন্তা করিও না, এদিককার যা
হয় একটা ব্যবস্থা করিয়া শীঘ্রই দুচার দিনের মধ্যে আর্মি
রাজবাটি পেঁচিব।

পঃ। কল্যাণীকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।

ইত-

আঃ তোমার মামাবাৰু

পত্রখানা পড়ে সর্বিতা নিজেও যেন কতকটা স্বস্তি ও শান্তি বোধ করে।

অনেকক্ষণ পরে সত্যজিৎ কথা বলে, যাক এ একপক্ষে আপনার ভালই
হলো, আপনার মামা আসছেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে। কিন্তু এত বড় একটা
দৃঃসংবাদ, তাঁকেই তো সর্বাগ্রে সংবাদ দিয়ে এখনে আনানো উচিত ছিল।
বলতে গেলে এখনও তো দেখতে পাচ্ছ উনিই আপনার একমাত্র আত্মীয়।

সর্বিতা এবার সংক্ষেপে মামার পরিচয়টা দেয় সত্যজিতের কাছে, ইনি
অবিশ্য আমার নিজের আপন মামা নন। তবে আপনার জনের চাইতেও বেশী।
মার দ্রুসম্পর্কীয় পিসতৃত ভাই। এবং যা ঐ মামাদের বাড়িতেই মানুষ এবং
শূন্যেছ ওখান থেকেই মার বিবাহও হয়েছিল।

তা যাই হোক, উনি এল আপনি অনেকটা বল-ভরসা পাবেন তো বটেই।
তাছাড়া শুঁর মেয়েও যখন ও'র সঙ্গেই আসছেন—একজন সঙ্গী পাবেন, নিঃসঙ্গ-
তাও অনেকটা আপনার লাঘব হবে।

মামার মেয়ে কল্যাণীকে কখনো আর্মি দের্দিনি তবে শূন্যেছ সে আমারই
সমবর্যেসী।

তাহলে তো খুবই ভাল হবে।

*

*

*

ঐদিন রাত্রের গাড়িতে সত্যজিৎ কলকাতায় চলে গেল।

॥ ৮ ॥

কিরীটীর টালিগঞ্জের বাড়িতে সত্যজিৎ, সুৰূত ও কিরীটীর মধ্যে কথাবার্তা
হচ্ছিল।

সত্যজিৎ তার এক বন্ধু অমিয়র চিঠি নিয়ে প্রথমে সুৰূতের সঙ্গে দেখা
করে এবং সুৰূত সত্যজিৎকে সঙ্গে নিয়ে কিরীটীর ওখানে আসে।

কিরীটী হাসতে হাসতে একসময় বললে কিন্তু একটা কথা র্যাদ আমাকে

খুলে বলেন সত্যজিৎবাবু, তাহলে বড়ই স্থগী হই।

বলুন কি জানতে চান!

আপনি তো সম্পূর্ণ ত্রুটীয় ব্যক্তি, but why you are so much interested?

কিরীটীর প্রশ্নে সত্যজিতের মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে।

সেটুকু কিরীটীর দ্রষ্টিই এড়ায় না। মন্দ হেসে সে বলে, বলোছি। আর বলতে হবে না। আচ্ছা আপনাদের মধ্যে কোন প্র্ব-পরিচয় বা সাক্ষাত আলাপ ছিল?

সত্যজিৎ এতক্ষণে লজ্জা ও সংকেচিত কাটিয়ে উঠেছে, স্মিতকণ্ঠে বললে, তাহলে আপনাকে কথাটা খুলেই বলি কিরীটীবাবু। আপনাকে বলেছি, আমার বাবা ও ম্তুজয় চৌধুরী গ্রামে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তেন। আমাদের বাড়ি রাজবাড়িরই পাশের গ্রামে মহেশডাঙ্গা। মাঝে থাকে একটা খাল। মহেশডাঙ্গা থেকে প্রত্যহ খাল পার হয়ে বাবা পাশের গ্রামের স্কুলে পড়তেন। আসতেন। ম্তুজয় চৌধুরী জমিদার-বাড়ির ছেলে; এন্ট্রান্স পাস দেবার পর আর তিনি লেখাপড়া করেননি। বাবারও লেখাপড়া হয়ে ওঠেনি অর্থাত্বে। এবং পাস দেবার কিছুদিন পরেই বাবা একবস্তে কোনমতে ভাগ্যব্যবেষ্টনে পার্লিয়ে ধান সন্দূর বর্মায়। ক্রমে বাবা সেখানে গিয়ে কাঠের ব্যবসা করে নিজের অবস্থা ফেরান। দুই বন্ধুর মধ্যে ভাগ্যক্রমে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও ঘোগাঘোগটা ছিল হয়নি কখনও। নিয়মিত প্রতিমারফৎ পরস্পরকে সকল সংবাদ দেওয়া-নেওয়া করতেন। আমার চাইতে সর্বিতা বছর ছয়েকের ছোট। দুই বন্ধুর মধ্যে প্রত মারফতই কথা হয়েছিল, আমার সঙ্গে বাবা সর্বিতার বিবাহ দেবেন। অবশ্য এসব কথা কিছুই আমি জানতাম না। পরে মাস পাঁচেক আগে বিলেত থেকে ফিরে আসার পর বাবা একদিন আমাকে ঘরে ডেকে বললেন সব কথা। এবং তাঁর ইচ্ছাটুকুও জানালেন। কিন্তু আমি রাজী হলাম না। যাকে কোনদিন দেখিবান, যার সম্পর্কে কিছুই জানি না বলতে গেলে, তাকে হঠাতেই সাড়া পার্ছিলাম না। কিন্তু বাবা বার বার আমাকে বলতে লাগলেন তাঁর বাল্যবন্ধুকে তিনি কথা দিয়েছেন, অন্যথায় তিনি দস্তাপ্রারক হবেন। অবশ্যে বাবার পৌঢ়াপৌড়িতে কতকটা বাধ্য হয়েই আমি বললাম, বেশ, এখানে এসে সেই মেয়েকে দেখে যদি আমার পছন্দ হয় তাহলে আমি এ বিবাহে রাজী আছি। বাবা তাঁর বন্ধুকে প্রত মারফৎ সব কথা জানালেন। ম্তুজয় চৌধুরীও এ বিষয়ে দেখলাম অত্যন্ত আধুনিক মনোভাবাপ্রয় ছিলেন। তিনি পত্রোন্তরে জানালেন, তাই হবে, আমি যদি গিয়ে তাঁর মেয়েকে দেখে পছন্দ করি তাহলে এ বিবাহ হবে। আর তাছাড়া এও তিনি জানালেন, আজ পর্যন্ত তাঁর মেয়েকে এ বিবাহ সম্পর্কে কোন কথাই জানাননি যখন তখন আমার গিয়ে তাঁর মেয়েকে দেখার মধ্যে কোন অসুবিধাই থাকতে পারে না। সেই অনুসারেই সামনের গ্রীষ্মের বন্ধে সর্বিতা বাড়ি যাবে, আমাকেও ঐ সময়েই যেতে লিখলেন।

আপনি তাহলে সেই ব্যবস্থা অনুযায়ীই এসেছেন বাংলাদেশে? হ্যাঁ।

আচ্ছা পরে আপনার সঙ্গে ও সর্বিতা দেবীর সঙ্গে ও-সম্পর্কে কোন কথাবার্তা হয়েছে?

না।

ভাল কথা, নায়েব বসন্ত সেন যখন চৌধুরী-বাড়িতে বহুদিন আছেন, এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু জানেন?

জানাটাই তো স্বাভাবিক। এবং আমার মনে হয় জানেনও, কারণ আর্ম যে আসছি সে কথাটা যখন তিনি চৌধুরী ইশাইয়ের কাছে শুনেছিলেন তখন ও কথাটা কি আর শোনেননি?

তা বটে। তবে আপনার সঙ্গে ঐ সম্পর্কে কোন কথা হয়েছে কি?

না।

আপনার বাবাকে তাঁর বন্ধুর নিহত হ্বার সংবাদটা নিশ্চয়ই আপনি দিয়েছেন?

দিয়েছি।

আর বিবাহ সম্পর্কে আপনার মতামতটা? কিরীটীর চোখের কোণে কৌতুকের চাপা হাসি।

সত্যজিৎ চাপা হাসির সঙ্গে জবাব দেয়, শুধু আমার মতামত হলোই তো এক্ষেত্রে চলবে না মিঃ রায়। সর্বিতা দেবীরও এখন বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছেন, তাঁর নিজস্ব একটা মতামতও তো আছে এ ব্যাপারে।

হাঁ, তা একটা আছে বৈকি। তবে তাঁকে না দেখে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না করেই তাঁর সম্পর্কে আপনার ঘূর্থ থেকে বতটুকু জেনেছি, আপনার যখন এ বিবাহে অমত নেই তখন তাঁর দিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কেন বলুন তো? একজনের সঙ্গে আলাপ করে অন্যের thought-readingও আপনি করতে পারেন নাকি দ্রু খেকেই?

তা একটু-আধটু-পারি বৈকি। নহলে এত সহজে এ ব্যাপারে আর্ম রাজী হতাম না। বিশেষ করে যখন জানতে পারছি এ ব্যাপারের শেষটুকু মধুরেণ সমাপ্ত হবে; এর আগের অধ্যায়ে যত দুঃখই থাকুক না কেন, সেটাই মনকে আমার inspiration দ্রুগয়েছে। নহলে সত্য কথা বলতে কি আপনাকে, আজ-কাল তথাকথিত হত্যা-রহস্যের মীমাংসার ব্যাপারে যেন কোন interestই পাই না। সেই অর্থ, সেই লালসা, সেই প্রেম, সেই প্রতিহিংসা প্রত্যেকটি হত্যার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত শেষ দশ্যে হয় হাতকড়া বা ফাঁসির দাঢ়ি দিয়ে এমন একটা করুণ রসের সংগ্রহ করে যে, নিজের উপরও যেন ধিক্কার এসে যায়।

কিন্তু সত্যিকারের culprit বা দেৱীকে ধরিয়ে দেওয়াও তো নাগরিক হিসাবে আপনার একটা মহৎ কাজ বা কর্তব্য।

তা ঠিক আমার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয় সত্যজিৎবাবু। এককালে একটা মোহ ও vanity বশেই এ lineয়ে হাত দিয়েছিলাম। বুদ্ধির দেলায় একজনকে ধরাশায়ী করতে একটা অপ্রাৰ্পণ পূলক অনুভব করতাম। তবে সেটা একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন নেশাটা এসেছে থিতিৱে।

কেন?

তাঁর কারণ দেখতে পাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তথাকথিত ঐ সব ভিলেনের দল অপরাধই করে বটে, তবে অপরাধের প্রটাকে জানে না।

অপরাধের আর্ট?

হ্যাঁ। আট বলতে অবশ্য এক্ষেত্রে আমি এখানে ভিলেনের চাতুরীটাকেই mean করেছি। বলাই বাহুল্য আপনার ব্যাপারটা সে পর্যায়ে পড়ে না, কারণ আপনার কাছ হতে আনন্দপূর্বক সমস্ত ঘটনা শুনে আমার যতদূর মনে হচ্ছে, হেমপ্রভা চৌধুরী ও মতুজগুলি চৌধুরীর হত্যার ব্যাপার দৃঢ়ে একস্ত্রে তো গাঁথা নয়ই, হত্যাকারীও এক নয়।

সত্যজিৎ যেন একটু বিস্মিত হয়েই কিরীটীর মুখের দিকে তাকায় এবং বলে, কিন্তু তাই যদি হবে, তাইলে দৃঢ়ে মতদেহ একই জায়গায় পওয়া গেল কেন? Why peculiar coincidence!

ঘটনার পারম্পর্য বা সামঞ্জস্য এক এক সময় এরকম অল্ভুত ঘটতে দেখা যায় সত্যজিৎবাবু, কিন্তু দীর্ঘ উর্ণিশ বছরের ব্যবধানে একই হত্যাকারী প্রথম হত্যার পর নিবিতীয়বার হত্যা করবে এটা আদপেই স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু—

না সত্যজিৎবাবু, time factor is a very important factor! আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যেসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকে, হত্যাকারী একটা ক্ষণিক উভেজনার মুহূর্তেই হত্যা করে বসে। প্র্ব-পরিকল্পিত ভাবে সব situationকে closely watch করে হত্যা করে না। অবশ্য একেবারেই যে হয় না তা আমি বলতে চাই না, কারণ নজিরের অভাব নেই। যেমন ধরনুন পাকুড় মার্ডার কেস, ভাওয়ালের মধ্যম কুমারকে হত্যার প্রচেষ্টা—প্ল্যান করেই এবং সময় প্রয়োজন ঘটনাকে ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে বুঝতে পারবেন সেরকম কিছু নয়। প্রথমটা নিবিতীয়টাকে follow করেনি, তবে নিবিতীয় হত্যাটা প্রথম হত্যাটার cause বা কারণ হতে পারে। সে যাক। এ ধরনের মতামত প্রকাশ করবার আগে আমাদের অনেক কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য এ ব্যাপারে জানা প্রয়োজন। এবং আরো অনেক কিছু বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। অর্থাৎ যাকে আমরা তদন্তের ব্যাপারে findings বলি—সব এখনও আমাদের হাতে তো আসেনি—

তাহলে কবে আমরা রওনা হচ্ছি মিঃ রায়?

শুভস্য শীঘ্ৰঁ! আজই রাত্রে গাড়িতে হলেই বা ক্ষতি কি?

বেশ তো, তবে সেই রকম ব্যবস্থাই করি।

করুন।

অতঃপর সত্যজিৎ তখনকার মত কিরীটীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাঠোথ্বন করে।

॥ ৯ ॥

কিরীটীকে নিয়ে সত্যজিৎ রাজবাটিতে পোঁছবার পরের দিনই সন্ধ্যার দিকে নিত্যানন্দ সান্যাল মশাই তাঁর কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে এসে পোঁছলেন।

স্টেশনে জমিদার-বাড়ির টমটেই সান্যালমশাইকে আনতে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার সবে তখন চারিদিকে ঘন হয়ে এসেছে। প্রমোদভবনের কক্ষে কক্ষে বাতি জরলে উঠেছে।

সত্যজিতের ঘরেই কিরীটী তার থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল।

সত্যজিং পাশের ঘরে সর্বিতার সঙ্গে কথা বলছিল, আর কিরীটী একা ঘরের মধ্যে একটা আরাম-কেদারার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করে মধ্যে মধ্যে ধ্রুমোদ্ভ্বরণ করছিল।

সিংড়তে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং সেই সঙ্গে শোনা গেল গম্ভীর মোটা গলার ডাক, সবি ! আমার সবি মা কই !

কণ্ঠস্বর শুরু করে প্রবেশ করা মাঝই কিরীটী সহসা যেন নিজের অভ্যন্তরে আরাম-কেদারাটার উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে।

পায়ের শব্দ করেই সিংড়ি-পথে উপরের দিকে উঠে আসছে।

সর্বিতাও বোধ হয় সে কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল এবং ঘর থেকে বাইরে বারান্দায় বের হয়ে এসেছিল।

কিরীটীও উঠে এগিয়ে যায় খোলা দরজাটার দিকে।

এবং নিজের অস্তিত্বকে গোপন রেখেই ইচ্ছা করে দরজার খোলা কবাট দ্বাটো ভেজিয়ে দিয়ে ঈষৎ ফাঁক করে বাইরের বারান্দায় দ্রুতপাত করে।

সিংড়ির মাথাতেই আগন্তুক নিয়ানন্দ সান্যালের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল এবং সর্বিতা নীচু হয়ে নিয়ানন্দের পায়ের ধূলো নিতে যেতেই নিয়ানন্দ পরম স্নেহে প্রসারিত দুই বাহুর সাহায্যে সর্বিতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মধুসস্ত করুণ কঢ়ে বলে উঠলেন, থাক মা থাক, হয়েছে—হয়েছে।

কণ্ঠস্বরটা সান্যালমশাইয়ের অশ্রুতে যেন বুজে আসে, চোখের কোলেও দ্বিফোটা জল চক্রক্ করে ওঠে বোধ হয়।

সর্বিতার মাথাটা সান্যালমশাই নিজের প্রশংসিত বক্ষের উপর ন্যস্ত করে ধীরে ধীরে ওর মাথার চুলে সন্মেহে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করতে থাকেন।

বারান্দার যেটুকু আলো সান্যালমশাইয়ের চোখে-মুখে পড়েছিল, সেই আলোতেই কিরীটী দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে, অন্তরের রূপৰ শোকাবেগটা সামলাবার জন্য সান্যালমশাই যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে সান্যাল-মশাইয়ের মেরে কল্যাণীও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কল্যাণী সর্বিতার চাইতে বছর চারে কর ছোট হবে বলেই মনে হয়। মেরোটি কালো দেখতে হলেও সে কালো রূপের মধ্যে অপ্রূ একটা শ্রী আছে। মেরোটির মৃখখানির যেন এক কথায় তুলনা হয় না। ছোট কপাল, কপালের উপর কয়েকগাছি চূর্ণ কুল্তল এসে পড়েছে; দ্বিচোখের দ্রুতিতে অপ্রূ একটা বৃক্ষের দাঁপ্ত যেন ঝকঝক করছে।

সর্বিতা নিজেকে সামলে নিয়ে সান্যাল মশাইয়ের সন্মেহের বাহুবল্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ধীরকষ্টে বলে, চলুন মামাবাবু, ঘরে চলুন।

চল মা।

কল্যাণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে সর্বিতা তাকেও আহবান জানায়, এসো কল্যাণী।

প্রভু হে, দয়াময় ! সবই তোমার ইচ্ছা ! বলতে বলতে সান্যালমশাই সর্বিতা ও কল্যাণীকে অনুসৃত করে সর্বিতার ঘরের দিকে অগ্রসর হতেই সর্বিতার ঘরের দ্বারপথে সত্যজিং এসে দাঁড়াল।

সহসা খোলা স্বারপথে সত্যজিংকে এসে দাঁড়াতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন সান্যালমশাই, এবং একবার সত্যজিতের দিকে তাকিয়ে নিমেষেই তার

আপাদমস্তক এক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সর্বতার দিকে ফিরে তাকালেন জিজ্ঞাসা
দৃষ্টিতে।

সর্বতা কোন প্রকার ইত্যভূত মাত্র না করে সান্যালমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে
বললে, বাবার বন্ধুর ছেলে সত্যজিৎবাবু, বর্মা থেকে এসেছেন।

ও, তুমই সত্যজিৎ-মত্তুঞ্জয়ের বন্ধুপুত্র! মত্তুঞ্জয়ের মুখে তোমার
সম্পর্কে আমি সব কথাই শনেছি। তা বেশ বেশ,—, কথাটা বলে এবাবে
সত্যজিতের দিকে সম্মেহ দৃষ্টিতে তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, তা বাবাজীর
এখানে কবে আসা হলো?

সর্বতা দেবীর সঙ্গে একই ট্রেনে এখানে এসেছি। জবাব দিল সত্যজিৎ।

একই ট্রেনে আসা হয়েছে! তা বেশ বেশ! মত্তুঞ্জয়ের বন্ধুপুত্র তুমি, এ
বাড়ির পরমাঞ্চায়ী বইক। হ্যাঁ মা সর্ব, এর এখানে থাকতে কোন কষ্ট বা
অসুবিধা হচ্ছে না তো?

না, না, আপনি বাস্ত হবেন না মাঝাবাবু। প্রত্যুভূত দেয় সত্যজিৎ।

সকলে এসে সর্বতার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল।

সত্যজিৎ একটা খালি চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে সান্যালমশাইয়ের দিকে
তাকিয়ে বললে, বস্ন মাঝাবাবু।

সান্যালমশাই চেয়ারটার উপর উপবেশন করে একবাব ঘরের চতুর্দশকে
দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলেন।

বসন্তের সঙ্গে দেখা হলো না—সে কি নেই? জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকালেন
নিত্যানন্দ সর্বতার মুখের দিকে।

হ্যাঁ, বসন্তকাকা আছেন তো। সর্বতা জবাব দেয়।

কই, নিচে তাকে দেখলাম না তো।

দৃশ্যের দিকে কাছারীতে গিয়েছেন, এখনো বোধ হয় ফেরেননি।

এমন সময় নীচে একটা উচ্চকক্ষের গোলমাল শোনা গেল। গোলমালের
শব্দ ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই কানে এসেছিল এবং সকলেই প্রায় উৎকর্ণ
হয়ে ওঠে।

ব্যাপার কি! নিচে এত গোলমাল কিসের? নিত্যানন্দই কতকটা যেন
স্বগতভাবেই প্রশ্ন করলেন।

আমি দেখছি। সত্যজিৎ এগিয়ে যায়।

সর্বতা ও সত্যজিৎকে অনুসরণ করে।

নিচে বাইরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সত্যজিৎ ও সর্বতা ধূমকে দাঁড়িয়ে
যায়।

অত্যন্ত দীর্ঘকায় মিলিটারী লংস ও বুসকোট পরিধান এক ভদ্রলোক
উচ্চকক্ষে নামের বসন্তবাবুর সঙ্গে তর্ক করছেন। ঠাকুর, বনমালী, গোবিন্দ
প্রভৃতি ভূত্যের দল চারিদিকে দাঁড়িয়ে ভিড় করে।

আগন্তুকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ গঠন প্রথমেই সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।
মুখখনা চৌকো। ছড়ানো চোয়াল।

মুখখনা দেখলেই মনে হয় যেন অত্যন্ত দ্রুবশ্ব কঠিন ও কর্কশ। চোখ
দুটো ছোট ছোট গোলাকার।

লোকটার সামনেই পায়ের কাছে একটা হোড়অল স্ট্রাপ দিয়ে বাঁধা, একটা
চামড়ার মাঝারি আকারের সুটকেস ও একটা এ্যাটাচী কেস।

আগন্তুক বসন্তবাবুকেই প্রশ্ন করছিল—আমার চিঠি পার্নি মানে কি ! এডেন থেকে পর পর দণ্ডখানা চিঠি দিয়েছি। এতদ্ব পথ এই বোৰা নিজেৰ কাঁধে করে নিয়ে আসতে হয়েছে।

না, আপনার কোন চিঠিই পাইন।

বেশ, চিঠি না পেয়েছেন না পেয়েছেন। চিঠিটা গেলে আৱ এমনি ঝামেলাটা আমাকে সহজ কৰতে হতো না—

কিন্তু আপনার পৰিচয় সম্পর্কে যখন আৰ্মি এতটুকুও জ্ঞাত নই, তখন এ বাড়তে আপনাকে আৰ্মি উঠতে দিতে পাৰি না। নায়েব বসন্ত সেন বললেন।

বটে ! উঠতে দিতে পাৰেন না ! আমাৰ পৰিচয়টা পাৰও নয় ?
না। দৃঢ়কণ্ঠে বসন্তবাবু প্ৰত্যন্তৰ দেন।

তাহলে আপনি বলতে চান যে মৃতুঙ্গয় চৌধুৱী আমাৰ কাকা ছিলেন না ? অৰ্থাৎ সোজা কথায় আৰ্মি তাৰ ভাইপো নই ? কিন্তু এ কথাটাও কি কখনও আপনি শোনেননি কাকার মূখে যে, তাৰ এক বড় জাঠতুতো ভাই ছিল শশাঙ্ক-শেখৰ চৌধুৱী এবং ১৮ । ১৯ বৎসৰ বয়সেৰ সময় তিনি ভাগ্যাব্বেষণে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান ? আপনি তো শুনি বহুকাল এ-বাড়িত আছেন। এ কথাটা কখনো কাকার মূখ শোনেননি ?

শুনেছি। শুনেছি তাৰ এক জাঠতুতো ভাই ছিল কিন্তু—

তবে আবাৰ এৱ মধ্যে কিন্তুটা কি ?

কিন্তুটা ষষ্ঠেট আছে বৈকি। গম্ভীৰ দৃঢ় সংযত কণ্ঠে বসন্তবাবু এবাবে বললেন, আপনি সন্তোষ চৌধুৱী ষে সেই গৃহত্যাগী শশাঙ্কশেখৰ চৌধুৱীৰই একমাত্ৰ পুত্ৰ তাৰ তো কোন প্ৰমাণ দেৰননি, একমাত্ৰ আপনার কথা ছাড়া—

What do you mean ! আমাৰ কথা ছাড়া মানে কি ? আমাৰ কথাৰ কি কোন ঘূলাই নেই ? আপনি তাহলে বলতে চান I am an imposter—প্ৰতারক !

মিথ্যে আপনি চেঁচাচ্ছেন মশাই। গলাবাজি কৰে এ প্ৰশ্নেৰ মীমাংসা হতে পাৰে না। আপনার কাছে কোন লিখিত-পত্ৰিত প্ৰমাণ আছে কি, যাৰ সাহায্যে আপনি প্ৰমাণ কৰতে পাৰেন যে আপনিই সেই শশাঙ্কবাবুৰ পুত্ৰ সন্তোষ চৌধুৱী, এই চৌধুৱী বংশেৱই একজন—

তাৰও আছে বৈকি ! প্ৰয়োজন হলে আদালতেই সেটা আৰ্মি পেশ কৰবো, আপনাকে নয় অবশ্য—, ব্যৱহাৰিক কণ্ঠে জবাৰ দিল সন্তোষ চৌধুৱী।

সৰিতা এতক্ষণ নিঃশব্দ বিস্ময়ে ওদেৱ পৰস্পৱেৱ কথা-কাটকাটি শুনৰছিল। কিন্তু চূপ কৰে থাকতে পাৱল না, একটু এৰিগয়ে এসে বললে, কে এই ভদ্ৰলোক কাকাবাবু ?

সন্তোষ চৌধুৱী সৰিতাৰ কথায় তাৰ দিকে চোখ তুলে তাকাল, তুমই বোধ হয় সৰিতা, কাকার মেয়ে ? আমাকে তুমি চিনবে না। আৰ্মি তোমাৰ জাঠতুতো ভাই। এডেন থেকে আসছি, আমাৰ নাম সন্তোষ চৌধুৱী।

এডেন থেকে আসছেন ?

হ্যাঁ। It's a long journey ! সব বলবো, আগে একটু চা চাই বোন। তুম্হাৰ গলা একেবাৱে শুকিৱে কাঠ হয়ে গিয়েছে। এমন হতছাড়া জায়গা যে স্টেশনে একটা চায়েৰ স্টল পৰ্যন্ত নেই। পৰক্ষণেই সৰিতাৰ জবাৰেৰ অপেক্ষা মাছও না কৰে অদ্বৰে দণ্ডায়মান ভত্তেৱ দিকে তাকিয়ে বললে, এই বেটোৱা, হী

করে ভূতের মত দাঁড়িয়ে দেখছিস কি ! জিনিসগুলো উপরে নিয়ে চল না ।
I want some rest, ভীষণ tired !

কিন্তু তার কথায় কেউ কোন আগ্রহ জানায় না । যে যেমন দাঁড়িয়েছিল
তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে ।

সন্তোষবাবুর জিনিসগুলো নিচের মহলে আমার পাশের খালি ঘরটার রাখ ।
গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে বস্তুবাবু বললেন ।

নিচের মহলে থাকতে হবে মানে ? তৌক্ষ্য দ্রষ্টিতে তাকাল সন্তোষ
চৌধুরী বস্তুবাবুর মুখের দিকে ।

হাঁ, নিচের ঘরেই আপনাকে থাকতে হবে যতক্ষণ না আপনার identity
আর্থি সঠিকভাবে পার্শ্ব ।

কঠিন স্বরে নায়েব বস্তুবাবু বলে ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন আর স্বিতীয়
কোন বাক্যব্যাপ্ত মাত্রও না করে ।

বস্তুবাবুর খড়মের শব্দটা খট-খট করে ঘরের বাইরের বারান্দায় ফিলিয়ে
গেল । ঘরের মধ্যে যারা আর সকলে উপস্থিত ছিল, স্থাগন মত নিঃশব্দে
দাঁড়িয়ে রইলো ।

শেষ নির্দেশ যেন জারী হয়ে গিয়েছে । এবং বস্তুবাবুর মুখ্যনিঃস্ত সে
নির্দেশের বিরুদ্ধে এ কক্ষের মধ্যে উপস্থিত কারো যেন এতটুকু ক্ষীণ প্রতি-
বাদ করবারও ক্ষমতা বা দৃঃসাহস নেই, সেটুকু ব্যবহাতে কারোরই কষ্ট হয় না ।

কক্ষের জমাট স্তম্ভতাকে ভঙ্গ করে প্রথমেই কথা বলল সন্তোষ চৌধুরী,
তাহলে আমাকে নিচের ঘরে থাকতে হবে সর্বিতা ? কথাটা বলে সন্তোষ
সর্বিতার মুখের দিকে তাকাল ।

ঘটনার পরিস্থিতিতে সত্যজিৎ নিজেকে যেন একটু বিব্রত বোধ করে ।
সম্পূর্ণ অনাধীর্য সে ।

সত্যাই যদি এই লোকটি একটু আগে যা বলল ঠিক হয় এবং এই
চৌধুরীদের আস্থায়ই হয়, তাহলে একে নিচের একটা ঘরে স্থান দিয়ে নিজের
তার উপরের একখানা ঘর দখল করে থাকাটা নিশ্চয়ই শোভনীয় হবে না ও
সমীচীনও হবে না ।

সত্যজিৎ এবারে কথা বললে, আর্মাই কেন নিচের একটা ঘরে এসে থাকি
না মিস চৌধুরী ? উনি বরং—

আপনি ! বিস্মিত সপ্তম দ্রষ্টিতে তাকাল সন্তোষ চৌধুরী এতক্ষণে
সত্যজিতের মুখের দিকে ।

আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না সন্তোষবাবু । আপনি এসেছেন এডেন
থেকে আর আর্মি আসছি বর্মাম্বলুক—রেঙ্গন থেকে ।

এদের কোন আস্থায় রেঙ্গনে ছিলেন বলে তো কই জানি না ! সন্তোষ
চৌধুরী কথাটা বললে ।

ঠিকই । আর্মি এদের আস্থায় নই—

তবে ?

মৃতুজ্ঞবাবুর বন্ধুপত্র । এদের গ্রহে সামান্য কয়েকটা দিনের জন্য
অতিথি মাত্র । শীঘ্ৰই চলে যাবো ।

আঃ, একান্ত নিরাসন্ত ভাবেই সন্তোষ চৌধুরী শব্দটা উচ্চারণ কৰল ।

আপাততঃ তো ওপরের কোন ঘর খালি নেই সন্তোষদা, আপনি বঞ্চ দুটো

দিন কাকা যে ব্যবস্থা করে গেলেন নিচের ঘরেই থাকুন।

সাবিতার কথায় ঘৃণপ্রিৎ সকলেই যেন একটু বিস্মিত ভাবেই ওর ঘুমের দিকে তাকাল। গোবিন্দ, বাবুর জিনিসপত্রগুলো নায়েবকাকার পাশে যে ঘরটা খালি আছে, সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করে দাও। সাবিতা এবাবে কতকটা দৃঢ়কষ্টেই যেন তার বক্তব্যটা জানিয়ে দিল।

গোবিন্দ এগিয়ে এসে সন্তোষ চৌধুরীর মালপত্রগুলো মাটি থেকে তুলে নিতে নিতে বললে, চলেন বাবু—

চল। সন্তোষের কণ্ঠস্বর ও ঘুমের চেহারাটা কেমন যেন অন্ধুত শান্ত ও নিরাসস্ত শোনায়।

গোবিন্দ মালপত্রগুলো মাথায় তুলে নিয়ে ঘরের বাইরের দিকে পা বাড়াল এবং সন্তোষ চৌধুরী তাকে অনুসরণ করল।

বসন্তবাবুর পাশের ঘরটা খালিই পড়েছিল।

ঘরটা স্বল্পপরিসর হলেও আলো-হাওয়ার প্রচৰ ব্যবস্থাই আছে। জিনিস-পত্রগুলো মেঝেতে নায়িরে রেখে গোবিন্দ সন্তোষের ঘুমের দিকে তাকিয়ে বললে, বসন্ত বাবু, আগে একটা আলো জেবলে নিয়ে আস।

গোবিন্দ ঘর হতে বের হয়ে গেল।

অন্ধকার ঘরটার মধ্যে একাকী সন্তোষ চৌধুরী দাঁড়িয়ে রইলো।

॥ ১০ ॥

পারে পারে একসময় কিরীটী তার নির্দিষ্ট ঘরটা থেকে বের হয়ে বাইরের বারান্দা অতিক্রম করে সির্পড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

সন্ধ্যা থেকেই সারা আকাশটা জুড়ে ঘেঁষে ছেয়ে গিয়েছিল।

শুরু হলো এতক্ষণে বৃক্ষট, সেই সঙ্গে পাঞ্চা দিয়ে প্রবল হাওয়া।

মধ্যে মধ্যে কালো আকাশটার এক প্রাক্ত হতে আনা প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্রূপের নলী আলো যেন চোখ রাঙিয়ে থাচ্ছে। গুরু-গুরু মেঝের ডাক থেকে থেকে আকাশটাকে যেন কাঁপিয়ে তুলছে।

বারান্দাটা অতিক্রম করে কিরীটী বাইরের মহলের দিকে অগ্রসর হলো। ইতিমধ্যে বারান্দার খোলানো বাতি জেলে দেওয়া হয়েছে। প্রবল বায়ুর ঝাপটায় বাতিটা দৃঢ়লাগ্রহ। কাঁপছে বাতির শিখাটা। দেওয়ালের গায়ে প্রাতি-ফলিত আলোটাও সেই সঙ্গে কাঁপছে এধার থেকে ওধারে গুরুমন্ড।

জলের ঝাপ্টা বারান্দাতেও আসছে—বৈশিষ্ট্য এই খোলা বারান্দায় থাকলে সর্বাঙ্গ ভিজে যাবে। সামনেই একটা ঘরের খোলা ম্বার দেখতে পেয়ে কিরীটী সেই ঘরের মধ্যেই গিয়ে চুকে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ভারী গলায় প্রশ্ন এলো, কে?

কণ্ঠস্বরটা অনুসরণ করে সামনের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই কিরীটীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল নায়েব বসন্তবাবুর।

এইমাত্র বোধ হয় সন্ধ্যা-আহিক সমাপ্ত করে বসন্তবাবু শুধু একটা ধূতি পরিধানে খালিগায়ে ঘরের অধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে। দেওয়ালের গায়ে একটা দেওয়াল-বাতি জুলছে। তারই আলোয় কিরীটী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বসন্ত-

বাবুর মুখের দিকে।

বসন্তবাবুর দৃঢ়চোখের তারায় যেন একটা কঠিন প্রশ্ন ছুরির মত ঝিরিকষে উঠেছে।

নায়েব বসন্ত সেনের দৃঢ় চক্ষুর ছুরির ফলার মত ধারালো শার্ণগত দৃষ্টি যেন কয়েকটা মুহূর্ত কিরীটীর দৃঢ় চক্ষুর দৃষ্টির সঙ্গে উক্ত স্পর্ধায় মিলিত হয়ে স্থির হয়ে থাকে। পলকহীন, অক্রম্পত।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্মই, পরক্ষণেই বসন্ত সেনের চক্ষুর দৃষ্টি ও মুখের একটু আগে কঠিন হয়ে ওঠা সমস্ত রেখাগুলো সহজ ও কোমল হয়ে এলো। বিনীত হাস্যে চোখ-মুখ উল্লভাসিত হয়ে উঠেলো।

কিরীটীবাবু যে! হঠাতে কি মনে করে? বসন্তবাবুই প্রথমে প্রশ্ন করলেন।

কিরীটী স্মিতকণ্ঠে বললে, একা একা ঘরের মধ্যে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম। বসতে পারি সেনমশাই?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, বসন্ত। অভ্যর্থনা জানালেন নায়েব বসন্ত সেন। এবং সমস্ত আবহাওরাটাকে সহজ ও লঘু করে সম্মুখের একটা খালি চেয়ার চেতের নির্দেশে দেখিয়ে দিলেন বসন্তবাবু কিরীটীকে।

আপনার সময় নষ্ট করছি না তো সেনমশাই? চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে কিরীটী কথাগুলো নায়েবমশাইয়ের মুখের দিকে তারিকেই উচ্চারণ করলে।

না, না—সন্ধ্যার পর আর্য বিশেষ কোন কাজই করি না। এই সময়টা রাতে আহারের আগে পর্যন্ত আমার সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময়।

কিরীটী চেয়ারটার উপর নড়েচড়ে একটু আরাম করে বসল এবং পকেট থেকে চামড়ার সিগার কেসটা বের করে কেস থেকে একটা সিগার নিয়ে সেটায় অগ্নিসংযোগ করল।

নায়েব বসন্ত সেনও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন করলেন। পরিধেয় ধূতিটার কোছাটা খুলে গায়ের উপর জড়িয়ে নিলেন।

খোলা জানলা-পথে জলসিঞ্চ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা আসছে, বেশ শীত-শীত করে।

ব্লিটও যেন নেমেছে একেবারে আকাশ ভেঙে।

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে অতিবাহিত হয়, দৃঢ়জনের কারো মুখেই কোন কথা নেই। বাইরে শব্দ একটা ব্রহ্মের বাম-বাম শব্দ। টেবিলের উপরে একটা সাদা চিমিনি দেওয়া কেরোসিনের টেবিল বাতি জ্বলছে। বাতির আলোয় ঘরটা বেশ আলোকিতই হয়ে উঠেছে।

সহসা এক সময় নায়েব বসন্তবাবুই স্তন্ত্রতা ভঙ্গ করলেন, কর্তাৰ মৃত্যুর সমস্ত ব্যাপারটাই তো আপনি সত্যজিৎ ও সর্বতাৱ মুখে শুনেছেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ।

এ সম্পর্কে সত্যজিতের যা ধারণা তাৰে নিশ্চয়ই শুনেছেন?

শুনেছি। কিরীটী মুকুষ্টে জবাব দেয়।

কিন্তু ব্যাপারটা আপনার কি মনে হয় মিঃ রায়?

দেখুন ঘটনা সম্পর্কে যতটা শুনেছি তাতে অবশ্য আমার মনে হয় এর
পিছনে একটা বিশ্রী চক্রান্ত আছে—

চক্রান্ত ! কথাটা উচ্চারণ করে নামের বসন্ত সেন তাকালেন কিরীটীর
মুখের দিকে বিশ্রয়-দ্রষ্টিতে ।

হ্যাঁ ! এবং ঠিক, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর হত্যা-রহস্যের কিনারা করতে হলে
আমাদের দীর্ঘ উনিশ বৎসর আগে তাঁর স্তৰীর হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যুকে সর্বাঙ্গে
মীমাংসা করতে হবে—

হেমপ্রভার মৃত্যু ! সে তো উনিশ বছর আগে ঘটেছে। তাছাড়া হেম-
প্রভার মৃত্যুও তো যতদ্বার জানি স্বাভাবিক ব্যাপার। রোগক্রান্ত হয়ে তাঁর
মৃত্যু ঘটে ।

তৈক্ষ্য অমুসন্ধানী দ্রষ্টিতে তাকাল কিরীটী বসন্ত সেনের মুখের দিকে।
কানাইয়ের গার মুখ থেকে শোনা সত্যজিৎ-বর্ণিত হেমপ্রভার সে মৃত্যু-কাহিনী
কি তবে বসন্ত সেনের অঙ্গাত ! সত্যজিৎ কি বসন্ত সেন সে ব্যাপারের কিছুই
জানেন না ? না তিনি স্বীকার করতে চাইছেন না ? কিন্তু সত্য হোক মিথ্যা
হোক, বেশ ভাল করে যাচাই না করে কিরীটী বসন্ত সেনকে মৃত্যু দেবে না।
সেই কারণেই ব্যাপারটা যেন আজও বসন্ত সেনের অঙ্গাতই এইভাবে চিরতীয়
প্রশ্ন করল কিরীটী, কেন, আপনি কিছুই জানেন না—হেমপ্রভা দেবীর
সত্যকারের মৃত্যুর ব্যাপারটা ?

কই না ! হেমপ্রভার মৃত্যুর মধ্যেও কোন একটা ব্যাপার ছিল, এ তো কই
আমার এতদিন জানা ছিল না ! তিনি হঠাতে একদিন সকালে অসুস্থ অবস্থাতেই
বেশী রকম অসুস্থ হয়ে পড়ায় কর্তা রঞ্জেই তাঁকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য
কলকাতায় চলে যান এবং কলকাতাতেই তাঁর মৃত্যু হয় ।

না, তা বোধ হয় ঠিক নয়। গম্ভীর কণ্ঠে কিরীটী প্রত্যুত্তর দেয় ।

কী আপনি বলছেন মিঃ রায় ! আমি যে তখন এ বাড়িতেই ছিলাম।
আমার চোখের সামনে দিয়ে অসুস্থ হেমপ্রভাকে পালিকতে চাপিয়ে কর্তা
কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান !

হ্যাঁ, পালিক যেতে দেখেছেন বটে তবে তার মধ্যে একটা পালিকতে কেউ
ছিল না—ছিল থালি । এবং তার আগেই হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যু ঘটেছিল ।

যত সব আজগুবী ব্যাপার ! কে বলেছে আপনাকে এসব কথা শৰ্নিন ?

আমাকে কেউ বলেনি । বলেছে কানাইয়ের মা সর্বিতা ও সত্যজিৎ-
ব্যবরকে ।

কানাইয়ের মা বলেছে ! দাঁড়ান তো দোখি, হারামজাদীকে একবার
ভাকি—

বসন্ত সেন চেয়ার ছেড়ে উঠতে শাছিলেন কিন্তু কিরীটী তাঁকে বাধা
দিল, ব্যস্ত হবেন না বসন্তবাবু, বসন্ত । আমার কথাটা শেষ করতে দিন আগে।
এখনও আমার শেষ হয়নি ।

কিন্তু এ যা আপনি বলছেন এ তো একেবারে সম্পূর্ণ আরবা উপন্যাস।
সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য !

উপন্যাসের চেয়েও অবিশ্বাস্য অনেক ঘটনা অনেক সময়েই আমাদের
জীবনে ঘটে নামের মশাই । অবশ্য আমার ধারণা ছিল ব্যাপারটা আপনার
অঙ্গাত নয় ।

না মিঃ রায়, আপনি হয়ত জানেন না। মৃত্যুজয় চৌধুরীর আমি মাইনে-করা ভৃত্য হলেও তাঁর সঙ্গে কোনীদিন আমার প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ছিল না। বর্ধ-এবং ভায়ের মতই আমরা পরস্পরের পরস্পরের কাছে ছিলাম। তাঁর জীবনের কোন ঘটনাই আমার অঙ্গাত ছিল না কোন দিন। সেক্ষেত্রে এতবড় একটা ঘটনা তিনি আমার কাছে লক্ষণয়ে রেখেছেন এ কথা আমি বিশ্বাসই করতে পারি না।

হয়ত এমনও হচ্ছে পারে সর্বদা তিনি সব কথা আপনার কাছে বললেও ঐ ব্যাপারটা কোন বিশেষ কারণেই আপনার কাছ থেকে গোপন করেছিলেন—

কারণ বলছেন, কি তার এমন কারণ থাকতে পারে! আর সত্যিই যদি আপনি যা বলছেন তাই হয়ে থাকে, তাহলে তো এত বড় একটা ঘটনা তিনি নিঃশব্দে চাপা দিয়ে থাবেন, তাই বা কেবল করে সম্ভব বা বিশ্বাসযোগ্য বলুন? তারপর একটু থেরে বললেন, আপনি জানেন না মিঃ রায়, কিন্তু আমি জানি, হেমপ্রভাকে তিনি জীবনাধিক ভালবাসতেন। তাঁর পায়ে কাঁটাটি ফুটলেও তিনি ব্যক্ত পেতে দিতে পারতেন। আর অর্থন একটা ব্যাপারকে তিনি নীরবে সহ্য করে থাবেন!

নায়েব মশাই, আপনি অবিবাহিত। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ও ভালবাসার রাস্তাটা এমন জটিল যে তার অনেক সময় হাঁসিসই পাওয়া যায় না। বিশেষ করে আমাদের এই বাংলাদেশে কোন কোন স্বামী-স্ত্রী জীবনব্যাপী গর্বিমূল অসামঝসকে এমনভাবে সহিষ্ণুতা ও সামাজিক নিয়মকানন্দনের চাপে পড়ে কাটিয়ে দিয়ে থায় যে, জীবিতকালে তো নয়ই—মৃত্যুর পরেও সেটার কোন আভাসমৃগ্রহণ হয়ত পাওয়া যায় না। অবশ্য আপনি মনে করবেন না যে আমি এমন কিছু বলতে চাইছি স্বগীয় মৃত্যুজয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী সম্পর্কে। এবং এক্ষেত্রে সেটা খুব বড় কথাও আপাতত নয়। আমি যেটা সম্পর্কে স্থিরানিশ্চিত হতে চাই সেটা হচ্ছে, সত্য সত্য হেমপ্রভা দেবীরও এইখানেই মৃত্যু হয়েছিল কিনা এবং তাঁর মৃতদেহ নন্দনকাননের বকুলবক্সের তলেই মৃত্যুজয় চৌধুরীর কলকাতা হতে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন বাদে তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন কিনা।

এসব আপনি কি বলছেন মিঃ রায়? হেমপ্রভার মৃতদেহও সেই বকুল বক্সেলাই কর্তা কলকাতা হতে ফিরে এসে অবিষ্কার করেছিলেন?

হ্যাঁ, তাই। অন্ততঃ কানাইয়ের মাঝ বার্গত কাহিনী সেই কথাই বলে।

না মিঃ রায়, কানাইয়ের মাঝে এ সম্পর্কে ভাল করে জিজ্ঞাসাবাদ করা আমার একান্তই প্রয়োজন।

সে বললাগ তো, পরে করলেও আপনার চলবে। তবে আমি কি যদি আপনি বিশ্বাস করেন তবে এইটুকু আপনাকে আমি বলতে পারি, ও সম্পর্কে আমি নিজেও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম এবং আমার ধারণা সে যথ্য কিছুই বলেনি। উনিশ বৎসর প্রিভে ঠিক যেমনটি ঘটেছিল এবং যেমনটি সে দেখেছিল ঠিক তেমনটাই সে বলেছে, তার মধ্যে কোন কিছু অত্যাক্ষ বা অবোধ্য কিছুই নেই।

কিন্তু তাই যদি হবে—কান ইয়ের মাঝ কথা যদি সত্যিই ধরে নেওয়া যায়, তাহলে একটা ব্যাপার আমি আপদেই ব্যবে উঠতে পারছি না যে, হেমপ্রভার মৃত্যুর ব্যাপারটা এভাবে গোপন করবার মৃত্যুজয়ের কি উদ্দেশ্য থাকতে

পারে ?

আমার জিজ্ঞাসা ও তাই সেন মশাই ! তিনি তাঁর স্তৰীর মৃত্যুর ব্যাপারটা ঐভাবে আগাগোড়া গোপন করে গেলেন কেন সকলের কাছ থেকে, এমন কি আপনার মত সুবৃদ্ধের কাছেও কেন গোপন করে গেলেন ? অবশ্য ঘটনা হতে ব্যতিকূ জানা যায়, কানাইয়ের মা একান্তভাবেই দৈবক্রমে ব্যাপারটা দেখে ফেলেছিল বলেই আজ আমরা এতদিন পরে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরেছি, নচেৎ সেটা হয়ত কেউ জানতে পারত না । আর্মি যতদ্বর শুনেছি এবং এইমাত্র আপনার মৃথ থেকেও যতটা জানতে পারলাম, আপনার সঙ্গে স্বগর্ভীয় মৃত্যুঝয় চৌধুরীর একটা নিকট ঘোগাঘোগ ছিল মনের দিক দিয়ে ; তাই জিজ্ঞাসা করছি এমন কোন অতীত কাহিনী বা ঘটনার কথা তাঁর জীবনের আপনি জানেন কি, যার ঘৰারা আমরা তাঁর স্তৰীর রহস্যময় মৃত্যুর উপরে কোন অলোক-সম্পাদ করতে পারি ।

কিরীটীর সোজা সরল প্রশ্নে নায়েব বসন্ত সেন কিছুক্ষণের জন্য যেন মাথা নিচু করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ।

কিরীটী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নায়েব বসন্ত সেনের দিকে তাকিয়ে বললে, শুনুন নায়েবমশাই, এক বিষয়ে আর্মি অন্ততঃ স্থিরানিশ্চিত যে মৃত্যুঝয় চৌধুরীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করাই হয়েছে । অবশ্য ঘটনার অনেক পরে আর্মি অকুশ্মানে এসেছি, তাহলেও এ মৃত্যু-রহস্যের মীমাংসা করাটা খুব দৃঢ়সাধ্য ব্যাপার হবে না ; কেবল কিছু সময় নেবে । কিন্তু আপনাদের সকলের সাহায্য র্যাদ পাই তাহলে মীমাংসার ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসে ।

আর্মি তো আপনাকে প্রথম দিনই বলেছি কিরীটীবাবু, আমার ব্যতিকূ সম্ভব সাহায্য আপনাকে আর্মি করতে প্রস্তুত । এবং একথাও আপনাকে আর্মি প্রথম দিনই বলেছি, মৃত্যুঝয়ের মত নির্ভর ও সৎ চারিত্রের লোক আর্মি জীবনে বড় একটা দৈর্ঘ্যনি । কোন কলঙ্কই তাঁকে স্পর্শ করেনি । অত্যল্প দ্রু নায়েব বসন্ত সেনের কঠস্বর ।

কিরীটী কিছুক্ষণ নিঃশব্দ চূপ করে বসে রইল এবং মধ্যে মধ্যে হস্ত-ধ্রুত চুরুটায় মদ্র মদ্র টান দিয়ে ধূমোদ্গীরণ করতে লাগল ।

ইতিমধ্যে বাইরে ব্ৰহ্ম থেমে গিয়েছে । কেবল বৰ্ণ-ক্রান্ত রাশির কালো আকাশটার গায়ে বিদ্যুতের চমকানি থেকে থেকে নীল আলোর সঙ্গে জানয়ে যাচ্ছে ।

কিরীটী আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বললে, যে রাতে মৃত্যুঝয় চৌধুরী মারা যান সেই বিকালে বা সন্ধ্যায় শেষ আপনার সঙ্গে কখন দেখা হয়েছিল সেন মশাই ?

রাত দশটায় তিনি আহার করেন, তার আগে পর্যন্ত তাঁর শোবার ঘরেই আমরা দ্রুজনে বসে কথাবার্তা বলছিলাম—

কি ধরনের কথাবার্তা সে-রাতে আপনাদের মধ্যে হয়েছিল ?
সবিতা সম্পর্কেই বিশেষ যা কথাবার্তা হয়েছিল । সতজিংৎকে তিনি রেঞ্জন থেকে আসতে লিখেছেন এবং সে এলে উভয়ের র্যাদ উভয়কে পছন্দ হয় তাহলে এই সামনের আষাঢ়েই ওদের বিবাহ দেবেন—এই সবই বলছিলেন ।

আর কোন কথা হয়নি আপনাদের মধ্যে, যাতে করে তাঁর অত্যাসন্ন মৃত্যুর ব্যাপারটা সম্পর্কে কোনৱুপ ধারণা করা যেতে পারে ?

না।

হঁ। আজ্ঞা ইদানীং তাঁর মনের অবস্থা ঠিক কেমন ছিল বলতে পারেন ?
কোন প্রকার দৃশ্যমান বা দ্রুতাবনা—

না।

জমিদারীর অবস্থা ও আর্থিক অবস্থা ইদানীং তাঁর ভালই ছিল
নিশ্চয়ই ?
হ্যাঁ। ব্যাখে প্রায় লাখ তিনেক টাকা মজুত আছে, কলকাতায় একখানা
বাড়ি এবং এখানকার জমিদারী ও কারবারের অবস্থা আশাতীত ভালই বলতে
হবে।

তিনি কোন উইল লিখে রেখে গিয়েছেন বলে জানেন কিছু ?

বছর পাঁচেক আগে একটা উইল করেছিলেন। ইদানীং অবশ্য একবার
কিছুদিন আগে বলেছিলেন, প্রবের সেই উইলটার একটু সামান্য অদলবদল
করবেন, কিন্তু সেটা আর করা হয়ে গঠন হচ্ছেন।

সে উইলে কি লেখা আছে জানেন ?

তাঁর ঘাবতীয় সম্পত্তি তাঁর একমাত্র মেয়ে সবিতাই পাবে, কেবল—
কেবল ?

কেবল হাজার পঞ্চাশ টাকা তিনি আমার নামে দিয়ে গিয়েছেন, প্রয়োজনমত
সেটা আমি এবং আমার একাত্ত ইচ্ছামত যে কোন কাজে ব্যবহার করতে
পারবো।

আর তাঁর কোন নিকট বা দ্বার-আঞ্চলীয় বা বন্ধুবান্ধবকে কিছুই দিয়ে
যাননি ?

না। তবে—, বসন্তবাবু একটু ইতস্ততঃ করতে থাকেন। তারপর
কিছুক্ষণ চঁপ করে থেকে কি যেন ভেবে বললেন, প্রাতুল্পন্ত সন্তোষ চৌধুরীর
নামে উইলের মধ্যে একটা নির্দেশ আছে—

কিরাটপুর বিস্মিত দৃশ্যটতে তাকাল বসন্ত সেনের মুখের দিকে, যিনি আজ
সম্ম্যাবেলো এডেন না কোথা থেকে এলেন, উনিই কি সেই দ্বৰসম্পর্কীয়
প্রাতুল্পন্ত সন্তোষ চৌধুরী ?

বলতে পারি না উনিই সেই মৃত্যুঝয়ের বর্ণিত সন্তোষ চৌধুরী কিনা,
যদিও সেই পরিচয় নিয়েই উনি এসে আজ হাজির হয়েছেন—

ভদ্রলোককে তাহলে ইতিপূর্বে কখনো আপনি দেখেননি এবং চেনেনও
না ?

না।

উইলে শুরু সম্পর্কে কি নির্দেশ আছে বলাচ্ছিলেন ?

প্রাতুল্পন্ত সন্তোষ চৌধুরী যদি কোন দিন ফিরে এসে তাঁর পিতৃ-সম্পত্তির
দাবী জানান, তাহলে সমস্ত সম্পত্তির ১।৪ অংশ সে পাবে। বাকী ৩।৪ অংশ
পাবে কন্যা সবিতা। সবিতা যদি বিবাহ না করে তাহলে অর্ধেক সম্পত্তি ঐ
সন্তোষ চৌধুরী পাবেন অথবা সবিতার মৃত্যুর পর যদি তার কোন সন্তান-
সন্ততি না থাকে তাহলে ঐ সন্তোষ চৌধুরী বা তাঁর বংশধরেরা যদি-জীবিত
থাকে তাহলে সমস্ত সম্পত্তির ৩।৪ অংশ তারা পাবে এবং বাকী অংশ সবিতার
স্বামী পাবে।

সবিতা দেবী তো ঐ সন্তোষ চৌধুরী সম্পর্কে পূর্বে কিছুই জানতেন

না, অন্ততঃ গতকালও তাই বলেছেন।

না, সে জানত না। একমাত্র আমিই জানতাম। মৃত্যুজ্ঞয় আমাকে উইল করবার সময় একবার মাত্র বলেছিলেন।

ঐ সন্তোষ চৌধুরী কোথায় থাকেন ইত্যাদি বা সে সম্পর্কে কিছুই কি মৃত্যুজ্ঞয় চৌধুরী আপনাকে বলেননি?

হ্যাঁ বলেছিলেন, এডেন না কি কোথায় থাকেন—

এডেনের ঠিকানাটা বলেননি?

না।

আজ যে ভদ্রলোক সন্ধ্যাবেলা সন্তোষ চৌধুরীর পরিচয়ে এলেন, একে কি আপনার আসল লোক নয় বলে কোনরূপ সন্দেহ হচ্ছে?

যতক্ষণ না সঠিকভাবে জানতে পারছি ততক্ষণ মেনে নিই বা কেমন করে? যার কেবলমাত্র নাই শুনেছি, অথচ পূর্বে কখনো যাকে চাক্ষুষ দেখিনি তাকে এত সহজে স্বীকার করে নিতে তো পারি না।

উনিই যে আসল সন্তোষ চৌধুরী তার কোন প্রমাণ এখনও দেখেন নি? না।

আপনি জানতে চাননি?

চেয়েছিলাম, বলেছেন প্রয়োজন হলে সে-সব প্রমাণ নাকি আদালতেই পেশ করবেন। আমাকে কোন প্রমাণ দিতে রাজী নন তিনি।

দেওয়াল-ঘড়িতে চং চং করে রাত্রি দশটা ঘোষণা করল।

আহারের সময় উপস্থিত—ভৃত্য এসে সংবাদ দিল। কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

॥ ১১ ॥

ভাল করে আকাশের বুকে ভোরের আলো তখনও ফুটে ওঠেনি। অত্যাসন্ন প্রত্যয়ের চাপা রক্তাভার প্রবের আকাশটা কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে, খোলা জানলাপথে জলো হাওয়া কেমন শীত-শীত বোধ হওয়ায় কিরীটীর ঘূমটা ভেঙে গেল। কিরীটী শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়ল। আলনা থেকে জান্তা টেনে নিয়ে গায়ে চাপিয়ে কিরীটী ঘরের দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় দের হয়ে এল। এ বাড়ির কারোই এখনও নিম্নাভঙ্গ হয়নি। সিঁড়ি-পথ অতিক্রম করে কিরীটী সোজা বাইরে চলে এল সদর দরজা খোলা দেখে। প্রমোদভবন থেকে সোজা যে রাস্তাটা দৃশ্যাশের ঝাউবিথীর মধ্যখান দিয়ে সামনের সড়কে গিয়ে মিশেছে কিরীটী সেই রাস্তাটা ধরেই এগিয়ে চলল। হাওয়ায় ঝাউগাছের চিকন পাতাগুলি এক প্রকার সোঁ সোঁ শব্দ তুলেছে। এত সকালে প্রমোদ-ভবনের সদর দরজাটা খোলা দেখে কিরীটী ভেবেছিল হয়ত চাকরবাকরদের মধ্যেই কেউ ইতিমধ্যে উঠেছে, কিন্তু ঝাউবিথীর মাঝখান দিয়ে পথটা ধরে থানিকটা এগিয়ে যেতেই তার সে ভুলটা ভেঙে গেল। অল্পদ্রবে একটি নারী-মৃত্তি ধীরপদে এগিয়ে চলেছে। এত সকালে এই পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে কে! সবিতা দেবী নার্কি? কিন্তু নারীমৃত্তির চলবাব ভঙ্গী দেখে কিরীটী ব্যবতে পারে সে সবিতা নয়। তবে কে? কিরীটী একটু দ্রুতই পা চালিয়ে চলে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় অগ্রগামী নারীমৃত্তিকে কিরীটী অনুসরণ

করতে করতেই দেখে পরিধানে তার আকাশ-নীল রংয়ের একটা শাঁড়ি এবং
মাথার চৰল লম্বা বেণীর আকারে প্রস্তোপারি দোদুল্যমান। পায়ে বোধ হয়ে
চম্পল সু, চলার ভঙ্গী ও চাল-চলন দেখে মনে হয় সেও তারই মত প্রাতঃভ্রমণে
বের হয়েছে হয়ত।

অনেকটা কাছাকাছি হতে এবং দুজনের ঘণ্টে ব্যবধান করে আসতেই
তাকাল। এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের দ্রষ্টি বিনিময় হলো।

কিরীটী এতক্ষণে চিনতে পারে, অগ্রগামিনী আর কেউ নয়, সর্বিতার গত
সন্ধ্যায় বিদেশাগত মাঝার মেঝে কল্যাণী।

কল্যাণী একটু বিস্মিত দ্রষ্টব্যেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

কিরীটীও তাকিয়ে ছিল কল্যাণীর মুখের দিকেই।

পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি এখনো এবং কল্যাণী ইতিপূর্বে
কিরীটীকে না দেখলেও কিরীটী গত সন্ধ্যাতেই দরজার ফাঁক দিয়ে কল্যাণীকে
দেখেছিল, তাতেই তার কল্যাণীকে চিনতে কষ্ট হয়নি।

কিরীটীই প্রথমে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলে, সুপ্রভাত, আপনিই
বোধ হয় কল্যাণী দেবী!

কল্যাণী তার সম্পূর্ণ অপরিচিত কিরীটীর মুখে তার নিজের নামোচ্চারণ
শুনে কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গেই যেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ। কিন্তু
আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না ঠিক!

আমার নাম কিরীটী রায়। কিরীটী স্মিতকণ্ঠে জবাব দেয়।

ও, আপনিই কিরীটীবাবু! সর্বিতাদি কাল রাত্রে আপনার কথা বলছিল
বটে। নমস্কার।

বেড়াতে বের হয়েছেন বৃক্ষ?

হ্যাঁ। নতুন জায়গায় আমার তেমন ঘূর্ম হয় না। সারাটা রাত বিছানার
উপরে ছট্টফট্ট করে ডেরের দিকে আর শৈলে থাকতে ভাল লাগলো না। তাই
বের হয়ে পড়লাম। পাঞ্জাবের রূক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, বাংলা-
দেশের এই শ্যামল রূপটি ভারী ভাল লাগছে।

দুজনেই আবার তখন পাশাপাশি চলতে শুরু করেছে সামনের দিকে।
চলতে চলতেই কিরীটী কল্যাণীর কথার প্রত্যুত্তর দেয়, হ্যাঁ, এমন দেশটি আর
কোথাও গেলে পাবেন না। বলতে গেলে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম ভারতের
সবগুলি আমি পর্যটন করেছি, কিন্তু বাংলার মাটিতে ও আকাশে যে মিট্টি—
শ্যামল একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতার সন্ধান পাই এমনটি আর কই চোখে তো
আমার পড়ল না।

হয়ত আপনার কথাই সত্য মিঃ রায়। বাংলাদেশের মেঝে হলোও জন্ম
আমার পাঞ্জাবে এবং বলতে গেলে এই আমার বাংলার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

যত দিন যাবে দেখবেন এ দেশকে আপনার আরো বেশী করে ভাল
লাগবে। খতুতে খতুতে আকাশে ও মাটিতে এর পরিবর্তন—রংয়ের খেলা
যেমন অপূর্ব তেমনি সুন্দর। এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় যেন সৌন্দর্য ছাড়িয়ে আছে।
বাকে নিত্য দেখেও আশ মেটে না।

পূর্ব আকাশে একটু করে দিনের আলো যেন পাপড়ির মত দল মেলেছে।

রাস্তাটা নিজৰ্ন। ছেট ছেট লাল কাঁকর ছড়ানো রাস্তাটায়। জৰিদারেরই
টেরী রাস্তাটা। গতরাত্রের বৃষ্টিতে রাস্তাটা এখনো ভিজে আছে।

ରାମତାର ଦୁ'ପାଶେ ଖୋଲା ମାଠ—ଯେନ ସବ୍ଜ ଦୁ'ଥାମା ଚାଦର ଦୁ'ଦିକେ ବିଛାନୋ । ତୁମେ ଏକଥା ସେକଥାର ମଧ୍ୟେ ଦିରେ ଦୁ'ଜନାର ମଧ୍ୟେ ଆଲାପଟା ଆରୋ ବେଶ ଜମେ ଓଠେ । କିରୀଟୀର କଳ୍ୟାଣୀକେ ବେଶ ଲାଗେ । ମେଯେଟି ବେଶ ସପ୍ରତିଭ । ବାଂଲାର ବାହିରେ ପାଞ୍ଜାବେ ମାନୁଷ ବଲେଇ ହୟତ କଳ୍ୟାଣୀର ସ୍ଵଭାବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାଯ ଓ ଚାଲଚଲନେ ଏକଟା ସାବଲୀଲ ଗାତ୍ର ରହେଛେ । ବାଂଲାଦେଶେର ଐ ବ୍ୟେସୀ ମେଯେଦେର ମତ ଲଜ୍ଜା ବା ଆଡ଼ିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଚାରିତ୍ରେ ମଧ୍ୟେ କୋଥାଓ ନେଇ । କଳ୍ୟାଣୀର ଚାରିତ୍ରେ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାଯ ସେ ଏକଟା ସହଜ ସରଲତା ତାଇ ନୟ, ତାର ଦୈହିକ ଗଠନ ଓ ସବ୍ସେଥ୍ୟର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ସୁମ୍ମଥ ଓ ସହଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଛେ । ରୂପ ବଲତେ ଯା ବୋର୍ଦ୍ଦୀ କଳ୍ୟାଣୀର ତା ନା ଥାକଲେଓ ଚେହାରାଯ ଏକଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଛେ—ଗାୟେର ରଂ କାଳୋଇ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଇ କାଳୋର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ଏକଟା ସିନ୍ଧକର ଶ୍ୟାମଳ ଲାବଣ୍ୟ ଆଛେ ଯେଟା ଅତି ସହଜେଇ ଯେନ ଅନ୍ୟେ ଦୁଃଖିଟିକେ ଆକର୍ଷଣ କରେ ।

ଚୋଥମ୍ବୁଥେର ଗଠନଟିଓ କଳ୍ୟାଣୀର ଭାରୀ ଚମ୍ରକାର । ବାଁକାନୋ ଧନ୍ଦକେର ମତ ଦ୍ରୁ, ଘନ ଅର୍ଥପଙ୍କୀର, ସଜଳ ସିନ୍ଧ ଦୁଃଖିଟି ଚୋଥେର ତାରା । ପାତଳା ଦୁଃଖିଟି ଓଷ୍ଠ । ବାମ ଗାଲେର ଉପରେ ଏକଟି ତିଲ ମୁଖେର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକେ ଯେନ ଅନେକଥାର୍ନ ବ୍ରାହ୍ମ କରେଛେ । କଥାଯ କଥାଯ ଚମ୍ରକାର ହାସେ କଳ୍ୟାଣୀ । ଏବଂ ସେଇ ହାସିଟି ଯେନ ସମସ୍ତ ଚୋଥେ-ମୁଖେ ଛାଡ଼ିରେ ପଡ଼େ ।

ମେଯେଟିର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ଓ ଯେନ ଏକଟା କୌତୁକପ୍ରିୟତା ବିଦୟମାନ ।

ସର୍ବିଦ ଓ ସତ୍ୟଜିତ୍ବବୁର ମୁଖେଇ ଶୁନ୍ନୋଛଲାମ ଆପଣି ନାକି ଏକଜନ ସାଂଘାତିକ ବାରା ଡିଟେକ୍‌ଟିଭ୍ ମିଃ ରାଯ় !

ବାଘା ଡିଟେକ୍‌ଟିଭ୍ ! ଆର କି ଶୁନ୍ନେଛେ ବଲ୍ଲନ ତୋ ମିସ୍ ସାନ୍ୟାଲ ? ହାସତେ ହାସତେଇ କିରୀଟୀ କଳ୍ୟାଣୀକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ।

ଆରୋ କତ କି ! ସବ କି ଛାଇ ମନେ ଆଛେ ? ବଲତେ ବଲତେ ହଠାତ୍ କଳ୍ୟାଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଆଜ୍ଞା ମିଃ ରାଯ, ସତ୍ୟାଇ କି ଆପନାର ମନେ ହୟ ଆପଣି ପିସେମଶାଇଇସେର ହତ୍ୟାକାରୀକେ ଧରତେ ପାରବେ ?

ରାମତାର ଏକପାଶେ ଏକଟା ବଡ଼ ଆକାରେର ପାଥର ପଡ଼େଛିଲ । କିରୀଟୀ ପାଥରଟାର ଦିକେ ଏଗ୍ରତେ ଏଗ୍ରତେ କଳ୍ୟାଣୀକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ବଲେ, ଆସନ୍ତ ମିସ୍ ସାନ୍ୟାଲ, ଏଇ ପାଥରଟାର ଉପରେ କିଛିକଣ ବସା ଥାକ ।

ବେଶ ତୋ !

ଦୁଃଖନେ ପାଥରଟାର ଉପରେ ଗିଯେ ବସଲ ।

ପକେଟ ଥେକେ ଚାମଡାର ସିଗାର କେସଟା ବେର କରେ ଏକଟା ସିଗାର ସେଟା ଥେକେ ଟେନେ ନିତେ ନିତେ କଳ୍ୟାଣୀର ଦିକେ ତାକିଯେ କ୍ଷିମତଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଧୂମପାନ କରିବେ ପାରି ? ଆପଣି ନେଇ ଆପନାର ?

Oh Surely, not at all !—ମଦୁ, ହାସ୍ୟ-ତରଳ କଣ୍ଠେ କଳ୍ୟାଣୀ ଜବାବ ଦିଲ ।

ସିଗାରଟାର ଦେଇଶଲାଇ ଜବାଲିରେ ଅଗ୍ରମଂଶୋଗ କରେ ନିଃଶବ୍ଦେ ଗୋଟା ଦୁଇ-ତିନ ଟାନ ଦିଲ କିରୀଟୀ । କଳ୍ୟାଣୀ ପାଥରଟାର ସାମନେ ଥେକେ ଏକଟା ଘାସେର ଶୀର୍ଷ ଢନେ ଛିପେ ଦାଁତ ଦିରେ କାଟିଲେ ଲାଗଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକ ଭାବେ ।

ହଠାତ୍ କିରୀଟୀ ଆବାର କଥା ଶୁରୁ କରେ, ହାଁ, କି ଯେନ ବଲଛିଲେନ ଆପଣି ମିସ୍ ସାନ୍ୟାଲ ! ହତ୍ୟାକାରୀକେ ଧରତେ ପାରବୋ କିନା, ତାଇ ନା ?

ହାଁ, ଜାନେନ ଆମି ଏକଜନ ଡିଟେକ୍‌ଟିଭ୍ ବହିରେ ଥିବ ଭଣ୍ଡ ! ଏହିବ ତଦନ୍ତର ସ୍ୟାପାରେ ଆମାର ଭାରୀ interest ଲାଗେ, ଛୋଟିଥାଟେ ସବ ଅନ୍ତରୁତ ସୁନ୍ଦର ଥରେ ହତ୍ୟା-

କାରୀକେ ଖୁଜେ ବେର କରା ଭାରୀ ଶକ୍ତ କାଜ, ନା ?

ତା ଏକଟ୍ ଶକ୍ତ ବିହିକି । ଚୋଥ ଥାକଲେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀତେ ଯାକେ ଆମରା ସାଧାରଣତଃ common sense ବିଲ ଏକଟ୍ ପ୍ରଥର ଥାକଲେଇ ସେ କୋନ ରହିଲେ ରହିଲେ ଆସତେ ବିଶେଷ ବେଗ ପେତେ ହୁଯ ନା ।

ତବେ ସକଳେ ପାରେ ନା କେନ ?

କିରୀଟୀ କଲ୍ୟାଣୀର କଥାଯ ଏବାରେ ହେସେ ଫେଲିଲ ଏବଂ ହାସତେ ହାସତେ ବଲେ, ଆସଲ ବ୍ୟାପାରଟା କି ଜାନେନ ? ଧରିଲୁ ଆପନାକେ ଏକଟ୍ ସାଧାରଣ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଦିଇ । ବଲୁନ ତୋ ସାବିତା ଦେବୀର ବାଡ଼ିତେ ଏକତମା ଥେକେ ଦୋତଲାଯ ଉଠିଲେ କଟା ସିର୍ପିଡ଼ ଆଛେ ?

କଟା ସିର୍ପିଡ଼ ! ବିଶ୍ଵିତ ଦର୍ଶିତେ ତାକାଳ କଲ୍ୟାଣୀ କିରୀଟୀର ମୁଖେର ଦିକେ ।

ହ୍ୟା, ବଲୁନ ନା । ଆପନି କତବାର ଐ ସିର୍ପିଡ଼ ଦିଯେ ଓଠା-ନାମା କରେଛେନ କାଳ ଥେକେ ?

ତା କାଳ ରାତ୍ରେ ବାରଚାରେକ ଏବଂ ଆଜ ସକାଳେ ଏକବାର ।

ପାଞ୍ଚବାର । ତାହିଁଲେ ବଲୁନ ଐ ସିର୍ପିଡ଼ ଦିଯେ ଆପନି ଓଠା-ନାମା କରେଛେନ ଏବଂ ଦେଖେଛେନ ଓ ସିର୍ପିଡ଼ଗୁଲୋ କେମନ, ନା ?

ହ୍ୟା ।

ତାହିଁଲେ ବଲୁନ କଟା ସିର୍ପିଡ଼ ଆଛେ ?

ଏହି ପର୍ଚିଶ-ଟିଶ୍ଟା ହବେ ବୋଧ ହୁଯ ।

ଡଙ୍କ, ଏକପିଶଟା ସିର୍ପିଡ଼ ଆଛେ । ତବେଇ ଦେଖିଲୁ ଏକଇ ସିର୍ପିଡ଼ର ପଥେ ଆପନି ଓ ଆମି ଦୁଇଜନାଇ ଓଠା-ନାମା କରେଛି । ଆମି ସିର୍ପିଡ଼-ପଥ ଦିଯେ ଆପନାର ଅତ କେବଳ ଓଠା-ନାମାଇ କରିଲି, ପ୍ରଥମବାରେଇ ଓଠିବାର ସମୟ ଚାରିଦିକେ ଭାଲ କରେ ସିର୍ପିଡ଼ଗୁଲୋର ଅବଶ୍ୟକ ଦେଖେ ଯୋଟ କଟଗୁଲୋ ସିର୍ପିଡ଼ର ଧାପ ଆଛେ ତାଓ ଗୁଣେ ନିର୍ମେଛି ! ଏହି ହୁଯ । ଆପନାରା, କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକେରା ଦେଖେନାହିଁ, you only see but I observe ! ଏଇଥାନେଇ ଆମାଦେର ପରମପରର ମଧ୍ୟେ ତଫାଳ । ଆମି ବାଡ଼ିଟାର ଉପରତଳାର ସାବତୀଯ ଖୁଟିଟନାଟି ସବ ବଲତେ ପାରି । ଚଲୁନ ରୋଦ ଚଢ଼େ ଉଠେଛେ । ଏବାରେ ଫେରା ଯାକ ।

ଚଲୁନ ।

ଦୁଇଜନେ ଉଠି ଆବାର ପ୍ରମୋଦଭବନେର ଦିକେ ଚଲତେ ଶୁରୁ କରେ ।

କିରୀଟୀ ଏକ ସମୟ ଆବାର ପଥ ଚଲତେ ଚଲତେଇ କଲ୍ୟାଣୀକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ବଲେ, କଥା ହିଚିଲ ଆମାଦେର ହତ୍ୟାକାରୀକେ ଧରତେ ପାରବୋ କିନା ? ଧରତେ ପାରବୋଇ ତବେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏଥିନ ଆମାର କେବଳ ଚାରିଦିକ ଦେଖିବାର ଓ କାନ ପେତେ ଶୋନିବାର ପାଲାଇ ଚଲେଛେ । ଏରପର ସା ଦେଖିବେ ଶୁଣିବେ ସବ କିଛି ତାର ଭାବତେ ହବେ ଏବଂ ଭାବତେ ଭାବତେଇ ଆମାର ଚୋଥେର ସାମନେ କୁମେ ସବ ରହିଲେ ରହିଲେ କୁମାଶ ଭେଦ କରେ ଆମ୍ବୋ ଫୁଟେ ଉଠିବେ ସଥନ, ତଥନଇ ଆପନାକେ ଆମି ବଲତେ ପାରବୋ କବେ ଠିକ ହତ୍ୟାକାରୀର କିନାରା ଆମି କରତେ ପାରବୋ । ତାର ଆଗେ ନାହିଁ ।

ଆମାକେ ଆପନାର ଏହି ରହିଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନେର ବ୍ୟାପାରେ ସହକାରଣୀ କରେ ନେବେନ ମିଃ ରାଯ ?

ବେଶ ତୋ । ସହକାରୀ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟକାରେର ସହକାରୀ ହୁଯ ତାହିଁଲେ କାଜ କରିବାର ମଧ୍ୟେଓ ସେ ଏକଟ୍ ଆନନ୍ଦ ଆଛେ ।

କିରୀଟୀ ହାସତେ ହାସତେଇ ଜବାବ ଦେଇ ।

কিন্তু আমার সাহচর্য যদি আপনার কাজে বিষ্য ঘটায় ?

বিষ্য ঘটাবে কেন ? আপনার মনে যদি আমাকে আমার কাজে সত্ত্বকারের সাহায্য করবার ইচ্ছা থাকে তাহলে কি আর আপনি বিষ্য ঘটাবেন ?

চলতে চলতে দৃঢ়নে প্রায় তখন প্রমোদভবনের মধ্যে এসে গিয়েছে। দূর থেকে দেখা গেল নায়েব গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর পাশে লক্ষ্মীকান্ত দাঁরোগা।

দৃঢ়নেরই দৃঢ়ট একই সঙ্গে অদ্বৈতে গেটের সামনে দণ্ডায়মান লক্ষ্মী-কান্ত সাহা ও নায়েবের উপরে পর্তিত হল।

নায়েবের পাশে ঐ ভদ্রলোকটি কে মিঃ রায় ? কল্যাণী কিরীটীকে প্রশ্ন করে।

চিনতে পারা তো কষ্ট নয় ভদ্রলোকটিকে মিস্ সান্যাল ! কিরীটী প্রত্যন্তে দেয়। আপনি চেনেন না নার্কি খুঁকে ?

না, তবে ভদ্রলোকের বেশভূষা দেখে অনায়াসেই একটা অনুমান করে নিতে পারা যায়—চেয়ে দেখনুন। ভদ্রলোকের পরিধানে খার্ক প্যান্ট ও খার্ক হাফ-স্টার্ট।

তার থেকে কি প্রমাণ হলো ?

প্রমাণ হচ্ছে এই যে, ভদ্রলোক বোধ হয় এখানকার থানা অফিসার, পুলিসের লোক।

বেশ তো আপনার যদ্দি ! খার্ক জামাকাপড় পরলেই পুলিসের লোক হবে নার্কি ? মিলিটারীর কোন লোকও তো হতে পারে ?

এক্ষেত্রে তা নয় তার কারণ দৃঢ়টে, এক নম্বর হচ্ছে মিলিটারী ড্রেস্ টিক অয়নান্ট হয় না, স্বিতারিতৎঃ এই রকম জামায় ঐ পোশাক কেউ পরলে সে পুলিসের লোক হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা—

কথা বলতে বলতে ওরা দৃঢ়নে প্রায় লক্ষ্মীকান্ত সাহা ও নায়েবের একে-বারে কাছাকাছি ততক্ষণে এসে পড়েছে। নায়েব কথা বললেন কিরীটীকে সম্বোধন করে, এই যে মিঃ রায়, আস্নুন। বেড়াতে বের হয়েছিলেন বুঁৰুৱা ?

হ্যাঁ।

আপনার জন্যেই ইনি অপেক্ষা করছেন। আস্নুন, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি এখানকার থানা-ইনচার্জ লক্ষ্মীকান্ত সাহা। আর এ'র কথা আপনাকে গতকাল আমি জানিয়েছিলাম চিঠি দিয়ে, ইনি শ্রীযুক্ত কিরীটী রায়।

নমস্কার। লক্ষ্মীকান্ত কিরীটীকে নমস্কার জানায়।

নমস্কার। কিরীটী প্রতিনমস্কার জানাতে জানাতে অর্থপূর্ণ দ্রষ্টিতে তেরাচাভাবে কল্যাণীর দিকে সর্কোতুকে তাকায়।

কাল বসন্তবাবুর চিঠিতে আপনার এখানে আসবার সংবাদ পেয়েই আপনার সঙ্গে আলাপ করার লোভটা স্মরণ করতে পারলাম না, মিঃ রায়। ছুটে এসেছি।

ধন্যবাদ। ম্দু নষ্ট কঠে কিরীটী জবাব দেয়।

গুরুখেই শুনলাম চৌধুরী মশাইয়ের মেয়ে নার্কি তাঁর বাপের হত্যা-রহস্যের কিনারা করতে আপনাকে এখানে ডেকে এনেছেন। ব্যাপারটা কিছু বুঁৰুতে পারলেন ?

না, এই তো সরে দিন দৃষ্টি মাত্র এখানে এসেছি, এখনও তো সব চারিদিক
ভাল করে দেখাশোনা করবার সম্যোগ পাইনি।

দেখাশোনা আর কি করবেন! লাশও তো সৎকার করে ফেলা হয়েছে।—
লক্ষ্মীকান্ত জবাব দেন।

তা তো ফেলতেই হবে, বাসি মড়া ঘরের মধ্যে রেখে আর লাভ কি বলুন?
মিথ্যে কেবল দুর্গন্ধি ছড়াবে বই তো নয়! কিরীটী হাসতে হাসতে বললে।
তাহলে আর দেখবেন কি?

যে কোন হত্যার ব্যাপারেই ম্তদেহটা তো শেষ পরিচ্ছেদ মাত্র লক্ষ্মীকান্ত-
বাবু। প্রশ্নের অঙ্গের উত্তরমালা ছাপার অঙ্গে একটা সংখ্যাত্তর মাত্র। কিংতু
উত্তরটা জানলেই তো আর অঙ্গটা কষা যায় না। কি বলেন? হাসতে হাসতে
কিরীটী কথাটা বলে।

কিরীটীর হেঁরালি ভরা কথাগুলোর সঠিক অর্থ একেবারেই লক্ষ্মীকান্তের
হৃদয়ঙ্গম হয় না। তথাপি সে জবাব দিতে পথচার্পণ হয় না।

তা যা বলছেন, তবে কি জানেন মিঃ রায়, ব্যাপারটা যা বোঝা যাচ্ছে বেশ
একটু জটিলই।

কেন বলুন তো?

কারণ এখানকার কোন স্থানীয় লোকই ঢৌধুরী মশাইকে হত্যা করেনি—
তাই বুঝি!

নিশ্চয়ই, সে সম্পর্কে কোন ভুলই নেই। Some outsiders—আর আপনি
কি মনে করেন খন করার পর আর সে বেটো এ সহরের চতুঃসীমানায় আছে?
সঙ্গে সঙ্গেই পগারপার হয়েছে।

হঁ।

তা হলেই বুঝুন। নচেৎ আমিই কি এত সহজে হাত গুটিয়ে বসে
থাকতাম নাকি! এতক্ষণে বেটাকে নিয়ে হাজতে প্রতাম না!

চলুন না, ভিতরের ঘরে বসেই কথাবার্তা হবেখন। কথাটা বললেন
নায়েব।

তাই চলুন। লক্ষ্মীকান্ত জবাব দেন।

নায়েব বসন্ত সেনেরই আহবানে অতঃপর সকলে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে
নায়েবের কক্ষমধ্যেই এসে চুক্লেন।

বসন্ত দারোগা সাহেব, কিরীটীবাবু বসন্ত। মা-লক্ষ্মী, তুমিও বোস।
সম্মৰ্মপণ কঠে বসন্ত সেন সকলকেই বসবার জন্য আহবান জানালেন।

সকলে উপবেশন করে।

একটু চা হবে তো দারোগা সাহেব? লক্ষ্মীকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে
বসন্ত সেন প্রশ্ন করলেন।

চা! তা না হয় আনান!

বসন্ত সেন বোধ হয় চায়ের যোগাড় দেখতেই অব্দরের দিকে চলে
গেলেন।

কল্যাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার লক্ষ্মীকান্তই জিজ্ঞাসা করলেন,
আপনাকে তো চিনতে পারলাম না? আপনি?

কল্যাণী বোধ করি নিজের পরিচয়টা নিজেই দিতে যাচ্ছিল, কিরীটী বাধা
দিয়ে বললে, উনিও এখানে নবাগতা, মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় এসে পোঁচেছেন।

সৰিতা দেবীর মাঘাতো বোন। কল্যাণী সান্যাল।

মাঘাতো বোন! কই গৃত্য়জয় চৌধুরীর কোন শ্যালক আছেন বলে তো
সেদিন সৰিতা দেবী কিছু বললেন না?

এবাব জবাব দিল কল্যাণী নিজেই, মাঘাতো বোনই বটে, তবে তাঁর সঙ্গে
ঠিক রক্তের কোন জোরাল সম্পর্ক নেই। আমার বাবা নিয়ানল্দ সান্যাল পিসমার
দুরসম্পর্কীয় পিসতুত ভাই। এবং শুনোছ আমাদের বাড়তে আমার
ঠাকুরমার কাছেই নাকি তিনি মানুষ। আমাদের বাড় থেকেই পিসমার বিবাহ
হয়েছিল।

বেশ সহজ পরিষ্কার কষ্টে কল্যাণী লক্ষ্মীকান্তকে কথাগুলো বলে গেল।
কল্যাণীর জবাব দেবার ভঙ্গী ও কথার চমৎকার বাঁধুনি কিরীটীকে কল্যাণীর
প্রতি শুন্ধান্বিতই করে তোলে। সংক্ষেপে সে লক্ষ্মীকান্তের ঘাবতীয় প্রশ্নেরই
তখন উত্তর দিল।

লক্ষ্মীকান্ত দারোগাও কল্যাণীর জবাবে তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে
পারে না।

এমন সময় দেওয়ান বস্তবাবু আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এলেন।

নায়েবকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে লক্ষ্মীকান্ত তাঁকেই এবাবে প্রশ্ন
করলেন, সেই ছোকরাটি, সত্যাজিত না কি নাম, চৌধুরী মশাইয়ের বন্ধুপুত্ৰ—
চলে গিয়েছেন নাকি?

না, তিনি এখনো এখানেই আছেন। তাঁকে ডাকবো নাকি?

না, ডাকতে হবে না। হ্যাঁ ভাল কথা কিরীটীবাবু, আপনার পরিচয়
হয়নি সেই ছেলেটির সঙ্গে?

কিরীটী মন্দ হেসে জবাব দেয়, হ্যাঁ, তা হয়েছে বৈক। কেন বলুন
তো!

না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম, ছেলেটিকে আপনার কেমন বলে মনে
হয়?

চমৎকার! A perfect gentleman!

ভৃত্য একটা প্রেতে করে চার পেয়ালা চা নিয়ে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ
করল।

তিনিই বোধ হয় সৰিতা দেবীকে পরামর্শ দিয়ে আপনাকে এখানে
আনিয়েছেন!

কিরীটী একঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পারে, হঠাৎ তার সত্যাজিত সম্পর্কে
ঐ ধরনের প্রশ্নটা করবার উদ্দেশ্য কি। লক্ষ্মীকান্তের সঙ্গে দু'একটি কথা বলবার
পরই কিরীটী লক্ষ্মীকান্ত-চৰণত সম্পর্কে কতকটা আল্দাজ করে নিতে পেরে-
ছিল এবং এটা সে বুঝতে পারছিল, চপটাস্পষ্টি ভাবে না জানালেও লক্ষ্মী-
কান্ত তার এখানে আগমনটা বিশেষ স্নেহেরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি।
এ জগতে একশ্রেণীর লোক আছে যারা নিজেদের অধিকারের সীমানা বা
চৌহান্দির মধ্যে তৃতীয় কোন বাস্তির মাথা গলানোটা আদপেই ভাল দণ্ডিতে বা
সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কিরীটী মনে মনে একটু হাসে এবং
অত্যন্ত সহজ কষ্টে লক্ষ্মীকান্তের প্রশ্নের জবাব দেয়।

কতকটা তাই বটে, আবার সম্পূর্ণ সেটা না-ও বটে। কারণ সৰিতা
দেবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেই বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, কারো কথা চট করে

যে মাথা পেতে মেনে নেবেন ঠিক সে শ্রেণীর মেয়ে তিনি নন।

লোকচরিত্ব সম্পর্কেও তো দেখছি বেশ আপনার অভিজ্ঞতা আছে কিরীটীবাবু!

হ্যাঁ, লোকচরিত্ব নিয়েই যথন কারবার করতে হয়, সে সম্পর্কে একটু-আটু জ্ঞান না থাকলে কি করে চলে বলুন? কিন্তু সেকথা যাক, লক্ষ্মীকান্ত-বাবু! আপনি অন্ধগ্রহ করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এতে যে কি আনন্দিত হলাম! আপনিই এলেন, নচেৎ গতকালই ভাবিছিলাম আপনার সঙ্গেই যে সর্বাংগে আমার একবার দেখা করা প্রয়োজন —

কেন বলুন তো?

বলতে গেলে আপনিই তো এই শহরের দণ্ডমূখের খোদ মালিক। তাছাড়া মৃত্যুঝয় চৌধুরীর হত্যার ব্যাপারে যা কিছু investigation তো আপনার প্রারাই হয়েছে। কাজেই এর রহস্যের দদন্তে নামতে হলে আপনার সাহায্য ও উপদেশটাই তো সর্বপ্রথম কথা।

কিরীটীর কথা বলবার ভাঙ্গাতে কল্যাণী এমন কি বসন্ত সেন পর্যন্ত ওর মূখের দিকে না তাকিয়ে পারে না। কিরীটীর গগনায় ভুল হয়নি। সাপের মূখে ধূলো পড়ার মতই কাজ হলো, লক্ষ্মীকান্তের কচু গুটিয়ে এলো। বিনয় বিগালিত কঠে লক্ষ্মীকান্ত জবাব দিলেন, হেঁ! হেঁ! কি যে বলেন আপনি কিরীটীবাবু? তবে হ্যাঁ, কেসটা জাটিল হলেও আমার দিক থেকে যথাসম্ভব সাহায্য আপনি পাবেন।

পাবো বলেই তো আশা করে আছি। নচেৎ কোন দণ্ডসাহসে এ কেসটা আমি হাতে নিয়েছি বলুন তো?

কিন্তু দারোগা সাহেব, এদিকে চা যে জুড়িয়ে গেল! কথাটা বললে কল্যাণী।

ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক ঠিক। লক্ষ্মীকান্ত হাত বাড়িয়ে ত্বে থেকে একটা কাপ নিতে নিতে বললেন, এ কি, তিন কাপ চা যে!

কথাটার জবাব দেয় কিরীটীই, একটা কাপ ঐ সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে নিতে, নায়েব মশাইয়ের বোধ হয় চা তেমন চলে না!

এবাবে জবাব দিলেন নায়েবই, হ্যাঁ। এ-ষুগের লোকদের মত চা-টা তেমন আমার ঠিক সহ্য হয় না। কিরীটীবাবু ঠিকই বলেছেন।

চা খুন না! আশ্চর্য তো! কথাটা বললেন লক্ষ্মীকান্ত।

না। সকালে বিকালে চায়ের বদলে আমি এক জ্লাস করে দৃশ্য পান করি।

হ্যাঁ, ওর আবাদের মত বোধ হয় আসার বস্তুতে তেমন পক্ষপার্িত্ব নেই। উনি একেবারে খাঁটি ও সার বস্তুরই প্রিয়। হাসতেই হাসতেই কিরীটী কথাটা উচ্চারণ করে এবং হাসতেই হাসতেই কথাটা বললেও, আড়চোখে বসন্ত সেনের মূখের প্রতি দ্রষ্টিপাত করতে কিরীটী ভোলে না। নায়েবের চোখের তারা দৃঢ়টা যেন বারেকের জন্য একবার ঝিকিয়ে উঠে আবার স্বার্ভাবিক শান্ত হয়ে গেল, সেটুকুও তার নজর এড়ায় না।

বাইরে এমন সব চাটিজুতোর শব্দ শোনা গেল। এবং সেই সঙ্গে গলাও শোনা গেল, বসন্ত ভায়া, কোথায় হে?

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই দ্রষ্ট ঘৃণপৎ খোলা-পথের দিকে

পাঁতত হয়।

এই যে সান্যাল মশাই আসন্ন। আসন্ন—আমি এই ঘরেই আছি। উদার কঢ়ে আহবান জানালেন বসন্ত সেন।

॥ ১২ ॥

কল্যাণীর পিতা নিত্যানন্দ সান্যাল এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন পরক্ষণেই। পরিধানে একটা সাদা ধূতি, গায়ে একটা মের্জাই। পায়ে বিদ্যাসাগরী চুট।

আসন্ন সান্যাল মশাই। এইদের সঙ্গে আপনার পরিচয়টা করিয়ে দিই। ইনি শ্রীষ্ট লক্ষ্মীকান্ত সাহা, এখানকার থানার বড়বাবু। ইনি মিঃ কিরীটী রায় রহস্যভেদী—আর ইনি—

নবকার, আসন্ন। আপনার পরিচয় আগেই আপনার কল্যা দিয়েছেন। লক্ষ্মীকান্ত বসন্ত সেনের বক্তব্যে বাধা দিয়ে কথাটা বললেন।

বটে! বটে! মা কালই ব্যবি আগেই আমার পরিচয় দিয়েছে? কিন্তু মেয়ের কাছ থেকে বাপের পরিচয়—সেটা তো ঠিক পরিচয় পাওয়া হলো না দারোগা সাহেব! কোতুকমিশ্রিত কঢ়ে জবাব দিলেন সান্যাল।

কেন বলুন তো? প্রশ্ন করলেন লক্ষ্মীকান্ত।

কেন আবার! অতিশয়োজ্জিতে সে পরিচয় যে অনিবার্য ভাবেই দ্রুত হবে। তারপর মেয়ের দিকে তাঁকিয়ে বললেন, সকালে উঠে কোথায় গিয়েছিলে মা-জননী? আমার এখনো উপাসনা সমাপন হয়নি। প্রভাত-উপাসনার ব্যবস্থাটা করে দাও তো গিয়ে মা—

এখনি যাচ্ছ বাবা। সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। কতকটা যেন লজ্জিত ভাবেই কথা কঢ়ি বলে কল্যাণী কক্ষ হতে একটু দ্রুতই নিঞ্জান্ত হয়ে গেল।

আপনি কালই এখানে এসে পেঁচেছেন শুনলাম! কথাটা বললেন লক্ষ্মীকান্ত নিত্যানন্দ সান্যালের মুখের দিকে তাঁকিয়ে।

হ্যাঁ। সংবাদপত্রে সব জানা মাছই চলে আসতে হলো। আপনার বলতে আজ আমি ছাড়া মেয়েটার আর কেউই তো নেই। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। ছেলেবয়সে মাকে হারাল, চিসংসারে একমাত্র ছিল ঐ বাপ, তাকেও হারাল। খেদপূর্ণ কঢ়ে কথাগুলো বললেন সান্যাল মশাই।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত তিনজনের একজনও কেউই সান্যাল মশাইয়ের কথার কোন জবাব দিল না।

সকলেই নিঃশব্দে বসে রইল।

নিত্যানন্দই আবার কথা বললেন, কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো দারোগা সাহেব! এ যে একেবারে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য! এই অজ শহর, এখানেও এসব ঘটে! কিরীটীবাবু—, কথা বলতে বলতে হঠাতে কিরীটীর দিকে ঘূরে তাঁকিয়ে সান্যাল তাঁর বক্তব্যের শেষটুকু কিরীটীর উদ্দেশ্যেই যেন বাস্ত করলেন, আপনি তো শুনলাম একজন নামকরা বিচক্ষণ গোয়েন্দা, আপনাই বলুন না?

অসম্ভব হলেও ব্যাপারটা এইখানেই তো ঘটেছে মিঃ সান্যাল! জবাব

দিলেন লক্ষ্যীকান্ত সাহা।

কিন্তু কে হত্যা করলো? আর তাকে হত্যা করেই বা কিলাভ?

শ্বিতীয় প্রশ্নটার আপনার জবাব পেলেই তো আপনার প্রথম প্রশ্নটার জবাবটাও আমরা পেয়ে যাই সান্যাল মশাই! এবাবে জবাব দিল কিরীটীই, এবং সেটাই তো এক্ষেত্রে আমাদের তদন্তের মূল ব্যাপার!

কি জানি কিরীটীবাবু, ঘটনাটা সংবাদপত্র মারফৎ পড়া অবধিই যেন আমি একেবাবে তাজ্জব বনে গিয়েছি। তারপর একটু থেমে আবাব বলতে লাগলেন—

আমি চৌধুরীকে তো বেশ ভাল করেই জানতাম, অমন চর্চাবান সহদয় লোক হয় না আজকালকার দিনে বড় একটা। তারপর কতকটা যেন স্বগত ভাবেই বললেন, দয়াময়, সবই তোমার লীলা প্রভু!

আমাদেরও তাই বস্ত্ব সান্যাল মশাই। কিরীটী আবাব কথা বলে, এ দৃষ্টিনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে এবং সেটা থাকতেই হবে। বিনা উদ্দেশ্যে বা বিনা কারণে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড কখনো সংবর্চিত হয় না। হত্তে পারে না। আপনি, বস্ত্ববাবু, আপনারা দীর্ঘদিন ধরে নিহত মৃত্যুজয় চৌধুরীকে জানতেন। তাঁর সম্পর্কে আপনারা আমাদের যত সংবাদ দিতে পারবেন আর কারো পক্ষেই সেটা সম্ভবপর হবে না। এবং এ-ও সৰ্বত্য যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে থেকেও অত্যল্প প্রয়োজনীয় বা ম্ল্যবান স্ত্রের সম্মান পাই যাব সাহায্যে এই ধরনের তদন্ত-ব্যাপারে মীমাংসাটা সহজ ও সরল হয়ে আসে।

কিন্তু দ্রুতের বিষয় কিরীটীবাবু,—, সান্যাল বলতে লাগলেন, এমন কোন ঘটনাই কই চৌধুরী সম্পর্কে আমার মনে পড়ছে না যেটা আপনাদের বললে আপনারা এ ব্যাপারে আলোর সম্মান পাবেন, যে ঘটনাকে তার এইভাবে নিহত হবার সামান্যতম কারণ বলেও বিবেচনা করা যেতে পারে। তাহলেও আপনারা যদি আমাকে বলেন ঠিক কি আপনারা জানতে চান চৌধুরী সম্পর্কে, তাহলে জানা থাকলে বলতে পারি কারণ সে যে আমার কতখানি আপনার ছিল সে একমাত্র আমিই জানি। আমার কোন মার পেটের বোন ছিল না কিরীটীবাবু। হেমে আমার দ্রু-সম্পর্কীয় মায়াতো বোন হলেও সহোদরারও অধিক ছিল। একই মায়ের স্নেহের অঙ্গলে সে ও আমি বর্ধিত হয়েছি। সে যে আমার কতখানি ছিল,—, বলতে বলতে প্রৌঢ় সান্যালের গলার স্বরটা রূদ্ধ হয়ে আসে— দুই চক্ষুর দৃষ্টি অশ্রুতে বাপসা হয়ে ওঠে।

সান্যালের শেষের কথাগুলোতে কক্ষের আবহাওয়াটা যেন কেমন করণ হয়ে ওঠে।

সান্যাল তাঁর ধৃতির প্রান্ত দিয়ে উদগত অশ্রুকে মুছে নিয়ে আবাব বলতে লাগলেন, উনিশ বৎসর পূর্বে হঠাতে একদিন কলকাতা থেকে চৌধুরীর চিঠিতে যথন জানলাম হেমের মৃত্যু হয়েছে, সে আর ইজগতে নেই, সেদিনের কথা আমি ভুলবো না কিরীটীবাবু। হেমের অস্তুরের সংবাদ পূর্বেই চৌধুরীর চিঠিতে পেরেছিলাম বটে, কিন্তু সে যে অত শীঘ্র আমাদের মাঝে কাটিয়ে তার এত সাধের সাজানো ঘর ফেলে ঐ বয়সেই মৃত্যুমুখে পরিত্যক্ত হবে এ যেন সৰ্বতই আমার স্বপ্নাতীত ছিল। হেমের মৃত্যুর পর দু'বাব মাত্র এখানে আমি এসেছি—এ বাড়তে পা দিলেই যেন হেমের শত সহস্র স্তৰ্ণি আমার কণ্ঠ টিপে

ধরেছে, তাই হাজার ইচ্ছা হলেও এদিকে আর পা বাড়াইনি। আর পা দিয়েই বা কি হবে বলুন! যার সঙ্গে সম্পর্ক সেই ষথন রইল না! আর চৌধুরীর কথাই বা কি বলবো, কি ষে ভালবাসত ও হেমকে! হেমের অসময়ে মৃত্যুতে ও যেন একেবারে হঠাতে অল্প বরসেই দেহ ও মনে স্থাবর হয়ে পড়েছিল। বাইরে থেকে অবশ্য বুঝবার উপায় ছিল না, তিতে তিতে একেবারে শূরুক্যে যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

কিরীটী ও বসন্ত সেনের মধ্যে একবার দ্রুতি-বিনময় হয় চাকতে, ষথন সান্যাল হেমপ্রভার মৃত্যুর কথা বলাইছিলেন। কিন্তু কিরীটী বা বসন্ত সেন দ্বিজনার কেউই সান্যালের কথার মধ্যে কথা বলে তাঁকে বাধা দিল না। সান্যালের বন্ধব শেষ হতেই সহসা কিরীটী বলে ওঠে, একটা কথা সান্যাল মশাই, একটা আগে আপনার ভগী হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যু সম্পর্কে ষে কথাটা বললেন, মানে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল, তাই কি?

বিস্মিত সান্যাল কিরীটীর প্রশ্নে ওর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দ্রুতিতে তাঁকরে বললেন, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

কিন্তু কানাইয়ের মার মুখে হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যু সম্পর্কে যা জানা গিয়েছে সেটা কিন্তু—, কিরীটী শেষটুকু বলতে বোধ হয় ইতস্ততই করে।

সান্যাল তীক্ষ্ণ দ্রুতিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন, কি শুনেছেন? হেমপ্রভা দেবীর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেনি এবং সকলে যা জানে কলকাতায়ও তাঁর মৃত্যু ঘটেনি।

সে কি! একই সঙ্গে বলতে গেলে প্রায় কথাটা উচ্চারণ করলেন সান্যাল ও দারোগা লক্ষ্মীকান্ত সাহা।

নিষ্ঠার সত্যাকে এবার অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবেই যাচাই করার প্রয়োজন। এতকাল যা ঘন রহস্যের অন্তরালে সকলেকে অজ্ঞাত ছিল আর তা থাকবে না। মৃত্যুজয় চৌধুরীর মৃত্যুর রহস্য অতীতেক আর এক রহস্যকে লোকচক্ষুর সম্মুখে উন্মোচিত করল যেন কাজিক্ষণ্ঠেই হ্যাঁ।

কালের বিধান।

কালাপ্রাতে যা নিশ্চিহ্ন হয়ে ধূমে-মুছে আকবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলেই সকলে ভেবেছিল, আজ আবার কানাইয়ের মাঝায় তাকে বর্তমানের মধ্যে এনে উপস্থিত করেছে।

ক্ষণপর্বে উচ্চারিত কিরীটীর কথায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলকেই কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিপ হয়ে থাকে।

কারো কষ্ট হতে এতটুকু স্বরও নিগর্ত হয় না।

বারেকের জন্য চাকিত দ্রুত দ্রুত সঞ্চালনে কিরীটী ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে তাঁকরে নিল।

হ্যাঁ, গতকাল সেন মশাইয়ের সঙ্গেও ঐ কথার ইতর প্রতিমুক্তি আমরা করেছিলাম—কিরীটী আবার বলে।

এ কথা কি সত্য বসন্ত? এবারে প্রশ্ন করলেন সান্যাল বসন্ত সেনকে। না, সত্য নয়। কঠোর তীক্ষ্ণ কষ্টে নায়েব প্রত্যক্ষের দিলেন।

নায়েব মশাই, কোন কিছু আপনার অজ্ঞাত বলেই তাকে একমাত্র সেই দ্বন্দ্বিতেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। কালও আপনাকে এটুকুই বলবার চেষ্টা করেছিলাম। বিশ্বাস করুন, কানাইয়ের মা মিথ্যা বলেনি।

ডাক তো বস্তুত ভায়া একবার ঐ খি কানাইয়ের মাকে। কথাটা বললেন
সান্যালই এবারে।

হ্যাঁ, তাই ডাকুন, সাতাই র্দান্ত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর স্তৰী হেমপ্রভা দেৰ্বীৱ
মৃত্যুৰ ব্যাপারে কোন রহস্য থেকেই থাকে সেটাকে অতি অবশ্য যাচাই কৱা
প্ৰয়োজন। লক্ষ্মীকান্ত যেন অতি উৎসাহেৰ সঙ্গে কথাটা বললেন।

গোৰিবল্দ এই গোৰিবল্দ! বস্তুতবাবু দৱজাৰ বাইৱে গিয়ে ভূত
গোৰিবল্দকে ডাকলেন।

একটু পৰেই গোৰিবল্দ ঘৰেৰ মধ্যে এসে উপস্থিত হলো, বাৰু!

কানাইয়ের মাকে একবার ডেকে দে তো। যা শীগ্ৰগিৰ পাঠিয়ে দে এ
ঘৰে। গোৰিবল্দ আদেশ পালনেৰ জন্য চলে গেল।

কিন্তু কানাইয়ের মার কথার সত্যতা যাচাই কৱাৰ চাইতেও তেৱে বিস্ময়
সকলেৰ জন্য অপেক্ষা কৱাছিল, যখন গোৰিবল্দ এসে সংবাদ দিল সকাল থেকে
কানাইয়ের মাকে বাঁড়িৰ মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কানাইয়ের মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে আবাৰ কিৱে! ভাল কৱে
খোঁজ নিয়ে দেখ। কোথায় যাবে বুড়ী!

তীক্ষ্ণ রাগত কষ্টে কথাগুলো বললেন বস্তুত সেন।

আজ্জে ভাল কৱেই দেখোছি। ঠাকুৰ আৱ বনমালীও বললে, সকাল থেকে
অনেক খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি—

ঠিক এৰ্মান সময় প্ৰথমে সৰিবতা ও তাৱ পশ্চাতে সত্যজিৎ কক্ষমধ্যে এসে
প্ৰবেশ কৱলৈ।

সৰিবতাৰ চোখমুখে একটা উল্লেগণ ও দৃশ্যচিন্তা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
ঘৰেৰ মধ্যে প্ৰবেশ কৱে সৰিবতা সকলকে সেই ঘৰেৰ মধ্যে উপস্থিত দেখে, এমন
কি দারোগা লক্ষ্মীকান্ত সাহাকেও সেই ঘৰেৰ মধ্যে উপৰিষট দেখে প্ৰথমটায় যেন
একটু ইতস্ততই কৱে কিন্তু পৱক্ষণেই সে স্বৈৰেকাটুকু কাটিয়ে উঠে বাষ্প কষ্টে
বস্তুত সেনেৰ দিকে তাৰিকয়েই বলে, নায়েৰ কাকা, সকাল থেকে এ বাঁড়িৰ মধ্যে
কানাইয়ের মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা জলজ্যান্ত মানুষ রাতৰাতি কোথায় উধাৰ হয়ে যাবে? নিচৰাই
কোথাও না কোথাও আছে। আৱ একবার ভাল কৱে খুঁজে দেখতে বলাছ মা
গোৰিবল্দকে। জবাৰ দিলেন বস্তুত সেন।

ততক্ষণে কিৱীটী একটা কথা বলেনি। একপাশে চৰ্পাট কৱে দাঁড়িয়ে
ছিল। এবাবে সে কথা বললে, কানাইয়েৰ মা কোন ঘৰে শুণতো?

নৌচৰে তলায় চাকৰদেৱ ঘৰেৰ পাশেৰ একটা ঘৰে। জবাৰ দিল সৰিবতা।

চল্লন তো, একবাব ঘৰটা ঘৰে দেখে আসি। কিৱীটী সৰিবতাৰ দিকে
তাৰিকয়ে চোখেৰ দৃশ্যচিন্ততে তাকে অনুসৰণ কৱতে বলে খোলা দৱজাৰ দিকে
সৰ্বপ্ৰথম এগিয়ে গেল। এবং দৱজাৰ কাছাকাছি গিয়ে ফিৱে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী-
কান্তকে সম্বোধন কৱে বললে, আস্বন লক্ষ্মীকান্তবাবু, চল্লন আপনিও এক-
বাব দেখবেন না ঘৰটা?

হ্যাঁ চল্লন। লক্ষ্মীকান্তও অতঃপৰ তাকে অনুসৰণ কৱে এগিয়ে
গেলেন।

বস্তুত সেনও অনুসৰণ কৱলেন ওদেৱ।

বারান্দাটা অভিষ্ঠম করে প্রশংস্ত একটা ধীধানো আঙ্গন। আঙ্গনার দক্ষিণ প্রান্তে পর পর তিনটে ঘর। তারই একটা ঘরে কানাইয়ের মা সর্বিতারা এখানে আসবার পর থেকে রাত্রে শুচ্ছল। ওদের এখানে আসবার প্রবেশ অবশ্য কানাইয়ের মার জিনিসপত্র এই ঘরের মধ্যে থাকলেও, উপরের তলার একটা ঘরেই শুভতো সে। পশের দ্বিধানা ঘরের একটায় থাকে বনমালী, অন্যটায় গোবিন্দ ও ঠাকুর!

নার্তিপ্রশংস্ত ঘরখানি। ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। সর্বিতাই ঘরের সামনে এসে ঘরটা দেখিয়ে দিতে সর্বাঙ্গে কিরীটীই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র বিশেষ কিছু তেমন নেই। একধারে একটা টিনের পুরাতন রং-চটা প্রাঙ্ক, ছোট একটা মিলারের চ্যাপ্টা তালা লাগানো। তারই পাশে একটা মাটির কলসী ও তার উপরে পরিষ্কার কাঁসার গ্লাস উব্দুড় করা।

দেওয়ালের গায়ে গায়ে পেরেকের সাহায্যে দাঁড়ি টানিয়ে খানকয়েক সাদা-কাপড় পরিষ্কার শাড়ি ঝোলানো আছে।

কিরীটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একবার চারিদিকে তার অভিষ্ঠত তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দ্রঃঞ্জিট ব্লিউর নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে পর পর যে দ্রুটি বন্ধ জানালা ছিল সে দ্রুটি খুলে দিল।

এক ঝলক হাওয়া ও আলো ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। জানালা দ্রুটো বিলের দিকে। জানালা খুললেই দিগন্তপ্রসারী বৌরাণীর বিলের জল ঢোকে পড়ে।

কিরীটী শয়্যাটার দিকে এগিয়ে গেল। শয়্যার মলিন চান্দরটা জায়গায় জায়গায় কুঁচকে আছে এবং মাথার বালিশটা বিছানার একধারে পড়ে আছে।

অতঃপর কিরীটী ঘরের মেঝেটা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দ্রঃঞ্জিটে পরীক্ষা করতে করতে হঠাতে হাঁটু গেড়ে এক জায়গায় বসে পকেট থেকে একটা লেন্স বের করে সেটার সাহায্যে কি যেন দেখতে লাগল।

অন্যান্য সকলে কোতুহলী হয়ে কিরীটীর পশ্চাতে এসে দাঁড়ায়।

মিনিট দেড়েক বাদে কিরীটী আবার সেজা হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং সর্বিতার মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল, কানাইয়ের মা তো বিশেষ করে আপনার কাজ-কর্মই দেখাশোনা করত, তাই না?

হ্যাঁ। ইদানীঁ বয়স হওয়ায় তাকে বিশেষ কাজকর্ম তো করতে দেওয়া হতো না। নিজের খণ্ডিত যা টুকুটাক কাজ একটু-আধটু করত।

কাল রাত্রে শেষবারের মত তাকে কথন আপনি দেখেন?

রাত এগারটার কিছু পরে সে আমার কাছ থেকে চলে আসে।

আজ সকালে কথন সর্বপ্রথম জানতে পারেন যে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না?

এই তো ষষ্ঠোখানেক আগে। রোজ সকালে সে আগার জন্য চা নিয়ে যেত, অজ যায়নি দেখে খোঁজ করতেই তো বনমালী এসে আমাকে বললে কানাইয়ের মাকে পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে।

বনমালী কোথায়?

বনমালীকে ডেকে আলা হল ঘরের মধ্যে।

এই সে বনমালী, তুমি কোন্ ঘরে গতকাল রান্তে শুয়েছিলে ? কিরীটী
প্রশ্ন করল।

এই ডানদিককার পাশের ঘরটাতে বাবু।

আজ সকালে তোমার দিদিমাণি খেঁজি করবার আগে কানাইয়ের মাকে যে
পাওয়া যাচ্ছে না, জানতে না ?

আজ্ঞে না। খুঁজতে এসেই তো দেখলাম এ ঘরে সে নেই।

কাল রান্তে শেষ কখন তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ? ,

খাওয়ার সময় রান্তে, তখন সাড়ে দশটা হবে—

তারপর ?

আজ্ঞে তারপর আমি ঘুমোতে চলে আসি ঘরে, আর তার সঙ্গে দেখা
হয়নি কাল রান্তে।

রান্তে কোন রকম শব্দ শুনেছিলে এ ঘরে ?

না।

খুব ঘূর্মিয়েছিলে বুঝি ?

আজ্ঞে। বৃষ্টি হওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল—

ঠাকুর কোথায় ? তাকে একবার ডেকে আন তো !

বনমালী গিয়ে রান্ধনশালা হতে ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিল।

বছর প্রিশ-পঁয়াশি বয়সে হবে লোকটার। ঢ্যাঙা রোগা চেহারা। গায়ের
রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। গালের হনু দণ্ডে বিত্রীভাবে সজাগ হয়ে আছে। প্রবৃ
কালো ঠেঁট। উপরের পার্টির দাঁত বিকশিত হয়েই আছে। লোকটার স্বভাব
বোধ হয় বেশ পরিচ্ছন্ন। পরিষ্কার একটা খাটো ধৰ্মত পরিধানে। গল অ
সম্বৰান ধৰ্মত একগুচ্ছ পৈতা।

তুমই এ বাড়িতে রান্না কর ? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

আইজ্জা কর্তা।

কি নাম তোমার ?

আইজ্জা অধীনের নাম যোগেশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজী শ্রেণী।

বাড়ি কোথায় ?

আইজ্জা সোনারাং।

কত দিন আছ এ বাড়িতে ?

তা আপনাগোর আশীর্বাদে ধরেন গিয়া এক বৎসর তো হইবই।

তুমি এই পাশের ঘরেই শোও তো ?

আইজ্জা।

কানাইয়ের মাকে বাড়ির মধ্যে কাল রাত থেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে
না, জান ?

আইজ্জা কি কইলেন ? কানাইয়ের মায়েরে খাইজা পাওয়া যাইতেছে না।
কন কি ! যাইবো কনে ? এহানেই কোথায় হয়ত হইবো ! খাইজা দেখুন ?

॥ ১০ ॥

সকলে আবার নায়েবের ঘরে ফিরে এলো।

কানাইয়ের মার অর্তকৃত অন্তর্ধানের ব্যাপারটা যেন সকলকেই একেবারে

বিশ্বায়ে অভিভূত করে দিয়েছে।

রাতারাতি কোথায় যেতে পারে কানাইয়ের মা ?

শহর এখান থেকে প্রায় মাইল পাঁচক দূরে। সে যদি নিজের ইচ্ছাতেই চলে গিয়ে থাকে, তাহলে এই পাঁচ মাইল পথ রাত এগারটার পর কোন এক সময় এখান থেকে বের হয়ে অতিক্রম করে গিয়েছে।

কালকের সেই ব্রিট-বাদলের অন্ধকার রাত্রে যদি সে স্বেচ্ছায় গিয়েও থাকে, তাহলেও খুব বেশী দূর এখনও যেতে পারেনি নিশ্চয়ই।

আর যদি অন্য কিছু হয়, তাহলে !

অত্যন্ত দ্রুত কিরীটী আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে একবার চিন্তা করে বিশেষণ করে নেয় বোধ হয়।

এ কথা অবশ্য ঠিকই, হয় কানাইয়ের মা স্বেচ্ছায় এ-বাঁড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছে, নচেৎ হয়ত যেতে হয়েছে। অথবা এ-বাঁড়ি থেকে তাকে কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

চলে গিয়েই যদি থাকে সে এ-বাঁড়ি থেকে স্বেচ্ছায় ! কিন্তু কেন যাবে ? কি এমন কারণ থাকতে পারে তার ঘাবার ?

যদি যেতে বাধ্য হয়ে থাকে ! হয়ত সেটা অসম্ভব নয়।

আর যদি তাকে এখান থেকে সরানো হয়ে থাকে ! সেটাও অসম্ভব নয়। কারণ এ বাঁড়ির সে বহুদিনকার পুরুতন দাসী। এ পরিবারের সঙ্গে সে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত। তার পক্ষে অনেক অতীত ঘটনার সাক্ষী হওয়া মোটেই তো অস্বাভাবিক নয়। এবং সেটা সকলের পক্ষে বাঞ্ছনীয় তো নয়ই, অভিপ্রেত বা স্মৃত্করণ নয়।

ধরেই যদি নেওয়া যায় তাকে সরিয়েই ফেলা হয়েছে কোন বিশেষ কারণে, তাহলে কত দূরে কোথায় তাকে সরানো হল ?

রাতারাতি কত দূরে তাকে সরিয়ে ফেলা সম্ভবপর ?

কিরীটী সহসা লক্ষ্যীকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, আপনার কি মনে হয় দারোগাবাদ, কানাইয়ের মার ব্যাপারটা ?

মাগী নিশ্চয়ই কোথাও চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে কেন ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না, খুঁজে আর দেখতে হবে না। অনেক খোঁজা হয়েছে, তাকে পাওয়া যায়নি।

খোঁজেন খোঁজেন—ভাল কইয়া খুঁজিয়া দেখেন, পাইবেন খন। যাইবো কনে ! যাওনের জায়গা থাকলি তো যাইবো ! পোড়াকপাইলা বুড়ীর চাল-চূলো কোথাও কি আছে নাকি ! বেবাক গিইলা বইসা আছে না মাগী ! ওই যা, ওদিকে ডাল বসাইয়া আইছি ! সব বোধ হয় পুইড়া ছাই হইয়া গেল ! নির্বিকার ঘোগেশ বোধ হয় রন্ধনশালার দিকে ঘাবার জন্যই দরজার দিকে পা বাড়ায়।

এই হারামজাদা, যাচ্ছস কোথায়, দাঁড়া ! সহসা ঘেন অর্তিক্র্তে বাঘের ঘতই গর্জিয়ে ওঠেন লক্ষ্যীকান্ত দারোগা।

থমকে দাঁড়য়ে যায় ঘোগেশ। এবং ফ্যালফ্যাল করে লক্ষ্যীকান্তর মুখের দিকে তাকায়।

যাচ্ছস কোথায় ? বাব, যা জিজ্ঞাসা করছেন তার জবাব দে !

যোগেশ কিন্তু লক্ষ্মীকান্তের কথার কোন জবাব দেয় না, কেবল তাকিয়ে
থাকে নিশ্চিপ হয়ে তাঁর মুখের দিকে।

শালার চোখমুখের ঢেহারা দেখেছেন কিরীটীবাবু? পাকা শয়তান! লক্ষ্মীকান্ত কথাটা কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বলে।

গালিগালাজ দেন ক্যান? কি করাছ আমি? যোগেশ দারোগা সাহেবের
মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

না, গালাগালি দোব না, তোমায় পাদ্যার্থ দেব!

কি কইলেন? যোগেশ আবার প্রশ্ন করে।

যোগেশ, তুমি তো পাশের ঘরেই কাল রাতে শূরোঁছিলে? এ ঘরে কাল
রাতে কোন শব্দ শুনেছ? প্রশ্ন করে এবারে কিরীটী।

আইজ্জা শব্দ শুনলুম ক্যামনে? ক্ষেত্রীর মাঝ কর, আমি একবার নিদ্রা
গেলে নাকি ঢাকের বাদিওও কানে আমার থার না! তা আপনাগোর ছিচরণের
আশীর্বাদে নিদ্রাটা আমার একটু গাঢ়ই।

হঁ। আচ্ছা তুমি থাও।

যোগেশকে অতঃপর বিদায় দেওয়া হল।

এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানেন কিরীটীবাবু?
কি?

বুড়ী নিশ্চয়ই ম্যাঞ্জের চৌধুরীর ম্যাঞ্জের ব্যাপারে জড়িত ছিল। কেন
কারণে বেগতিক দেখে পালিয়েছে; কিন্তু আমিও আপনাকে বলে রাখিছ
কিরীটীবাবু, আমারও নাম লক্ষ্মীকান্ত সাহা, চৌধু বছর দারোগাগাঁরি করাছ
—ও হাঁ করলেই ব্রহ্মতে পার। থানায় ফিরে গিয়েই চারিদিকে আমি লোক
পাঠাবো। বেটী পালাবে কোথায়, হাতে দাঁড় দিয়ে হিড় হিড় করে টেলে এলে
হাজতে ভরবো না! দেখুন না—

কানাইয়ের মাকে ধরতে পারলে অবশ্য মন্দ হত না, তবে তাকে এত সহজে
ধরা থাবে বলে মনে হচ্ছে না মিঃ সাহা!

এটা আমার এলাকা কিরীটীবাবু—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সহসা এমন সময় পাশের ঘর থেকে উপ্র কর্কশ একটা কষ্ট শোনা গেল,
গোবিন্দ! এই গোবিন্দ—গোবিন্দ! এখনো চা দেবার সময় হল না বেটো
তোদের?

লক্ষ্মীকান্ত নায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কে?

সন্তোষ চৌধুরী—গতকাল সন্ধ্যায় এডেন থেকে এসেছে। জবাব দিলেন
বসন্ত সেন।

লোকটা কে? আবার জিজ্ঞাসা করেন লক্ষ্মীকান্ত।

পরিচয় দিচ্ছে কর্তার জাঠতুত ভাইয়ের ছেলে—ভাইপো।

ভাইপো! কই, এর সম্পর্কে কোন কথা তো সৈদিন আপনার মুখে বা
সর্বতা দেবীর মুখে শুনিনি।

আপনিও ওর আসবাব পূর্বে ওর সম্পর্কে কোন কথাই শোনেননি?
এবাবে প্রশ্ন করে লক্ষ্মীকান্তই সর্বতাকে।

না।

আপনার বাবা কোন দিন যে তাঁর জাঠতুত ভাই এডেনে থাকেন সে সম্পর্কে
কোন কথাই আপনাকে বলেননি মিস চৌধুরী? প্রশ্ন করল এবাবে কিরীটী

সর্বিতার দিকে তাকিয়ে।

না। সর্বিতা এবাবেও ঐ একই ছোট সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

নায়েব মশাই, আপনি? আপনি কোনদিন তাঁর মুখে শোনেনান তাঁর কেন জাঠতুত ভাই আছেন এডেনে, এ কথা? কিরীটী বসন্ত সেনের মুখের দিকে তাকিয়েই আবার প্রশ্ন করল।

শুনেছিলাম একবার কয়েক বছর আগে। কথায় কথায় একদিন তিনি বলেছিলেন, তাঁর এক জাঠতুত ভাই বিবাহের পর হঠাৎ বাপের সঙ্গে নাকি কি নিয়ে গোলমাল বাধায় কাউকে কিছু না জানিয়েই রাতারাতি রোকে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যান।

তারপর?

তারপর নাকি আর তাঁদের কোন সংবাদ পাওয়া ঘায়নি। চৌধুরীরাও তখন জয়েণ্ট ফ্যারিল ছিলেন। রামশক্রম চৌধুরী ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর পিতা পরম্পর সহৃদার ভাই ছিলেন। রামশক্রম তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র। রামশক্রমের গ্ৰহ-ত্যাগের পর দীর্ঘ এগার বৎসরেও যখন গ্ৰহত্যাগী নিরুদ্ধিষ্ট পুত্র আর গ্ৰহে ফিরে এলো না এবং হাজার চেষ্টা করেও বহু অর্থব্যয় করেও তাঁর বা তাঁর স্ত্রীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না তখন তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ভাগের সম্পত্তি স্বেচ্ছায় তাঁর একমাত্র ভাতুপ্ত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকেই দান করে যান কেবল একটি শতে—যদি কোনদিন তাঁর গ্ৰহত্যাগী পুত্র বা তাঁর বৎশের কেউ ফিরে আসে, তাহলে তাঁর ভাগের সম্পত্তি তাকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হব। কিন্তু সেও আজ দীর্ঘ চৌদ্দিশ বৎসর আগেকার ঘটনা।

এই ভদ্রলোক বলছেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর জ্যোত্ত্বাতার পুত্র? লক্ষ্মীকান্ত প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ।

কিন্তু তার প্রমাণ কিছু দিয়েছেন?

প্রমাণের কথা জিজ্ঞেস করায় বললে, প্রয়োজন হলে সে সব প্রমাণই কোটে দাখিল করবে। আমাকে সে কিছুই দেখাতে রাজী নয়। বসন্ত সেন লক্ষ্মী-কান্তের প্রশ্নের জবাব দিলেন।

হ্যাঁ। ডাকুন তো একবার ভদ্রলোকটিকে?

লক্ষ্মীকান্তের নির্দেশে নায়েব বসন্ত সেন কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। এবং সোজা গিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন। নিন্দাভঙ্গের পর সন্তোষ চৌধুরী শয্যার উপরে বসে আপন মনে একটা সিগারেটে অগ্নিসংঘোগ করে নিঃশব্দে মধ্যে মধ্যে সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ধূমোদ্গীরণ করছিল; নায়েবের পদশব্দে ভৃত্য বোধ হয় চা এনেছে তেবে বললে, কই, চা এনেছিস?

কিন্তু কথাটা বলে সামনের দিকে তাকিয়ে ভৃত্য বদলে স্বয়ং নায়েবকে দেখে ভুক্তিপ্রাপ্ত করে বললে, এই যে, নায়েব মশাই যে! ব্যাপার কি বলুন তো, সাতাই আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়াবার মতলব নাকি আপনার? সকালবেলা যে ভদ্রলোককে এক কাপ চা দিতে হয়, তাও কি এ বাড়িতে চাকরী জানে না?

ঠিক এমনি সময় কল্যাণী হাতে এক কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে কক্ষের মধ্যে

এসে প্রবেশ করল।

কল্যাণীকে সহসা চায়ের কাপ হাতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে দেখে উভয়েই কম বিস্মিত হয় না।

এ কি! আপনি চা নিয়ে এলেন কেন? চাকররা কোথায়? প্রশ্নটা করল সন্তোষ।

কল্যাণী ঘূর্দ হেসে জবাব দিল, আপনার মেজাজের ভয়ে গোবিন্দ চা নিয়ে আসতে সাহস পেল না, তাই অভিষ্ঠ নিয়ে এলাগ্র আপনার চা।

কল্যাণীর হাত হতে চায়ের কাপটা নিতে নিতে সন্তোষ যেন একটু উজ্জিতভাবেই বলে, হ্যাঁ, সকালবেলা চা না পেলে মেজাজটা আমার যেন কেমন বিগড়ে যায়।

কল্যাণী কিন্তু সন্তোষের কথায় আর কোন জবাব না দিয়ে অতঃপর ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল।

এইবাবে নায়েব বসন্ত সেন বললেন, একটু তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করে নিন সন্তোষবাবু। আপনাকে ঝুঁরা পাশের ঘরে ডাকছেন।

কে ডাকছেন?

এখানকার থানার বড় দারোগা সাহেব।

দারোগা সাহেব! কিন্তু তাঁর সঙ্গে কি প্রয়োজন?

তা তো জানি না, তবে এখন একবার আপনাকে ডেকেছেন।

আমি ডাকাতও নই, খন্নাও নই। I have got no business with any দারোগা সাহেব!

আপনার কোন বিজনেস না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। সহসা খোলা স্বারপথে লক্ষ্যীকান্তর কঠিন্যের শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘূর্গণ্ড বসন্ত সেন ও সন্তোষ সামনের স্বারপথের দিকে তাকাল।

শুধু একা লক্ষ্যীকান্ত সাহাই নয়, কিরীটী সর্বিতা ও সত্যজিৎও সঙ্গে আছে।

লক্ষ্যীকান্ত কথা বলতে বলতে সোজা একেবাবে ঘরের মাঝখানে সন্তোষের ঘূর্ধনাধীন এসে দাঁড়ালেন।

সন্তোষ রূক্ষ বিরাঙ্গিপূর্ণ দ্রষ্টিতে ক্ষণকাল আগন্তুক লক্ষ্যীকান্তের ঘূর্ধনের দিকে তাঁকয়ে থেকে কর্শকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কে আপনি? ভদ্রলোকের ঘরে সাড়া দিয়ে পার্মিশন নিয়ে ঢুকতে হয়, এইটুকু জানেন না?

জানি কিনা সে পরে বিবেচনা করা যাবে শাই। আপাততও আপনাকে আমার সঙ্গে এখন একবার ধানায় যেতে হবে। বেশ সতেজ নির্দেশপূর্ণ কণ্ঠ লক্ষ্যীকান্তের।

থানায় যেতে হবে কেন? বাঁকা দ্রষ্টিতে তাকায় সন্তোষ লক্ষ্যীকান্তের ঘূর্ধনের দিকে।

কারণ আপনি আমার এলাকায় বিদেশী, আমাকে না জানিয়ে প্রবেশ করেছেন।

তাই নাকি? বাংলাদেশের মধ্যেও গ্রামে ও ছোটখাটো শহরে পাসপোর্ট সিস্টেমের প্রচলন হয়েছে এ কথা তো কই শুনিনি?

দেখন সন্তোষবাবু, কার সঙ্গে রাসিকতা করছেন একটু ভেবে করবেন। আপনি আমার সঙ্গে এখন থানায় যেতে রাজী কিনা বলুন?

যাদি না যাই ?

কেমন করে যাওয়াতে হয় আমিতা জানি। থানা থেকে কলেস্টেবল
পাঠিয়ে দেব কি ?

সন্তোষ গুম হয়ে কিছুক্ষণ কি ঘেন ভাবল, তারপর উঠে দাঁড়য়ে বললে,
চল্লন কোথায় যেতে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন দারোগা সাহেব, এ অপমান
আমিত এত সহজে হজম করে নেব না।

এখন তো চল্লন, তারপর যা করবার করবেন। বলতে বলতে কিরীটীর
দিকে ফিরে তাকিয়ে লক্ষ্যীকান্ত বললেন, কিরীটীবাবু, আপনি আসুন।
আপনার সঙ্গে আমার অনেক প্রামাণ্য আছে।

আমি ভাবছিলাম সন্ধ্যার দিকে আপনার ওখানে যাব। কিরীটী জবাব
দেয়।

বেশ, তাই না হয় আসবেন। চল্লন সন্তোষবাবু।

সন্তোষকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্যীকান্ত ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ১৪ ॥

লক্ষ্যীকান্ত সাহা সহসা সন্তোষ চৌধুরীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে যেন একটা
নাটকীয় সংঘাতের সংগ্রিষ্ট করে গেলেন।

তবে দ্বিজনের জুতোর শব্দ ঘরের বারান্দায় ঘিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সকলেই ঘরের মধ্যে স্তৰ্দ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কোন
কথা বলে না। সকাল থেকে কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পর পর দ্বিটা ঘটনা ঘেন
অত্যন্ত আকস্মাক ভাবেই ঘটে গেল। প্রথমতঃ কানাইয়ের মার নিরুদ্ধিদণ্ড
হওয়া, স্বিতাইয়তঃ লক্ষ্যীকান্তের কতকটা জোর করেই সন্তোষ চৌধুরীকে
সঙ্গে করে থানায় নিয়ে যাওয়া।

ঘটনার পরিস্থিতিতে সকলেই যেন অল্পবিস্তর হকচিয়ে গিয়েছে।

সত্যজিৎ প্রথমে নিষ্ঠাধৃতা ভঙ্গ করে কিরীটীকে প্রশ্ন করল, লক্ষ্যী-
কান্তবাবু কি সন্তোষবাবুকে arrest করে নিয়ে গেলেন নাকি মিঃ রায় ?

না, না—তা কেন হবে, বোধ হয় ওঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে চান।
সন্তোষবাবুর কাছ থেকে সহজে কোন কথা বের করা যাবে না বলেই বোধ
হয় সঙ্গে করে থানায় নিয়ে গেলেন।

নায়েব বসন্ত সেন একবার তীক্ষ্য দ্রষ্টতে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে
নিঃশব্দে ঘর হতে বের হয়ে গেলেন অত্যন্ত যেন আকস্মাক ভাবেই। বসন্ত
সেনের এভাবে অকস্মাত ঘর ছেড়ে চলে যাওয়াটা সকলের কাছেই বেশ যেন
একটু রাচ্ছ ও অপ্রত্যাশিত বলেই মনে হল এবং ঘটনার রুচতাটুকু সর্বিতাকেই
যেন লজ্জিত করে তোলে বিশেষ করে, কারণ বসন্ত সেনের কিরীটীর প্রতি
তীক্ষ্য দ্রষ্টতে তাকানোর ব্যাপার সর্বিতার দ্রষ্টকেও এড়ার্ন।

লজ্জিত ও সঙ্কুচিত সর্বিতার মনের অবস্থাটা কিরীটী তার মুখের ওপরে
পলকমাত্র দ্রষ্টপাত করেই উপলব্ধি করতে পেরে স্থিত কঠে বলে, চল্লন
সর্বিতা দেবী, উপরে আপনার বাবা যে ঘরে শুরেন সে ঘরটা একবার ভাল করে
দেখতে চাই। আপনার আপনি নেই তো ?

না, না—নিশ্চয়ই না, চলুন না। কিন্তু কানাইয়ের মার ব্যাপারটা যে কিছুই ব্যক্তি উঠতে পরিষ্ঠ না থাই রায়। কোথায় গেল সে? সবিতার কণ্ঠ-স্বরে ঘটেওট উব্বেগ প্রকাশ পায়।

সবিতার প্রশ্নে কিরীটী বারেকের জন্য মৃখের দিকে তাকাল, তারপর অত্যন্ত শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, ভুল আমারই হয়েছে মিস চৌধুরী। পর্ণাহেই আমার কানাইয়ের মার সম্পর্কে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সাতাই আমি দণ্ডিত।

তীক্ষ্য বৃদ্ধিমতী সবিতা কিরীটীর কথার তৎপর্যটা বোধ হয় অর্ত সহজেই অনুমান করে উব্বেগাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে, কিরীটীবাবু, তবে কৰ্ত্ত—

হ্যাঁ, হঠাৎ যদি হতভাগনী কানাইয়ের মার মৃতদেহটা এই প্রমোদভবনের আশেপাশে কোথাও আবিষ্কৃত হয়ে যায় অশ্র্য হব না এতটুকুও, তবে—

কিরীটীর অসমাপ্ত কথার কতকটা জের টেনেই সবিতা প্রশ্ন করে, তবে মিঃ রায়?

না, থাক। মানুষের মন কিনা তাই খারাপটাই মনের মধ্যে সর্বাগ্রে এসে উঠে দেয়। আপনার মা হেমপ্রভা দেবীর মৃত্যুর ব্যাপারেও যে একটা রহস্য জড়িয়ে আছে, কথাটা এত তাড়াতাড়ি বোধ হয় আমাদের প্রকাশ করা উচিত হয়নি।

মিঃ রায়, তবে কি—, কতকটা যেন আর্তকণ্ঠেই সবিতা কিরীটীকে কি একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে সহসা ঢুক করে ব্যাকুল দণ্ডিতে কিরীটীর মৃখের দিকে তাকায়।

সবিতা দেবী, অসংবিধ রসনা বড় মারাঞ্জক জিনিস। তাছাড়া আপনার হয়ত জানা নেই ইট-সিমেন্ট-স্লুর্কির তৈরী ঘরের দেওয়ালেরও কান আছে। মানুষের মত তারাও শুনতে পায়। শুধু যে শুনতে পায় তাই নয়, কথাও অনেক সময় বলতে পারে। চলুন উপরে যাওয়া যাক। কিরীটী যেন বন্ধবটা জ্ঞার করেই একপ্রকার শেষ করে দিয়েই অর্ধপথে খোলা দরজার দিকে পা বাড়ালে।

দরজার ঠিক মুখেই কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে সান্যালের দিকে তাকিয়ে বললে, বাবা, তোমার প্রভাতী উপাসনার যে সময় চলে গেল। কতক্ষণ তোমার উপাসনার সব ব্যবস্থ করে বসে আছি। উপাসনায় বসবে না?

সান্যাল ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, হ্যাঁ মা, চল যাই। দয়াময় প্রভু! বলতে বলতে সান্যাল অন্যান্য সকলকে অতিক্রম করে বেশ একটু দ্রুত পদবিক্ষেপেই এগিয়ে গিয়ে সির্পিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

কল্যাণী ও তার পিতাকে অনুসরণ করল।

সির্পিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ কিরীটী সবিতার দিকে তাকিয়ে বললে, একটা শাবল আর একটা কোদালের প্রয়োজন আমার মিস চৌধুরী। পাওয়া যাবে এখানে?

বিস্মিত সবিতা কিরীটীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কোদাল আর শাবল! কি হবে তা দিয়ে?

কিরীটী হাসতে হাসতে জবাব দেয়, অতীতকে খণ্ডে দেখবো!

অতীতকে খণ্ডে দেখবেন?

হ্যাঁ। কে জানে হয়ত তক্ষশিলার মত অত্যাশ্চর্য ধৰ্মসাবশেষের সম্মানও মিলতে পারে। কিন্তু জিনিস দৃঢ়টো পাওয়া যাবে কি?

কেন যাবে না? গোবিল্ডকে বললেই সে দেবেখন। কখন চাই আপনার ও দৃঢ়টো।

আমার ঘরে রেখে দিতে বলবেন, সময়মত কাজে লাগবো। কিরীটী প্রত্যুষের দেয়।

ইতিমধ্যে সির্পড়ি অতিক্রম করে সকলে প্রায় দোতলায় এসে পেঁচেছে! সর্বিতা সকলের আগে, কিরীটী ও সত্যজিৎ পাশাপাশি অগ্রবর্তীনী সর্বিতাকে অনুসরণ করে।

চলতে চলতে চাপা নিম্নকল্পে সত্যজিৎকে সম্মোধন করে কিরীটী বলে, কাল দৃশ্যের দিকে আপনাকে আমার একটু প্রয়োজন সত্যজিতবাবু। সময় হবে তো?

নিশ্চয়ই হবে।
বেশ।

ম্তুজয় চৌধুরীর শয়নকক্ষ।

দরজায় তালা দেওয়া ছিল, সর্বিতা তার ঘর থেকে চাবিটা এনে তালা খুলে ঘরটা খুলে দিল। সর্বিতার এবাবে এখানে আসা অবিধি ঐ ঘরটায় সর্বদা তালা দেওয়াই থাকে, কেবল সম্মান কিছু আগে একবার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কানাইয়ের মাকে দিয়ে ঘরটা ঝাড়পোঁছ করে বাবার ফটোর নিচে একটা ধূপ-দানিতে ধূপ রেখে আসত।

ম্তুজয়ের ঘরের মধ্যে যে জিনিসটি যেমন ভাবে সজ্জিত ছিল, এখনো অবিকল ঠিক তেমনটাই আছে। কোন কিছুই নাড়াচাড়া করা হয়নি বা ছোঁয়া হয়নি।

প্রথমে সর্বিতা কক্ষমধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল, তার পশ্চাতে কিরীটী ও সত্যজিৎ।

কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে বাবেকের জন্য কিরীটী তার চিরাচারিত তীক্ষ্ণ অনুসম্মান দ্রংশ্টি দিয়ে চতুর্পাশবিস্থিত ঘরের ধাবতীয় কিছু দেখে নিল নিঃশব্দে।

ঘরে ঢুকতেই সামনে দেওয়ালে যে এনলার্জড ছবিটি টাঙানো আছে—ম্তুজয় চৌধুরী ও তাঁর শিশু বালিকা কন্যা সর্বিতা—অনুমানেই বুঝে নেয় কিরীটী।

ঠিক মুখোমুখি না হলেও ঘরের অন্য দিককার দেওয়ালে একটা সেকালের ভারী মেহগনী কাঠের পালিশ করা দেরাজ। দেরাজ পুরাতন হলেও পালিশ যেন এখনো চক্ চক্ করছে। দেরাজের ঠিক উপরে একখানা এনলার্জ করা ছবি দেওয়ালের গায়ে টাঙানো। ছবিটা বাঁধানো সেনালী রংয়ের স্ক্রিন কার্বু-কার্যমণ্ডিত মোটা চওড়া ফ্রেমে। ছবির মধ্যে দেখা যাচ্ছে বছর ২৪। ২৫-এর এক নারীকে। চিনতে কঢ় হয় না কিরীটীর এবাবেও অনুমানে, ঐ হেম-প্রভার প্রতিকৃতি—সর্বিতা জননী। ঠিক অবিকল যেন সর্বিতাই ছবির মধ্যে। মায়ের চেহারার, এমন কি চোখ-মুখ-কপালের হৃবহৃ আদলাটি পর্যন্ত পেয়েছে সর্বিতা তার জননীর।

ঘরের দক্ষিণ কোণে একটা ভারী কাঠের চোকির উপরে বসানো একটা লোহার সিল্ডুক।

সবিত! ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই চারটে জানালার কবাটই খুলে দিয়েছিল। ঘরটি এমন ভাবে তৈরী যে, প্রচুর আলো-হাওয়ার অবাধ গর্তিবিধি আছে।

বিলের দিকে দৃষ্টো জানালা থেকে একেবারে একটি উচু পালঙ্কের উপরে নিভাঁজ একটি শয্যা সবৃজ বর্ণের বেডকভার দিয়ে ঢাকা।

একপাশে আলনায় খানকয়েক ধূতি জামা গোছানো। এবং আলনার নিচে দুই জোড়া জুতো।

ঘরের অন্যদিকে একটা ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের উপরে কিছু কাগজপত্র ও খানকয়েক প্ল্যাটক।

সামনেই একটা চেয়ার ছাড়াও একটা দেওয়াল-আলমারি, একটা দাঘী আরাম-কেদারা ও একটা জলচোকি আছে ঘরে।

ঘরের দৃষ্টো দরজা—একটা প্রবেশের ও নির্গমনের, অন্য দরজাটা সামনে দিকে ছাদে যাতায়াতের জন্য।

ঐ দেওয়াল-আলমারি, সিল্ডুক ও ড্রয়ারের চার্বি আপনাব কাছেই তো সবিতা দেবী? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। সবিতা একটা চার্বির রিং কিরীটীর হাতে তুলে দিল, এই চার্বির রিংয়েই সব চার্বি পাবেন।

আচ্ছা মিস চৌধুরী, আপনার পিতা রাতে যখন নিম্ন যেতেন, জানালা-দরজা শুনেছি খোলাই থাকত! ছাদের ঐ দরজাটা, ওটাও কি খোলাই থাকত, জানেন? কিরীটী সহসা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। যতদ্বাৰা জানি, ঐ দরজাটাও রাতে তিনি খুলেই শুনতেন। সবিতা জবাব দেয়।

সাধারণতঃ রাত কটা পর্যন্ত জেগে তিনি পড়াশুনা ও জৰিমদারী সংক্রান্ত কাজকর্ম করতেন?

শুতে প্রায়ই তাঁর বারোটা সাড়ে-বারোটা হয়ে যেত। সকালের দিকে তাই বোধ হয় তিনি একটা দৰিতেই উঠতেন।

কিরীটী পথমেই কথা বলতে বলতে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, সাধারণতঃ এই টেবিলে বসেই তো তিনি কাজকর্ম করতেন?

হ্যাঁ।

কিরীটী লক্ষ্য করে দেখে, টেবিলটার উপরে সূক্ষ্ম একটা ধূলোর পর্দা পড়ে আছে।

টেবিলটা ইদানীং কর্তদিন ঝাড়-পোঁছ করা হয়নি?

কানাইয়ের মাকে ও টেবিলটা ছাঁতে বারণ করে দিয়েছিলাম। এখানে আসবাব পর আর্মি একদিন মাত্র টেবিলটা পরিষ্কার করেছিলাম।

কিরীটী নিঃশব্দে তাকিয়ে টেবিলটার উপরে যাবতীয় কিছু খণ্টিয়ে দেখেছিল, সহসা তার নজরে পড়ল একটা লম্বা চুল টেবিলের কাঠের জোড়ের মুখে আটকে আছে।

চুলটা কোতুহলভরে টেনে বের করল কিরীটী। লম্বা কোঁকড়ানো চুল। কোন নারীর কেশ একগাছ।

কিরীটী লম্বা কেঁকড়ানো কেশগাছি দৃষ্টি হাতের আঙুলে ধরে টেনে টেনে দেখতে লাগল এবং মধ্যে মধ্যে সর্বিতার দিকে তাকাতে লাগল। কৌতুহলী সর্বিতা ও সত্যজিৎ একই সঙ্গে প্রশ্ন করে, কি কিরীটীবাবু?

একগাছি কেশ! বলতে বলতে পকেট হতে একটা কাগজ বের করে কেশগাছি দেই কাগজের মধ্যে রেখে সহতনে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটের মধ্যে রাখতে রাখতে বললে, কই, এর মধ্যে বলুন তো কোন্ চার্বিটা ড্রয়ার-গুলোর?

চার্বির রিংটা সর্বিতার হাতে দিতে দিতে সর্বিতা একটা লম্বা মোটা চার্বি ড্রয়ারের গায়ে চুকিয়ে ড্রয়ারটা খুলে দিল।

এক এক করে সর্বিতার সাহায্যে কিরীটী দৃষ্টি দিককার ছটা ড্রয়ারই খুলে তার ভিতরকার কাগজপত্র সব পরীক্ষা করতে লাগল। এবং কাগজপত্রগুলো দেখতে দেখতে একসময় একটা শোটা বোর্ড বাঁধাই সন্দৃশ্য অ্যালবাম টেনে বের করল। অ্যালবামটার মধ্যে অনেক ফটো আঁটা রয়েছে।

কিরীটী বিশেষ কৌতুহলের সঙ্গেই অ্যালবামের পাতাগুলো উল্টে উল্টে দেখে ঘেতে লাগল।

ফটোগুলো তোলা বোধ হয় অনেকদিন আগেকার। একটু লালচে রং ধরেছে প্রায় প্রত্যেক ফটোটেই এবং ফটোগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগই নানা জায়গার ফটো। ঘরবাড়ি, পুরাতন মন্দির, ফোর্ট, জলাশয়, রাস্তাঘাট, বাগান-বাঁগচা, কবর ইত্যাদির।

বেশীর ভাগই রাজপুতানার ফটো দেখছি! অ্যালবামটা কার সর্বিতা দেবী?

অ্যালবামটা এর আগে কখনও আমি দেখিনি; বোধ হয় বাবারই—

আপনার বাবার ফটো তুলবার শখ ছিল বৰ্তীয় একসময়?

বলতে পারি না ঠিক। কখনও বাবাকে ফটো তুলতে আমি দেখিনি।

এককালে হয়ত তিনি খুব দেশভ্রমণ করেছেন! আপনার বাবার মৃথে কখনও দেশ ভ্রমণের গল্প শোনেননি মিস চৌধুরী?

না।

সাধারণতঃ আপনার বাবার সঙ্গে আপনার কি ধরনের কথাবার্তা হত?

এই আমার লেখাপড়া, আমার কলেজের কথা এই সবই আলোচনা করতাম আমরা। সর্বিতা জবাব দেয়।

হঁ। অ্যালবামটা আমার কাছে আমি রাখতে পারি আপাততঃ?

বেশ তো, রাখুন না।

কিরীটী অতঃপর কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। কাগজগুলো দেখতে দেখতে একটা খামের মধ্যে খানকতক পুরাতন চিঠি যন্নের সঙ্গে লাল সন্তো দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পেল।

চিঠিগুলো খুলে পরীক্ষা করতে গিয়ে কিরীটী একটু আশ্চর্যই হয়, চিঠিগুলো অনেকদিন আগেকার এবং হিন্দী ভাষায় লেখা।

হিন্দী ভাষায় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা চিঠি!

খানচার-পাঁচ চিঠি। চিঠিগুলো কিরীটী অ্যালবামটার মধ্যেই খাম সমেত রেখে দিল। সহসা একসময়ে কিরীটী শুন্য শব্দ্যাটির দিকে তাকিয়ে সর্বিতার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে বললে, যে রাত্রে আপনার বাবা নিহত হন, সে রাত্রে শয়ার উপর যে চাদর ও বেডকভার বিছানো ছিল সেগুলো কি বদল করা

হয়েছে মিস চৌধুরী ?

না । কেবল ঐ বেডকভারটা বিছানার উপর ছিল না, ওটা পরে আমি পেতে বিছানাটা ঢেকে রেখেছি ।

কিরীটী এগয়ে গিয়ে বিছানার উপর থেকে বেডকভারটা টেনে তুলে ফেলে বিছানার চাদরটা একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল ।

একটা কথা সর্বতা দেবী, যে রাখে আপনার বাবা নিহত হন, পরের দিন সকালে ঐ ছাদের দিকের দরজাটা কি খোলা দেখা গিয়েছিল ?

তা তো বলতে পারি না ! বনমালী হয়ত বলতে পারবে ।

ঠিকই আহারাদির পর কিরীটী একাকী তার ঘরের মধ্যে বসে একটা চেয়ারের উপরে সকালবেলা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর টেবিলের ড্রয়ার থেকে আনা ফটোর অ্যালবামটা আবার একবার উল্টেপাল্টে দেখছিল ।

একটা পাতায় এসে দৃষ্টি ঘেন মৃদু বিস্ময়ে ক্ষিতির হয়ে থাকে ।

একটি মণ্ডরের চম্পরে দাঁড়িয়ে পূজ্যার্গণীর বেশে একটি অপরূপ সুন্দরী ১৯। ২০ বৎসর বয়স্কা রাজপুতানী মেরে । ফটোটা অনেকদিনের পুরাতন হলেও এবং ফটোর বর্ণ অনেকটা ফিকে হয়ে এলেও মেয়েটির অপরূপ দেহঙ্গী ও সৌন্দর্য এখনও একেবারে চাপা পড়ে যায়নি ।

মেয়েটি হাসছে । পরিধানে ঘাগরা ও গায়ে ওড়না । বুকের দৃশ্যাশ দিয়ে বলছে দৃষ্টি বেণী ।

সহসা বাইরে পদশব্দ শোনা গেল ।

চমকে উঠে তাড়াতাড়ি হাতের অ্যালবামটা বন্ধ করে বিছানার তলায় রেখে দিয়ে দরজার দিকে তাকাল । দরজাটা অবশ্য ভেজানোই ছিল ।

দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত শোনা গেল, আসতে পারি ?

কে, কল্যাণী দেবী ! আসুন, আসুন । কিরীটী মৃদু আহবান জানাল । কল্যাণী এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল ।

অপর্ব সাজ পরেছে সে । পাঞ্চাবী মেয়েদের মত ঢিলা পায়জামা, পাঞ্চাবী ও রেশমী একটা উড়ন্তী গলায় ভাঁজ করা ।

বাঃ ! চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু আপনাকে এই বেশে মিস্ সান্যাল ! কিরীটী মৃদু কষ্টে বলে ।

নিজেকে অত্যন্ত free মনে হয় এই পোশাকে ।

তা তো হবেই । ওই বেশেই যে আপনি অভ্যন্ত । কিরীটী জবাব দেয় ।

বোধ হয় তাই । কিন্তু একা একা ঘরের মধ্যে বসে আপনি করছিলেন কি ?

বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? কিরীটী কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে স্মিতভাবে বললো ।

॥ ১৫ ॥

তাহলে বসেই পড়া যাক, কি বলেন ? সম্মুখের চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে হাস্যদীপ্ত কষ্টে কল্যাণী বললো ।

হ্যাঁ বসুন ।

দৰেৱ কোগে একটা শাবল ও ছেঁট কোদালেৱ উপৱে হঠাতে নজৱ পড়ে
কল্যাণীৱ। বিস্মিত দণ্ডিতে বশ্চু দুর্ঘটিৰ দিকে তাকিয়ে কল্যাণী প্ৰশ্ন কৱলে,
ব্যাপৱ কি? কোদাল আৱ শাবল দিয়ে কি হৰে মিঃ রায়?

মাটি খুঁড়ুৰো। হাসতে হাসতেই জৰাব দেয় কিৱীটী।

মাটি খুঁড়ুৰেন! হঠাতে মাটি খুঁড়ুৰ কি প্ৰয়োজন হলো আবাৱ?

জানেন না, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তেই কত বিৱাট বিস্ময়েৱ আগৱাৱ সন্ধান
পেৱেছি! কত শত বৎসৱেৱ ঘূৰ্মূলত অতীতকে মাটিৰ কৰৱ-শৰ্ষ্যা হতে চোখেৰ
সামনে খুঁজে পেৱেছি! তক্ষণীলা, ঘেঁঝোদড়ো, হৱোপা।

তা যেন হল, কিন্তু এখানেও সে সব আছে নাকি?

নেই যে তাই বা কে বলতে পাৱে? কৰিব বচন জানেন না—যতন কৱহ
লাভ হইবে রতন!

সত্য মিঃ রায়, আপনি হেঁয়ালি কৱেও কথা বলতে পাৱেন!

সে কথা থাক। আপনাকে একটা কাজেৰ ভাৱ দিতে চাই, পাৱবেন?

নিচয়ই। বলুন কি কাজ? উৎসাহিত হয়ে ওঠে কল্যাণী।

সল্লোষ্ববাবুৰ উপৱে আপনাকে একটু নজৱ রাখতে হবে।

সল্লোষ্ববাবু! তাকে তো সকালবেলা থানার দারোগা arrest কৱে নিয়ে
গেল—কিন্তু কেন বলুন তো, হঠাতে ভদ্রলোককে arrest কৱল কেন?

আমাৱ যতদূৰ ঘনে হয়, সল্লোষ্ববাবুকে arrest কৱবাৱ গত উপযুক্ত
evidence লক্ষ্যীকৰণত সাহাৱ বুলিতে নেই। হয়ত কয়েকটা জিঞ্জাসাবাদ
কৱেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

কিন্তু এও তো ভাৱী অন্যায়। এমনি কৱে হৃত্কৰে একজন ভদ্রলোককে
arrest কৱে নিয়ে যাওয়া!

অন্যায় বৈকি। কিন্তু ঘটনাক্ষেত্ৰে এমন বিশ্বী সময়ে ও এমন বিশ্বী পৰিস্থিতিৰ
মধ্যে তিনি এসে পড়েছেন যে, এ রকমটা হওয়া বিশেষ কিছুই আশচৰ্য নয়।
দশচক্রে ভগবান ভূত বলে একটা প্ৰবাদ আছে না আমাদেৱ দেশে, এক্ষেত্ৰেও
অনেকটা তাই হয়েছে মিস্ সান্যাল।

কিৱীটীবাবু?

কল্যাণীৰ গলাৱ স্বৱে কিৱীটী যেন বেশ একটু বিস্মিত হয়েই ওৱ মুখেৰ
দিকে তাকাল, বলুন?

একটা অনুৱোধ আমাৱ—দাবীও বলতে পাৱেন। আপনি অবশ্য কথাটা
মানবেন কিনা জানি না, তবে আমাৱ কি মনে হয় জানেন, কোন কোন ক্ষেত্ৰে
সামান্য কয়েক ঘণ্টাৰ আলাপ-পৰাইচয়েই কেউ কেউ পৰস্পৱেৰ কাছে এত ঘনিষ্ঠ
ও এত সহজ হয়ে আসে যে ভাৱতেও অনেক সময় বিসময় লাগে। এই ধৰুন
আপনার কথাই। কতক্ষণেৱই বা আলাপ আপনাৱ সঙ্গে, অথচ মনে হচ্ছে যেন
আপনাৱ সঙ্গে বৰ্বৰ কৰ্তানৱেই না পৰিচয়। হয়ত আপনি মনে মনে হাসছেন,
কিন্তু—

কেন, হাসবো কেন? কিৱীটী হাস্যোদীপ্ত কঢ়েই বাধা দিয়ে বলে
ওঠে।

সে যাই হোক, সেই দাবীতেই অনুৱোধটা জানাচ্ছ, আপনি আমাকে
আপনি বা মিস্ সান্যাল না বলে শুধু কল্যাণী বলে ডাকলে কিন্তু ভাৱী খুশী
হবো এবং সেই সঙ্গে যদি আপনিৰ দৱষ্টা তুলে দিয়ে ‘তুমি বলে সম্বোধন

করেন, তাহলে খুশীর সত্ত্বাই বলছি অন্ত থাকবে না। তাছাড়া বয়সেও তো আমি আপনার চাইতে অনেক ছোটই হব, সৌন্দর্য দিয়েও তো অনায়াসেই আগামে আপনি তুমি বলে ডাকতে পারেন।

বেশ তো। তুমি বলেই ডাকলেই যদি তুমি খুশী হও কল্যাণী তাই হবে।
কিরীটী সিঙ্গ কঠে জবাব দেয়।

আঃ, বাঁচলাম। এবাবে নিশ্চল মনে বলি, খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায়
শুধু পিসেমশাইয়ের হত্যার ব্যাপারটাই ভাবছিলাম। একটা ব্যাপারে কেমন
যেন খট্টকা লাগছে।

কি বল্বুন তো ?

আবার বল্বুন ?

ও ভুল হয়ে গিয়েছে, বল !

আচ্ছা এই পিসিমার হত্যার ব্যাপারটা—নামের বলেছেন তিনি ও সম্পর্কে
কিছুই জানেন না, এও কখনো হতে পারে ?

কোতুকে কিরীটী প্রশ্ন করে, কেন ?

না, অনেক দিনকার প্রাতেন লোক উনি এ বাড়ির, শুধু তাই নয়
পিসেমশাইয়ের একদিক থেকে ষতদ্বাৰ শূন্যলাঘু নাকি বন্ধুর মতই ছিলেন
উনি। আমার তো মনে হয়, বিশেষ কারণেই কথাটা তিনি অস্বীকার করছেন
এখন।

তুমি হয়ত ঠিকই ধরেছ কল্যাণী, তাহলেও এত তাড়াতাড়ি কোন বিষয়েই
চট্ট করে মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়।

তারপর কানাইয়ের মাঝে অন্তর্ধানের ব্যাপারটা !

কি মনে হয় তোমার ?

এর পিছনেও কোন রহস্য আছে।

কি রকম ?

পাছে কানাইয়ের মাঝে উপস্থিত থাকলে পিসিমার ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়,
তাই হয়ত তাকে সরানো হয়েছে কোশলে।

স্বাভাবিক।

কিন্তু বেচারীকে খুল করে কেউ ঐ রোরাণীর বিলের জলে ডুর্বিষ্ণে
দেয়ান তো ?

তাতেও আশচর্য হবার কিছু নেই কল্যাণী।

বলেন কি ?

ঠিক তাই। একটা মিথ্যাকে ঢাকতে গিয়ে যেমন সেই সঙ্গে দশটা মিথ্যার
আমদানি করতে হয়, তেমনি বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে একটা হত্যার ব্যাপারকে
চাপা দেওয়ার জন্য আরো ‘দ্বি’একটা আনন্দঘণ্টক হত্যা এসে পড়ে। অথচ
হত্যাকারী বোঝে না যে সে নিজে যত ধৰ্ত ও ক্ষিপ্রই হোক না কেন, হত্যা
তার পথ-রেখা বা চিহ্ন সৰ্ব ক্ষেত্রেই রেখে যাবেই পশ্চাতে। এবং সেই পথেরেখা
ধরে এগিয়ে চললে তাকে ধরা দিতে হবেই, সুরুতকেও আমি বহুবার বলেছি
এ কথা। কেবল একটা ছকে ফেলা—

কিন্তু সেই ছকে ফেলা—

হ্যাঁ, সেজন্য কিছু সত্ত্বের (clue) আবশ্যক। Detection-এর মূল
কথাটাই তো তাই। সত্ত্বকে খুজে বের করতে হবে—

How interesting !

Interesting সন্দেহ নেই। তবে সমগ্র ব্যাপারটাকে interesting করে তুলবার জন্য স্থির বিচার-বৃদ্ধি, বিবেচনা-শক্তি ও সতর্ক তীক্ষ্ণ সজাগ দ্রষ্টর প্রয়োজন প্রতি মহস্তে। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা বৃদ্ধির অঙ্ক।

বৃদ্ধির অঙ্ক ?

হ্যাঁ। তোমাকে যখন বর্তমান এই detection ব্যাপারে সহকর্মী হিসাবেই নিয়েছি, কয়েকটা প্রশ্ন তোমাকে ভাববার জন্য দিচ্ছি। তবে জবাব দিও।

প্রশ্ন ? বলুন ?

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে—মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী হেমপ্রভার মৃত্যুর মধ্যে কোন ঘোগাঘোগ আছে কিনা ? ২নং প্রশ্ন হচ্ছে—যদি থেকেই থাকে তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় মৃত্যুর মধ্যে দীর্ঘ এই উনিশ বৎসরের ব্যবধান কেন হলো ? ৩নং প্রশ্ন—এই উনিশ বৎসরের ব্যবধানে একই হত্যাকারীর পক্ষে একই কারণে দ্বৃজনকেই হত্যা করা সম্ভবপর কিনা ? ব্যবত্তে পারছো বোধ হয়, তৃতীয় প্রশ্নের যদি জবাবটা খুঁজে পাও, ঐ সঙ্গেই প্রথম প্রশ্নের জবাবটাও সহজ হয়ে আসবে।

ইঁ ?

৪নং প্রশ্ন—দ্বিতীয় মৃত্যু হচ্ছে এই একই জায়গায় বকুলবক্ষতলে পাওয়া গেল কেন ? দ্বিতীয় হত্যার স্থান ঐ বকুলবক্ষতলই বেছে নেওয়া হয়েছিল, না দ্বিতীয় হত্যার পর মৃত্যু হচ্ছে এই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ? নিয়ে যাওয়াই যদি হয়ে থাকে, কি তার উদ্দেশ্য ছিল ? শুধু তাই নয়, যদি ধরে নেওয়া যায় এখানেই মৃত্যু বহন করেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জাগবে মনে, হত্যাকারী দেহে প্রচুর শক্তি ধরে। ঐ সঙ্গে একথাও মনে হবে, তাহলে কোথায় হত্যা করা হয়েছিল ?

আচ্ছা একটা কথা মিঃ রায়, আপনি কি তাহলে ধরেই নিচেন কানাইয়ের মা পিসিমার মৃত্যু সম্পর্কে যে কাহিনী বলেছে তা সত্য ?

নিশ্চয়ই ।

কিন্তু তার প্রমাণ কি ?

Yes, it is an intelligent question ! প্রমাণ ? একেতে প্রমাণের চাইতে probability উপরেই আমি বেশী জোর দিয়েছি, কিন্তু কেন ? প্রথমত কানাইয়ের মার মত একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে এ ধরনের একটা চৰৎকাৰ কাহিনী গড়ে তুলে বলবার যেমন কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে না, তেমনি তার মত একজন অশিক্ষিত দাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ পারম্পর্য ও শক্তি বজায় রেখে এমন একটা স্বীকৃত কাহিনী রচনা করে তুলবার ক্ষমতা থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ অনেকদিনকার প্ল্রানো দাসী এ বাড়ির সে এবং হেমপ্রভা দেবীৰ বাপেৰ বাড়ি থেকেই সে এসেছে। খাস দাসী ছিল সে হেমপ্রভা দেবীৰ। এবং তার প্রতি একটা প্রগাঢ় স্নেহ ও ভালবাসা গড়ে ওঠা কানাইয়ের মার পক্ষে অসম্ভব তো নয়—অস্বাভাবিকও নয়। সেদিক দিয়েও যদি বিচার করে দেখি তাহলে দেখা যাবে হেমপ্রভা দেবীৰ কোনৱুং কলঙ্ক রটে বা তাঁৰ চৰাচৰের প্রতি কোনৱুং বাঁকা ইঁগিগত আসতে পারে, কানাইয়ের মার স্বারা সেটাও খুব স্বাভাবিক নয়। তৃতীয়তঃ কনাইয়ের মার মত একজন স্ত্রীলোকের প্রিভাবে তারই মৰ্মন-পঞ্চীর সম্পর্কে একটা কঢ়িপ্ত কাহিনী গড়ে তুলে বলবারই বা কি স্বার্থ থাকতে

পারে! চতুর্থতঃ ঘটনাটা আপনি প্রকাশ না করবার যে হেতু কানাইয়ের মা দৰ্শণয়েছে, সেটা ও আমার চোখে থাবই স্বাভাবিক লেগেছে। এবং শেষ ও পশ্চম, আচমকা এইভাবে কানাইয়ের মা নিরুদ্ধিষ্ঠা হওয়ায় তার বর্ণিত কাহিনী যে মিথ্যা নয়—কথাটা আরো বেশী করেই আমার কাছে সত্য বলে মনে হচ্ছে। আর একমাত্র সেই কারণেই আজ সকাল থেকে কানাইয়ের মা নিরুদ্ধিষ্ঠা হবার পর থেকে বর্তমান রহস্যের চিন্তাধারাটা আমি একটা নির্দিষ্ট পথে চালনা করতে সক্ষম হয়েছি।

মঞ্জু বিস্ময়ের সঙ্গেই কল্যাণী কিরীটীর ঘৃঙ্গিপূর্ণ আলোচনা শুনছিল। সামান্য একটা ব্যাপারকে সে কত তীক্ষ্ণ অনুসর্ধীৎসা ও ঘৃঙ্গি দিয়ে বিচার করে ভাবলেও চৰ্কৃত হতে হয়।

কিরীটীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, রাজহাঁস যেমন দৃঢ় ও জলের ঘর্খে থেকে কেবল দৃঢ়তাকেই ছেঁকে টেনে বের করে নেয়, রহস্যের তদন্তের ব্যাপারেও আমাদের তের্বাঁ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য হতে নির্জলা প্রয়োজনীয় সত্যটুকু ছেঁকে নিতে হবে। তবেই না সমস্ত রহস্যটা সহজ হয়ে আসবে! তারপর সহস্রা কিরীটী নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, কিন্তু এবারে আমাকে একবার থানার দিকে যেতে হবে যে কল্যাণী!

এখন থানায় যাবেন?

হ্যাঁ, বেলা প্রায় আড়াইটে হল, দেখে আসি সন্তোষ-পর্ব কতদূর গড়াল! ম্দ্ৰ হাস্য সহকারে কথাটা বলতে বলতে কিরীটী চোরাটা হতে গাঢ়োঢাল কৰল।

কখন ফিরবেন মিঃ রায়?

বেশী দোরি হবে না। সন্ধ্যার আগেই হয়ত ফিরতে পারবো।

কল্যাণী কক্ষ হতে বের হয়ে যাবার পর কিরীটী সর্বপ্রথমে ঘরের দরজা-টায় খিল তুলে দিল। সত্যজিৎ এখন সবিতার ঘরেই আছে, চট্ট করে এ ঘরে আসবে না। মাঝ কয়েক দিন আগেকার তার ভাৰ্বিয়ৎ বাণীটা মনে পড়ে যায়, বর্তমান এই কেসেরই কথাপ্রসঙ্গে তার কলকাতার বাড়িতে বসে সত্যজিৎকে যে আশীর্বাদটুকু সে দিয়েছিল সবিতা সম্পর্কে, মনের দিক দিয়ে তাদের যে অপূর্ব একটা যিল গড়ে উঠেছে এই কদিনের সামুদ্রিক—সেটা আৱ কাৰো চোখে না পড়লেও কিরীটীর প্রথর ও সজাগ দৃঢ়িকে ডাঢ়াতে পারেনি। দৃঃজনের মিলেছে ভাল। এবং সামান্য এই কদিনের আলাপ-পৰাচয়ে কিরীটী বুৰাতে পেরেছিল বেশ বলিষ্ঠ চৰিৱের ছেলোটি। বেশীৰ ভাগ সময়ে সবিতা ও সত্যজিৎ প্রায় একই সঙ্গে থাকে। সত্যজিতের নিৰবসন সাহচর্যে পিতার আকৃষ্ণক মৃত্যু-শোকটা ও সবিতার কাছে অনেকটা সহনীয় হয়ে এসেছে। একটিবার নলনকানন্টা ঘূৰে দেখে আসতে হবে, সেই কারণেই কিরীটী কাজের দোহাই দিয়েই আপাততঃ কল্যাণীকে বিদায় দিয়েছে দৰ থকে। থানায় যাবার জন্য লক্ষ্যীকৃত আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেও আপাততঃ তার যাবার ইচ্ছা নেই। অতএব এই হচ্ছে উপগ্ৰহ অবসর। নায়েব বসন্তবাবু কাছারি-বাড়িতে গিয়েছেন টুট্টম্ নিয়ে। সবিতা ও সত্যজিৎ উপরে সবিতার ঘরে বিশ্রাম্ভালাপে রাত। নিত্যানন্দ সান্যাল এখন দিবাৰানন্দ দিচ্ছেন। বাড়িৰ দাসদাসীয়াও এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। কিরীটী একটা জামা গায়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘৰ হতে বের হয়ে দোতলার শূন্য বারান্দাটার উপরে

এসে দাঁড়াল। মিথুনের নির্জনতায় সমস্ত প্রমোদভবন যেন নিষ্ঠত্ব হয়ে আছে। কোথায়ও এটকুকু সাড়াশব্দ পর্যন্ত যেন নেই। কানিশের ওপরে কবৃতরণগুলি নিষ্ঠত্ব। তথাপি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চারিদিকে এক-বার তাকিয়ে নিয়ে কিরীটী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো জামার পকেটে খুরপীর ঘৃত একটা ছোট অস্ত নিয়ে। নিচের অনুরূপ বারান্দাটা অত্তুম করে কিরীটী বাঁধানো আঙ্গিনাটির উপরে এসে দাঁড়াল। মাথার উপরে স্বৰ্ণ অনেকটা হেলে পড়েছে, তথাপি আষাঢ়ের তীব্র রৌদ্রদাহ চারিদিক যেন ঝলসে দিচ্ছে। আঙ্গিনা অত্তুম করে শেষপ্রাপ্তের একটা খালি অব্যবহার্য ঘরের মধ্যে এসে সে ঢুকল। গতকালই মিথুনের দিকে কিরীটী গোটা বাঁড়িটাই একবার ঘূরে ঘূরে দেখছিল। ঐ ঘরের মধ্যে একটা দরজা আছে। আঙ্গিনার দরজাটি ছাড়াও যে দরজাপথে প্রমোদভবনের বাইরে নলনকাননে যাবার জঙগলের মধ্য দিয়ে বাঁধানো পথটার উপরে গিয়ে পড়া যায়। দরজাটা খুলে কিরীটী সেই পথের উপরে এসে দাঁড়াল। ঐ পথ দিয়ে নলনকানন থেতে মিনিট পাঁচকের বেশী লাগে না। নলনকাননে পেঁচে কিরীটী জঙগলাকীর্ণ বাগানটার মধ্যে অনন্মনস্ক ভাবে ঘূরে ঘূরে বেড়াতে লাগল। এবং ঘূরতে ঘূরতেই একসময় কিরীটী পূর্ববর্ণিত সেই প্রাতন পত্রবহুল বকুল বৃক্ষটির নিচে ছায়ায় এসে দাঁড়াল।

ঐ বকুলবৃক্ষতলই হচ্ছে অকুম্থান।

একটি মৃতদেহ এই বৃক্ষতলে দীর্ঘ উনিশ বৎসর আগে আবিষ্কৃত হয়ে-ছিল, মিতীয় মৃতদেহটি মাঝ কয়দিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। সহসা একটা কথা কিরীটীর মনে হয়। এই নলনকানন দীর্ঘকাল অব্যবহার্যই পড়ে ছিল। বহুদিন মানুষের পদচিহ্ন এখানে পড়েনি। প্রমোদভবন হতে নলনকাননে আসবার যে দৃষ্টি স্বারপথ—তার চেহারা ও অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় বহু-দিন সে স্বার দৃষ্টি ব্যবহার করা হয় নি। খোলা হয় নি ঐ স্বার দৃষ্টি। মানুষের বর্জন ও অবহেলার ঝমে এই নলনকানন আগাছা ও জঙগলে পরিকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। এসব সত্ত্বেও নায়েব বসন্ত সেন এইখানেই বা কেন তার প্রভুর অন্বেষণে এসেছিল? তবে কি এখানে মধ্যে মধ্যে মতুঝয় চৌধুরী আসতেন? এবং সে সংবাদ কি বসন্ত সেনের অগোচর ছিল না? স্বাদি ধরে নেওয়া যায় আসতেনই, তাহলে সে কথাটা জানা বসন্ত সেনের পক্ষে অন্ততঃ অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কেনই বা মতুঝয় চৌধুরী এই নলনকাননে আসতেন? তাঁর মতা স্বার কথা স্মরণ করেই কি? দীর্ঘ উনিশ বৎসর ধরে কারো স্মৃতি এমনি করে বহন করা সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলেও মতুঝয়-চৌধুরী সেটা সম্ভব ছিল কিনা? মতুঝয় স্বারে অবশ্যই ভালবাসতেন, নচে আর মিতীয়বার স্বার পরিগ্ৰহ করেই বা করলেন না কেন? সংয়ৰ্ম্মী ও মিতবাক প্রদূষ ছিলেন মতুঝয় এবং চৌধুরীর তাঁর ঐ দিকটা অবশ্য সৰিতার কথা হতেই জানা গিয়েছে। স্বারে ভালবাসলেও তিনি কদাপি ভুলেও একমাত্র কল্যা সৰিতার সঙ্গেও মতা স্বার সম্পর্কে আলোচনা করতেন না। কিন্তু কেন? এও কি স্বার প্রাতি গভীর প্রেমেরই একটা লক্ষণ? না তার কোন নিগ়ত কারণ ছিল? কোন কারণেই তিনি স্বার সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনা সংযোগে ইচ্ছাপূর্বকই এড়িয়ে চলতেন, এমন কি একমাত্র কল্যা নিকটে পৰ্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর আরো একটা কথা মনে হয়, উনিশ বৎসর পরে একদা প্রভাতে অসুস্থা স্বারে সহসা তাঁর

ঘরে শয্যায় না দেখতে পেয়ে কি কারণেই বা স্ত্রী সম্পর্কে তিনি অমন সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন? স্ত্রীকে ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না, সেজন্য তাঁর অমন লুকো-চৰ্টির করাই বা কি এমন প্রয়োজন ছিল? খোলাখুলি ভাবে ব্যাপারটা সকলের সঙ্গে আলোচনা না করে অমন রহস্যজনক ভাবে রাতারাতি অসম্মত স্ত্রীকে চিকিৎসার দোহাই দিয়ে কলকাতায় নিয়ে চলে যাবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? কেন সমগ্র ঘটনাকে অমনভাবে সাজানো হলো? লোকে যদি জানতই যে তাঁর স্ত্রীকে বাড়ির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না, তাতে একটা দুর্নামের বা কলঙ্কের কথা ওঠা হয়ত স্বাভাবিকই ছিল কিন্তু তার চাইতেও কি বেশী কিছু সন্দেহ মৃত্যুঝয়ের মনের মধ্যে ছিল?

অতীত!

অতীতকেই সর্বাগ্রে জানতে হবে এ রহস্যের মীমাংসা করতে হলৈ। চিন্তিত করীটী নলনকাননের মধ্যে ঘরে ঘরে বেড়াতে লাগল। এবং ঘৰতে ঘৰতে একসময় করীটী একেবারে জলের ধার দ্বেষে এসে দাঁড়ায়।

সহসা পাড়ের একটা জায়গা ওর দ্রষ্টিকে আকর্ষণ করে। সেখানকার মাটিতে যে লম্বা লম্বা ঘাসগুলো আছে সেগুলো যেন মাটির বুকে একেবারে লেপটে আছে। একটু নিস্তেজ ও শুকনোও ঘেন। নিঃশব্দে কৌতুহলে এগিয়ে গিয়ে করীটী সেখানকার মাটির ঘাসগুলো পরীক্ষা করতে থাকে। নিয়মিত ভাবেই দীর্ঘদিন ধরে কোন ভারী বস্তুবিশেষের চাপে যেন সেখানকার মাটি আর ঘাস দ্রেংতে গিয়েছে। কোন ভারী বস্তুর ধাক্কা থেঁয়ে থেঁয়ে জায়গাটা যেন চিহ্নিত হয়ে আছে আশপাশের পাড়ের অন্যান্য অংশ হতে।

করীটী তার তীক্ষ্ণ দ্রষ্টব্য দিয়ে চারিদিক পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। পাড়ের অন্যান্য অংশের চাইতে গাছপালাগুলোও এখানে যেন একটু ধৰন সম্বিশত, একটু ছায়াবহুল, একটু অধ্যকার, একটু নির্জন। বড় বড় শাখা-প্রশাখা ও পছবহুল দৃঢ়তো পলাশবৃক্ষ। একটি পলাশবৃক্ষের তলে মন্ত বড় একটা পাথরের ছত আছে। আরো একটু এগিয়ে করীটী পাথরটার সামনে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্যই লাগে করীটীর। পাথরটা বেশ পরিচ্ছম। এই জগলা-কীর্ণ মানুষের অগম্য স্থানে অর্থন একটি পরিষ্কার পাথর করীটীর দ্রষ্ট আকর্ষণ না করে পারে না। চিন্তিত মনেই করীটী পাথরটার উপর এগিয়ে গিয়ে উপবেশন করল।

স্বৰ্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। প্রথম রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত শিতমিত অবস্থা। চারিদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে একটা স্নিফ ছায়া। নিস্তরঙ্গ বিলের জল। সামনের দিকে তাকাল করীটী। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এক দিকে তার পশ্চাতে নলনকানন, অন্য দিকে যতদূর দ্রষ্টব্য চলে কেবল জল আৰ জল। দীক্ষণ্ডিকে অস্পত্তি পাড়ের রেখা দেখা যায়। বৈকালের শুয়ুরুমাণ আলোয় দেখা যায় কেবল একটা ধূসৰ রেখা। বোৱা যায় ঐদিকটার পাড়ে গাছপালা আছে। এই স্বীপ থেকে দীক্ষণ্ডের ঐ পাড়ের দ্রুত কতটা হবে? খুব বড়জোর আধ-মাইলটাক হবে হয়ত।

আরো কিছুক্ষণ বাদে করীটী উঠে দাঁড়াতে যাবে, সহসা ওর নজরে পড়ল দিনশেষের স্লান আলোয় ঠিক ওর পায়ের নিচেই ঘাসের উপরে কি ঘেন একটা চিক্কিটি করছে। কৌতুহলভরে করীটী ঝঁকে নিচু হয়ে ঘাসের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে বস্তুটা তুলে নিল।

স্বর্ণ-অঙ্গুরীয়া একটি।

হাতের পাতার উপরে স্বর্ণ-অঙ্গুরীয়াটি রেখে তৌক্য দ্রষ্টব্যে পরীক্ষা করতে লাগল কিরীটী। ওর নজর পড়ল অঙ্গুরীয়ার উপরে একটি নামের আদ্যাক্ষর লেখা, দেবনাগরী অক্ষরে অক্ষরটা হচ্ছে ‘ল’। কিরীটী অঙ্গুরীয়াটা বুকপক্ষের মধ্যে রেখে দিল।

স্থানত্যাগ করে এবারে কিরীটী নন্দনকাননের মধ্যস্থিত বিরাম-কুটীরের দিকে অগ্রসর হলো।

আকাশের আলো যেন আরো স্লান হয়ে এসেছে। একটা বিষণ্ণ করুণ স্তন্ধূতা চারিদিকে যেন জমাট বেঁধে উঠছে ক্রমে ক্রমে। অন্ধূত একটা স্তন্ধূতা, কেবল মধ্যে মধ্যে চারিপার্শ্বের বৃক্ষাদি হতে এক-আধটা পাতা খসে পড়ছে নিঃশব্দে। সহসা কতকগুলো বিচির পাথরীর শব্দে চারিদিক মর্মায়িত হয়ে উঠলো। সম্মায় নীড়গতা পাথরীর দল।

কিরীটী এঁগয়ে গিয়ে বিরাম-কুটীরের বারান্দায় উঠলো এবং কয়েক পা অগ্রসর হতেই অঙ্গপট আলোয় ওর নজরে পড়ল বারান্দার ধূলায় অঙ্গপট কতক-গুলো ছেট ছেট পদচিহ্ন।

ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য কিরীটী পকেট হতে শঙ্কশালী টর্চ-বাতিটা বের করে বোতাম টিপে টর্চের আলোয় সেই পদচিহ্নগুলি দেখতে লাগল।

ক্ষীণ অঙ্গপট পদচিহ্ন! স্বভাবতঃ চট করে কারো দ্রষ্টব্যে পড়বে না। ভিজে কাদামাখা পায়ে কেউ কোনাদিন হেঁটে গিয়েছিল। হয়ত তারই অঙ্গপট চিহ্ন—আজও সামান্য যা বোৰা যাচ্ছে। এবং আরো নজরে পড়ল সেই পদচিহ্নগুলোর আশেপাশেই ধূলোর ওপর জুতোর সোলের কতকগুলো ছাপ। ছাপগুলো প্রথম পায়ের ছাপ হতে অনেক স্পষ্ট। বোধ হয় অল্প কিছুদিন আগে মাত্র জুতো পায়ে কেউ এখানে এসেছিল। ক্রেপ সোল দেওয়া জুতোর ছাপ। প্রমোদভবনে কে কি রকম জুতো পায়ে দেয়? কিরীটীর মনে পড়ল, লক্ষ্য করেছে সে একমাত্র সত্যজিৎই ভারী ক্রেপ সোলের জুতো পায়ে দেয়। সত্যজিৎই এসেছিল হয়ত এখানে। মনে মনে হাসে কিরীটী। অনুসন্ধিস্বার্থে আছে ছেলেটির, দেখশৈলে শেষ পর্যন্ত হালে পানি না পেয়েই তার ঘ্যারস্থ হয়েছে। কিন্তু পাশের ঐ অঙ্গপট পদচিহ্নগুলো কার? পদচিহ্নের গঠন ও আকার দেখে মনে হয় কোন স্বীলোকেরই পদচিহ্ন ওগুলো। তবে কি সবিতাও এসেছিল সত্যজিৎের সঙ্গে এখানে? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? ব্যতদ্র মনে পড়ে ও লক্ষ্য করেছে, সবিতা তো কদাপি খালি পায়ে চলাফেরা করে না। এমন কি বাড়ির মধ্যে কক্ষেও না। এতদ্র সে খালি পায়ে নিশ্চয়ই আসেনি? তবে কার পদচিহ্ন?

ক্রমে এক এক করে কিরীটী বিরাম-কুটীরের সমস্ত কক্ষগুলোই পরীক্ষা করে দেখল। অন্তর্গত পদচিহ্ন আর কোথাও সে দেখতে পেল না।

দিনের বেলা আর একবার এসে বিরাম-কুটীরটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

বাইরে সম্ম্যার কালো ছায়া একটু একটু করে ক্রমে যেন চারিদিক ছেয়ে ফেলছে। ধূসর আলোয় আশেপাশের গাছপালাগুলো অঙ্গপট ছায়ার হত মনে হয়।

নির্দিষ্ট নিজের কক্ষের ম্বার টেলে ভিতরে প্রবেশ করতেই কিরীটী চমকে উঠল। ইতিমধ্যে এক সময় ভৃত্য এসে কক্ষের আলোটা জেরলে দিয়ে গেলেও আলোর শিখাটা কমানো। মদ্র আলোয় কিরীটীর ঢোখ পড়ল কক্ষের মধ্যে একটা চেয়ার অধিকার করে বসে আছে সন্তোষ চৌধুরী।

কিরীটীর পদশব্দে সন্তোষ ততক্ষণে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়য়েছে।

সন্তোষবাবু?

হ্যাঁ আমি—আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি মিঃ রায়। মদ্র কঠে সন্তোষ চৌধুরী প্রত্যন্তে দিল।

কি ব্যাপার? থানা থেকে কখন ফিরলেন? বসুন। বসুন।

সন্তোষ আবার চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। কিরীটীও অন্য একটা চেয়ার টেনে ঘূর্ঘোমুখি হয়ে বসল।

এই মিনিট কুড়ি হবে—

তারপর কি খবর বলুন? হঠাতে আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন কেন দারোগা সাহেব?

॥ ১৬ ॥

আর বলেন কেন? মিথ্যে খানিকটা হয়রান করলে কেবল। আমার নামও সাঙ্গা চৌধুরী—কেবল দারোগা বৃক্ষে দেবো!

প্রমাণটা যখন আপনার কাছেই আছে, সেটা সকালে এখানে দোখয়ে দিলেই তো পারতেন, সকলের সন্দেহভঙ্গ হয়ে যেত। মিথ্যে তাহলে আর এর্মান করে হয়রান হতে হতো না আপনার!

প্রমাণ আর প্রমাণ! এ কি জল্লম মিঃ রায়? এই বাড়িরই ছেলে আর্মি? সর্বিতা আর আমার দেহে একই রক্তের ধারা বইছে। আমার কথাই কি প্রমাণ নয়? সর্বিতার বাবা ও আমার বাবা আপন জাঠতুত খৃত্তুত ভাই ছিলেন।

নিশ্চয়ই সেটাই প্রমাণ বৈক। তবে কি জানেন সন্তোষবাবু, বলতে গেলে একটা ঘৃণ এ বাড়ির সঙ্গে আপনাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। আপনার পিতা-ঠাকুর আপনার জন্মের পুর্বেই এ গৃহ ছেড়ে চলে যান। তারপর দীর্ঘকাল ধরে যতদ্বয় শুনেছি কোন পত্র দেওয়া-নেওয়াও হতো না। এক্ষেত্রে যদি এদের মধ্যে সন্দেহ জেগেই থাকে তাতে করে এদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যাব কি আপনিই বলুন না? কিরীটী মদ্রকঠে প্রশ্নটা করে সন্তোষ চৌধুরীর ঘূর্ঘের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ও বুড়ো শয়তানটার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু সর্বিতা? সেও আমাকে কি বিশ্বাস করতে পারছে না?

আপনি তো বুঝতেই পারছেন সন্তোষবাবু, বসন্তবাবুই এখন একদিক দিয়ে সর্বিতা দেবীর গার্জেন।

গার্জেন! I can tell you Mr. Roy that old শকুনি—ঐ যত অনর্থের মূল। কাকামণির হত্যার আসল ব্যাপারটা আমি কিছুই জানতাম না। আজই থানায় গিয়ে সব শুনলাম—

বিস্মিত প্রশ্নভোগ দ্রুতভাবে কিরীটী তাকাল সন্তোষ চৌধুরীর দিকে,

আপনি জানতেন না ? কি জানতেন না ? মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী যে নিহত হয়েছেন, জানতেন না ?

না তা নয়, তবে কাকার মৃত্যুর আগাগোড়া ব্যাপারটা জানতাম না ! জানতাম না যে সত্যসত্যই তাঁকে হত্যা করেছে কেউ।

কিরীটী কিছুক্ষণ সম্মতে উপরিষ্ঠ সন্তোষ চৌধুরীর মুখের দিকে তাঁকয়ে থাকে। কপালে দুষ্প্রকৃত কুশন দেখা দেয়।

সন্তোষ চৌধুরী ইতিবাধ্যে যেন তার পূর্বোক্ত কথার জের টেনেই বলতে থাকে, আপনাকে আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না মিঃ রায়, সংবাদটা যে কত বড় একটা শক্তি দিয়েছে আমাকে ! মাত্র বছর দুই আগে বাবা মারা গিয়েছেন। মা মারা গেছেন বছর বাবো আগে। লেখাপড়াও বিশেষ কিছু করিনি। বাবার এডেনের স্টীমার পয়েন্টের কাছে মস্ত বড় একটা স্টেশনারী দোকান ছিল ওখানকারই একজন অফিসিয়াল গুলমাল পার্টনারের সঙ্গে। প্রচুর লাভ হতো দোকানটা থেকে। আমিও ঐ দোকানটাতেই কাজ করতাম। হঠাত মাস চারেক আগে ঐ পার্টনার আমাকে জানাল দোকানে নার্কি আমার কোন শেয়ার নেই। আমি ওখানকার একজন মাইনে-করা কর্মচারী মাত্র। বাবা নার্কি মৃত্যুর কিছু-দিন আগেই তাঁর দোকানের অর্ধেক শেয়ার ওকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

তা আপনি তো বললেন আপনার বাবা বছর দুই হলো মারা গেছেন—এত দিন সে কথা সে জানায়নি কেন ?

বললে পাছে আমি মনে আঘাত পাই সে-কারণেই কোন কথা আমাকে নার্কি জানায়নি।

তাহলে এতদিন পরেই বা হঠাতে জানাল কেন ?

দোকানের একটা ব্যাপারে গোলমাল হওয়ায় আমার সঙ্গে তখন সব কথা খুলে আমায় সে বলে।

তারপর ?

অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কোন ফলই হলো না। দীর্ঘ উনিশ-কুড়ি বছরের ব্যাপার। কোন দলিলপত্রও খুঁজে পেলাম না। অবশেষে বাধ্য হয়েই একপ্রকার বিরস্ত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম ভারতবর্ষে।

যদি কিছু মনে না করেন মিঃ চৌধুরী, একটা প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই।

নিশ্চয়ই। বলুন না শুনি ?

আপনার কাকা মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী যে মারা গিয়েছেন এ সংবাদটা আপনি কেথেকে পেলেন ?

কিরীটী তীক্ষ্ণ দ্রষ্টিতে সন্তোষ চৌধুরীর মুখের দিকে তাঁকয়ে থাকে। কিরীটীর প্রশ্নটা সে সন্তোষ চৌধুরীকে বেশ একটু বিব্রত করে তুলেছে তাঁর চোখে-মুখেই সেটা যেন সম্পত্তি হয়ে উঠেছে।

বাংলা সংবাদপত্রে সংবাদটা বের হয়েছিল। তাতেই আমি জানতে পারি। একটু যেন ইতস্তত করেই কথাগুলো বলে সন্তোষ চৌধুরী।

বাংলা সংবাদপত্রে ! এডেনে কি বাংলা সংবাদপত্র যায় নার্কি ?

হ্যাঁ। মর্বাণী, বাংলার অর্থ-সাম্পর্ক কাগজটা আমাদের বাসায় নিয়ামিত যেত। তাতেই সংবাদটা পাই, এখানে রওনা হবার দিন দুই আগে।

সংবাদটায় কি লেখা ছিল ?

এই ষে দেখ্ন না কাগজের কাটিংট। এখনো আমার ব্যাগেই আছে। I kept it. বলতে বলতে সন্তোষ চৌধুরী তার জবাব পকেট হতে সন্দেশ একটা চামড়ার পার্স বের করে পার্স থেকে সংবাদপত্রের ছোট একটা কাটিং কিরীটীর হাতে তুলে দিল।

কিরীটী ঘরের আলোয় কাটিংটা পড়তে লাগল। স্থানীয় সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদ!—স্থানীয় জর্মিদার মৃত্যুজয় চৌধুরীর প্রাণহীন দেহ গতকলা বৌরাণীর বিলের মধ্যস্থিত ষে দ্বীপটি—যাহাকে স্থানীয় লোকেরা নদনকানন বলিয়া জানে সেখানেই পাওয়া গিয়াছে। জর্মিদারের মৃত্যুর কারণ জানা যায় নাই। রহস্যজনক বলিয়াই মনে হয়। মৃত্যুজয় চৌধুরী অত্যন্ত অমায়িক ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জর্মিদারীর উন্নয়নকল্পে এয়াবৎকাল তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ইত্যাদি।

গতীর মনোযোগের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে লেখাটা পড়ে কিরীটী কাগজটা সন্তোষ চৌধুরীকে ফেরত দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, চৌধুরী মশাইরের ষে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে সে তো এই সংবাদেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে দেখতে পাইছ সন্তোষবাবু!

কথাগুলো বলতে বলতেই কিরীটী সন্তোষ চৌধুরীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দাঁড়িতে তাকাল।

এবার প্রত্যুষের কতকটা যেন ইতস্তত করেই সন্তোষ চৌধুরী জবাব দেয়, হ্যাঁ। তবে তার মৃত্যুটা রহস্যজনক বলতে ষে ব্যাপারটা এতটা ধোরাল হত্যা এটাই ব্যবে উঠতে পারিনি দারোগাবাবুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সব জানতে পারবার পূর্ব পর্যন্ত।

অতঃপর কিরীটী ক্ষগকাল চূপ করেই থাকে। তারপর একসময় মৃথ তুলে মৃদুকণ্ঠে বলে, দারোগাবাবুর সঙ্গে আপনার কি কথা হলো?

ভদ্রলোকটিকে বিশেষ সুবিধাজনক বলে মনে হল না যিঃ রায়। কথা-বার্তা আমাদের মধ্যে যা কিছু হয়েছে কাকার হত্যা সম্পর্কেই। তাঁর ধারণা হত্যাকারী বাইরেরই কোন লোক। কিন্তু আমিও তাকে ব্যবিয়ে দিয়েছি—
কি ব্যবিয়ে দিয়েছেন?

আদপেই সেটা সম্ভবপর নয়!

সম্ভবপর নয় কেন?

কেন আবাব কি! এ বাড়িরই কেউ না কেউ তাঁকে হত্যা করেছে।

আপনার কি তাই মনে হয় মিঃ চৌধুরী?

নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে কোন ভুল নেই। এই গোবিন্দপুরে কে তাঁকে বাইরে থেকে হত্যা করতে আসবে? আর কেনই বা আসবে?

সন্তোষ চৌধুরীর কথায় কিরীটী মৃদু হাস্য করে, কোন জবাব দেয় না।

হাসছেন ষে? আপনিই বলুন না, তাঁর সঙ্গে বাইরের লোকের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

ভুলে যাচ্ছেন কেন মিঃ চৌধুরী, তিনি এখানকার জর্মিদার ছিলেন এবং শুধু তাই নয় তাঁর ব্যবসা ছিল ও বন্ধকী কারবারও কিছু কিছু করতেন। তাঁর পক্ষে বাইরের শত্রু থাকা কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়। বরং স্বাভাবিকই বলতে পারেন।

কিন্তু আপনি থাই-বলুন মিঃ রায়, আমার স্থির বিশ্বাস থাইরের কেউ নয়। এ বাড়ির মধ্যে থারা উপস্থিত ছিল সেরাতে তাদের মধ্যেই কেউ না কেউ কাকাকে হত্যা করেছে। তাছাড়া এ বাড়ির প্রদাতন বি কানাইয়ের মা, নিশচয়ই সে মারাত্মক কিছু জানত থার জন্য তাকেও রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হতে হয়েছে এ বাড়ি থেকে গতরাতে। আমাদের প্রত্যেকেরই কি এখন কর্তব্য জানেন?

কি? কৌতুকভরা দৃষ্টিতে কিরীটী সন্তোষ চৌধুরীর ঘুথের দিকে তাকাল।

নিরুদ্ধিষ্ঠা কানাইয়ের মাকে যেমন করে যে উপায়ে হোক এখন সর্বাগ্রে খুঁজে বের করা।

সন্তোষ চৌধুরীর কথার কোনো জবাব দেয় না কিরীটী। নিঃশব্দে ঠেঁটের মধ্যে পাইপটা চেপে ধরে ধূমপান করতে থাকে। কিছুক্ষণ একটা স্তৰ্যতার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে থায়।

একসময় কিরীটী পীড়াদায়ক স্তৰ্যতাকে ভঙ্গ করে সন্তোষ চৌধুরীর ঘুথের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু আমাকে আপনার কি বলবার ছিল বলুন তো? যেজন্য এখানে আমার অপেক্ষায় বসেছিলেন?

হ্যাঁ, থানা থেকে আসতে আসতে আমার কি মনে হচ্ছিল জানেন?

এ হত্যা-রহস্যের একটা ঘীরাংসা করা প্রয়োজন। এবং আপনি যখন এ কাজে হাত দিয়েছেন তখন আমাদের প্রত্যেকেরই আপনাকে আমাদের সাধারণ সাহায্য করা কর্তব্য। আমি তা করবো—সেই কথাটা বলবার জন্য আপনার অপেক্ষায় ছিলাম।

ধন্যবাদ। আপনাদের সকলেরই সাহায্যের আমার প্রয়োজন। মৃদুভাবে কিরীটী জবাব দেয়।

* * *

ঐ রাতেই। রাত তখন গোটা এগার হবে। অল্পক্ষণ আগে মাত্র সকলের আহারাদি শেষ হয়েছে। অন্জবল টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় নিম্নপ্রহরে কিরীটী যে এ্যালবামটা ঘৃত্যজ্ঞ চৌধুরীর ঘরের ড্রয়ার থেকে এনেছিল তারই পাতাগুলো পুনরায় অন্যন্যস্ক ভাবে ওল্টাচ্ছিল। সহসা এমন সময় অতির্ক্তে দরজার বাইরে একটা দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। কিরীটী ক্ষিপ্র-হস্তে অ্যালবামটা বুজিয়ে তার শয্যার নিচে একেবারে চালান করে দিল। এবং বিস্তৃত দৃষ্টি ভেজানো দরজার দিকে তুলে ধরল।

পরমহতেই ভেজানো দরজা ঠেলে ক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল কল্যাণী।

কল্যাণী দেবী! কি সংবাদ? এত রাতে?

কল্যাণীর চোখেমুখে একটা সুস্পষ্ট উন্তেজনার আভাস।

লক্ষ্মীকান্ত সাহা! অস্ফুট কঠে কল্যাণী উচ্চারণ করল।

বসো। বসো। ঐ চেয়ারটায় বোস। কিরীটী পাশেরই শূন্য চেয়ারটা দেখিয়ে কল্যাণীকে খালত কঠে আহবান জানাল।

কল্যাণী কিন্তু বসে না। চেয়ারের একটা হাতলের উপরে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে মনের উন্তেজনাটা সামলে নেবার চেষ্টা করে মৃহূর্তের জন্য। তারপর মৃদুকঠে বলে, নায়ের ঘশাইয়ের ঘরে লক্ষ্মীকান্ত সাহা গোপনে বোধ হয় কোন পরামর্শ করছে আর সেই ঘরের বন্ধ দরজার গায়ে আড়ি পেতে

দাঁড়িয়ে শুনছেন সন্তোষবাবু।

কিরীটী কল্যাণী-প্রদত্ত সংবাদটায় কোন গুরুত্বই আরোপ না করে অন্ধ হাস্য তরল কঢ়ে বলে, তাতে হয়েছে কি?

বিশ্বিমত সপ্তশ্চ দ্রষ্টিতে তাকায় কল্যাণী কিরীটীর মুখের দিকে।

কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা কি জানালে হতো না মিঃ রায়? কল্যাণীর কণ্ঠস্বরে উচ্বেগটা অস্পষ্ট থাকে না।

বসো। আজকের রাতে যে সভা বসেছে তার সমস্ত রহস্যই হয়ত আর দৃঢ়চার দিনের মধ্যেই সর্বসমক্ষে উন্ঘাটিত হয়ে যাবে। এখন তাড়াহুড়ো করতে গেলে হয়ত সব কেঁচে যাবে।

কিরীটীর কথাগুলো কল্যাণী যে ঠিক স্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারেনি সেটা কিন্তু কিরীটীর আদপেই বুঝতে কষ্ট হয় না কল্যাণীর চোখমুখের দিকে তারিয়ে।

আমার কথাটা হয়ত ঠিক বুঝতে পারিনি কল্যাণী। খুব সম্ভবত ঘটনাচক্রে নিজের ব্যর্থতায় লক্ষ্যবুকান্ত সাহা সাদা কথায় যাকে বলে একেবারে ঘৰীয়া হয়ে উঠেছে। কাজেই যে কোন একটা কাজের স্বারা নিজের ক্ষমতা জাহির করবে হয়ত সে দৃঢ়চার দিনের মধ্যেই। এ হয়ত তারই প্রস্তুতি চলেছে।

বারাল্দার দামী ওয়াল-কুকটা এমন সময় চং করে রাণি সাড়ে এগারটা ঘোষণা করল। রাত অনেক হলো কল্যাণী, এবারে তুমি শূন্তে যাও। আমারও ঘূর্ম পেয়েছে। বলতে বলতে নিদ্রাকাতর হয়েই যেন সে একটা হাই তুলল। এবং কথাটা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কল্যাণীকে ঘর ত্যাগ করবার জন্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কল্যাণীও আর নিবৃত্তি না করে ঘর হতে বের হয়ে গেল। কিন্তু তার কৌতুহলী মন কিরীটীর কথায় নিবৃত্ত হয় না। পায়ে পায়ে সে নিচের সির্পি বেয়ে এক-তলার দিকে অগ্রসর হয়।

আহারাদির পর নিদ্রা আসছিল না দেখে কল্যাণী প্রমোদভবনের সামনে দাঙ্কণাশে যে ফুলের ছোটখাটো একটা বাগান আছে সেখানে আপন মনে অন্ধকারেই একটা পাথরের বেদীর উপরে বসেছিল। দৃশ্যের থেকেই একটা অসহ্য গুরুত্ব গরমে প্রকৃতি যেন থমথম করছে। বাতাসের লেশমাত্রও নেই। বিকালের দিকে আকাশের এক প্লানেট একটু মেঘ উঠেছিল কিন্তু সেটাও ঘন চাপ বৈধে উঠতে পারেনি, অন্ধকার রাণির আকাশপটে তারাগুলো কেবল শিঁটিমিটি জুলছে। কল্যাণী আপন মনে বসে বসে কিরীটীর সঙ্গে ল্বিপ্রহরে যে আলোচনা হয়েছিল তাই ভাবছিল। কে মতুঞ্জয় চৌধুরীকে হত্যা করেছে? আর কেনই বা করেছে? কিরীটীর কথায় মনে হয় স্বার্থটা অর্থ-সম্পর্কিত। অর্থই এ অনর্থের মণি। মতুঞ্জয় চৌধুরীর বিরাট সম্পত্তির প্রকৃতপক্ষে মালিক এখন ঐ সবিতাই। তবে সন্তোষ চৌধুরী তার যে পরিচয় দিয়েছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে এ সম্পত্তির একটা অংশ তারও প্রাপ্য। নায়েব বসন্ত সেন সন্তোষ চৌধুরী তার পরিচয়ের উপযুক্ত প্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে স্বীকার করে নিতে রাজী নন। স্পষ্টই সেকথা তাকে জানিয়ে দিয়েছেন এখানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। সন্তোষ চৌধুরীও জোর গলায় জানিয়ে দিয়েছে উপযুক্ত প্রমাণ তার কাছে আছে এবং প্রয়োজন হলে সে প্রমাণ করবেও যে সে

এই বৎশেরই সন্তান। সত্য হোক মিথ্যা হোক প্রমাণ তার হাতে নিশ্চয়ই আছে, নচেৎ এভাবে জোর গলায় সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করত না। তা ছাড়া সে কি বোঝে না প্রতারক প্রমাণিত হলে আইনের হাতে কিভাবে লাঞ্ছিত হতে হবে। শব্দ—তাই নয়, শাস্তিও তাকে পেতে হবে এবং নায়ের বসন্ত সেন সহজে তাকে নিষ্ক্রিতি দেবে না। সহসা এমন সময় সাইকেলের ঘণ্ট শব্দে সচাকিত হয়ে কল্যাণী আড়ারে গেটের দিকে তাকাল, গেটের আলোয় সাইকেল-আরোহীকে দেখে চিনতে ওর কষ্ট হলো না। দারোগা লক্ষ্যুক্তি সাহা। লক্ষ্যুক্তি দারোগা এত রাত্রে এখানে! সকালেই তো ভদ্রলোক এখানে এসে-ছিলেন এবং যাবার সময় সঙ্গে করে সন্তোষ চৌধুরীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার কিছু আগে সন্তোষ চৌধুরী ফিরে এসেছে ও দেখেছে। এও জানে কল্যাণী, রাত্রের আহাৰ সৰ্বতাই বনমালীকে বলে সন্তোষের ঘরে প্রেরণ করে-ছিল। কৌতুহলী হয়ে কল্যাণী দ্বাৰা থেকেই লক্ষ্যুক্তি দারোগাকে অনুসৃত করে। লক্ষ্যুক্তি সাইকেলটা গেটের একপাশে হেলান দিয়ে দাঁড় কৰিয়ে রেখে সোজা ভিতরে প্রবেশ করে নায়ের বসন্ত সেনের ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। একটা থামের আড়ালে আঘাগোপন করে কল্যাণী লক্ষ্যুক্তিকে লক্ষ্য করতে লাগল। নায়েবের ঘরের বাথ দরজার সামনে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই অক্ষ পরে দরজা খুলে খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালেন বসন্ত সেন।

কি দারোগা সাহেব! এত রাত্রে?

বসন্ত সেনের প্রশ্নে বাথ ওষ্ঠের উপরে ডান হাতের তর্জনী তুলে চাপা গলায় লক্ষ্যুক্তি বললেন, আস্তে। কথা আছে, উপরে চলুন।

উভয়ের ঘরের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর হতে পুনরায় দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কল্যাণী একটু অবাকই হয়েছিল। প্রথমতঃ এত রাতে লক্ষ্যুক্তির আবির্ভাব এবং তাঁর আগমনের বাপারে ঐভাবে সতর্কতা অবলম্বন। কল্যাণী চিন্তা করবারও অবকাশ পেল না, অর্তকৃতে একটা অস্পষ্ট শব্দ ওর শ্রবণে-শিশ্রয়ে প্রবেশ করতেই ও ফিরে তাকাল। পাশের ঘরের দরজা খুলে সন্তোষ চৌধুরী পা টিপে টিপে বের হয়ে এলো। কল্যাণী থামের আড়ালে আঘাগোপন করেই লক্ষ্য করতে লাগল সন্তোষ চৌধুরীর গাঁতবিধি।

স্লতপৰ্ণে পা ফেলে সন্তোষ এর্গয়ে এসে দাঁড়াল বসন্ত সেনের ঘরের বাথ দরজার গায়ে একেবারে যেন ঘেঁষে। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ সন্তোষ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। বারান্দার ঝোলানো বাতির আলো সন্তোষের চোখে-মুখে এসে পড়েছে। কপালের রেখাগুলো কুণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

কল্যাণী বুঝতে পারে সন্তোষ আঁড়ি পেতে ঘৰের ভিতরকার বসন্ত সেন ও লক্ষ্যুক্তির কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করছে। সহসা কল্যাণীর মনে হয় এ সংবাদটা কিরীটীকে এক্সেন্ট দেওয়া প্রয়োজন।

এত রাতে লক্ষ্যুক্তির আবির্ভাব ও সন্তোষ চৌধুরীর আঁড়ি পেতে ওদের কথা শোনবার চেষ্টা—ব্যাপার দৃঢ়েটোই যেন কেমন একটা সন্দেহের উদ্দেশ্যে করে। আজ সকাল হতেই পরের পর ঘটনাগুলো—কানাইয়ের মা গত রাত থেকে সহসা নিরুদ্ধিষ্ট হয়ে গেলেন। লক্ষ্যুক্তি সাহা এসে সন্তোষ চৌধুরীকে থানায় ধরে নিয়ে গেলেন। ফিরে এলো সে সন্ধ্যার মুখে। তার-পর রাত প্রায় এই এগারোটায় সহসা লক্ষ্যুক্তির এখানে আবির্ভাব। সন্তোষ

ଚୌଧୁରୀର ଐ ଧରନେର ସନ୍ଦେହଜନକ ଗର୍ତ୍ତିବାଧି ! କଲ୍ୟାଣୀ ଆର ଦେଇ କରେ ନା ।
ଥାମେର ଆଡ଼ାଲ ଥିକେ ସରେ ଗିଯେ ପା ଟିପେ ଟିପେ ସିର୍ବିର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଗେଲ ।

ସମ୍ମତ ବାଢ଼ିଟା ଜୁଡ୍ଗେ ଏକଟା ସତ୍ତ୍ଵତା ।

କଲ୍ୟାଣୀ ପା ଟିପେ ଟିପେ ସିର୍ବି ଅତିକ୍ରମ କରେ ନିଚେ ନାମଛେ । ସିର୍ବିର
ଆଲୋଟା ଅପ୍ରୟାପ୍ତ ହେଁଯାଇ ସମ୍ପର୍କ ସିର୍ବି-ପଥଟା ତେମନ ଶ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଆଲୋକିତ
କରତେ ପାରଛେ ନା । ଆଧୋ-ଆଲୋ ଆଧୋ-ଛାଯାଇ ଘେନ ଏକଟା ଆଲୋଛାଯାର ରହ୍ୟ
ଘେନ ହେଁ ଉଠେଇ । ନିଚେ ନେମେ ଏସେ ସୋଜା କଲ୍ୟାଣୀ ଥାମେର ଆଡ଼ାଲେ ଆଡ଼ାଲେ
ବାରାଦା ଦିଯେ ବସନ୍ତ ସେନେର ଘରେର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଗେଲ, କିନ୍ତୁ ସେଖାନେଓ ସନ୍ତୋଷକେ
ଦେଖିତେ ପେଳ ନା । ବସନ୍ତ ସେନେର ଘରେର ଦରଙ୍ଗା ପ୍ରବେର ମତଇ ଏଥିନେ ବନ୍ଦ ।

କେ ?

ମୁହଁତେ ଅନ୍ଧକାରେଓ ଗଲାଟା ଚିନତେ କଲ୍ୟାଣୀର କଣ୍ଠ ହୟ ନା । ସନ୍ତୋଷ
ଚୌଧୁରୀ ।

କେ ?

ଆମ କଲ୍ୟାଣୀ । ମୁଦ୍ଦକଟେ ଜବାବ ଦେଇ କଲ୍ୟାଣୀ ।

କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ! ଲାଗେନି ତୋ ?

ନା ।

ଏତ ରାତ୍ରେ ନିଚେ ଯେ ଆପନି ? ଶୁତେ ଘାନାନି ଏଥିନେ ? ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଶ୍ନ
କରେ ।

ନା । ଶୁଇନ ଯେ ଏଥିନେ ଦେଖିତେଇ ତୋ ପାଛେନ । ଆପନିଓ ତୋ ଶୋନାନି
ଏଥିନେ ଦେଖିଛ ? ପାଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କଲ୍ୟାଣୀ ।

ନା । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସାଇଲ ନା ତାଇ ଅନ୍ଧକାର ବାରାଦାଯ ଘରେ ବୈଡାଇଲାମ ।

ଆମିଓ ତାଇ । ମୁଦ୍ଦ ହାସ୍ୟ-ତରଳ କଣ୍ଠେ କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟାମର ଦିଲ ।

କଲ୍ୟାଣୀର କଷ୍ଟସ୍ବରେର ମଧ୍ୟେ ଯେ ଏକଟା ହାସିର ଚାପା ଆଭାସ ଆଛେ ସନ୍ତୋଷେର
କିନ୍ତୁ ବୁଝିତେ ସେଟା କଣ୍ଠ ହୟ ନା । ଅଞ୍ଚାତେଇ ବୋଧ ହୟ ନୁହୁଟେ ତାର ଏକଟୁ
କୁଣ୍ଡିତ ହେଁ ଓଠେ ।

ଅର୍ତ୍ତକିତେଇ ସନ୍ତୋଷ ବଲେ ଓଠେ, ହାସହେନ ଯେ ?

ହାସାଇ ! କଇ ନା ତୋ !

ସନ୍ତୋଷ କୋନ ଜବାବ ଦେଇ ନା କଲ୍ୟାଣୀର କଥାଯ । ଚାପ କରେଇ ଥାକେ ।

କଣପରେ ସନ୍ତୋଷ ଆବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଆପନି ତୋ ସର୍ବିତାର ମାମାତୋ ବୋନ,
ତାଇ ନା ?

ହ୍ୟା । ରକ୍ତେର ସମ୍ପକ୍ତ ନା ହଲେଓ ଆଉୟିତାର ସମ୍ପକ୍ତ ।

ତାର ମାନେ ?

ତାର ମାନେ ଆର କି ! ରକ୍ତେର କୋନ ସମ୍ପକ୍ତ ନେଇ ଆମାଦେର ପରମପରେର
ମଧ୍ୟେ । ସର୍ବିଦିର ମା ଆମାର ବାବାର ପାତାନେ ବୋନ ଛିଲେନ, ଏହି ଆର କି !

ଓଁ । ଏକଟା ସର୍ବିତାର ସଙ୍ଗେ ଘେନ ‘ଓ’ ଶର୍ଦ୍ଦିଟ ସନ୍ତୋଷେର କଣ୍ଠେ ଉଚ୍ଚାରିତ
ହଲୋ ।

ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଁବେଳେ ବୋଧ ହୟ ମିଃ ଚୌଧୁରୀ, ଆମି ସମ୍ପାଦିତ ଏକଜନ ଦାବୀ-
ଦାର ନାହିଁ ବଲେ ? କଣପବ୍ରେର ସେଇ ହାସ୍ୟ-ତରଳ କଷ୍ଟସ୍ବର ଅନ୍ଧକାରେ ଧରିନିତ ହେଁ
ଉଠିଲୋ ।

ଆପନି ଏକଜନ ଭାଗୀଦାର ହଲେଇ ବା ଅସନ୍ତୋଷେର ଆମାର କି କାରଣ
ଥାକିତେ ପାରତୋ ବଲ୍ଲ ? ସର୍ବିତାର ସମ୍ପାଦିତ ଦାବୀ ନିଯେ ତୋ ଏଥାନେ ଆମି

আসিনি!

কিম্তু সকলের ধারণা তো তাই।

সকলের ধারণাই যে তাইলে ভূল, এইটুকুই আমি বলতে পারি। আমি এসেছি আমার নিজের দেশের বাড়িতে ফিরে, আমার সাত পুরুষের ভিটাতে। সম্পত্তির ওপরে বা কোন টাকা-পয়সার ওপরে আমার কোন লোভই নেই। এদের কারো সঙ্গে আমার কোন বিবাদও নেই, কেবল আমি আমার ন্যায় অধিকারে এখনে থাকতে চাই। কিন্তু আশচর্য, দেখুন তাও এরা দিতে রাজী নয়!

কল্যাণী সন্তোষের কথার কোন জবাবই দেয় না। জবাব দেবার মত তার কি-ই বা আছে।

সন্তোষ আবার বলতে শুনুন করে, এ বাড়ির উপরের তলয় পর্যন্ত নায়েব বসন্ত সেন আমাকে প্রবেশাধিকার দেয়ান্ত। অথচ শুনলেন তো আজ সকালে, বসন্ত সেন নিজের ঘুর্খেই স্বীকার করল কাকার উইলে সৃষ্টি লেখা আছে আমি ফিরে এলে আমি আমার ভাগের সম্পত্তি পাবো।

আমাকে এসব কথা বলছেন কেন? এতক্ষণে কোনমতে কল্যাণী কথা কয়টি বলে।

না, না—রন্তের সম্পর্ক না থাকলেও সর্বিতার তো আপনি আঘাতীয়ের মতই। অতঃপর সহসা যেন আলোচনার মধ্যে একটা প্র্ণৰ্ছেদ টেনে দিয়ে সন্তোষ বলে গুঠে, আচ্ছা চলি। রাত অনেক হলো। বলতে বলতে সন্তোষ তার ঘরের দিকে পা বাঢ়াল।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে গিয়ে কল্যাণী থম্ভকে দাঁড়াল। পিতা নিত্যানন্দ সান্যাল হাত দৃঢ়িট পশ্চাতের দিকে নিবন্ধ করে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে পায়চারি করছেন।

কল্যাণীর পদশব্দে নিত্যানন্দ কন্যার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে তাকালেন।

মৃখখানা থম্ভম্ভ করছে—চোখের দৃঢ়িটতে সৃষ্টিগত অসন্তোষ।

গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন নিত্যানন্দ, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে? নিচে বাগানে বেড়াচিলাম।

এই মাঝরাতে নিচের অধিকার বাগানে বেড়াচিলে! বেড়াবার চমৎকার সময়! কঠে শ্লেষ।

কল্যাণী পিতার ঘুর্খের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

এ সেই নিত্যানন্দ সান্যাল নন, যিনি সর্ব ব্যাপারেই নির্লিপ্ত নির্বিকার। যিনি শান্ত সহিষ্ণু, অমার্যাক।

দৃঢ়ই চোখের দৃঢ়িটতে যেন একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ বক্রবক্র করছে। ক্ষণকাল সেই আক্রোশ-বরা দৃঢ়িটতে কন্যার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সহসা যেন ক্রুদ্ধ কঠে বিবোঝ্যার করলেন, মিথ্যাক! লজ্জা করলো না তোমার মিথ্যা কথা বলতে! নিচের বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ বখাটে ছেকরার সঙ্গে গল্প করছিলে না?

কল্যাণী নিশ্চিপ্প। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কথার জবাব দিতেও তার ঘৃণা হয়। সমস্ত মন সঞ্চূচিত হয়ে গুঠে।

এত রাতে ঐ ছেকরাটার সঙ্গে কি তোমার এমন কথা হাঁচিল শুনি?

তথাপি কল্যাণী নিরুত্তর। এতটুকু স্বরও ওর কঠ হতে বের হয় না।

আক্রোশে ও জবালায় নিত্যানন্দ চাপা কঠে আবার তর্জন করে গুঠে,

কি? চূপ কেন? জবাব দাও?

নিরুত্তর। কল্যাণী এখনো নিরুত্তর।

কল্যাণী! কটু তিক্ত কঠে আবার তর্জন করে উঠলেন নিত্যানন্দ।

কিছুই আমার বলবার নেই। এতক্ষণে ধীরে সংযত কঠে কল্যাণী জবাব দেয়।

কিছুই তোমার বলবার নেই?
না।

বেশ। কালই তোমাকে আমি লুকিয়ানায় পাঠিয়ে দেবো। প্রীষের ছুটিটা তুমি হস্টেলেই থাকবে।

বলতে বলতে নিত্যানন্দ কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

আর নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত কল্যাণী দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মধ্যে।
প্রচণ্ড একটা অঘৃৎপাতের মত তখন তার সমস্ত অন্তরটা জরুর পুড়ে যেন
একেবারে খাক হয়ে যাচ্ছে।

॥ ১৭ ॥

সর্বিতার ডাকে কিরীটীর নিদ্রাভঙ্গ হলো।

কিরীটী চোখ মেলে দেখল শয়ার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে সর্বিতা। তার
চোখেম্বথে সূক্ষ্মপট উদ্বেগ।

কি হয়েছে সর্বিতা দেবী?

আপনি শীগীগির একবার নিচে চলুন। লক্ষ্যীকান্তবাবু এসেছেন। নায়েব
কাকাকে arrest করে নিয়ে যাচ্ছেন—এ সব কি যিঃ রায়! নায়েব কাকাকে
arrest করছেন কেন?

কিরীটী শয়া ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা গায়ে দিতে দিতে বলে,
কেন লক্ষ্যীকান্ত সাহা নায়েব শশাইকে arrest করেছেন আমি কেমন করে তা
বলবো বলুন? তা তিনি কিছু বলেননি কেন শুকে তিনি arrest করছেন?

না। কেবল বললেন—এ সব পুলিসের সিঙ্কেট ব্যাপার, সকলের কাছে
বলতে তিনি রাজী নন।

এক্ষেত্রে আমিই বা তাহলে কি করতে পারি বলুন? নির্লিপ্তভাবে কিরীটী
জবাব দেয়।

কিন্তু আমাদের তো একটা প্রতিবাদ করা উচিত।

পূর্বের মতই পরম নির্বিকার ও শান্তভাবে জামার বোতামগুলো লাগাতে
লাগাতে কিরীটী বলল, পুলিসের কোন কাজে প্রতিবাদ করলে তো তারা
আপনাকে সমর্থন করবে না সর্বিতা দেবী!

তাই বলে অন্যায় জুলুম! সর্বিতার কঠস্বর রূপ্য হয়ে আসে।

অন্যায় জুলুমই যে তাই বা কি করে আপনি ব্যবলেন? চলুন দোখি!

কিরীটী প্রস্তুত হয়ে নিতে নিতে বললে। উভয়ে নিচে বসন্ত সেনের
ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে দুখানা চেয়ারে ঘুরোঘুরী নিঃশব্দে বসে আছেন বসন্ত সেন,
থানার দারোগা লক্ষ্যীকান্ত সাহা আর একপাশে চূপ করে দাঁড়িয়ে সতাজিং।

ওদের পদশব্দে বসন্ত সেন ও লক্ষ্মীকান্ত দ্বিজনেই মৃত্যু তুলে তাকালেন।

নমস্কার লক্ষ্মীকান্তবাবু। ব্যাপার কি ! এত সকালেই ? প্রশ্ন করে হাসি-
মৃখে কিরীটী আর একটু এগিয়ে যায় ঘরের মধ্যে।

লক্ষ্মীকান্তের মৃখখনানা অত্যন্ত গম্ভীর।

গম্ভীর কণ্ঠেই প্রতিনমস্কার জানিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বললেন, মিঃ রায়
এসেছেন ভালই হলো। সর্বতা দেবী, সত্যজিৎবাবু আপনারা অনুগ্রহ করে
একটু বাদ পাশের ঘরে যান ! মিঃ রায়ের সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল।

কিরীটীই নিঃশব্দে চোখের ইঞ্জিতে সত্যজিৎ ও সর্বতাকে কক্ষ ত্যাগ
করে যেতে ক্ষণেকের জন্য অনুরোধ জানায়।

দ্বিজনেই নিঃশব্দে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল কিরীটীর চোখের
ইঞ্জিতে।

দরজাটা এবারে ভেজিয়ে দিন মিঃ রায়। পূর্ববৎ গম্ভীর কণ্ঠেই লক্ষ্মী-
কান্ত বললেন।

মন্দ হেসে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল।

বসন্তবাবুকে গতরাতেই এসে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম মিঃ রায়। কিন্তু
উনি বলছেন আমার সে-সব প্রশ্নের কোন জবাব দিতেই উনি নাকি বাধ্য নন।
তাই এক্ষেত্রে একপ্রকার বাধ্য হয়েই আমাকে আইনের প্রয়োগ করতে হচ্ছে।

মিথ্যে কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই লক্ষ্মীকান্তবাবু। আরী প্রস্তুত,
আপনি চলুন। শান্ত দ্রুকণ্ঠে সহসা কথা বললেন বসন্ত সেন।

কাল আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে থানায় গিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন,
কিন্তু দুপুরের দিক থেকেই শরীরটা কেমন ভাল লাগছিল না তাই—

গোলে ভালই করতেন মিঃ রায়। অনেক interesting কথা শনতে
পারতেন।

তাই নাকি ? কি রকম ? কাল রাত্রে যখন আপনি এসেছিলেন টের
পেয়েছিলাম কিন্তু ভাবলাম বসন্তবাবুর সঙ্গে হয়ত কোন গোপনীয় জরুরী
কথা আছে তাই আর বিরস্ত করিনি আপনাকে।

হ্যাঁ, আপনি হয়ত শুনে স্মৃথীই হবেন, কাল সন্তোষবাবুকে থানায় নিয়ে
গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অনেক রহস্যাই উল্পাটিত হয়েছে যার
ফলে সম্পূর্ণ কেসটাই একটা definite shape নিয়েছে। প্রথমে অবশ্য ভদ্রলোক
মৃখ খুলতে চাননি কিন্তু জানেন তো মৃখ খুলবার দাওয়াই আমাদের জানা
আছে—চাপে পড়ে সব প্রশ্নের জবাব শেষ পর্যন্ত দিয়েছেন।

বটে ! কৌতুহলী দ্রিষ্টিতে তাকায় কিরীটী লক্ষ্মীকান্তের সাফল্যে গদগদ
মৃখের দিকে।

সহসা এমন সময় বসন্ত সেন তাঁর নিস্তর্থতা ভঙ্গ করে কথা বললেন,
কিন্তু আঘি আপনাকে বলছি, সন্তোষবাবু যে সব চিঠি আপনাকে দেখিয়েছেন
একটা ও তার সত্য নয়; কারণ গত চার্বিশ বৎসর একখানা চিঠি ও মৃত্যুজয়
চোধুরী কাউকে লেখেননি। এমন কি তাঁর মেয়েকেও তিনি নিজহাতে চিঠি
কোনাদিন লেখেননি। চিঠি যা লেখা হতো তাঁরই জবানীতে আমার হাত দিয়েই।

প্রশ্ন করল এবারে কিরীটীই, কেন তিনি নিজহাতে চিঠি লিখতেন না
তার কোন কারণ ছিল কি ?

হ্যাঁ ছিল।

সেই কারণটাই তো আপনার কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম। লক্ষ্যীকান্ত
বলে ওঠেন, কিন্তু উনি বলতে রাজী নন।

রাজী নন কেন? প্রশ্নটা কিরীটীই করে।

না, রাজী নই। আপনাদের বর্তমান তদন্তের ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের
ও প্রশ্নের জবাবের কোন সংস্পর্শ আছে বলেই আমি মনে করি না। তাছাড়া
মৃত্যুঞ্জয়ের হাতের লেখা আমার থথেষ্ট পরিচিত, চিঠিগুলো আমাকে দেখালেই
আমি দপ্তরের খাতাপত্রে তাঁর হাতের যে সব লেখা আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে
সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে দিতে পারবো, কিন্তু দারোগা সাহেব চিঠিগুলো
আমাকে দেখাতেই রাজী নন!

কিরীটী বসন্ত সেনের কথায় লক্ষ্যীকান্ত সাহার দিকে মুখ ফিরিয়ে
তাকাল এবং বললে, সে চিঠিগুলো আপনার কাছেই আছে বুঝি মিঃ সাহা?

হ্যাঁ। আসবেন আপনি থানায়, দেখাবোঝন।

চিঠিগুলো সেন মশাইকে দেখাতে আপনার সর্তাই আপনি আছে নাকি?
বর্তমানে আছে, কারণ আপনি চিঠিগুলো পড়লেই জানতে পারবেন।

হঁ। শুধু এই জন্যই কি আপনি শুকে arrest করেছেন?

না, আরো দুটো কারণ আছে।

আরো দুটো কারণ আছে?

হঁ, যে রাতে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী নিহত হন সে রাতে উনি এখানে উপস্থিত
ছিলেন না, শুরু জবাবদীতে বলেছিলেন উনি—

না, ছিলাম না তাই বলোছি। মহাল দেখতে গিয়েছিলাম, রাত প্রায় গোটা
তিনিকের সময় ফিরি। জবাবটা দিলেন বসন্ত সেন।

কিন্তু সত্য কথা তো তা নয়। আপনি সেদিন আদপেই এ বাড়ি হতে
বের হননি। নিজের ঘরের মধ্যেই ছিলেন।

কথাটা এবারে বলেছিল কিরীটী।

কিরীটীর কথায় যাগ্রগৎ চমকে দৃঢ়নেই বসন্ত সেন ও লক্ষ্যীকান্ত সাহা
ওর মুখের দিকে বিস্তৃত প্রশ্নভরা দ্রুতিতে তাকায়।

সে কি! তবে যে আপনি গতরাতে বলাছিলেন জমিদারী সংক্রান্ত কোন
একটা বিশেষ গোপনীয় ব্যাপারেই কোন একটা মহালে আপনাকে ঘেতে হয়ে-
ছিল এবং গোপনীয় বলেই মহালের নামটা আপনি বলবেন না? তৈক্ষ্ণকষ্টে
এবারে বসন্ত সেনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা শেষ করলেন সাহা, হঁ!
আসলে আপনি তাহলে এ বাড়ি ছেড়ে সেদিন কোথায়ও যাননি!

কিরীটীর কথায় ও লক্ষ্যীকান্ত সাহার চালেঞ্জ নায়েব বসন্ত সেন যেন
একেবারে পাথরের মতই স্তরে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মুখখানাও যেন ঐ মুহূর্তে তাঁর মনে ইচ্ছিল একেবারে পাথরেই গড়া
ভাবলেশহীন। ক্রোধ, বিরাঙ্গ, হতাশা, ব্যথা, লজ্জা, অপমান কোন কিছুই
যেন প্রকাশ পাচ্ছে না মুখের ক্ষেত্র অঞ্চল রেখাগুলোতে।

নায়েব মশাই, এ কথা তাহলে সত্য? পুনরায় প্রশ্ন করলেন লক্ষ্যীকান্ত
সাহা।

জানি না। আপনাদের কোন প্রশ্নেই জবাব দিতে রাজী নই লক্ষ্যী-
কান্তবাবু। আপনি আমাকে arrest করতে এসেছেন করুন। কোথায় আমাকে
নিয়ে ঘেতে চান, চলুন আমি প্রস্তুত। নিরাতিশয় একটা তাঁচিলোর সুরই যেন

নায়ের বসন্ত সেনের কণ্ঠস্বরে ঘরে পড়ল।

আপনি তাহলে জবাব দেবেন না? আবার প্রশ্ন করলেন লক্ষ্মীকান্ত।
না।

এখন মনে হচ্ছে কানাইয়ের মার অন্তর্ধানের ব্যাপারেও আপনি লিপ্ত
আছেন। লক্ষ্মীকান্ত বললেন।

যেমন আপনার অভিভূতি ভাবতে পারেন। মিথ্যে আপনি সময় নষ্ট
করছেন দারোগা সাহেব। আমার মৃত্যু থেকে আপনি একটি প্রশ্নেরও জবাব
পাবেন না।

লগুড়াহত জানোয়ারের মতই এবারে যেন লক্ষ্মীকান্ত সাহা একেবারে
কিন্তু হয়ে ওঠেন এবং তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে বলেন, কিন্তু আমি লক্ষ্মীকান্ত
সাহা! আপনাদের মত বহু নায়েবকেই আমার দেখা আছে। চলুন আগে
ধানায়, তারপর দেখা যাবে আপনাদের মত ঘূর্ণ চারিত্বের লোককে—

দারোগা লক্ষ্মীকান্তের কথাটা শেষ হল না, মৃহূর্তে বাষের মতই থাবা
মেরে রূদ্রাঞ্জলি বসন্ত কেন লক্ষ্মীকান্তের বক্তব্যটা অর্থপথে থামিয়ে দিলেন
লক্ষ্মীকান্ত! ভুলো না এটা বসন্ত সেনের এলাকা। এখন যদি তোমাকে
জ্যান্ত হাত পা বেঁধে সামনের ঐ বৌরাণীর বিলের জলের ঠাণ্ডা পাঁকের নিচে
পুত্রে ফেলি তোমার ফিরিঙ্গি বাপটাকুল্দার সাধ্যও হবে না তোমার লাশ খুঁজে
বের করে! এ তোমার ধানার চোহন্দী নয়—ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা
বলতে শেখিন এখনো।

ঠাণ্ডা বারুদ-স্তুপ যেন সহসা একটি মাত্র শফালিঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে
হাবানলের মতই দাউ দাউ করে জরুলে উঠেছে।

শান্ত ভদ্র বসন্ত সেনের মধ্যে যে এমন একটি রূপ ভরণ্কর রূপ
ক্ষমাচ্ছাদিত হয়ে চাপা পড়েছিল ভাবতেও যেন বিস্ময় লাগে।

বসন্ত সেনের এ যেন এক অভিনব রূপ।

বৃক্ষের সমস্ত শরীরটা যেন একটা নিষ্কাশিত তীক্ষ্ণ ধারালো আসির মত
ঝজ্জ হয়ে উঠেছে। ক্ষণপূর্বের পাথরের মতই ক্ষিতির অঞ্চল মৃত্যুর্ধান যেন
মৃহূর্তে রূদ্রাঞ্চলের মতই ধৰ্মক্রিয় করে জরুলে উঠেছে।

এককালে জীমিদারের নায়েবদের যে দোর্দুপ্রতাপের কথা শোনা যেত এ
যেন সেই প্রাতান দিনেরই নায়েব। সরকারী কোন আইন বা নীতির এরা ধার
ধারে না, এদের আইন এদের কাছে। অশিষ্ট অবাধ্য প্রজাকে বেগাদাতে জজ্জিরিত
করে এদেরই পূর্ব-পুরুষেরা হয়ত একদা অন্ধকার সাঁতসেংতে গুপ্তকক্ষে
জীবন্ত করব দিত। রাতারাতি খুন করে লাশ মাটির নীচে পুত্রে ফেলত,
নয়তো পৃক্ষরিণীর তলায় গলায় পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দিত। অথবা জ্যান্ত
দেওয়ালের সঙ্গে ইট দিয়ে রাতারাতি গেঁথে ফেলত।

লক্ষ্মীকান্ত নিজেও বোধ হয় এতটা আশা করেননি। মৃহূর্তের জন্য
তাই বোধ হয় তিনিও কিংকর্তব্যবিচূড় হয়ে পাথরের মতই নিশ্চল অবস্থায়
দাঁড়িয়ে থাকেন এবং হিস্তে জানোয়ারকে নিয়ে ঘাঁটানো আর বিবেচনার কাজ
হবে না ভেবেই নিজের রূপ এবারে সম্পূর্ণ পালেট দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,
জীমিদার মৃত্যুজ্ঞান চৌধুরীর হত্যাপরাধের সদেহে আপনাকে আর্ম ফেন্দার করাই
বসন্তবাবু—

লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যের কথা শেষ হতেই সহসা যেন বাজের মত তীক্ষ্ণ উচ্চ

কঠে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন বসন্ত সেন।

কিরীটী লক্ষ্মীকান্ত দুরজনেই চমকে ওর প্রচণ্ড হাসির শব্দে ওর মুখের
দিকে তাকায়। বসন্ত সেন হাসছেন, হাঃ! হাঃ! হাঃ!

কেউই ওর হাসিতে বাধা দেয় না।

হাসি থামিয়ে বসন্ত সেন বাঙাগীমাণিত কঠে বলেন, এই বিদ্যা আর বুদ্ধিকরই
এত দম্ভ! তুমি বের করবে মৃত্যুঞ্জয়ের হত্যাকারীকে! এর চাইতে সে আশাহত্যা
করে ঘরেছে বা অদ্য কোন আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছে, যে রিপোর্ট
দিয়েছিলে সেই যে ছিল ভাল। মিথ্যা তোমার কাদা ঘেঁটে নোংরা হওয়াই সার
হবে লক্ষ্মীকান্তবাবু। কিন্তু বড় গলায় তো আমাকে প্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছ,
শেষ পর্যন্ত তোমার আইন দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে তো দারোগা-
বাবু! যাগ গে। মরুক গে। চল কোথায় যেতে হবে—

বসন্ত সেনের উচ্চারিত প্রতিটি কথা ষেন নিষ্ঠার ব্যঙ্গের ছুঁচ বিপর্যয়ে
দেয় দারোগা লক্ষ্মীকান্তের সর্বদেহে।

লজ্জায় অপমানে আক্ষেশে তিনি যেন ফুলতে লাগলেন। রোষকষায়িত
লোচনে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল বসন্ত সেনের মুখের দিকে। মুখ দিয়ে তাঁর
কোন বাক্যও সরে না।

হাতকড়াও দেবে নাকি! না এমনিই গেলে চলবে দারোগাবাবু? আবার
প্রশ্ন করলেন বসন্ত সেন।

না, এমনি চলুন আমার সঙ্গে—

কিন্তু যদি রাস্তায় তোমাকে একটা থাম্পড় কঁষিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাই, ধরে
থাকতে পারবে তো? ঐ তো তোমার চেহারা! আমার শক্তির খবর জান তো!
ব্যাখ্য হলেও এখনও লাঠি হাতে নিয়ে যদি দাঁড়াই, তুমি তোমার থানার সমস্ত
চেলা-চামুড়াদের নিয়েও সামনে আমার দাঁড়াতে পারবে না।

লক্ষ্মীকান্ত বসন্ত সেনের কথার কোন জবাবই দেন না।

এবারে ঘূর্দন হেসে বসন্ত সেন বললেন, না, ভয় নেই চল। দেখেই আসা
যাক তোমার আইনের দৌড়টা কত দূর!

অগ্রে অগ্রে বসন্ত সেন ও পশ্চাতে লক্ষ্মীকান্ত সাহা কক্ষের বাখি দরজাটার
দিকে অগ্রসর হলেন। দরজার কাছবরাবর গিয়ে হঠাত বসন্ত সেন ঘৰে দাঁড়িয়ে
কিরীটীকে সম্বোধন করে বললেন, চললাম কিরীটীবাবু, মৃত্যুঞ্জয়ের সালিস্টার
রায় আগ্রণ বোসের অতীনলাল কাল-পরশ্বের মধ্যে হয়ত এসে পড়বেন। তাঁকে
আসতে লিখেছিলাম। মৃত্যুঞ্জয়ের উইলের ব্যাপারে মিঃ বোস আসছেন, সান্যাল
মশাই রইলেন, সত্যজিৎ রইলো, সকলের সামনে যেন উইলটা পড়া হয়। সম্পত্তির
প্রবেট নিতে হবে, মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরে সিল্ককে নগদ টাকা আছে। চারিটা আমি
সবি মার হাতে গতকালই দিয়ে দিয়েছি।

কিরীটী এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। নির্বাক শ্রোতা হয়েই সমগ্র দৃশ্যটা
আগাগোড়া উপভোগ করছিল। এখনও চুপ করেই রইল।

হঠাত অতঃপর লক্ষ্মীকান্তের দিকে ঘৰে তাকিয়ে বসন্ত সেন বললেন, এক
মিনিট দারোগা সাহেব। তুমি একটু বাইরে যাও, আমি কিরীটীবাবুর সঙ্গে
কথা বলে এক্ষণ্ঠ আসছি।

নিঃশব্দে লক্ষ্মীকান্ত স্বিতায় আর বাক্যবায় না করে দরজাটা খুলে দ্বন্দ্ব
হতে নিষ্কান্ত হয়ে গেলেন।

নিঃশব্দে বসন্ত সেন দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে
দাঁড়ালেন সম্মুখে দণ্ডায়মান কিরীটীর ঘূর্খের দিকে তাকিয়ে।

কিরীটীবাবু!

বলুন।

আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

বলুন!

এ ব্যাপারে আর আপনি থাকবেন না। এখান থেকে চলে যান। আপনার
প্রয়ো ফিসই আমি দেবো। সর্বিতা আর সত্যজিৎ ওরা বুকতে পারবে না—
কিন্তু—

তাছাড়া ভেবে দেখুন, কি হবে আর মিথ্যা কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করে—

আপনি কি তাই মনে করেন? তৈক্ষ্য দ্রষ্টিতে কথা কয়টি বলে কিরীটী
তাকাল বসন্ত সেনের ঘূর্খের দিকে।

হ্যাঁ, তাই মনে করি। এটুকু অন্ততঃ ব্বুবার আমার শক্তি আছে কিরীটী-
বাবু এবং পেরেছিও। আপনি লক্ষ্যীকাল নন, তাই আবার অনুরোধ জানাচ্ছি,
আপনি ফিরে যান। বরং আপনার প্রাপ্তের চাইতে বেশীই কিছু—

ভুল করছেন আপনি সেন মশাই। বুরতেই যখন কিছুটা আপনি আমাকে
পেরেছেন, এটুকুও আপনার বোৰা উচিত ছিল, টকার লোভ দেখিয়ে আমাকে
আপনি নিরস্ত করতে পারবেন না। তাছাড়া আরো একটা কথা, আমাকে এ
কেসে নিয়ন্ত করেছেন আপনি নন—সর্বিতা দেবী। তিনি যদি এখন আমাকে
যেতে বলেন আমি সানদে এই মহুর্তে চলে যাবো, অন্যথায়—

তাহলে আপনি স্থিরপ্রতিষ্ঠাই?

কথা যখন দিয়েছি, একটা মীমাংসা না করা পর্যন্ত আমার যবার উপায়
নেই সেন মশাই। আমাকে ভুল ব্বুবেন না। সত্য-সন্ধানী আমি—সত্য-বন্ধ!

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বসন্ত সেন কিরীটীর চোখের প্রতি
চোখ রেখে।

শাঙ্গিত তরবারির মতই দৃঃজোড়া চোখের দ্রষ্টিপুর যেন পরম্পরের
প্রতি নিবন্ধ হবে আছে।

বেশ তবে তাই হোক। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বসন্ত সেন জবাব দিলেন।

একটা কথার জবাব আপনার কাছে পেতে পারি কি সেন মশাই? হঠাৎ
কিরীটী প্রশ্ন করে।

কি?

এমন কোন স্বীলোককে আপনি কি জানেন, যিনি ঘৃত্যঞ্জয় চৌধুরীর
বিশেষ পরিচিতাই হয়ত ছিলেন, যার নামের আদ্যাক্ষর হয়ত ছিল ‘ল’—

কিরীটীর কথা শুনে চকিতের জন্যই যেন বসন্ত সেনের চোখের তারা
দৃঃটো জবলে উঠে আবার স্বাভাবিক হয়ে এল! শান্ত নির্নিপ্ত কণ্ঠে জবাব
দিলেন বসন্ত সেন, না—

হ্যাঁ। আর একটি কথা—

বলুন!

বৌরাণীর বিলে নৌৰিবহারের জন্য এদের কোন নৌকা বা বোট ছিল কি?

না। জবাবটা বসন্ত সেন এবাবে যেন একটু ইতস্তত করে দেন।

আপনার ঠিক স্বরণ আছে?

আছে বৈকি।

হ্যাঁ, একটা কথা গতকাল আপনাকে বলা হয়নি, কানাইয়ের মার ঘরের মেরেতে কতকগুলো অস্পষ্ট ক্রেপ-সোলের জুতোর ছাপ দেখেছিলাম। এবং ঠিক অনুরূপ জুতোর ছাপ নলনকাননের অধ্যস্থিত বিরাম-কুটীরের ঘরের মেরেতেও দেখেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম জুতোর ছাপগুলো বৃক্ষ সত্তজিৎ-বাবুরই, পরে বুঝেছি তা নয়—

আমি তো ক্রেপ-সোল দেওয়া জুতো পরি না রাখ শাই! শান্তকণ্ঠে জবাব দিন বস্তু সেন।

জানি। কিরীটীর ওষ্ঠপ্রাণে বঙ্গিম হাসির একটা রেখা জেগে ওঠে এবং ধীরকণ্ঠে বলে, আছা নমস্কার। প্রয়োজন হলে আমাকে সংবাদ দিতে পারেন সেন শাই। কারণ—

কিরীটীর কথাটা নায়েব বস্তু সেন শেষ করতে দিলেন না, প্রশান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, তার প্রয়োজন হবে না। ধন্যবাদ। নমস্কার।

অল্পভূত দ্যুতার সঙ্গে অতঙ্গের ঘাড় উচ্চ করে দরজাটা খুলে নিঃশব্দে পদসপ্তারে বস্তু সেন কক্ষ হতে নিষ্কা঳ হয়ে গেলেন।

কিরীটী নির্নিয়ে বস্তু সেনের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওষ্ঠপ্রাণে আবার তার সেই ক্ষণপূর্বের বঙ্গিম হাসি জেগে ওঠে।

॥ ১৪ ॥

পুর পুর দুটি প্রভাত দুটি আকস্মিক ঘটনা-বিপর্যয়ে প্রযোদভবনের উপরে যেন প্রচণ্ড আঘাত হেনে গেল।

কানাইয়ের মার অকস্মাত নিরাঙ্গিন্তা হওয়া, নায়েব বস্তু সেনের লক্ষ্যাকান্ত কর্তৃক প্রেপ্তার হওয়া।

বস্তু সেন কিন্তু তাঁকে প্রেপ্তার করার ব্যাপারটা আদৌ একটা গুরুতর ঘটনা বলে ধরেননি। ঘর হতে বের হয়ে বারান্দায় দণ্ডায়মান সত্তজিৎ ও সর্বিতার ব্যাকুল সপ্তশন দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো।

সত্তজিৎ সর্বিতা দুঃজনেই যেন একটু বিস্মিত হয়। বস্তু সেনের মুখের কোথাও উচ্চেগের বা চাপেলেয়ের বিশ্বামী চিহ্নও নেই যেন। প্রশান্ত মুখ এবং ওষ্ঠপ্রাণে নিশ্চিল একটি হাসির স্পষ্ট আভাস। কোন বাক্যবিনিয়নই হলো না পরম্পরের মধ্যে, কেবল নির্বাক দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই যেন বস্তু সেন বৃক্ষে দিলেন চিন্তার উদ্বেগের কোন কারণ নেই।

অন্দর অতিক্রম করে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বস্তু সেন হাঁক দিয়ে দারোয়ানকে ডাকলেন।

ভোজপুরী দারোয়ান সেলাম ঠুকে এসে দাঁড়াল, জি!

লছমনকে বোলনা টমটম তৈয়ার করকে তুরন্ত ইধার আনেকে লিয়ে!

নায়েবের হৃকুমে দারোয়ান সহিস লছমনকে সংবাদ দিতে চলে গেল।

অদ্বৰ গেটের পাশে দারোগার ঘোড়াটা বাঁধা ছিল, সেদিকে তাকিয়ে বস্তু সেন বললেন, আপনার সঙ্গে ঘোড়া আছে দেখিছ দারোগাবাবু—আপনি বরং তাহলে এগোন, আমি টম্টমে থানায় আসছি।

আমিও আপনার সঙ্গেই টম্টম্যে যাবোখন—

কিন্তু আপনার ঘোড়া ?

সে থানায় গিয়ে একজন সেপাইকে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

দারোগার কথায় বসন্ত সেন মুচ্চি একটু হাসলেন। বুঝতে পারছিলেন, অতঃপর লক্ষ্মীকান্ত সাহার আর সাহসে কুলোছে না তাঁকে একলা ছেড়ে যেতে।

বস্তুতঃ কতকটা তাই বটে। বসন্ত সেনকে ঘাঁটাবারও এখানে এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে যেমন আর তাঁর সাহস ছিল না তেমনি তাঁকে এখানে একা ছেড়ে থানায় ফিরে যেতেও ভরসা পাচ্ছিলেন না। যেমন করে হোক যত শীত্র সম্ভব এখন বসন্ত সেনকে নিয়ে থানায় নিজের লালাকার মধ্যে গিয়ে তুলবার জন্য মনে মনে সতীই তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

ক্ষণপর্বে কক্ষের মধ্যে বসন্ত সেনের উচ্চারিত তাঁর সদস্ত্রোঙ্গগুলো লজ্জায় অপমানে আঙোশে যেন তাঁর ভিতরটা পূর্ণিয়ে থাক করে দিচ্ছিল, কিন্তু এখানে একাকী অসহায়ভাবে তাঁরই চৌহান্দির মধ্যে দাঁড়িয়ে হস্তি ছাড়বার মত দৃঃসাহস আর তাঁর ছিল না।

কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই দারোগাবাব ! স্বেচ্ছায় যখন আপনার হাতে নিজেকে ধরা দিতে চলেছিই, আর যাই হোক বসন্ত সেন কথার খেলাপ করবে না। বেশ, তাহলে না হয় একটু অপেক্ষাই করুন—টম্টম্টা আসুক।

বারান্দার উপরেই দৃঃজনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে লহুন টম্টম্য জুতে বিয়ে এল।

বসন্ত সেন এগিয়ে যেতেই লহুন নায়েবের হাতে লাগামটা তুলে দিল সমস্তমে।

বসন্ত সেন বরাবরই টম্টম্য নিজেই চালান।

পাদানীর উপরে পা দিয়ে টম্টম্যে উঠে বসে লাগামটা জুত করে ধরে চাবুকটা হাতে নিচ্ছেন বসন্ত সেন, লক্ষ্মীকান্ত এগিয়ে এলেন পাদানীর দিকে টম্টম্যে উঠে বসবার জন্য। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে যেন একটা বিত্তী ব্যাপার ঘটে গেল। চাকিতে ঘোড়াটার লাগামটা টেনে উত্থত ভঙ্গতে মুখ ফিরিয়ে লক্ষ্মীকান্তকে স্বেচ্ছান করে বসন্ত সেন বললেন, উহু ! এ টম্টম্যে নয়, এ ঘোড়াটা নতুন, বড় তেজী। কখন কি বিপদ ঘটায় বলা যায় না, আপনি আপনার ঘোড়ায় চেপেই বরং আমার পিছনে পিছনে আসুন—বলতে বলতে হাতের মুঠোয় ধরা চাবুকটা শূন্যে আলোলিত হয়ে হস্ত করে একটা শব্দ তুলতেই শিঞ্চিত তেজী ঘোড়া নক্ষত্রবেগে ছুটে যেন টম্টম্টাকে টেনে নিয়ে সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হতভুর্ব লক্ষ্মীকান্ত স্তৰ্য হয়ে গেটের সামনে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সমস্ত অন্তরটা তখন যেন একটা ভীষণ অঘ্যাতপাতের মত জবলে পড়ে থাক হয়ে যাচ্ছিল তাঁর।

দাঁতে দাঁত চেপে অদৃশে গাছের সঙ্গে বাঁধা রোগ-জীণ “ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রচণ্ড আঙোশে সমস্ত শরীর যেন তাঁর কাঁপছে, পা টলছে।

ঘোড়াটার উপরে উঠতে গিয়ে দৃঃদ্বারা উঠতে পারলেন না লক্ষ্মীকান্ত। এখনো অশ্ব ব্যাপারে লক্ষ্মীকান্ত খুব বেশী রপ্ত হননি।

তিনবারের বার উঠে বসলেন তিনি ঘোড়ার পিঠে।

ধীরে ধীরে দুলুকি চালে ঘোড়া চলতে লাগল। রাস্তায় পড়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কেবল একটা ধূলোর চৰ সম্মুখের পথটাকে ধূঞ্জালের মত আচ্ছন্ন করে আছে—টম্টমের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

* * *

কক্ষের মধ্যে স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিরীটী। ক্ষণপূর্বের হাসির ষে বাঞ্ছিম রেখাটি ওষ্ঠপ্রাণেতে তার দেখা দিয়েছিল সেটা একসময় মিলিয়ে গিয়েছে, কপালের রেখাগুলো কুণ্ডিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ পদশব্দে চোখ তুলে তাকাতেই নজরে পড়ল কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করছে সত্যজিৎ ও সুবিতা।

আসুন সত্যজিৎবাবু, সুবিতা দেবী! ওরা চলে গেলেন?

হ্যাঁ, নায়েব টম্টমে গেলেন আগে—পিছনে গেলেন দারোগবাবু। জবাব দিল সত্যজিৎ।

তাই নাকি! কিরীটীর ওষ্ঠপ্রাণেতে আবার সেই বিচিত্র হাসি জেগে ওঠে, বেশ শক্ত পাখায় পড়েছেন এবারে আমাদের সাহা মশাই!

কিন্তু এ অত্যন্ত অন্যায় জুলুম আপনাকে আমি বলতে পারি কিরীটী-বাবু! কখনই হতে পারে না, নায়েব কাকা বাবার কোনপ্রকার অনিষ্ট চিন্তা করতেই পারেন না। কেউ বললেও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আবেগে উত্তেজনায় সুবিতার কষ্টস্বরটা কাঁপছিল।

আপনি বাস্ত হবেন না সুবিতা দেবী। চিন্মুখ আশ্বাস-ভরা কষ্টে কিরীটী বলে, বসন্তবাবু দোষী কি নির্দোষী সে বিচার করতে যাওয়া এখন হয়ত আমাদের কারো পক্ষেই বিবেচনার কাজ হবে না, আইনের জোর দেখিয়ে যে লক্ষ্যুক্তি ওষ্ঠকে ধরে নিয়ে গেলেন সেটার মীমাংসার অবশ্য অন্য পথও ছিল। একেবারে সটান হাজতে নিয়ে গিয়ে না পুরলেও চলতো।

কিন্তু কারণটা কি মিঃ রায়? প্রশ্ন করলো এবারে সত্যজিৎ।

বসন্তবাবু তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন যে রাতে মত্যুঝয়বাবু নিহত হন সেদিন সকালের দিকেই নাকি একটা মহাল পরিদর্শনে গিয়ে ফিরেছিলেন তিনি ঐদিন রাত দুটোর পরে। কিন্তু—

কিন্তু—

কিন্তু আদপেই তিনি ঐদিন কোন মহালে যাননি। নিজের ঘরেই ছিলেন। কথাটা বললে কিরীটী।

সে কি!

হ্যাঁ, তবে দারোগবাবুও সে-কথা জানতেন না এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত। তিনি মানে আমাদের দারোগবাবু ওষ্ঠকে পীড়াপীড়ি করিছিলেন জানবার জন্য ক্রোন্ মহাল পরিদর্শনে উনি গিয়েছিলেন, কিন্তু বসন্তবাবু সেকথা বলতে রাজী নন। পরে অবশ্য আমার কথায় ব্যাপারটা যেন আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু আপনার কথাই কি সত্তা মিঃ রায়? কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে পুনর্টা করলে এবারে সুবিতা।

হ্যাঁ সুবিতা দেবী।

সে কথা আপনি জানলেন কি করে মিঃ রায়?

কানাইয়ের মার মুখে—

ঘরের মধ্যে যেন বঙ্গপাত হলো।

কানাইয়ের মার মুখে? প্রশ্ন করলে সত্যজিৎ।

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনার সঙ্গে তার কথা হলো কথন? আবার সত্যজিৎ প্রশ্ন করে।

যে রাত্রে সে নিরুদ্ধিষ্টা হয়, মানে পরশু রাত্রে শুতে যাবার আগে সিঁড়িতে কানাইয়ের মার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে এনে করেকটা প্রশ্ন করি। তখনই ওই কথাটা নায়েব সম্পর্কে জানতে পারি। প্রথমটায় সে বলতে রাজী হয়নি, পরে চাপ দিয়ে কথার মারপাঁচে ফেলে সত্য কথাটা বের করে নিরোচিলাম।

তবে কি সত্যই কানাইয়ের মা ঝুর—, সর্বিতার দিকে তাঁকয়ে বললে, বাবার মৃত্যুর আসল ঘটনাটা জানত নাকি?

না।

ক্ষমা করবেন মিঃ রায়, কানাইয়ের মার অর্তার্কর্তে পরশু রাত্রে নিরুদ্ধিষ্টা হ্বার ব্যাপারটা আপনাকে যেন নাড়া দিতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে তার evidenceগুলোও অন্ততঃ বিশেষ ভাববার ছিল না কি?

নিশ্চয়ই। তাতে কোন ভুল নেই সত্যজিৎবাবু। তবে এই ব্যাপারে কানাইয়ের মা ষষ্ঠটকু part play করতে পারতো, she already played it এবং তার নিকট হতে ষষ্ঠটকু information আমাদের পাওয়ার ছিল আমরা পেয়েও গিয়েছি, তাই বর্তমানে সে অবাস্তৱ। হত্যাকারী তাকে spot থেকে সরিয়ে ফেলে খুব বৃদ্ধিমানের কাজ করেছে বলে তো আমার মনে হয় না! বরং সে একটু দোরাই করে ফেলেছে আমার মতে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভুল সে কি করেছে জানেন? শেষ পর্যন্ত এই কানাইয়ের মার ব্যাপারে তৎপর হতে গিয়েই। বেচারা ব্যবহারে পারেনি, হঠাৎ আচমকা এই case-এর evidence কতকগুলো নষ্ট করবার ইচ্ছায় কানাইয়ের মাকে না সরালে তার কাছে পেঁচবার একটা নির্দিষ্ট পথ আমরা পেয়ে যাবো। তবে এইটকুই বলতে পারি সত্যজিৎবাবু, কানাইয়ের মাকে হত্যা সে করেনি আর সেই কারণেই আমি কানাইয়ের মার নিরুদ্ধেশ হওয়া সম্পর্কে খুব বেশী আকর্ষিত হইনি।

কিন্তু কি করে আপনার ধারণা হলো যে কানাইয়ের মাকে সত্য সত্যই হত্যা করা হয়নি?

যুক্তি দিয়ে এখন আপনাকে আমি বলতে পারছি না সত্যজিৎবাবু, তবে বলতে পারেন এটা আমার মনের একটা intuition, আমার মনের অন্তর্ভুতই আমাকে তাই বলছে।

কিন্তু নায়েব কাকা সম্পর্কে কি করা যায় কিরীটীবাবু? এতক্ষণে সর্বিতা কথা বললে।

একটু আগেই তো আপনাকে আমি বললাম সর্বিতা দেবী, লক্ষ্মীকান্তবাবু, কতকটা জিদের বশেই বসন্তবাবুকে arrest করে নিয়ে গেলেন। আমি হলে arrest করতাম না। শেষের কথাটা কিরীটী যেন কতকটা অস্পষ্ট কষ্টে আস্তগতভাবেই উচ্চারণ করল।

সর্বিতা বা সত্যজিৎ দ্বন্দ্বের একজনও কিরীটীর কথার শেষটকু তার উচ্চারণের অস্পষ্টতার দরুন শব্দন্তে পায়নি, তাই সর্বিতাই প্রশ্ন করে, আঁ, কি বললেন মিঃ রায়?

না, ও কিছু না।

কিন্তু সে শাই হোক, যেমন করেই পারেন বস্তত কাকাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আপনাকে আসতেই হবে মিঃ রায়।

দেখি।

না, দেখি নয় মিঃ রায়, মনে হয় একমাত্র হয়ত দারোগাবু, আপনার কথাই শুনলেও শুনতে পারেন। বলবেন না হয়, ওর জন্য জামিন হতে হলে আমিই হব। যা টাকার জামিন চান উনি, প্রস্তুত আছি।

কিরীটী সর্বতার মুখের দিকে তাকাল, বুবলাম, কিন্তু দারোগা সাহেব arrest করেই নিয়ে গেছেন। Arrest একবার কাউকে এইভাবে করবার পর, বিশেষ করে খনের সন্দেহে, এখন জিলার ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া তো আর কেউই তাঁকে জামিন দেবার অধিকারী নন। তাহলে আপনাকে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই গিয়ে প্রার্থনা জানাতে হয়।

সত্যজিৎ এতক্ষণ চপ করেই ছিল, এবারে সে মুখ খুললে, যিথে কেন ব্যক্ত হচ্ছে সর্বতা। ওর উপরে আমরা যখন সব কিছুতে নির্ভর করছি, যা ভাল বোবেন উনি করবেন।

কি বলছো তৃষ্ণ জিত! জান না উনি আমাদের কতখানি! বাবা যে ওঁকে কতখানি দেন্দ ও বিশ্বাস করতেন আর কেউ তা না জানলেও আমি তো জানি। আর উনিও বাবাকে ঘেরন শুর্খি করতেন তেমনই ভালবাসতেন।

সর্বতার কথাটা শেষ হল না, ঘরের বাইরে চাঁচাতোর শব্দ শোনা গেল না অথচ নিয়ানন্দ সান্যাল ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর চোখেমুখে উল্লেগের একটা কালো ছায়া যেন ঘনিষ্ঠে আছে। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, এই যে তোমরা সব দের্খাছ এই ঘরেই আছো, এত সকালে দারোগাবুই বা এসে-ছিলেন কেন আর টম্টম করে বস্ততই বা অত তাড়াতাড়ি কোথায় গেল?

নিয়ানন্দ সান্যালের প্রশ্নে সর্বতার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, রূপ্ত-কণ্ঠে সে-ই জবাব দিল, নায়েব কাকাকে দারোগা লক্ষ্যনির্ধারণ arrest করে নিয়ে গেলেন।

Arrest করে নিয়ে গেলেন? বস্ততকে? মানে—, বিস্তৃত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সান্যাল।

বাবার হত্যার ব্যাপারে—, কথাটা সর্বতা শেষ করতে পারল না।

দয়াময়! প্রভু! বস্তত শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে—, উহঁ, না—না! তা হতে পারে না—নিঃশব্দে আপন মনেই মাথা দোলাতে লাগলেন সান্যাল, বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন! বস্তত কিনা ম্যাজিস্ট্রেটকে—

কিরীটী আর দাঁড়ায় না, একসময় নিঃশব্দেই পাশ কাটিয়ে ঘর হতে বের হয়ে আসে।

কিরীটীকে ঘর ত্যাগ করে যেতে দেখে সান্যাল সর্বতাকে সম্বোধন করে বলেন, উহঁ, এ তো ভাল কথা নয় মা সর্ব! এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন।

আমিও তাই কিরীটীবাবুকে একটু আগে বলছিলাম।

কিরীটীবাবু তো চলে গেলেন দেখছি। তা উনি কি বললেন?

এখন ওঁকে জামিনে খালাস করতে হলেও নাকি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমাদের যেতে হবে।

বেশ তো। সত্যজিৎবাবু, তুমই না হয় একটিবার তাহলে আজ সপরৈ
চলে যাও—আমি চিঠি দিয়ে দেবো থন। কিন্তু তা যেন হলো, এদিকে এদিক-
কার জমিদারীর ব্যাপারই বা কে সব দেখাশোনা করবে? কাছারীতে গিয়েও
তো একজনের বসা দরকার? সাক্ষেপন সার্টিফিকেট উইলের প্রোবেট এসবও
তো কিছু এখনও নেওয়া হয়নি!

কাকাবাবু, ফিরে না আসা পর্যন্ত কাছারী বন্ধই থাক মাঘাবাবু!—সর্বিতা
জবাব দিল।

পাগলী মেয়ে! তাই কি হয় রে! এত বড় জমিদারী, এত বড় ব্যবসা।
মাথার উপরে একজন শক্ত হাতে লাগাম না ধরে থাকলে কর্মচারীরা চূর্ণ-
ডাকাতি করেই যে সব দ্বিদিনে ফাঁক করে দেবে।

তাহলে কাকাবাবু, যত্নিদিন না ফিরে আসেন আপনিই না হয় সব দেখা-
শোনা করুন মাঘাবাবু।

না, না—মা। এই বন্ধ বয়সে ওসবের মধ্যে আর আমাকে জড়িয়ে ফেলবে
কেন মা!

কিন্তু মাঘাবাবু, আপনি ছাড়া এসব আর তাহলে দেখবেই বা কে? আমি
তো ওসবের কিছুই জানি না, বৰ্বৰও না!

তাই তো! তুম যে আমাকে বড় বিপদে ফেললে মা! অগত্যা—চোখের
উপরে আমি বৈচে থাকতে হেমের একটিমাত্র সন্তানের সব ভেসে যাবে তা তো
আর দেখতে পারবো না। যাই তাহলে, আমিই না হয় কাছারীতে যাই। তার-
পরই উচ্চকষ্টে হাঁক দিলেন, বনমালী! এই বনমালী!

ডাক শুনে বনমালী এসে হাজির হল। সে বোধ হয় ঘরের আশপাশেই
কোথাও ছিল।

আমায় ডাকছিলেন মাঘাবাবু?

হ্যাঁ, এই যে বাবা বনমালী! যাও তো বাবা, টম্টম্টাকে জুততে বল
তো! কাছারী যেতে হবে।

টম্টম্ট তো নায়েবজী নিয়ে বাইরে গেছেন, এখনও ফেরেননি।

ও হ্যাঁ। দেখেছো কি ভুলো মন আমার! সত্যাই তো, টম্টম্টা তো
বসন্ত ভাস্তাই নিয়ে গেছেন—তা ঘোড়া আছে তো?

তা আছে।

তা ঘোড়াতেই জিন করিয়ে আনতে বলগে।

যে আজ্ঞে!

বনমালী চলে গেল। সান্যালও বোধ হয় কাছারিতে থাবার জন্য প্রস্তুত
হতেই চলে গেলেন।

ঘরের মধ্যে কেবল সর্বিতা ও সত্যজিৎ।

সর্বিতা? সত্যজিৎ ডাকে।

বল? সত্যজিতের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল সর্বিতা।

মনে হচ্ছে আজকের ব্যাপারে তুম যেন অত্যন্ত নাৰ্ভাস হয়ে পড়েছো?

কালকের ও আজকের ব্যাপারে আমার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা
আশঙ্কা জাগছে জিৎ। আমার সত্য বলছি কেমন যেন ভয়-ভয় করছে।

কিন্তু এখন তো ব্যবতে পারছো সর্বিতা, তোমার বাবার মতুর ব্যাপারে
সত্যাই প্রকাণ্ড একটা বড়ফন্দ হয়েছিল, কৃষে কৃষে এখন সব একটু একটু করে

জানা যাচ্ছে অনুসন্ধান করতে গিয়ে।

সাবিতা সত্যজিতের ঘৰ্ণনাও যেমন করতে পারে না তেমনও
সম্পর্কে কোন কথাও যেন বলবার স্পৃহা পর্যন্ত বোধ করে না।

কি শালিতাই ছিল তাদের এই বাপ ও মেয়ের সংসারে। হঠাৎ বড়ো
হাওয়ার আবির্ভাব কেন? কেন এ কালো মেঘ?

সত্যাই জিৎ, আমার কি মনে হচ্ছে জান? এই বাড়ি-ঘর দুয়ার সমস্ত
সম্পত্তি ফেলে রেখে কলকাতার হস্টেলেই আবার ফিরে যাই।

তাতেই এই সংকটকে কি তুমি এড়াতে পারবে সাব?

কিন্তু এখানকার হাওয়াই যেন কেমন বিষয়ে উঠেছে। আমার যেন দমবন্ধ
হয়ে আসছে।

আর কটা দিন অপেক্ষা করো, কিরণীটীবাবু তোমার বাবার হত্যা-রহস্যের
একটা মীমাংসা করতে পারেন ভালো, নচেৎ আমি তো—

সত্য কথা বলতে কি তোমায় জিৎ, তাতেও যেন আর আমার খুব বেশী
উৎসাহ বা রূচি নেই।

সে কি! এ তুমি কি বলছো সাব?

হ্যাঁ। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, বিশেষ করে মায়ের মৃত্যুর ব্যাপারটা
জানবার পর থেকে, বাবার ও মৃত্যুর ব্যাপারে কোথায় যেন একটা পারিবারিক
জটিলতাই জড়িয়ে আছে, যেটা এতদিন হয়ত কালের অন্ধকারে চাপা পড়ে
গিয়েছিল সকলে ভুলেও গিয়েছিল, এখন আবার এই মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে
ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে হয়ত সেই সব অতীতের কাহিনী মাথা ঝাড়া দিয়ে
উঠবে।

ও কথাটা যে আমার মনে হয়নি তা নয় সাবিতা কিন্তু অতীতে ধরেই যদি
নিই একটা পারিবারিক কলঙ্ক থেকেই থাকে এবং সেই জন্যই শুধু
তুমি তোমার জন্মদাতা অমন স্নেহভৱ পিতার হত্যাকারীকে এর্বান করে
নিষ্কৃতি দাও তাহলে তুমই কি মনে শালিত পাবে? পারবে নিজেকে ক্ষমা
করতে কোন দিন?

কিন্তু তুমি—, সাবিতা আর নিজেকে রোধ করে রাখতে পারে না। গত
কয়েক দিন ধরে যে প্রশ্নের কাঁটাটা নির্ণত তার হস্তয়কে ক্ষতিবক্ষত করছিল,
তার মা ও বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চয়ই একটা অতীতের পারিবারিক কলঙ্ক
কোথায়ও আছে এবং সেটা একদিন যখন সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়বে
দিনের আলোর মত সেদিন তখন সত্যজিৎ কি তাকে ক্ষমা করতে
পারবে?

এত বড় শোক ও দুঃখের মধ্যেও যে সদ্যজাত প্রেম তার সমগ্র হস্তয়কে
কানায় কানায় ভারিয়ে তুলেছে, শেষ পর্যন্ত যদি তারই পারিবারিক একটা অতীত
কলঙ্কের জন্য তাকে আবার ভুলে যেতে হয়, সে ব্যথাকেই বা সে ভুলবে কেমন
করে কি সাম্প্রদায়!

সত্যজিৎ! সত্যজিৎ! না, না—তাকে আজ আর সে হারাতে পারে
না! কিন্তু পিতার প্রতি কন্যার কর্তব্য—

আজ দ্বিদিন ধরে ঐ দ্বন্দ্বেই সে অর্হনীশ পীড়িত হচ্ছে।

প্রায় পেঁনে এক ঘণ্টা পরে ঘর্মান্ত কলেবরে রূদ্ধ আক্রোশে ফ্লতে ফ্লতে লক্ষ্যীকান্ত থানায় এসে পেঁচালেন। থানার দ্বিজন চৌকিদার এসে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরল।

ঘন ঘন চাবুকের ঘায়ে জজ্ঞিরত করে ও দ্বই পা দিয়ে পেটে ক্রমাগত লাঠি মেরেও অশ্বের গতি তিনি বাড়তে পারেননি। ঘোড়াটির মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছিল। আশেপাশে চেয়ে দেখলেন লক্ষ্যীকান্ত, কিন্তু টম্টম্ বা বসন্ত সেন কাউকেই নজরে পড়ল না। ঘোড়া হতে নেমে ঘর্মান্ত কলেবরে থানার বারান্দায় এসে উঠলেন লক্ষ্যীকান্ত। সেখনেও বসন্ত সেন নেই।

থানার বারান্দায় এ. এস. আই. পাণ্ডে দ্বিজন চাষীর এজাহার নিচ্ছলেন। চাষী দুটো সান্ত্বনাসিক কঠে পাণ্ডেকে কিংবলে বোঝাবার চেষ্টা করছিল, সহসা ওদের দিকে নজর পড়ার যেন বোমার মতই ফেটে পড়লেন লক্ষ্যীকান্ত, হাজত-ঘরে নিয়ে শূরারকা বাচ্চাদের বেশ করে ঘাকতক দাও, তবেই সব স্বীকার করতে পথ পাবে। যেমন কুকুর তার তের্মান মংগুর চাই।

অকস্মাত বড়বাবুকে আক্রোশে ফেটে পড়তে দেখে বিস্মিত পাণ্ডে মুখ তুলে তাকাল তার দিকে।

চাষী দ্বিজ অপরাধী নয়, একটা চুরির ব্যাপারে থানা থেকেই সাক্ষী হিসাবে ওদের এজাহার নেওয়া হচ্ছিল। অকারণে ওদের হাজতঘরে পুরে ঠাঙ্গাবার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

নায়েব বসন্ত সেন এসেছিল পাণ্ডে? প্রশ্ন করলেন লক্ষ্যীকান্ত।

কে, নায়েববাবু! হাঁ, তিনি তো প্রায় মিনিট পলেরো আগে এসেছিলেন টম্টমে করে। একখানা জরুরী চিঠি আপনার নামে লিখে রেখে গেছেন। বলে গেলেন আপনি এলৈই আপনাকে দিতে।

কি বললে? সে চিঠি লিখে রেখে চলে গেছে? কর্কশ কঠে শুধালেন লক্ষ্যীকান্ত সহকারী পাণ্ডেকে।

হ্যাঁ—এই যে চিঠি স্যার!

বলতে বলতে একটা ভাঁজকরা চিঠি এগিয়ে দিলেন পাণ্ডে বড়বাবুর দিকে।

চিঠি! কে চায় সে বদমায়েশের চিঠি! যেন একেবারে খেঁকিয়ে উঠলেন লক্ষ্যীকান্ত, সে বেটাকে আঘি গ্রেপ্তার করেছিলাম। আর সে বেটা কিনা দিব্য তোমাকে একটা চিঠি গছিয়ে দিয়ে ভেগে গেল! আহাম্মক! গর্ভভ কোথাকার! কি করো? ঘাস খাও? যত সব অপদার্থ অকর্মার দল!

ব্যাপারটা যেন এতটুকুও বোধগম্য হয়নি এমনি হাঁ করে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে পাণ্ডে লক্ষ্যীকান্তের দিকে কিছুক্ষণ, তারপর ঢোক গিলে বলে, গ্রেপ্তার! নায়েবজাঁকে গ্রেপ্তার করেছেন স্যার?

হ্যাঁ। ঐ বেটা ঘৃঘৰই তো জরিমার ম্তুঙ্গের চৌধুরীকে হত্যা করেছে।

বলেন কি!

চিঠিটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরলেন লক্ষ্যীকান্ত !
সংক্ষিপ্ত চিঠি ।

লক্ষ্যীকান্ত,

ভয় নেই আমি পলাছি না । দুঃচার দিনের মধ্যেই আমি আবার ফিরে আসছি, বিশ্বাস করতে পারো আমার কথায় । কতকগুলো জরুরী কাজ আছে আমার হাতে, সেগুলো শেষ না করা পর্যন্ত কিছুতেই আমি নির্মিত হতে পারছি না । আমার কথায় যদি বিশ্বাস করো তাহলে আমার জাগিন আমি রইলাম । আর একটা কথা, এ নিয়ে আবার সর্বিতাদের উপর কোন হামলা করো না । কথাটা বলতে হলো এই জন্যে যে তোমার পক্ষে বিচ্ছিন্ন কিছুই নেই । বৃন্দিটা আবার তোমার একটু বেশী মাত্রায় প্রথর কিনা । সাবধান করে দিচ্ছ তোমাকে, যেন প্রমোদভবনের কারো উপরে এতটুকুও কোন জুলাম না হয়, তাহলে ফিরে এসে তোমাকে জীবন্ত রাখবো না ।

নায়েব বসন্ত সেন

আক্রোশে ইতাশায় অপরানে যেন লক্ষ্যীকান্তের সমস্ত অন্তরটা তাগুঝ-পাতের মত দাউ দাউ করে ভালছে । পর্ণিত চিঠিটা আক্রোশে হাতের মুঠোর মধ্যে দুমড়াতে দুমড়াতে রোষক্ষয়ার্থত লোচনে পাণ্ডের দিকে তারিক্যে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দিকে গেছে সে ?

মনে হল স্টেশনের দিকেই যেন গেলেন স্যার !

এই মুহূর্তে সাইকেল নিয়ে বের হয়ে পড়ুন—যেমন করে হোক তাকে গ্রেপ্তার করে আনা চাই বা তার সংবাদ আনা চাই । যান ।

যাচ্ছ স্যার ।

তাড়াতাড়ি পাণ্ডে উঠে দাঁড়ালেন ।

লক্ষ্যীকান্ত চীৎকার করে উঠলেন, সমশের—ইসমাইল !

থানার দুই জাঁদরেল ষণ্ডমার্ক সেপাই । থানার যত অপকর্ম ওদের দিয়েই করানো হয় । হত্তদন্ত হয়ে তারা বড়বাবুর ডাক শুনে ছুটে এলো, হোজুর—

ছোটবাবু স্টেশনে যাচ্ছেন সাইকেল চেপে । তোমরাও যাও । নায়েব বসন্ত সেনকে ধরে আনতে হবে ।

সমশের আর ইসমাইল ।

লক্ষ্যীকান্তের দ্বৃষ্টি ঘমদ্বত-সদ্শ সাকরেদ । এ সব ব্যাপারে এক পায়ে তো ওরা দাঁড়িয়েই আছে সর্বদা ।

সমশের ও ইসমাইল দুজনের আবার নায়েব বসন্ত সেনের উপরে রাগও ছিল ।

জর্মি সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে মাস দুই আগে ওরা একটা চাষী জোত-দারকে সায়েস্তা করতে গিয়েছিল, আচমকা পূর্বাহৈই সংবাদ পেয়ে তীরের মত ঘোড়া ছুটিয়ে নায়েব বসন্ত সেন অকুস্থানে এসে হাজির হয় ।

বসন্ত সেনের হাতে ঘোড়া হাঁকাবার সময় বিনুনী-করা চামড়ার একটা চাবুক ধরা থাকত । চাবুকটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরেই বসন্ত সেন ঘোড়া থেকে ঘর্মাঙ্গ কলেবরে লাফিয়ে ভূমিতে এসে দাঁড়াল, কি ব্যাপার সেপাই ?

চাষী জোতবার পরাগ মণ্ডল নায়েবকে দেখে কেঁদে পড়ল, দেখেন কস্তা, সেপাইদের অত্যাচারটা একবার দেখেন । গিয়ে মিথ্যে ওরা আমায় থানায় নিয়ে

যেতে চায়।

বসন্ত সেন বললেন, সেপাই, তোমরা থানায় ঘাও। আমি দারোগা সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যাবোখন। বলো সাহেবকে ওর জামিন আমি রইলাম।

সমশের আর ইসমাইল দুঃজনেই খিঁচয়ে উঠেছিল কটুকণ্ঠে, সরে ঘান নারেব মশাই। এ সব থানা-পুলিসের ব্যাপারে আপনি ঘোড়লি করতে এসেছেন কেন?

বাবের মতই অক্ষয় গজের উঠেছিলেন বসন্ত সেন, এই শুয়ারাক বাজ্জা! জানিস কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস? চাবকে একেবারে পিঠের চামড়া তোদের তুলে নেবো।

ইতিমধ্যে গোলমাল ও চেঁচামেচিতে প্রায় শ'খানেক চাষী সেখানে চার-পাশে এসে ভিড় করেছে। লোহার মত কঠিন শস্তি দেহের বাঁধুন তাদের।

রাগে গজাতে গজাতে সমশের আর ইসমাইলকে থানায় ফিরে আসতে হয়েছিল।

সেয়াত্তায় অবশ্য থানার দারোগাকে বসন্ত সেন শ'পাঁচেক টাকার নোট গঁজে দিয়ে তার রোববহু হতে প্রুণ মণ্ডলকে বাঁচিয়েছিল।

সমশের আর ইসমাইলকে দারোগা সাহেব চোখ রাঙিয়েই বলেছিল, জমিদারের এলাকায় বাস করতে হলে একটু সাধান হয়ে বুঝে-সূব্ধে কাজ করতে হয়।

কিন্তু রোপ্য চাকরির একটি ভগ্নাংশও তাদের পকেটে যায়নি, অতএব তাদের রাগটা বসন্ত সেনের উপরে প্রশংসিত হবার সুযোগ পায়নি। তারা এতদিন সুযোগের অন্বেষণেই ফিরেছে। আজ মিলেছে সুযোগ। মহা উজ্জ্বাসে তারা বসন্ত সেনের উদ্দেশ্যে অগ্রাগামী সাইকেলবাহী পান্ডের পশ্চাতে পশ্চাতেই বের হয়ে পড়তে দেরি করে না এতটুকুও।

আর ঠিক ঐ সময়ে প্রমোদভবনের মধ্যে কোথাও একটা সাইকেল পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধান করে ফিরিছিল কিরীটী।

বনমালী বললে, কাছারীর পাইক রামশরণের একটা ভাঙা সাইকেল আছে। বেচারা ঘোড়ার চড়তে জানে না বলে কর্তাবৰ্দু তাকে একটা সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন, জরুরী সংবাদ কখনো দেওয়া-নেওয়া করতে হলে রামশরণকে দ্রুত ঘাওয়া-আসার জন্য। মাস দুই হলো রামশরণ ছুঁটি নিয়ে দেশে গিয়েছে। নিচের যে ঘরে সে থাকত সে ঘরেই সাইকেলটা আছে। আনবো সেটা?

কিরীটীর আদেশে রামশরণের সাইকেলটা এনে দিল বনমালী।

কিরীটী সাইকেলটা চেপে বের হয়ে পড়ল।

বেঁরাণীর বিলটার ধার দিয়ে ব্যতদ্দৃত বাঁধানো সড়ক ছিল চালিয়ে শেষে কঁচা রাস্তায় এসে পড়ল কিরীটী। কঁচা সড়কে গত দুদিনের ব্রিটির ফলে কাদা জমে আছে। কোনমতে তার মধ্যে দিয়েই সাইকেল চালিয়ে সন্তর্পণে এগুতে লাগল কিরীটী।

বেঁরাণীর বিলের দাঁকিণ দিক ওটা। জনহীন, মানবের বস্তি বড় একটা নেই এদিকে। বেশীর ভাগই জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে কেবল দু'একটা চালাঘৰ এদিকটার চোখে পড়ে।

এই জঙ্গলই অস্পষ্ট রেখায় গত সম্ম্যান নির্দলকানন হতে দেখা গিয়ে-

ছিল। মাথার উপরে বৈশাখের জ্বলন্ত সূর্য। পিপাসায় কণ্ঠতালু কাঠ হয়ে উঠেছে। কোথাও একটু তৃষ্ণার জল পাওয়া যায় কিনা এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কিরীটী।

সহসা নজরে পড়ে ছোট একটা বাড়ি। চালাঘর বললে ভুলই হবে। মেঝে ও দেওয়ালের পাকা গাঁথুনির উপরে খড়ের ছার্টন। আশেপাশের খানিকটা স্থানও পরিচ্ছন্ন। তবে সংস্কারের অভাবে ও অয়েনে জঙগলাকীণই হয়ে আছে।

এমন নির্জনে একেবারে জঙগলের প্রান্তে এমন একটা বাড়ি দেখে একটু আশচ্যই হয়ে গিয়েছিল সে।

বাড়িটায় কোন লোকজন আছে বলেও মনে হয় না।

কোথাও কোন প্রাণতরালে বসে একটা ঘৃঘৰ কৃজন করছিল।

কিরীটী সাইকেল হতে নেমে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল। সহসা এমন সময় বাড়ির পশ্চাত্ত দিক হতে একটি প্রোঢ় বাড়ির সামনে এসে কিরীটীকে অদ্বৰ্দ্ধে সাইকেলটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

লোকটার সাজ-পোশাকে ও চেহারায় এ দেশীয় বলে মনে হয় না।

উচ্চ লম্বা চেহারা। মৃখে সাদা-পাকা চাপদাঢ়ি, মাথায় পার্গাড়ি রঙিন কাপড়ের। পরিধানে রাজপুতদের ধরনের পায়জামা, গায়ে একটা রঙিন পাতলা পাঞ্জাবি, পায়ে নাগরা।

মনে হয় লোকটা কোন রাজপুত-বংশীয়ই হবে।

কিরীটী হাতের ইশারায় লোকটিকে ডাকল।

প্রোঢ় ক্ষণকাল ইত্ততঃ করে বোধ হয় কি ভাবলে, তারপর ধীরে মৃথৰ পায়ে নাগরা জুতোর মচমচ শব্দ তুলে কিরীটীর সামনে এগিয়ে এল এবং অত্যন্ত রুক্ষ দ্রষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, কেয়া? কেয়া মাংতেছে আপ ইধার?

নমস্তে জী, আপকো দেখনেসে মাল্য হোতা হ্যায় কি আপ ইধার বাঙালকা আদমী নেই হো।

বেশখ বাবুজী, ম্যায় রাজপুত হঁ। বৃন্দের কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়ে আসে।

রাজপুত! বিস্মিত কিরীটী প্রশ্ন করে, আপ্ রাজপুতনাকে রহনেওয়ালে?

হ্যাঁ। রাজপুতনার এক গাঁয়ে আমার বাড়ি।

এখানে কর্তাদিন আপনি আছেন? আপনার নাম কি?

আমার নাম সুরয়মল সিং, জাতিতে আমরা রাজপুত চৌহান। মাস দেড়েক হলো এখানে এসেছি। কিন্তু কেন বলুন তো?

না, এমনি জিজ্ঞাসা করলাম।

সুরয়মল অতঃপর চুপ করেই থাকে।

এখানে কোন কাজ ছিল বুঝি আপনার সিংজী? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

কিরীটীর প্রশ্নে সুরয়মল একটু যেন থমকে গিয়ে ইত্ততঃ করে, তারপর গুদ্ধ হাস্যের সঙ্গে মোলায়েম কণ্ঠে জবাব দেয়, কাজ না থাকলে কি সাধ করে নিজের মূল্যক ছেড়ে এত দ্র দেশে কেউ আসে বাবুজী! তা বাবুজী, আপনাকে তো এদিকে কথনও দেখিন!

না, আমিও মাত্র কয়েকদিন হল এবিকে এসেছি, এখানকার লোক আমি নই। জায়গাটা ঘূরে ঘূরে দেখছিলাম। বড় পিপাসা পেয়ে গেল, হঠাৎ এই বাড়িটা চোখে পড়ায়—

পিপাসা লেগেছে বাবুজী আপনার, দাঁড়ান,— পরক্ষণেই ঘূরে দাঁড়িয়ে স্বরূষমল চীৎকার করে ডাকল, আরে এ চন্দ্রা, চন্দ্রা বিটো হো ?

মিহি মেয়েলী কষ্টে জবাব এল, যাই—

লোটামে থোড়া পানি আউর থোড়ি মিঠাই তো লাও বিটো—

না না, মিঠাই নয় স্বরূষমলজী, শুধু পানি। কিরীটী প্রতিবাদ জানায়।

এ কি কোন একটা বাত হলো বাবুজী। মেহমান্ আপনি আমার কুটীরে। প্রৌঢ় হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

অপ্রুব !

মৃহৃত্তে যেন কিরীটীর দৃষ্টি চোখের তারা বিস্ময়ে একেবারে স্তৰ্য হয়ে ধায়।

কিরীটী সম্ভুত্তের দিকে তাকিয়েছিল।

কোন একটি শালত রাগিণী যেন মৃত্তময়ী হয়ে নিঃশব্দে সঙ্গীতের মত চারিদিক মর্মায়িত করে এগিয়ে আসছে। কি অপ্রুব সৃষ্টাম দেহবঞ্জরী। চপলা চপলা।

একটু লম্বাটে ধরনের মৃথখানি।

হাতের মৃঠিতে মধ্যে যেন ধরা যায় সরু কঠিদেশ। পেলব সুকোমল দৃষ্টি বাহু।

পরিধানে র্যাদও রাস্তি পশমের ঘাসবা ও আঁটসাট কাঁচুলি, তথাপি যেন প্রস্ফুটিত কমলের মতই সৌন্দর্য চলচল করছে কমনীয়তায় মাধুর্যে। এক হাতে লোটা ও আর এক হাতে রেকাবিতে দৃষ্টো নাড়ু নিয়ে এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল তরুণী।

হরিগের মত সরল দৃষ্টি চোখের চাউনি তুলে তাকাল তরুণী।

চোখের নিচে কাজলের সূক্ষ্ম কালো রেখা। মাথার চুলে বেণী সংবন্ধ।

খালি পা দৃষ্টিতে অলঙ্করণ চিহ্ন।

এই আমার নাতনী চন্দ্রলেখা বাবুজী। আমার ভাইয়ের বিটো বিটো।

ওর মা ?

ওর মা ! আমাদের বিটো প্রৌঢ়ের চোখের কোল দৃষ্টি ছলছল করে এল।

অনুমানেই বুরতে পারে কিরীটী, প্রৌঢ়ের মেয়েটি আর ইহজগতে নেই।

কিরীটী চন্দ্রলেখার প্রসারিত হাত হতে মিষ্টির পাত্র ও লোটাটা নিল। নাড়ু ঠিক নয়, লাঙ্গু। এবং ওদের দেশীয় প্রথায়ই তৈরী। কোনমতে একটা লাঙ্গু গলাধঃকরণ করে কিরীটী এক লোটা পানিই ঢকচক করে পান করে নিল।

চন্দ্রলেখা কিরীটীর হাত হতে লোটা আর পাত্রটি নেবার জন্য এবার এগিয়ে আসতেই কিরীটীর স্মৃতির প্রভায় একটা বিদ্যুৎচমক খেলে যায় যেন।

অবিকল ঠিক এর্মান না হলেও এই মৃথখানিরই আদলটা যেন ওর চেনা।

তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে একবার তাকাল কিরীটী চন্দ্রলেখার মুখের

প্রাতি।

কোথায় কবে যেন অমানি একখানি মুখ সে দেখেছে। কিন্তু কোথায়! মিষ্টির পাত্র ও লোটাটা কিরীটীর হাত থেকে নিয়ে চলে গেল চন্দ্রলেখা অন্দরের দিকে।

কিরীটী তাকিয়ে থাকে মেয়েটির ক্রমঅপর্যাপ্ত দেহের দিকে।

কি দেখছেন বাবুজী?

কিরীটী ঘৃদ্ধ হেসে প্রোঢ় সূর্যমলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, আপনার নাতনীর ঠিক রাজরাণীর মতই রূপ সিংজী!

রাজরাণী! সবই ওর কপালের লিখন—, প্রোঢ় সূর্যমলের বৃক্ষখানা কাঁপিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন বের হয়ে আসে।

কথাগুলো অস্পষ্ট আত্মগতভাবে উচ্চারণ করেছিল সূর্যমল। কিরীটী সঠিক বুঝতে পারে না।

কিন্তু বললে না তো সিংজী, এ দেশে কেন তুমি এসেছো?

ঐ যে বল্লাম বাবুজী, ভাগোর লিখন! ভাগ্যই টেনে এনেছেন আমাদের এই দেশে—নইলে—, কথাটা সূর্যমল আর শেষ করে না। হঠাত যেন কথার মোড়টা ফিরিয়ে দিয়ে সূর্যমল বলে, এই ধূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেন বাবুজী, চল ওপাশের আমবাগানের বিলের ধারে চমৎকার একটা জায়গা আছে।

চল।—

সাতাই অপূর্ব জায়গাটা।

নির্বিড় আত্মকানন। সম্মুখেই দিগন্তপ্রসারী বিলের জল। বৌরাণীর বিল।

চিপ্পহরের খর স্বর্ণালোকে বিলের বৃক্ষে ঘন্থর বায়ুর তাড়নে জেগে-ওঠা ক্ষণ্ড ক্ষণ্ড টেঙ্গুলো যেন হীরার কুচির মতই জৰুরজৰুল করছে।

পত্রান্তরাল হতে একটা হারিয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে এবং মধ্যে মধ্যে শিশু দিয়ে উঠছে একটা বৃলবৃলি।

কিরীটী ভাবছিল এমন নির্বিলি জায়গাটিতে এমন একখানা বাঁড়ি কে তৈরী করল!

প্রশ্নটা সূর্যমলকে জিজ্ঞাসা না করে পারে না সে।

লোকালয়ের বাইরে এই নির্জন জায়গায় এই বাঁড়িটার খেঁজ তোমাকে কে দিল সিংজী?

যে বাবুজী আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন তিনি এই বাঁড়িতে এনে তুলেছেন আমাদের।

বাবুজী! কি নাম তার?

উহঁ বাবু, শুধাবেন না দয়া করে। ঐ কথাটি বললে বেইমানি করা হবে।
প্রতিজ্ঞাবন্ধ আমি—

হ্যাঁ?

কিরীটী মনের মধ্যে একটা জাল বুনে চলে।

একটা কাহিনীর ছিমসংগ্ৰহ। কিছুতেই এ কয়দিন ধরে যার কোন হাদিসই সে মনের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিল না, সেই ছিম স্তুর্তিই যেন সহসা মনের মধ্যে এসে উৎকিবৰ্ণক দিচ্ছে।

চিন্তার জাল নীহারিকার মত এখনও দ্রুত ঘূর্ণ্যমান আকারহীন। অস্পষ্ট
থেঁ়াটে।

তাছাড়া বাবুজীর বোধ হয় ইচ্ছাও ছিল না কারো সঙ্গে এ দেশে আর্য
আলাপ-পরিচয় করি বা কথা বলি। কিন্তু দেড় মাস একটা লোকের মৃত্যু
দেখি না। এই প্রথম এখানে বাইরের লোক তোমার সঙ্গে আর্য কথা
বলছি—

তোমার খাওয়াদাওয়া, বাজার-হাট করতে হয় না?

না। বাবুজীর লোক হস্তায় দুদিন করে সব পেঁচে দিয়ে যায়।

প্রৌঢ় স্মৃত্যমল ও তার অপূর্ব সুন্দরী তরুণী নাতনীর এখানে বাস করা
হতে সব কিছুই যেন একটা ঘন রহস্যের জালে ঘেরা।

কিন্তু অদৃশ্য পরিচয় দানে অনিচ্ছক সর্ব ব্যাপারে সদা সতক প্রৌঢ়-
বাণিত বাবুজীটি কে?

কি সম্পর্ক সেই বাবুজীর এই প্রৌঢ় রাজপুত ও তার তরুণী সুন্দরী
নাতনীটির সঙ্গে? কেনই বা সে এদের সুদূর রাজপুতানা হতে এই নির্জন
স্থানটিতে এনে লুকিয়ে রেখেছে? কি উদ্দেশ্যে?

কথায় বোঝা গেল, প্রৌঢ়ের নিকট হতে তার বাবুজীর কোন সংবাদই
পাওয়া যাবে না। কিন্তু সংগ্রহ করতে হবে সংবাদটি।

কেন হঠাত দেড় মাস যাবৎকাল রাজপুতানা হতে ঐ প্রৌঢ় স্মৃত্যমল সিং
ও তার তরুণী নাতনী চৰ্দুলেখা বৌরাণীর বিলের দক্ষিণ প্রান্তে এই নির্জন
কুটিরে বাসা বেঁধেছে?

বিলের অপর প্রান্তে প্রমোদভবনের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই তো?

এ বাড়িটা কার জনো সিংজী? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

না বাবুজী।

কিরীটী থখন প্রমোদভবনে এসে পেঁচল সূর্য তখন ঠিক মধ্যাগগনে।
তত্ত্বাবের মত সমস্ত আকাশটা প্রথর তাপে যেন গনগন করছে। প্রচণ্ড-
অগ্ন্যাত্মক যেন মাথার উপরে আকাশ হতে বরে পড়ছে।

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সর্বতা ও কল্যাণী। কল্যাণীর হাতের মধ্যে
ধরা একটা চিঠির কাগজ। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে নীল কোর্তা গায়ে কুলী
শ্রেণীর একটা লোক। লোকটা বোধ হয় স্টেশনের কুলীই হবে।

সাইকেলটা বারান্দার এক পাশে হেলান দিয়ে দাঢ়ি করিয়ে রেখে বারান্দার
উপরে উঠে এলো কিরীটী।

সর্বতার সমস্ত মুখ্যথানা যেন উদ্বেগে থম্থম্থ করছে। কল্যাণীর চোখ-
মুখেও চিন্তার ছায়া।

ব্যাপার কি মিস্ সান্যাল? কিরীটীই ওদের দিকে অগ্রসর হতে হতে
প্রশ্ন করে সর্বপ্রথমে।

এই দেখুন—, কল্যাণী হাতের কাগজটা কিরীটীর সামনে এঙ্গয়ে দেয়।

কি এটা? কাগজটা কিরীটী তার কোত্তহলী দৃষ্টির সামনে তুলে ধরল।
চিঠি। সংক্ষিপ্ত চিঠি একখানা।

লিখেছেন নায়েব বসন্ত সেন।

কোত্তহলভরেই চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে কিরীটী।

সুচরিতাস্ত মা সৰিতা,

কয়েকটা বিষয়ে জরুরী কাজে একান্ত বাধ্য হইয়াই আমাকে কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাইতে হইতেছে। এবং সেই কারণেই আপাততঃ লক্ষ্যুক্তি দারোগার কথা অগ্রহ্য করিয়া যাইতে হইল। তুমি কোনো প চিন্তা করিও না। পার তো এবং সর্বাদিকে ঘৃঙ্গল চাও তো কিরীটীবাবুকে বিদায় দিও তাহার যথাযোগ্য প্রাপ্য মিটাইয়া। ব্যক্তি চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তোমার কাকাবাবুর এই অনুরোধটি রাখিও মা। এটা আমার একান্ত অনুরোধ। তোমার পিতাঠাকুর আজ মৃত। সেই মৃতাঞ্চার প্রতি ষদি তোমার এতটুকুও সম্মান, শ্রদ্ধা বা কর্তব্য থাকে তাহা হইলে তাহার মত্যুরহস্যের অনুসন্ধানের ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হও। লক্ষ্যুক্তি দারোগাকেও প্রত্যক্ষ পত্র দিয়া গেলাম। টম্টম্টা স্টেশন-মাস্টারমশাইরের জিম্মায় রাখিল, সেটা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবে।

চিরআশৰ্বাদিক তোমার নায়েব কাকা

বসন্ত সেন

কিরীটীই কুলীটার দিকে চেয়ে বললে, তুই যা। মাস্টারবাবুকে বলিস গাড়িটা বিকেলে লোক গিয়ে নিয়ে আসবে। বলতে বলতে পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে কিরীটী লোকটাকে বকশিশ দিল।

কুলীটা হাসিমুখে সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

বসন্তবাবু এভাবে চলে গেলেন, এটা কি ভাল হলো মিঃ রায়? কথাটা বললে কল্যাণী।

বিশেষ কোন কারণেই তাঁকে যেতে হয়েছে, চিঠিতেই তো তিনি জানিয়েছেন কল্যাণী। এ ব্যাপারে এত চিন্তার কি আছে?

কিন্তু লক্ষ্যুক্তি দারোগা!

কল্যাণীর মুখের কথা শেষ হল না দেখা গেল ঝড়ের বেগে ধূলো উড়িয়ে এক অশ্বারোহী প্রমোদশুম্বণের দিকে আসছে।

দ্রুতধারামান অশ্বের লৌহক্ষের খট্ খট্ শব্দ ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে।

কিরীটী সৰিতা ও কল্যাণী তিনজনেই সোৎসুক অনুসন্ধিঃস্ত দ্রঃঘিতে অশ্বারোহীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

কে অশ্বারোহী!

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

ক্রমে অশ্বারোহী স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং তাকে চেনাও গেল।

ঝড়ের গতিতেই অশ্বারোহী সোজা একেবারে প্রমোদভবনের গেটের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে অভ্যন্তর দক্ষ অশ্বচালকের মতই ঘূর্হ্র্ত্তে অশ্বের বলগা টেনে এক লহমায় যেন অশ্বের সমস্ত গতিকে রোধ করে জিনের পা-দানে পা দিয়ে নিচে নেমে দাঁড়ালেন।

অশ্বের সর্বাঙ্গ ঘর্ষাঙ্গ ও মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে।

অশ্বারোহীও ঘর্ষাঙ্গকলেবর। ব্যক্তি বয়সে পরিশ্রমে তখনও তিনি হঁপাচ্ছেন। নিত্যানন্দ সান্যাল।

নিত্যানন্দ সান্যাল হাঁপাতে হাঁপাতে বারান্দায় এসে উঠে দাঁড়ালেন।

সর্ব মা তুমি আছ, কিরীটীবাবু, আপনি আছেন—ব্যাপার বড় সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত ভায়া থানায় ধরা না দিয়ে গা-চাকা দিয়েছেন। দারোগা তো একেবারে অগ্রিম। কাছারীতে কাজ করছিলাম, একেবারে মারমুর্দিতে গিয়ে হাজির—

সংবাদ আমরাও পেয়েছি। ধীরকষ্টে কেবল কিরীটী কথাগুলো বলে।

পেয়েছেন? শুনেছেন সব?

হ্যাঁ, বস্তুবাবু, সর্বিতা দেবীকেও স্টেশন থেকে একটা চিঠি দিয়েছেন সব ব্যাপার জানিয়ে।

চিঠি?

হ্যাঁ, এই দেখুন। কিরীটী চিঠিটা সান্যালের হাতে তুলে দিল।

রূপ্ত্ব নিঃশ্বাসে সান্যাল চিঠিটা পড়লেন।

কিন্তু বুঝতে পারছি না এরকম আহাম্মকের মত কাজ গুরুত্বের মত একজন স্থির বিবেচক লোক করতে গেলেন কেন? পূর্ণিম তো এসব কথা বিশ্বাস করবে না, আর লক্ষ্মীকান্ত দারোগা অত্যন্ত জ্যন্য চারিত্রের লোক, সে তো কোনোভাবেই বিশ্বাস করবে না।

কেন?

এই সাধারণ সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না মিঃ রায়। পূর্ণিম বিশ্বাস করবেন না এ ব্যাপারে আমদের কোন হাত বা ঘোগসাজস নেই। তাদের ধারণা আমরাই বস্তুত ভায়াকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছি। সে কোথাও যায়নি।

কিন্তু বাবা, লক্ষ্মীকান্ত দারোগাকেও নায়েবমশায় আলাদা চিঠি দিয়ে গিয়েছেন, লিখেছেন—, কথাটা বললে কল্যাণী।

চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে—পূর্ণিমের জাতও এম্বিন, ওসব চিঠির কথা বিশ্বাস করবে মনেও স্থান দিও না। সলিঙ্গ মন ওদের—সবেতেই ওরা সন্দেহ করে। স্টেশন পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। সেখানে স্টেশন মাস্টার পর্যন্ত নাকি বলেছে কলকাতাগামী ঐ সময় একটা ট্রেন ছিল কিন্তু ট্রেনটার স্টেশনে stoppage পর্যন্ত নেই, প্রথম শ্রেণীর প্যাসেজার এবং বিশেষ জরুরী প্রয়োজন বলিয়ে স্টেশন মাস্টারকে দিয়ে আগের জ্যন্যে ফোন করিয়ে গাড়ি থামিয়ে সেই গাড়িতে নাকি বস্তুত সেন চলে গেছেন। লক্ষ্মীকান্ত সাহা স্টেশন মাস্টারের কথা পর্যন্ত বিশ্বাস করেনি, ছাটে ঐখান থেকেই কাছারীতে গিয়ে হাজির হয়েছে। কাছারীতে সব ঘর ত্বরিত করে খুঁজেছে, প্রত্যেকটি লোককে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে।

হ্ৰস্ব। তাহলে দারোগা সাহেবের ধারণা বস্তুবাবুর কলকাতায় ধাওয়ার জ্যন্য ট্রেনে চাপাটাও চোখে ধূলো দেবার জ্যন্যই? কথাটা যেন আবার বলে কল্যাণী।

তা না হলে আর বলাছি কি! এখানেও সে আসবে না ভাব! এলো বলে!

তা সেজন্য এত চিন্তারই বা কি আছে সান্যালমশাই। আসুন না তিনি।
স্বর্ণকে এসে দেখেই যান না হয়। মনের মধ্যে সন্দেহ একটা পৃষ্ঠে রাখার
চাইতে সন্দেহটা মিটিয়ে নেওয়াই তো ভাল। জবাব দেয় কিরীটী মৃদু হাস্য-
তরল কঢ়ে।

এদিকে আরো একটা মুক্তিল হয়ে গিয়েছে যে মা সর্বিতা! এবাবে
সান্যাল এতক্ষণ নির্বাক স্থান্ধূর মত দণ্ডায়মান সর্বিতার দিকে তাকিয়ে বললেন,
কাছারীতে গিয়ে আর্মি সব কাজকর্ম দেখতে যাওয়ায় নানা প্রশ্ন সব শুনুন হল।
বাধ্য হয়েই কতকটা তাই আমাকে প্রকাশ করতে হল, বসন্তকে থানায় প্রেস্প্রার
করে নিয়ে গিয়েছে। যেই না ওই কথা আমার মুখ থেকে শোনা, সঙ্গে সঙ্গে
অর্থন চারিদিক থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনুন হয়ে গেল। কেন, কি ব্রহ্মত,
সাত-সতের। দয়াময় এ বৃন্ধ বয়সে কি যে ঝামেলার মধ্যে এনে আমাকে
ফেললেন! জীবনে মিথ্যার আশ্রয় আজ পর্যন্ত নির্হান্ব। মিথ্যা বলি কি করে!
বাধ্য হয়েই সব খুলে বলতে হল। আর কি বলবো, শুনুন হয়ে গেল কর্মচারীদের
মধ্যে যত কল্পনা আর জল্পনা। নানা ধরনের প্রশ্ন, মিথ্যা কথা তো বলতে
পারবো না, পালিয়ে এলাম। কি করি এখন বল তো মা?

সপ্রশ্ন দ্রুতিতে তাকালেন সান্যাল সর্বিতার মুখের দিকে।

সর্বিতার কানে কিন্তু সান্যালের অত বড় দীর্ঘ বক্তৃতার কিছুই প্রবেশ
করেনি।

সে তখন হতে বসন্ত সেনের প্রত্যটা পাওয়া অবধি পতনমধ্যে বসন্ত সেন
লিখিত কথাগুলোই ভাবছিল। মনের মধ্যে তার তোলপাড় করে ফিরছিল চিঠিটা
কথাগুলোই।

কিরীটীকে চলে যাবার জন্য অনুরোধ জানাতে বিশেষ করে লিখেছেন
বসন্ত কাকা। লিখেছেন তিনি, সেই মৃতাঘার প্রতি র্যাদ তার এতটুকু সম্মান,
শ্রদ্ধা বা কর্তব্য থাকে তাহলে যেন তাঁর (পিতার) মৃত্যু-রহস্যের অন্তস্থানের
ব্যাপার হতে সে নিবৃত্ত হয়। কয়েকদিন ধরে তার মনের মধ্যে যে একটা
সন্দেহের বিশ্রী কাঁটা খচখচ করছে, তারপর পারিবারিক ইতিহাসে কোথায়
যেন একটা জটিলতা জড়িয়ে আছে—সেটা স্বভাবতই একদিন সকলে ভুলে
গিয়েছিল, অতীতের অল্পকারে চাপা পড়ে গিয়েছিল, এইভাবে খৈচাখৈচ করতে
গেলে হয়ত অতীতের সেই বিস্মৃতপ্রায় জটিল কাহিনী দিনের আলোয় প্রকাশ
হয়ে পড়বে। কেঁচো খুঁড়ুত গিয়ে হয়ত গোখ্রো সাপ ফণ তুলে বের হয়ে
আসবে—হানবে মৃত্যু ছোবল।

তবে কি সে কিরীটীকে বিদায় দেবে?

কিন্তু কেমন করে? কেমন করে এখন সে বলবে কিরীটীবাবুকে যে
আপনি ফিরে যান মিঃ রায়?

কিন্তু কিরীটীবাবু এখন ফিরে গেলেই কি সব চাপা যাবে? সবাই সব
কথা যাবে ভুলে? না, তা আর তো হবে না। কেউ কোনাদিন ভুলবে না,
ভুলতে পারে না। মুখে না বললেও ইঁজিতে হাবেভাবে প্রকাশ করবে। প্রকাশ
না হলেও আড়ালে মুখ টিপে হাসাহাস করবে, তার চাইতে সত্য যা প্রকাশ
হোক। সংশয়ের এ পৌড়ন থেকে মৃত্যু হোক। সাতাই র্যাদ পারিবারিক কোনও
কলঙ্ক তাদের থেকেই থাকে জানুক সকলে। ধর্মী জর্মিদারদের বংশে অমন
কত কলঙ্ক থাকে। অপমানের ভয়ে লজ্জার ভয়ে আজ তাকে এড়িয়ে গেলেই

তা থেকে মৃষ্টি মিলবে না। পাপের, অন্যায়ের প্রায়শিক্ত যে করতেই হবে পূর্ব-পূরুষদের পরবর্তী বংশধরদের। হ্যাঁ, যদি কোন পাপ থেকেই থাকে তার পিতার, কল্যাসে তার প্রায়শিক্ত করবে। ভয় পাবে না সে। সতাকে সে অস্বীকার করবে না। বংশের কোন অজ্ঞাত পাপ যদি তাকে সংশ্রে করেই থাকে, ফলভোগ তাকে করতে হবে বৈকি। কিন্তু সত্তাজিৎ, সত্ত্যজিৎকে যদি হারাতে হয়? হারাতে হয় হারাবে। সত্যের জন্য কর্তব্যের জন্য দিতে যদি হয়ই, যদি হয়ই আবশ্যিক, দেবে সে তার প্রেমকে বালিদান। কঠিন প্রতিজ্ঞায় সবিতা নিজেকে দৃঢ় করে তোলে। এবং এতক্ষণে কতকটা যেন সন্তুষ্ট হয়ে স্বাভাবিক দৃঢ়ত্বে সান্যালের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত কষ্টে প্রশ্ন করে, কি বলছিলেন মামাবাবু?

বলছিলাম বসন্তের গ্রেন্ডারের ব্যাপারে কাছারী ও অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে বিশ্রী একটা সন্দেহ জেগেছে। মন্দুকষ্টে বললেন সান্যাল।

সেটা তো খুব স্বাভাবিক মামাবাবু। এ ধরনের ব্যাপারে ওরকম একটি-আধুনিক গোলমাল হৈচে হয়েই থাকে। এজন্য বিচালিত হলে তো আমাদের চলবে না। কালকে আপনার সঙ্গে আমিও একদার কাছারী ও অফিসে যাবো।

তুম? তুম যাবে? না, না—তার কোন প্রয়োজন হবে না। শক্ত হতে আমিও জানি। আমি দ্রেখিছিলাম কেবল আজ ব্যাটদের দৌড়। বিকেলের দিকে গিয়ে সব ঠিক করে দিচ্ছি। মন্দুক্তে নিত্যানন্দের কথার ধাঁচ পর্যন্ত পাল্টে গেল। কঠের স্বর গেল বদলে।

ইতিমধ্যে সকলের পশ্চাতে সন্তোষ চৌধুরী যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে এবং ওদের সকল আলাপ-আলোচনাও শুনেছে ধৈর্যের সঙ্গে নিঃশব্দে, ওরা কেউ টেরই পায় নি, এমন কি ওর উপস্থিতিটা পর্যন্ত। এতক্ষণে সন্তোষ চৌধুরী কথা বললে, সবিতা, তোমার যদি আপন্তি না থাকে—তুম যদি আমার সম্পর্কটা স্বীকার করে নিতে বিধা না করো—

উপস্থিত সকলেই বস্তা সন্তোষ চৌধুরীর দিকে ফিরে তাকাল। সন্তোষ চৌধুরীর কথা তখনও শেষ হয় নি, সে বল্লাইল, আমিও নায়েব ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত থেকে সব দেখাশোনা করতে পারি।

না, না—তোমার মানে আপনার এখন এসব ব্যাপারে না যাওয়াই ভাল সন্তোষব্যবাবু। প্রতিবাদটা জানালেন নিত্যানন্দ সান্যাল।

কেন? ক্ষতি কি তাতে? ভ্রুকুটি-কুটিল দৃঢ়ত্বে তাকায় সন্তোষ চৌধুরী সান্যালের দিকে।

ব্রুলেন না এটা? এখনও তো এ বাড়ির সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ওতে করে আরো হয়ত ব্যাপারটা জটিল হয়েই উঠবে।

আমি এই বাড়িরই ছেলে। এখন আমিই বলতে গেলে সর্বিতার সব চাইতে নিকটতম আভীয়—ঝামেলার কোন কথাই তো এতে উঠতে পারে না।

আহা, আপনি ঠিক ব্রুহেন না! আপনি কি বলেন মিঃ রায়?

বস্তবের শেষাংশটুকু সান্যাল পাশ্বেই দণ্ডায়মান কিরীটীর দিকে ফিরে তাকিয়ে শেষ করলেন।

আপনাদের ঘরোয়া পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে আমার মতামত দেওয়াটা ঠিক শোভন হবে না সান্যাল মশাই। মন্দুকষ্টে কিরীটী জবাব দেয়।

কারোরই কিছু করতে হবে না মামাবাবু। নায়েব কাকা ফিরে না আসা

পর্যন্ত—স্বতান্ত্র না সব গোলমাল মেটে, দেখাশোনা সব আঁইছি, হ্যাঁ—আমিই করবো। দ্রুত সতজ কঢ়ে সরিবতা বলে।

তুমি দেখবে! পাগলী! এসব ব্যবসা জমিদারীর ব্যাপার কি তুমি ব্যববে? কিছু তোমায় ভাবতে হবে না মা। আমি যথন এসে উপস্থিত হয়েছি—

না মামাবাবু, আপনাকে আর কষ্ট দেব না। বুড়ো মানুষ আপনি, কটা দিন এখানে থাকলেই মনে বল-ভরসা পাবে। যা দেখবার আজ থেকে আমি দেখবো। বলে উচ্চকঢ়ে হাঁক দিল, বনমালী—বনমালী!

সরিবতার ডাকে সাড়া দিয়ে বনমালী এসে হাজির হল, আমাকে ডাক-ছিলেন দিদিমুণি?

হ্যাঁ, লছমনকে স্টেশনে পাঠিয়ে দে, ট্র্যাম্টা নিয়ে আসুক। বিকেলে আমি কাছারীতে থাবো—

বনমালী চলে গেল।

এবার সরিবতা কিরীটীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, মিঃ রায়, দয়া করে যদি আপনি এখন আমার ঘরে একবার আসেন উপরে। আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা ছিল।

আর নিবিতীয় বাক্যব্যয় না করে অতঙ্গের দ্রুত সংবত পদবিক্ষেপে রাজেন্দ্রণীর মতই অন্দরের দিকে এগিয়ে গেল। সকলে বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে অপলক দ্রুঁঁটিতে তাকিয়ে রাইল সরিবতার গমনপথের দিকে।

আড়চোখে এবার তাকাল কিরীটী সান্যালের মুখের দিকে, প্রশান্ত মুখ-মণ্ডল প্রসন্ন হাসিতে ঘেন ঝলমল করছে।

কোথায়ও মুখের মধ্যে এতটুকু বিরাগ বা আঙ্কোশের চিহ্নাত্মক নেই। কিরীটী অগ্রসর হলো ভিতরে থাবার জন্য।

প্রভু! তোমার লীলা দয়াময়। মা কল্যাণী, উপাসনার একটু আয়োজন করে দেবে চল তো মা জননী! নিরাকার পরম শুক্র কোন্ পথে ষে কখন আমাদের চালিত করে' নিয়ে ঘাচ্ছেন তা তিনিই জানেন। শুক্র কৃপাহি কেবলম্।

নিত্যানন্দ ভিতরের দিকে পা বাড়ালেন।

কল্যাণী অনুসরণ করল পিতাকে।

কেবল স্তৰ্য নির্বাক সন্তোষ একাকী পাথরের অত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রাইল।

সরিবতা তার নিজের ঘরে একটা আরাম-কেদারার উপরে হেলান দিয়ে অধীশায়িত ভাবে চোখ বুজে নিঃশব্দে পড়েছিল, কিরীটীর পদশব্দ দোরগোড়া পর্যন্ত এলেও তার শ্রবণেন্দুয়ে প্রবেশ করল না। টের পায় না সে।

কিরীটী মৃদুকঢ়ে ডাকল, সরিবতা দেবী!

চোখ মেলে তাকাল সরিবতা, মিঃ মিঃ রায়, আসুন ভিতরে আসুন—, বলতে বলতে সরিবতা কেদারাটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কিরীটী ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করতেই সরিবতা ভিতর থেকে ঘরের দরজাটায় খিল তুলে বন্ধ করে দিল।

বসুন মিঃ রায়।

দ্রুজনেই উপবেশন করে মুখোমুখি দুটো কেদারায়।

କିଛୁକୁଣ ସତସ୍ତା ।

କିରୀଟୀ ପକେଟ ହତେ ଏକଟା ସିଗାର ବେର କରେ ଅର୍ମିସଂଯୋଗ କରଲ ।

ନାୟେବ କାକାର ଚିଠିଟା ପଡ଼ିଲେନ ତୋ ମିଃ ରାଯ় ?

କିରୀଟୀ ସବିତାର ମୁଖେର ପ୍ରାତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ବଲଲେ, ହଁ । ଶୁଧି ଚିଠିତେଇ
ଆପନାକେ ବସନ୍ତବାବୁ ଆମାକେ ଏ ବ୍ୟାପରେ ନିଯ୍ୟନ୍ତ୍ର କରତେ ବଲେନାନ୍, ଆଜ
ମକାଳେ ସାବାର ସମୟ ନିଜେଓ ଆମାକେ ଅନୁରୋଧ ଜାନିରୋଛିଲେନ ଫିରେ ସାବାର
ଜନ୍ୟ ।

ହଁ । ଆପନି—ଆପନି ତାତେ କି ଜାବାର ଦିଯ଼େଛେ ?

ବଲେଇ ଆପନି ଆମାକେ ନିଯ୍ୟନ୍ତ୍ର କରେଛେନ, ଆପନି ବଲେଇ ଆମି ଚଲେ ଯେତେ
ପାର । ଏଥିନ ଆମାର ଥାକ୍ରା ନା-ଥାକ୍ରା ଅବଶ୍ୟ ଆପନାର ଉପରେଇ ନିର୍ଭର କରଛେ ।
ତା ଆପନି କି ବଲେନ ?

ଆମି !

ହଁ ।

ଶୁନ୍ଦିନ ମିଃ ରାଯି, ଯତ ବଡ଼ ଦ୍ୱାଃଥ ଓ ଲଙ୍ଜାର ବ୍ୟାପାରଇ ହୋକ ନା କେନ, ଏଇ
ଶେଷ ଆମି ଦେଖତେ ଚାଇ । ଆମି ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଜ୍ଞ ।

ବେଶ ।

କିନ୍ତୁ ଏକଟା କଥା ମିଃ ରାଯି—

ବଲ୍ଲନ ?

ସତ୍ୟଇ କି ଆପନି ମନେ କରେନ ଏ ରହ୍ୟ ଆପନି ଉନ୍ଧାଟନ କରତେ
ପାରବେନ ?

ଆମି ଆପନାର ଏଥାନେ ଏସେଇ ଦିନ ପାଂଚେକ ମାତ୍ର । ଆର ପାଂଚଟା ଦିନ ଆମାକେ
ସମୟ ଦିନ ସବିତା ଦେବୀ ।

ଆର ପାଂଚ ଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ? ବିଷ୍ମିତା ସବିତା ତାକାଳ କିରୀଟୀର ମୁଖେର
ପ୍ରାତି ।

ହଁ । ପାଂଚଦିନ ବଲୀଛି, ହୟତ ତା ନାଓ ଲାଗତେ ପାରେ । ତବେ ତାର ବେଶୀ
ପ୍ରୋଜନ ହବେ ବଲେ ମନେ ହୟ ନା । ଭାଲ କଥା, ସତ୍ୟଜିତବାବୁକେ ଦେଖିଛି ନା
ସେ ?

ସଦରେ ତିନି ମ୍ୟାଜିଲ୍‌ଟେର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ ଗିଯ଼େଛେ ।

ଆପନାର ଏକଟୁ ଆଗେକାର ଦୃଢ଼ତାଯି ଆମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହରେଇ ସତିବା
ଦେବୀ । ଏବଂ ଆପନି ଜାନେନ ନା, ଅଜ୍ଞାତେଇ ଶମ୍ପଣ୍ଡଭାବେ ଆପନି ସମ୍ମତ
ପରିସିଦ୍ଧିତରଇ ଏକଟା ଆକର୍ଷମକ ମୋଡ ସ୍ମରିଯେ ଦିଯ଼େଛେ । ତାରପର କତକଟା ଯେଣ
ଅନ୍ଧକୁ ଆସଗତଭାବେ ବଲେ, I wanted this ! I wanted—now I am to
see and wait !

କି ବଲେନ ?

ନା, କିଛି ନା । ଆଜ୍ଞା ଆମି ନିଚେ ସାଇଁ । କିରୀଟୀ ସରେର ଦରଜା ଥିଲେ
ବାଇରେ ଚଲେ ଗେଲ । ଏବଂ ସିଂଡି ଦିଯେ ନାମତେ ନାମତେ ଅନ୍ଧକୁଟଭାବେଇ ପ୍ରବେର ମତ
ବଲତେ ଥାକେ, I hear the foot-steps ! ଆସବେ—ଏବାରେ ମେ ଆସବେ ।

ସ୍ଵପ୍ନୋଧରେ ମତଇ ଯେଣ ଅକଷ୍ମାଂ କିରୀଟୀର ସମସ୍ତ ଚେତନା, ଅନ୍ଧଭୂତ
ମଜାଗ ହୟେ ଉଠିତେ ଶୁରୁ କରେଛେ । ଚିନ୍ତାର ସନ କୁଳ୍ବଟିକା-ଜାଳ ଏକଟୁ ଏକଟୁ
କରେ ମଣ୍ଡିର ଆଲୋକସମ୍ପାତେ ଦ୍ରାରୀତ୍ତ ହତେ ଶୁରୁ କରେଛେ ।

আর দোর নেই।

রাণি কত হবে? হাত-ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল কিরীটী, পোনে
এগারটা।

অত্যন্ত ক্ষিপ্তস্থে কিরীটী সুইমিং-ক্ষিটউটটা পরে নিয়ে তার উপরে
ধূতিটা মালকেঁচা দিয়ে পরিধান করে নিল।

মাথায় এঁটে নিয়েছে সাঁতার দেবার একটা কালো রঙের রবারের তৈরি
সুইমিং ক্যাপ। পায়ে রবার-স্ব-।

ঘরের আলেটা কর্ময়ে দিয়ে নিঃশব্দে কক্ষ হতে বের হয়ে এলো কিরীটী
দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে।

সত্যাজিৎ সদর হতে ফেরে নি। ঘরের মধ্যে সে তাই একাই ছিল।

এর মধ্যেই সমগ্র প্রমোদভবন যেন ঘূমের নিঃসীম অভ্যন্তরে তালিয়ে গিয়েছে।
পা টিপে টিপে সিঁড়ি-পথ অতিক্রম করে ভিতরের আঁঙ্গনা পার হয়ে পূর্ব-
দিনের ঘরের মধ্যেকার সেই পথ দিয়েই নন্দনকাননে যাবার পথে এসে দাঁড়াল
কিরীটী।

মাথার উপরে রাণির আকাশে শুক্রাহ্নযোদশীর চাঁদ। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে
অদৃশে নন্দনকানন, দিগন্তপ্রসারী বৌরাণীর বিল কেমন যেন স্বপ্ন-বিহুল।

দ্রুতপদে কিরীটী নন্দনকাননে এসে পেঁচল। পূর্বদিনের সেই স্থানটি
চিনে নিতে কিরীটীর কষ্ট হয় না। তারপর ধীরে ধীরে জলের মধ্যে গিয়ে
নামল।

গ্রীষ্মের রাত, বেশ গরম বোধ হচ্ছিল, বিলের শীতল জলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে
শরীর যেন জ্বরিয়ে গেল। কিরীটী সম্ভুখিদিকে দৃষ্টি রেখে দ্রুত হস্ত-সঞ্চালনে
জল কেটে সাঁতরে চলল।

ক্ষীণ চন্দ্রাকরণস্নাত বিলের জলে সাঁতরাতে কিরীটীর মনের
মধ্যে কেমন যেন নেশা জাগে। মনে পড়ে বাঞ্ছিমের চন্দেশখরের প্রতাপ ও
শৈরালীর চন্দ্রালোকিত রাণ্ডে গঙ্গার বুকে সাঁতার দেবার কথা।

কিরীটী এগিয়ে চলে।

স্বপ্নের চাইতেও বর্তমানে যে চিন্তা তাকে এই রাণ্ডে বৌরাণীর বিলের
জলে এনে ফেলেছে, এই অস্পষ্ট দ্রুবর্তী অল্পকার বৃক্ষ-সমাকুল তটরেখা—সেই
দিকে লক্ষ্য রেখে কিরীটী সাঁতরে চলে আরও স্বিগুণ উৎসাহে।

অনেকটা পথ চলে এসেছে কিরীটী।

সহসা তার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল অস্পষ্ট ক্ষীণ সঙ্গীতের সুরে।
উৎকর্ণ হয়ে ওঠে কিরীটী সন্তরণ দিতে দিতেই। জলের মধ্যে গানের সুর!
হ্যাঁ, সতি; কে যেন গান গাইছে অল্প দূরে কোথাও। গানের সুরকে অনুসরণ
করে কিরীটী আরও খানিকটা দ্রুত নিঃশব্দে সাঁতরিয়ে এগিয়ে যায়।

ক্রমে স্পষ্ট—আরো স্পষ্ট শোনা যায় এবার গানের সুরলহুরী।

কি মধুর! কিবা অপরূপ কণ্ঠ! চন্দ্রালোকিত এই নিশ্চীথ রাণি যেন
বৈগাবাদন করছে। গানের সুর-মুর্ছনায় যেন আকাশ বাতাস দিগন্ত প্লাবিত
হয়ে যাচ্ছে।

আরো কিছুটা অগ্রসর হবার পর সহসা এতক্ষণে কিরীটীর নজরে পড়ে
তাঁরের সাম্মকটে একটি ছোট ভাসমান নৌকা জলের মধ্যে। ভাসমান সেই
নৌকার উপরে বসেই ধীরে ধীরে বৈঠা দিয়ে জল কাটতে কাটতে আপন মনে

সম্বৃত্তিরা হয়ে কে যেন গান গেয়ে চলেছে।

আরো একটু এগিয়ে গেল কিরীটী সন্তর্পণে।

চন্দ্রালোকে এবারে গায়িকা নৌকার উপরে উপবিষ্ট চন্দ্রলেখাকে চিনতে কিরীটীর কষ্ট হয় না।

গায়ে একটা পাতলা জরির ওড়না চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। বক্ষের দ্বিপাশ দিয়ে ঝুলছে পাকানো মত দ্বিটি বেণী।

আশ্চর্যই হয়ে যায় কিরীটী এত রাত্রে নৌকায় বসে চন্দ্রলেখাকে গান গাইতে শুনে।

কে জানে ওর দাদু হয়ত ঘূর্মিয়ে পড়েছে! সেই ফাঁকে চন্দ্রা নৌকা নিয়ে বিলের জলে ভেসে পড়েছে এই রাত্রে।

কি একটা উর্দু গান গাইছে চন্দ্রা। গানের ভাষা না বুঝলেও ভারি মিণ্ট কিন্তু লাগে কিরীটীর গানের ভাব।

কিরীটী এবারে একটু অধিকার দেখে তীরের এক অংশে সাঁতরে গিয়ে ওঠে এবং উঠে ভিজে কষ্টিউমটা গা হতে খুলে ধূর্তনা পরে নিল।

চন্দ্রা তথনও আপন মনে গান গাইছে। কিরীটী আলোছায়া-খচিত পথ দিয়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল।

দিনের বেলায় আজ যখন প্রোট সূর্যমলের সঙ্গে এই দিকে এসেছিল তখনুন বেশ ভাল করে চারিদিক দেখে রেখেছিল। বাড়ির পশ্চাত্তাগে পেঁচাতে তার কষ্ট হয় না।

এদিককার দরজাটা ভেজানো ছিল মাত্র। বোধ হয় চন্দ্রলেখাই ভেজিয়ে রেখে গিয়েছে।

সন্তর্পণে ভেজানো দরজাটা ঠেলে ফাঁক করে কিরীটী ভিতরে প্রবেশ করল, সামনেই অপশম্পত একটি আঁগনা।

অস্তগামী চন্দ্রালোকে চারিদিক তৈক্ষ্য দ্বিটিতে একব্যার দেখে নেয় কিরীটী।

ঘরের প্লিন্ট মাটি হতে প্রায় হাতখানেক উঁচু। তারপরেই একটা বারান্দা মত। বারান্দার উপরে এসে উঠলো কিরীটী।

পর পর তিনটি ঘর। দ্বিটি ঘরের দরজার তলা ঝুলছে। একখানা ঘরের স্ট্যান্ডঅ্যান্ড স্বারপথে আসছে মদ্দু আলোর একটুখানি আভাস।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল কিরীটী প্রথমেই সেই কক্ষের দিকে।

আলগোছে পায়ের বৃক্ষাঙ্গুল্তের উপরে ভর করে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়েই ঘরের মধ্যে উর্ক দিল। ঘরের এক কোণে দেওয়াল ঘেঁষে মাটির প্রদীপাধারের উপরে একটি মৎপদাদীপ জুলছে হিট্টাইট করে।

পদাদীপের সেই ক্ষীণালোকেই তৈক্ষ্য অনুসন্ধানী দ্বিটিতে কিরীটী কক্ষের চতুর্পার্শ দেখে নিল। শূন্য কক্ষ।

এক কোণে একটা খাটিয়ার উপরে শূন্য শব্দ্য। তারই পাশে একটা মাটির কলসী, একটা গ্লাস। দেওয়ালে পেরেকের সাহায্যে দাঢ়ি টাঁওয়ে খানকতক শাড়িকাপড় ঝোলানো।

কিরীটীর বুরতে কষ্ট হয় না এই ঘরেই শোয় চন্দ্রলেখা। এটা তারই শয়নকক্ষ নিশ্চয়ই।

এইটা যদি চন্দ্রলেখার শয়নকক্ষ হয় তো ওর দাদু সূর্যমলের ঘর

কোন্টা ? কোন্ ঘরে তাহলে স্বৰ্যমল থাকে ?

বাকী দুটো ঘর তো দেখছে ও তালাবন্ধ । তবে কি স্বৰ্যমল এই দুটো ঘরেরই কোন একটাতে থাকে ! এখন নেই, কোথায় গিয়েছে ! কিন্তু এত রাত্রে সে কোথায়ই বা যাবে বা যেতে পারে তার বয়সের তরুণী নাতনীকে একাকিনী এই নিজের জঙ্গলের মধ্যে একা বাড়িতে রেখে ?

তবে রাজপুত এরা, এদেশের লোকদের মত ভীতু তো নয় । তাছাড়া রাজপুতের মেয়ে আবারঙ্গ করতেও হয়ত জানে ।

সহসা এমন সময় অস্ফুটকাতর একটা শব্দে ও যেন বিদ্যুৎস্পষ্টের মতই থম্বকে সমস্ত ইল্লিম্বকে সজাগ করে উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে । শিকারী বিড়ালের মতই সজাগ হয়ে ওঠে ।

অস্ফুট কাতরোন্তি । স্পষ্ট ও শুনেছে ।

উৎকীর্ণ হয়ে আছে কিরীটী, অসম্ভব কিছুর একটা প্রতীক্ষায় ওর সমস্ত দেহটা যেন কঠিন ঝাঙ্ক হয়ে উঠেছে ।

আংগিনার উপরে চাঁদের আলো ম্লান হয়ে এসেছে । কোথায় অন্ধকারে একটা তক্ষক টক্ টক্ করে শব্দ করে উঠলো, নিস্তর্থ রজনী যেন কাকিয়ে উঠলো । কুৎসিত শব্দটা যেন নিস্তর্থ রজনীর বুকে একটা ভয়াবহ ইঞ্জিত দিয়ে গেল কোন আশ্চর্য অশ্রুত অমঙ্গলের । আবার শোনা গেল অস্পষ্ট কাতরোন্তি । ক্লান্ত অবসন্ন কঠের ঘন্টাকাতর শব্দ যেন । মনে হয় বৃক্ষ একটা বৃক্ষচাপা দৈর্ঘ্যবাস নিশ্চাতি রাতের স্তর্থতায় মর্মারিত হয়ে উঠেছে ।

কাতর শব্দটা আবার কানে ভেসে এলো । এবারে কিরীটীর মনে হলো যেন পাশেরই কোন ঘর থেকে শব্দটা অস্পষ্টভাবেই ভেসে আসছে ।

সতর্ক দ্রঃংতিতে তাকায় কিরীটী আধো আধো ছায়া ঘেরা বারান্দার চারদিকে ।

কোথা হতে আসছে শব্দটা শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে বোঝবার চেষ্টা করে ।

ঐ তালাবন্ধ দুটো ঘরের একটা ঘর হতে কি ? পায়ে পায়ে সন্তপ্রণে এগিয়ে যায় কিরীটী প্রথম ঘরটার দিকে ।

আবার সেই অস্পষ্ট কাতরোন্তি ।

সহসা আবার কিরীটী থম্বকে দাঁড়াল । বহুদ্রুর হতে যেন ভেসে আসছে দ্রুত ধাবমান অশ্বক্ষুরধৰন ।

খট্—খট্—খট্—খট্—

ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।

কোন অশ্বারোহী হয়ত এই দিকেই আসছে ।

ঘরের দিকে আর যাওয়া হল না । অস্পষ্ট কাতরোন্তি ক্ষণপূর্বে কোথা হতে আসছে তার আর সন্ধান করা হল না কিরীটীর । মুহূর্তে সে নিজের সংকট-গ্রাম পরিস্থিতিটা সমাক উপলব্ধ করে কর্মপূর্বক স্থির করে ফেলে । অত্যন্ত দ্রুত ক্ষিপ্রপদে কিরীটী আংগিনাটা অতিরুম করে বাঁড়িটার সম্মুখভাগে এসে দাঁড়াল । সকালবেলাতেই ঐদিন কিরীটী লক্ষ্য করেছিল একটা বড় শিমল গাছ ও তেঁতুল গাছ পাশাপাশি একটা জায়গায় বাঁড়িটার সামনে দাঁক্ষণ দিকে ধন হয়ে দাঁড়য়ে আছে ছায়া বিস্তার করে ।

কিরীটী দ্রুতপদে সেই দুটি বক্ষের আড়ালে গিয়ে আঞ্চলিক করে

দাঁড়াল।

অশ্ববৃন্দধর্ম এখন আরো স্পষ্ট ঘোনা যাচ্ছে। অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে এই দিকেই অশ্ব ছুটিয়ে আসছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অশ্বারোহী বাড়ির সামনে এসে বেগবান অশ্বের রাশ টেনে অশ্বের গাতি রোধ করল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় তীক্ষ্ণ দ্রুতিতে তাকিয়ে কিরীটী দেখল দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি অশ্ব হতে অবতরণ করল।

কিন্তু অশ্বারোহীকে চিনবার উপায় নেই। সর্বাঙ্গ একটা কালো মথ-মনের আংরাখায় আব্ত। মুখ্যবয়সেরও প্রায় সবটাই কালো একটা রুমালে ঢাকা।

অশ্বারোহী ধীর মন্থর পদে চাবুকটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরেই এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে।

দ্রুত বাল্পষ্ট পদবিক্ষেপ। চলার মধ্যে কোন সঙ্কেচ বা পিধামাত্রও যেন নেই।

স্মার্তির প্রস্তাগলো দ্রুত কিরীটী উল্টে যায়, মনে করবার চেষ্টা করে আগন্তুকের চলার ভঙ্গীটা—কোন পরিচিতজনের চলার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে কিনা।

কিরীটী কিন্তু বক্ষের আড়াল হতে বের হয়ে আসে না বা আগন্তুককে অনুসরণ করবার চেষ্টা করে না। নিচেষ্ট হয়েই অপেক্ষা করে।

সে স্পষ্ট দেখতে পেল এক সময় আগন্তুক বাড়ির মধ্যে আদৃশ্য হয়ে গেল।

বক্ষের আড়াল থেকে বের হয়ে আবার বাড়ির দিকে অগ্রসর হবে কিনা ভাবছে এমন সময় অতর্ক্তিই কিরীটী যেন চমকে ওঠে আবার পদশব্দে।

শুকনো ঝড়া পাতা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে মচ্মচ্ করে, কে যেন ধীর মন্থর পদে পশ্চাতের গাছপালার দিক থেকে হেঁটে আসছে।

চাকিতে কিরীটী আধো আলো আধো অন্ধকারে পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল। একটা অস্পষ্ট আবছা মৃত্তি এগিয়ে আসছে। পদ-ভরে তার শুকনো ঝরা পাতাগলো মচ্মচ্ শব্দে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

মৃত্তি কুম্ভে আরো এগিয়ে আসে। অস্পষ্ট আলোছায়াতেও কিরীটীর এবারে চিনতে কিন্তু কষ্ট হয় না।

স্রূরযমল সিৎ—

স্রূরযমল এগিয়ে বাড়ির মধ্যেই গিয়ে প্রবেশ করল।

কিরীটী তথাপি নিশ্চৃপ হয়ে দাঁড়িয়ে।

অপেক্ষাই করবে সে।

বোধ হয় মিনিট পনের বাদে আকাশে চাঁদের সামান্য অবশিষ্ট আলোক-টিকুও যেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

চাঁদ অস্তিমিত।

চারিদিক একটা অস্পষ্ট ধসের আবহাওয়ায় যেন রহস্যমন হয়ে উঠেছে।

হঠাতে কিরীটী সচাকিত হয়ে উঠল। প্রবের সেই আগন্তুক ও স্রূরযমল প্রায় পাশাপাশি দুজনে হাঁটিতে বাড়ির ভিতর হতে বের হয়ে এলো।

নিশ্চকষ্টে দুজনে তখনও যেন কি কথা বলছে পরম্পরের মধ্যে হিন্দী

ভাষাতেই। প্রথমটায় ওদের কারো কোন কথাই কিরীটী বুঝতে পারে না। কুমি হাঁটতে হাঁটতে ওরা দু'জনে যখন কিরীটী যেখানে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল আঘাগোপন করে তার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে, ওদের দু'একটা শব্দ খাপছাড়া অসংলগ্ন ভাবে ওর কামে এলেও সঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

এৰিগয়ে যেতে যেতে একসময় দু'জনেই কিরীটী যে গাছ দু'টোর আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল তার হাত দেড়েক তফাতে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

এবাবে ওদের কথাও স্পষ্ট শুনতে পেল কিরীটী।

সুরয়মল বলছিল, তোমাকে তো বললাম বাবুজী, আর এভাবে এখানে আমি দেশ মূলকু ছেড়ে থাকতে পারব না।

চাপা ভারী কষ্টে প্রত্যন্তের এলো, শোন সুরয়মল, তোমারই ভালুর জন্য এ ব্যবস্থা করেছি আমি।

কিন্তু—

আর বেশীদিন থাকতে হবে না। কাজ শেষ হয়ে এসেছে প্রায়।

বুট্টমুট তুমি এখানে আমাকে ধরে রেখেছ বাবুজী। এর্তাদিন তো হয়ে গেল তোমার কথায় কথায়—

সুরয়মল, ছেলেমানুষী করো না।

না বাবুজী, আর নয়। সামনের শনিবারই চলে যাবো।

পাগলা, তা হতে পারে না।

আমি যাবোই। মিথ্যেই তুমি আমাকে অনুরোধ করছো।

সুরয়মল শোন, আমার বিনা হ্রকুমে এখান হতে যদি এক পা-ও নড়, তাহলে—

বাবুজী, ভুলে যাচ্ছে সুরয়মল রাজপুতের বাচ্ছা। ও চোখরাঙানিকে থোড়াই কেয়ার করে।

ন্দিতায়ি বস্তার কষ্টস্বর সহসা এর পর যেন একেবারে খাদে নেমে এলো, এতদ্বাৰা এৰিগয়ে এসে এভাবে সব নষ্ট করো না সুরয়মল। তোমারই ভালুর জন্য বলছি আমি। আর একটা সপ্তাহ তুমি অপেক্ষা কৰ। এর্তাদিনই তো অপেক্ষা কৰলৈ।

সুরয়মল কোন প্রত্যন্তের দেয় না। চৃপ কৰেই থাকে।

কাল আবাৰ দেখা হবে। আৱ মনে থাকে যেন যা বলে গেলাম। বলতে বলতে হঠাতে থেমে গিয়ে কি যেন মনে পড়ে গিয়েছে এইভাবে জামার ভিতৰ হাত চালিয়ে একমুঠো নোট বেৰ কৰে সুরয়মলের দিকে এৰিগয়ে দিল, এই নাও, এই টাকাগুলো রাখো। আমি চললাম।

সুরয়মল হাত বাঁড়িয়ে নোটগুলো নিল।

অতঃপর আগন্তুক এৰিগয়ে অশ্বের পঞ্চে আৱোহী হয়ে নিম্নে অশ্বকে ছুটিয়ে দৃঢ়িট বাইৱে চলে গেল। দূৰ হতে বিলীয়মান অশ্বক্ষৰধৰ্মীন ভেসে আসে খট্ খট্ খট্। কুমি মিৰলয়ে যায়। সুরয়মল আৱো কিছুক্ষণ স্থাণ্ডৰ মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে একসময় বাঁড়িৰ দিকে পা বাড়াল।

পুনর্বার বিল সঁতিরে প্রমোদভবনে এসে যখন পেঁচল কিরীটী, রাত তখন প্রায় ডিনটে হবে। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর অবস্থ।

প্রমোদভবনটা মনে হচ্ছে যেন ঘুমে একেবারে পাথর হয়ে আছে।

বাতাসে ঝাউগাহের সরু সরু চিকন পাতাগুলো সৌ সৌ করুণ একটা শব্দে নিশ্চীথের স্তর্দ্ধতাকে একঘেয়ে ভাবে বিদীর্ণ করে চলেছে।

আর কোন শব্দ শোনা যায় না।

পূর্বের পথেই কিরীটী প্রমোদভবনে প্রবেশ করে আঁঙিনা অতিক্রম করে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করল।

সিঁড়ি-পথের দেওয়ালে আলোটা টিম্বটিম্ করে জরুলছে।

ঘোলাটে আলোয় সমস্ত সিঁড়ির পথটা যেন কেমন ছম্ছম্ করছে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠেছে কিরীটী, নিচের বারান্দায় যেন কার পদশব্দ পাওয়া গেল। সিঁড়ির দিকেই কেউ এগিয়ে আসছে।

মৃহূর্তে যেন কিরীটী সঁক্ষয় হয়ে ওঠে। নিঃশব্দ অথচ অত্যন্ত ক্ষিপ্তিতে বাকী সিঁড়িগুলো কতকটা লাফ দিয়ে দিয়েই অতিক্রম করে কিরীটী দেতলার বারান্দায় উঠে সোজা একেবারে নিজের ঘরের দরজাটা ঢেলে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করল। ঘরের আলোটা তেমনি কমানো, পিট্‌ পিট্‌ করে জরুলছে। শ্বয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলো পাশাপাশি দুটি শ্বয়া তার ও সত্যজিতের, দুটিই শূন্য।

কিন্তু অত ভাববারও সময় নেই কিরীটীর। চাকিতে ফঁ দিয়ে চৰ্মানির উপর ঘরের একটিমাত্র আলো নির্বাপত করে দিল সে।

নিমেষে নিশ্চন্দ্র অঁধার যেন সমস্ত কক্ষটি গ্রাস করে নিল।

কয়েকটা মৃহূর্ত নিঃশব্দ। কেবল শ্ববগেন্দ্রীয় দৃষ্টি সজাগ। উৎকর্ণ।

চোখের দ্রষ্টিতে ঘরের নিশ্চন্দ্র অল্ধকার ঝুমে সহ্য হয়ে আসে।

সতক নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে অতঙ্গের কিরীটী এগিয়ে গেল কক্ষের ভেজানো দরজাটার দিকে।

কবাট দুটো ঈষৎ ফাঁক করে বাইরের ম্দু আলোকিত বারান্দায় দ্রষ্টিপাত করলে কিরীটী। শূন্যতে ভুল করেন। পদশব্দই। কে যেন সিঁড়ি-পথে উপরেই উঠে আসছে।

পদশব্দ ঝমেই উপরের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু একজোড়া তো নয়, দুজোড়া পায়ের শব্দ যে শূন্যে কিরীটী!

আশ্চর্য! এত রাত্রে কারা উপরে আসছে?

আরো আশ্চর্য হলো কিরীটী যখন দেখলো শূন্যতে তার ভুল হয়নি—
দ্রজনই!

সত্যজিৎ ও কল্যাণী। এবং পরম্পর ওরা হাত-ধরাধরি করে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে।

কল্যাণী ও সত্যজিৎ! এত রাত্রে দ্রজনে নিচে ওরা কোথায় বিল?

সর্বিতা দেবী! সর্বিতা দেবী কোথায়?

তুমি ঠিক দেখেছ তো কল্যাণী, তাম থখন বিছানা ছেড়ে উঠে আস, সবিতা
ঘূর্মিয়েই ছিল? কল্যাণীর ঘূর্মের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে সত্যজিৎ।

হ্যাঁ। ঘূর্ম চপল হাসি কল্যাণীর ওষ্ঠপ্রাণে, নাক ডাকাচ্ছিল।

এর মধ্যে যদি সে উঠে থাকে বা ঘূর্ম ভেঙে গিয়ে থাকে?

দিন চারেক তো শুচিছ ওর সঙ্গে। গাঢ় ঘূর্ম—এক ঘূর্মে রাত কাবার
করে। কিন্তু কিরীটীবাবু—

এতক্ষণে তিনিও হয়ত নাক ডাকাচ্ছেন। চাপা হাসির সঙ্গে জবাব দেয়
সত্যজিৎ।

বারান্দার ওয়াল-কুকটা এমন সময় টং টং করে বাজতে শুরু করল।

রাত্রি চারটে।

শেষ হয়ে এলো রাত।

উঃ রাত চারটে, চাল! জ্বরিতপদে কল্যাণী তার ঘরের দিকে চলে গেল।

কিরীটীও আর মুহূর্ত মাত্র দেরি করে না। সোজা ক্ষিপ্রপদ অন্ধকারেই
গিয়ে শয়ার উপরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

চোখ বুজেই পড়ে থাকে অন্ধকারে কিরীটী কান দুটো সজাগ রেখে।
একটু পরেই ভেজানো কপাট খুলে গেল। নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল
সত্যজিৎ। ওর পায়ের শব্দেই কিরীটী টের পায়।

কিরীটী যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায়ই শয়ার শুয়ে পড়েছে।
ভাল করে জলও মৌছাবার অবকাশ পায়নি, বেশটও বদলাতে পারেনি।

সত্যজিৎ পকেট হতে টর্চ বের করে বোতাম টিপল। টর্চের আলোয় ঘরের
চারিদিক একেবার দেখে নিল। শায়িত কিরীটীর মুদ্রিত চোখের পাতায় টর্চের
তীব্র আলোর রঁশ্মাটা মুহূর্তের জন্য এসে পড়ে, কিরীটী বুরুতে পারে।

কিরীটীকে ঐ অবস্থায় শুয়ে ঘূর্মোতে দেখে সত্যজিৎ একটু অবাকই হয়।

এগিয়ে গেল সত্যজিৎ টেবিলের উপরে রাঙ্কিত আলোটা ফিরে আবার
জ্বালাবার জন্য। টেবিলের উপরেই দিয়াশলাইট ছিল।

দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালয়ে—হাত বাড়িয়ে আলো হতে চিমানিটা
খুলে হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উন্তপ্ত কাচের চিমানির স্পর্শে উঃ করে একটা
ঘন্টাগাকাতর শব্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজিতের হাত হতে চিমানিটা ঘেরেতে
পড়ে গিয়ে ঝন্বন শব্দে ভেঙে গুঁড়েয়ে থায়।

যেন হঠাতে চিমানি ভাঙাৰ শব্দেই আচম্কা ঘূর্মটা ভেঙে গিয়েছে, ধড়ফড়
করে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের দ্রিষ্ট নিয়ে কিরীটী অন্ধকারেই শয়ার উপরে
উঠে বসে প্রশ্ন করল, কে? কি হলো?

অপ্রতিভ সত্যজিৎ তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, আমি। কিরীটীবাবু, আমি।
আলো জ্বালতে গিয়ে হাত হতে হঠাতে চিমানিটা পড়ে ভেঙে গেল।

দাঁড়ান, নড়বেন না। ভাঙা কাচের টুকুজোতে পা কাটবেন। আমার একটা
ছোট হ্যারিকেন আছে, জ্বালাচ্ছ। কিরীটী শয্যা হতে নেমে ঘরের কোণে
রাঙ্কিত একপাশে তার সঙ্গে আনা ছোট দামী লণ্ঠনট তুলে নিয়ে বললে—
দিয়াশলাই আছে—দিন তো দিয়াশলাইটা!

হাত বাড়িয়ে অন্ধকারেই টেবিলের উপর থেকে দিয়াশলাইট খুঁড়ে দিল সত্যজিৎ, অল্প চেষ্টাতেই কিরীটী
আলোটা জ্বালল।

ঘরের অন্ধকার দূরীভূত ইল উজ্জ্বল আলোয়।

বাঁতটা ছোট হলেও প্রচুর আলো হয়।

হাতের বাঁতটা টোবলের উপরে নামিয়ে রেখে এতক্ষণে কিরীটী সপ্রশ্ন
দ্রষ্টিতে তাকাল সম্ভুক্ত স্থির দণ্ডায়মান সত্যজিতের দিকে।

বাইরের দেওয়ালে ওয়াল-কুকটা বাজতে শুরু করে—চং-চং-

এক দুই তিন চার পাঁচ—

বাত শেষ হয়ে এলো, এই ফিরছেন ব্যাঘি? ফিরতে এত দোরি হলো যে
সত্যজিতবাবু?

কিরীটীর প্রশ্নে বারেকের জন্য শুধু তুলে তাকাল সত্যজিৎ কিরীটীর
দিকে, কিন্তু ওর প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে টোবলের উপর হতে সিগারকেস্টা তুলে নিয়ে তা
থেকে একটা সিগার বের করে সিগারটায় অগ্নিসংযোগ করল।

জুবলুন্ত সিগারটায় গোটাকয়েক টান দিয়ে কিরীটী আবার সত্যজিতের
দিকে তাকাল।

সত্যজিৎ তখনও একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির নির্বাক।

বস্তুন সত্যজিতবাবু। আপনার সঙ্গে কয়েকটা আমার কথা আছে।

সত্যজিৎ তথাপি নির্বাক।

বস্তুন!

এবার সত্যজিৎ চেয়ারটার ওপরে উপবেশন করল।

শুনুন সত্যজিতবাবু, সর্বিতা দেবীর ব্যাপারে এখানে আমি এলেও এখানে
আমার আসবার যে যোগাযোগ সেটা আপনার দ্বারাই হয়েছে। বলতে গেলে
আপনিনই সেদিন আমাকে এখানে এনেছেন।

সত্যজিৎ কিরীটীর দিকে ঢোথ তুলে তাকাল।

এখানে আসবার পর এই কাদিনের অনুসন্ধানে—কিরীটী শুধুভাবে বলতে
লাগল, যতটুকু আমি জেনেছি বা বুঝেছি, সর্বিতা দেবীর পিতা মতৃঞ্জল
চৌধুরীর মতুর ব্যাপারটা অতীতের একটা অত্যন্ত জটিল কাহিনীর সঙ্গে
জড়িত আছে এটা স্পষ্টতই বোঝা গেছে এবং আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়
তাহলে দুঃঢার দিনের মধ্যেই আর একটা বড় রকমের দুর্ঘটনাও যে ঘটবে সে
সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। অবশ্য আমি যাতে এই অবশ্যিক্ষাবী দুর্ঘটনাটা না
ঘটে সে চেষ্টাই করাই। কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমি বর্তমানে
এসে দাঁড়িয়েছি, যে অবস্থায় সর্বিতা দেবীকে বাদ দিয়ে আমি আশা করছিলাম
অন্ততঃ আপনার সাহায্য আমি পাবই, এই জটিল রহস্যের পাক খাওয়া
স্থগনলোর—

কিরীটীর কথা শেষ হলো না, সত্যজিৎ কথা বললে, আমি তো সর্বদাই
প্রথম হতে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত মিঃ রায়।

তাই যদি হবে তাহলে গত কাদিন হতেই লক্ষ্য করছিলাম আমি, আপনি
আমাকে avoid করেই চলেছেন। এবং শুধু তাই নয়, সব কথাও আপনি
আমাকে খুলে বলছেন না!

কে বললে? যা যা এখানে এসে আমি জেনেছি সবই তো খুলে আপনাকে
আমি বলেছি।

না, বলেননি। কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা মেন হঠাতে কেমন কঠিন মনে হয়।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায় ?

ঠিকই বলছি। এই কন্দনেই আপনি যে কল্যাণী দেবীর সঙ্গে সর্বিতা দেবীর অঙ্গাতেই এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, কই এই কথাটা তো—

মিঃ রায় !

আমি ঘুমোইন—জেগেই ছিলাম সত্যজিতবাবু এতক্ষণ !

আপনি জেগে ছিলেন ?

হ্যাঁ। এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ এত রাত্রে সিঁড়িতে পদশব্দ পেয়ে কৌতুহলের বশেই এগিয়ে গিয়েছিলাম কে এত রাত্রে উপরে আসছে দেখবার জন্য। আপনাকে ও কল্যাণী দেবীকে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে হাত-ধরার্থ করে উঠে আসতে দেখে একটু বিস্মিত হয়েছিলাম ; কিন্তু সাতি; কথা বলতে কি সত্যজিতবাবু, তার চাইতেও বিস্মিত হয়েছি আমার ভুল ভেঙে যাওয়াতে।

আপনার ভুল ভেঙে যাওয়ায় ! কি ভুল ?

সর্বিতা দেবী ও আপনার মধ্যে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে বলে আমি অন্যান্য করেছিলাম, এখন দেখছি সেটা ভুল !

না, ভুল নয় কিরীটীবাবু !

ভুল নয় ? বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে কিরীটী সত্যজিতের মুখের দিকে তাকাল।

না। এবং সর্বিতা সব জানে।

সর্বিতা দেবী সব জানেন ! আপনার ও কল্যাণীর—

হ্যাঁ, সে জানে।

কি বলছেন আপনি সত্যজিতবাবু ? সব জেনেশনে সর্বিতা দেবী—

হ্যাঁ, কারণ তার ও আমার সম্পর্কটা প্রভের মতই অটুট আছে। কোন-প্রকার সন্দেহ বা গোলমাল হবার অবকাশ এখনও ঘটেন আমাদের পরস্পরের মধ্যে।

কিরীটীও যেন সত্যিই কিছুক্ষণের জন্য বিমৃঢ় হয়ে গিয়েছে। কণ্ঠে তার স্বর ফোটে না। কিছুক্ষণ সে স্তৰ্য হয়েই বসে থাকে।

সহসা বিদ্যুৎ-চমকের মত একটা কথা তার মনের মধ্যে উদয় হওয়ায় সত্যজিতের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, তাহলে সেরাতে আপনিই কি কানাইয়ের মার শোবার ঘরে—যে ঘর হতে সে নিরুদ্ধিষ্টা হয়, সেই ঘরে গিয়েছিলেন ?

এবারে সত্যজিতের চমকাবার পালা। চম্কে সে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, আপনি সে কথা জানলেন কি করে মিঃ রায় ?

সে কথা পরে হবে, তার আগে আমি জানতে চাই, তাহলে আপনি last person এ বাড়ির মধ্যে যিনি শেষবারের মত কানাইয়ের মাকে সেরাতে এ বাড়ি হতে নিরুদ্ধিষ্টা হবার প্রভে দেখেছিলেন—and not I ! But at what time ! রাত তখন ক'টা মনে আছে কি আপনার ?

কানাইয়ের মার ঘর হতে আসি রাত বোধ করি তখন পৌনে একটা হবে। গোপন না করে এবারে সত্যজিত বলে।

কিরীটী কিছুক্ষণ অতঙ্গের মিজের মনেই কি যেন চিন্তা করে এবং পরে মদ্রকণ্ঠে বলে, হ্ৰ ! তাহলে রাত একটার পর কোন এক সময়ে she was removed !

আপনার কি ধারণা মিঃ রায়, তাহলে তাকে কেউ জোর করেই—

সত্যজিতের কথা শেষ হয় না, কিরীটীই আবার পাঞ্চ প্রশ্ন করে, অবশ্যই এবং তাকে আমার ষতদ্বয় অনুমান করকৃত বাধ্য করা হয়েছিল এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য! কিন্তু আপনার কি অন্য রকম কিছু বলে মনে হয় সত্যজিৎ-বাবু? কিরীটী সপ্তম দ্রষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সত্যজিতের মুখের দিকে।

আমার মনে—, সত্যজিৎ যেন কেবল ইতস্তত করতে থাকে।

বল্দুন! বল্দুন! কি বলতে চান বল্দুন সত্যজিৎবাবু? বল্দুন সে রাখে হঠাতে কেন আপনি নিচের মহলে কানাইয়ের মার ঘরে গিয়েছিলেন? কেন? কি কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে? কিরীটীর কস্তুরে যেন একটু অনুভব, ব্যগ্রতা বরে পড়ে।

আপনার অনুমানই বোধ হয় ঠিক মিঃ রায়। আমি গিয়ে দেখি, কানাইয়ের মা already যেন যাবার জন্য তৈরি। ছোটবেল একটা পুর্টেলিতে খানকাঙেক কাপড় ও ট্র্যাকটার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেঁধে একপ্রকার প্রস্তুত হয়েই আছে—কিন্তু আপনি সেটা অনুমান করলেন কি করে, আমি তো কারো কাছেই ও-কথা বলিন। এমন কি—

এমন কি সবিতা দেবীর কাছেও বলেননি! বেশ করেছেন। আমি জানতে পেরেছি কি করে, আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন না? আপনার নিস্য নেওয়ার অভ্যাস আছে একমাত্র এ বাড়িতে, তাই না? সে নিস্য কিছু পড়ে আছে আমি ঘরের মেঝেতে পরের দিন সকালে দেখতে পেয়েছিলাম। তাছাড়াও এইদিন সকালে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার পর আপনার মুখের দিকে তাকিয়েও স্পষ্টই আমি ব্যবলায় you have something under your sleeve! কিন্তু আপনি গোপন করেছেন এবং সেটা অবশ্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ পরেই কানাইয়ের মার ঘরে গিয়ে মেঝেতে নিস্য গুঁড়ো পড়ে থাকতে দেখে। কিন্তু কেন? কেন আপনি কানাইয়ের মার সঙ্গে অত রাখে দেখা করতে গিয়েছিলেন? কিরীটী যেন আবার তার পূর্বের প্রশ্নেই ফিরে এলো।

কারণ আমি তাকে সন্দেহ করেছিলাম। আরো অনেক কিছুই এ ব্যাপারের সে জানে। এ-বাড়ির বহুদিনের পুরাতন দাসী সে—আমার ধারণা হয়েছিল নিশ্চয়ই সে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর জীবনের এমন কোন রহস্যময় গোপন ব্যাপার জানে—

ঠিক তাই। সে জানত—আপনার ধারণা নির্ভুল। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর জীবনের কোন জটিল গোপনীয় ঘটনা সে জানত এবং সেই কারণেই তাকে অন্য চলে যেতে হয়েছে।

তবে কি নায়েব বসন্ত সেনই? উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করে সত্যজিৎ।

না, বসন্ত সেন হত্যাকারী নন। তবে—

তবে?

মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর হত্যাকারীকে হয় তিনি জানেন, না হয় হত্যার কারণ তিনি জানেন।

বলেন কি! তা সত্ত্বেও তিনি সব কথা এভাবে গোপন করেছেন?

হ্যাঁ করেছেন। তারও কারণ হয়ত, আর কোন উপায় ছিল না।

তাই যদি হবে তাহলে এভাবে ধরা না দিয়ে নায়েব বসন্ত সেন mysteriously গাঢ়কা দিলেন কেন?

ঐ একই কারণেই হয়ত,—, কিরীটী আবার বলে।

কিন্তু এতে করে কি লাভ হল?

তাঁর লাভ হোক আর নাই হোক, অন্ততঃ আমার লাভ হয়েছে। গা-চকা
দিয়ে তাঁর একান্ত অবিজ্ঞান ও অজ্ঞাতেই তিনি আমাকে এই হত্যা-রহস্যের
তদন্তের ব্যাপারে কিছু সময় দিয়েছেন যেটার প্রয়োজন আমার একান্ত ভাবেই
হয়েছিল। কিন্তু আর একটা কথা সত্যাজিতবাবু—

বলুন?

আপনার ও কল্যাণী দেবী সম্পর্কে—

আজ নয়। আর একটা দিন আপনার কাছে সময় চাই মিঃ রায়। কাল—
আগামী কাল সব কথা কল্যাণী সম্পর্কে আপনাকে খুলে বলব।

হয়ত তার আর কোন প্রয়োজন হবে না। মৃদুকষ্টে কিরীটী প্রতুষ্ঠার দেয়।
কিরীটী চোরার হতে উঠে এগিয়ে গিয়ে বিলের দিককার জানলার কবাট দৃঢ়ে
আরো ভাল করে খুলে দেয়।

রাতের আকাশ অত্যন্ত প্রভাতের প্রথম আলোর স্পর্শে ক্রমে ক্রমে লালচে
হয়ে উঠছে।

ভোর হয়ে এলো।

মৃদুমন্দ রাত্রি-শেষের স্নিধি বায়ু কিরীটীর জাগরণ-ক্লান্ত চোখে একটা
বাপটা দিয়ে গেল।

সত্যাজিত এগিয়ে গিয়ে কাচের ভাঙা টুকরোগুলো এক এক করে মেঝের
উপর থেকে কুড়িয়ে একটা কাগজের উপরে তুলতে লাগল।

দিগন্তপ্রসারী বৌরাণী বিলের বুকের উপর হতে রাত্রিশেষের ঘোলাটে
পর্দাটা একটু একটু করে কে ঘেন টেনে তুলে নিছে।

অদ্বৈ নন্দনকাননে গাছপালাগুলোও ক্রমে দৃঢ়ির সামনে স্পষ্ট হয়ে
উঠছে।

ভাঙা কাচের টুকরোগুলো কাগজের মধ্যে জড়ে করে সত্যাজিত ঘরের
বাইরে চলে গেল।

থানায় গিয়ে একবার দারোগা লক্ষ্যীকান্ত সাহার সঙ্গে দেখা করা
প্রয়োজন।

কিরীটী আশা করেছিল, গত সন্ধ্যায়ই লক্ষ্যীকান্ত বসন্ত সেনের ব্যাপারে
হয়ত প্রয়োদভবনে আসবে, কিন্তু আসেন।

কিরীটী একটু ঘেন আশ্চর্ষই হয়েছে লক্ষ্যীকান্ত আসেন দেখে।

সন্তোষ চৌধুরীকে থানায় নিয়ে যাবার পর কি এমন সে লক্ষ্যীকান্তকে
বলেছে যাতে করে সেই রাত্রেই লক্ষ্যীকান্তকে বসন্ত সেনের সঙ্গে দেখা করতে
আসতে হয়েছিল?

অবশ্য লক্ষ্যীকান্ত গতকাল সকালে বলেছিল সে থানায় গেলে নাকি অনেক
interesting ব্যাপার জানতে পারত।

লক্ষ্যীকান্তের কথার কিরীটী বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়ানি এই কারণেই যে সে
অন্তমান করেছিল নিশ্চয়ই সে সব সন্তোষের কাছে শোনা কোন ঘটনা বা তার
কাছে প্রাপ্ত চিঠিপত্রের মধ্যে কোন সংবাদ পেয়েছে, যাতে করে লক্ষ্যীকান্ত
উভেজিত হয়ে এখানে ছুটে এসেছিল।

লক্ষ্যীকান্তের সঙ্গে এখন একবার দেখা করা প্রয়োজন।

প্রথম ভোরের আলো খোলা জানলাপথে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

হঠাতে কিরীটীর খেয়াল হয়, ভাঙা কাচের টুকরোগুলো ফেলবার অছিলায়
সেই যে কিছুক্ষণ প্ৰৱেশ সতীজিৎ এ ঘৰ হতে বেৰ হয়ে গেল আৱ ফিৰে
আসেন।

সহসা একটা কথা কিরীটীৰ মনে পড়ে যায়, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুৱীৰ ড্রয়াৱেৱ
মধ্যে প্ৰাপ্ত দেবনাগৰী অক্ষৱে লেখা চিঠিৰ বাণ্ডলটা।

চিঠিগুলো সব পড়া হয়ন।

ঘৰেৱ দৰজায় খিল তুলে দিয়ে কিরীটী চিঠিৰ ফিতে বাঁধা বাণ্ডলটা
সৃষ্টকেসেৱ ভিতৰ হতে ঢেনে বেৰ কৱল।

চেয়াৱে বসে চিঠিৰ বাণ্ডলটা খুলল কিরীটী।

বহুদিন আগেকাৱ লেখা। কাগজগুলো লালচে হয়ে গিয়েছে। কালিও যেন
অক্ষপংঘ হয়ে গিয়েছে।

প্ৰত্যোক্তি চিঠিৰ শব্দতে সম্বোধন কৱেছে বাবুজী বলে এবং চিঠিৰ
শেষে নাম দস্তখত কৱেছে কোন এক লক্ষ্যণ।

আটখানা চিঠি। হাতেৱ বাঁকা লেখা ও নাম দেখে বুৰতে কষ্ট হয় না
প্ৰত্যোক্তি চিঠিৰ লেখক একই ব্যক্তি এবং চিঠিগুলো দু'এক মাস তো বটেই,
কোন কোন চিঠি আবাৱ ছ মাস বা এক বৎসৱেৱ ব্যবধানে লেখা হয়েছে।

একটা চিঠিতে লেখা :

সে মৰেছে। আমিও মৰবো। কিন্তু মৰতে পাৰাছি না কেবল একজনেৱ
মৃত্যু চেয়ে। ওৱ যাহোক একটা ব্যবস্থা না কৱা পৰ্বল্লত মৰতে পাৰাছি না।
তাছাড়া চেৎ সিং, সেও তোমাকে নিষ্কৃতি দেবে না।

কে এই চেৎ সিং !

আৱ একখানা চিঠি :

চেৎ সিং তোমাকে একদিন খঁজে পাৰেই, কাৱণ আমাৱ চিহ্ন ধাৱণা চেৎ
সিং তোমাৱই খৈজে মূল্যক ছেড়েছে। চেৎ সিংয়েৱ বুকেৱ পাঁজৱা তুম ভেঙে
গুড়িয়ে দিয়েছো। হায়, কেন সেদিন তোমায় বিশ্বাস কৱেছিলাম ! লোভেৱ
উপষ্ৰূত শাস্তি আমাৱ মিলেছে।

আৱো পৱেৱ একখানা চিঠি এবং সৰ্বশেষ চিঠিই বোধ হয় :

এইবাৱ আমি নিশ্চিন্ত। চেৎ সিং আমাৱ জৰানয়েছে সে তোমাৱ সংবাদ
পেয়েছে, কিন্তু এই দুঃখ আমাৱ থেকে গেল—তোমাৱ সংবাদটা শোনা পৰ্বল্লত
আৱ হয়ত আমাৱ বাঁচা হবে না।

বৰ্ধ দৰজায় মৃদু কৱাঘাত শোনা গেল, মিঃ রায় !

কিৱীটী চমকে ওঠে, কে ?

দৱজাটা খুলন মিঃ রায়। আপনাৱ চা এনেছি।

কল্যাণীৰ গলা।

ক্ষিপ্ৰহস্তে চিঠিগুলো কোনমতে গুছিয়ে কিৱীটী বাণ্ডলটা সৃষ্টকেসেৱ
মধ্যে ভৱে ফেলে।

দৱজাটা খুলতেই দেখা গেল ধূমায়িত চায়েৱ কাপ হাতে প্ৰসূত হাস্যমুখে
দেৱেগোড়াতেই দৰ্মিয়ে কল্যাণী।

ঘৰ্মোচ্ছলেন নাৰ্কি এখনো ? প্ৰশ্ন কৱে কল্যাণী চায়েৱ কাপ হাতে ঘৰে
প্ৰবেশ কৱতে কৱতে।

না। আসন্ন, সৃপ্তভাত !

চায়ের কাপটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে কল্যাণী বলে, কাল রাত্রে আমাদের ঘরে কেউ বোধ হয় এসেছিল মিঃ রায়!

চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে কিরীটী সবেমাত্র চূম্বক দিয়েছিল, কল্যাণীর কথায় চকিতে ওর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দ্রষ্টিতে তাকাল। অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই এবং বোধ হয় বিশ্বাস করতে চাইছেন না আমার কথা?

দ্রুটোর একটাও নয় কল্যাণী দেবী। কিন্তু কিসে বুঝলেন আপনি?

কল্যাণী বোধ হয় লক্ষ্য করলে না যে কিরীটী তাকে ‘তুমি’র বদলে আবার ‘আপনি’ বলে কথা বলছে।

ঘূর্ম ভেঙেছে প্রথমে আমারই—উঠেই দোখ ঘরে কতগুলো জুতোর অঙ্গস্তুতি ছাপ—

ঘূর্ম ভেঙেছে! কতটুকু সময় তাহলে ঘূর্ময়েছিলেন?

মানে? সপ্রশ্ন দ্রষ্টিতে তাকাল কল্যাণী কিরীটীর প্রশ্নভরা দুই চোখের দিকে।

আমার চাইতে সে কথাটা কি আপনি ভাল জানেন না কল্যাণী দেবী!

কল্যাণী কিন্তু নিরুত্তর।

তার কষ্টে কোন ভাষাই যোগায় না যেন।

ঘরে তো গেলেন ভোর পাঁচটায়। ঘূর্মোবার সময় পেলেন কখন?

এবারে কিরীটী লক্ষ্য করে, কল্যাণীর সমস্ত মুখ্যথানা যেন একটা চাপা রক্ষিতাভা ধারণ করেছে।

কল্যাণী দেবী! মৃদুকষ্টে কিরীটী আবার ডাকে।

কল্যাণী তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

ঠিক এমনি সময় সর্বিতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল, মিঃ রায়!

আসন্ন সর্বিতা দেবী। স্বপ্নভাত। রাত্রে নিশ্চয়ই কাল খুব গভীর নিন্দা দিয়েছিলেন!

প্রশ্নসংচক দ্রষ্টিতে সর্বিতা তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

যাক, আপনার সৌভাগ্য বলতে হবে, গতরাত্রে আপনার কোন ক্ষতি হয়নি!

আপনি—

হ্যাঁ। এইমাত্র কল্যাণী দেবীর মুখেই শুনলাম আপনার শয়নঘরের দরজা খোলা পেয়ে সেই সুযোগে কে নার্কি আপনার শয়নঘরের অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন। এবং এও বোঝাই যাচ্ছে বিনিই গতরাত্রে আপনার শয়নঘরে প্রবেশ করে থাকুন না কেন, সুযোগের অভাবে তাঁর ঘনেরাঙ্গা পূর্ণ হয়নি।

কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না মিঃ রায়, কেউ যে গতরাত্রে কোন এক সময় আমার ঘরে প্রবেশ করেছিল সন্দেহ নেই সত্যি, কিন্তু কি করে সেটা আদৌ সম্ভব হলো? আমি ও কল্যাণী শোবার আগে, নিজে হাতে আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম ঘরের—, সর্বিতা বিহুলভাবে কথাগুলো বললে।

কিরীটী কৌতুকোজ্জবল দ্রষ্টিতে বারেকের জন্য কল্যাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে সর্বিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, বন্ধ থাকলেই বা! কারো

থ্বলতে তো সেটা কষ্ট হতে পারে না!

কিন্তু আমি বা কল্যাণী কেউই তো রাত্রে আমরা উঠিনি! সর্বিতা আবার বলে।

আপনি ওঠেননি এটা ঠিকই, কিন্তু কল্যাণী দেবী? কিরীটী প্রশ্ন করল।
ন, ফলিও ওঠেন। আমাদের দুজনের ঘূর্ম প্রায় একই সঙ্গে ভেঙেছে।
সর্বিতা জবাব দেয়।

সে প্রশ্নের মীমাংসা পরে করলেও চলবে। আগে একবার চলুন দেখ,
দেখে আসি আপনার ঘরটা। কল্যাণী দেবী বলিছিলেন আপনার শয়নঘরের
মেঝেতে নাকি কার জুতোর অস্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

আলোচনাটা যেন কতকটা ইচ্ছে করেই বল্ধ করে দিয়ে কিরীটী চেয়ার হতে
উঠে সর্বিতাকে নিয়ে অগ্রসর হল তার ঘরের দিকে।

শ্লথ শ্লথের পায়ে কল্যাণীও ওদের অনুসরণ করল।

অস্পষ্ট জুতোর ছাপই বটে।

এবং সেই পূর্বের ক্ষেপসোল দেওয়া জুতোরই ছাপ কয়েকটা ঘরের মেঝেতে
তথনও রয়েছে।

কিরীটী তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ছাপগুলো পরীক্ষা করে দেখে আর
একবার ঘরের চারপাশে চোখ ঘূরিয়ে দেখে নিল।

সর্বিতার নিম্নিত অবস্থায় যে সময়টা কল্যাণী ঘরে ছিল না এবং ঘরের
দরজা খোলা ছিল সেই স্মৃযোগেই কেউ এসেছিল এই ঘরে সুর্যনিশ্চিত।

কিন্তু কেন? কি উদ্দেশ্যে এসেছিল সে?

নিশ্চয়ই একেবারে বিনা উদ্দেশ্যে কেউ গতরাত্নে কল্যাণীর অবর্তমান ঘরে
আসেনি এবং সম্ভবতও রাত্রে ঠিক এ সময় কল্যাণী যে ঘরে থাকবে না এবং
দরজা খোলাই থাকবে তাও তো নিশ্চীথ আগন্তুক জ্ঞানত না!

কিন্তু—

পরক্ষণেই যেন কিরীটীর সমিদ্ধ মন প্রশ্নে আবর্তিত হয়ে ওঠে।

আপাগে একবার আদৃতে নিঃশব্দে দৃঢ়ায়মান কল্যাণীর ঘূর্থের দিকে না
তাকিয়ে পারে না কিরীটী।

আবার কিরীটী মেঝের উপরে জুতোর ছাপগুলোর দিকে তাকাল।

সর্বিতার পালঙ্কের একেবারে কাছ-বরাবর ষেঁবে জুতোর ছাপগুলো।

ঘরের দক্ষিণ দিক ঘেঁষে দৃঢ়ো শয্যা, একটা সর্বিতার দামী পালঙ্কের
উপরে, অন্ত হাত দ্বাই ব্যবধানে কল্যাণীর, ছোট একটা তত্ত্বপোশের উপরে।

দৃঢ়ি খাটের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় মেঝেতেই জুতোর ছাপগুলো রয়েছে।

সহসা কিরীটী সর্বিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, আপনাদের মধ্যে কে
প্রথম ঐ ছাপগুলো দেখতে পান মিস চৌধুরী?

কল্যাণী। ওই আমাকে পরে দেখায়।

দরজার বাইরে এমন সময় ভূত্যের কস্তুর শোনা গেল, দির্দিমাণ?
কে রে?

কলকাতা থেকে উকীলবাবু এসেছেন। মামাবাবু, আপনাকে একবার
এখনি নিচে ডেকে দিতে বললেন।

যান মিস চৌধুরী। বোধ হয় কলকাতা থেকে আপনাদের সৰ্লিস্টার

অতীনলাল বোস এসেছেন। কিরীটীই এবারে সর্বিত্তার দিকে তাকিয়ে বললে।

মিঃ বোস, সলিসিটার! তাঁর আসবার কথা ছিল কই—

হ্যাঁ, নারেব বসন্তবাবুই তাঁকে আসতে লিখেছিলেন আপনার বাবার উইল
সংক্রান্ত ব্যাপারেই। কিরীটী জবাব দিল।

বাবার উইলের ব্যাপারে?

হ্যাঁ। বাদিও সাধারণভাবে বিচার করে দেখতে গেলে আপনিই আপনার
পিতার যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উন্নোরাধিকারী, তাহলেও সকলের অঙ্গাতে
বাদি উইলের মধ্যে অন্য কোন বাস্থা বা এমন কোন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে
গিয়ে থাকেন যেটা জানা দরকার, সেদিক দিয়েও তো উইলের মধ্যে কি লেখা
আছে বা না আছে আপনার জানা দরকার সর্বিত্ত দেবী। ঘান নিচে ঘান।

আপনিও আস্বল মিঃ রায়!

কিন্তু আমার সেখানে থাকাটা কি উচিত হবে সর্বিত্ত দেবী? আমি তো
আপনাদের ফ্যারিলির কেউ নই, সম্পূর্ণ ত্তীয় ব্যক্তি!

তা হোক, আপনি চলুন। সত্যজিতবাবু কোথায়?

তিনি তো অনেকক্ষণ ঘর থেকে বের হয়ে এসেছেন, জানি না তো! কিরীটী
জবাব দেয়।

তুমি দেখ তো কল্যাণী, সত্যজিতবাবু কোথায়? কল্যাণীর দিকে ফিরে
তাকিয়ে সর্বিত্ত কথাটা বললে।

সকাল থেকে কই সত্যজিতের সঙ্গে তো আমার দেখাও হয়নি!

কিরীটী চাকিতে একবার কল্যাণীর মুখের প্রতি দ্রুতিপাত করে বললে,
চলুন দেখ যাক, নিচেও হয়ত তিনি থাকতে পারেন।

নিচে বাইরের ঘরেই সত্যজিতের দেখা পাওয়া গেল।

নিয়ানল্দ সান্যাল একজন সাহেবী পোশাক পরিহিত সন্ত্রী গৌরবণ্ণ
হ্যাঁত্পৃষ্ঠ মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁদের পাশেই দাঁড়িয়ে-
ছিল সত্যজিত রায়।

ওদের সকলকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে নিয়ানল্দ সান্যালই আহবান
জানালেন, এই যে সর্ব যা, এসো! ইনি অতীনলাল বোস, তোমাদের সলিসিটার।
এবং উপবিষ্ট মিঃ বোসের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, মিঃ বোস, এই
সর্বিত্ত—মতুঝেয় চোধুরীর একমাত্র মেয়ে।

নমস্কার মিস্ চোধুরী—বসুন। বসন্তবাবুরই জরুরী চিঠি পেয়ে আমি
আসাছি, কিন্তু এখানে এসে ওঁর মুখে বসন্তবাবু সম্পর্কে সব কথা শুনে তো—

বিরাস্ত ও দ্রুকুটিপূর্ণ দ্রষ্টিতে সর্বিত্ত সম্মুখৈ উপবিষ্ট নিয়ানল্দ
সান্যালের মুখের দিকে তাকাল এবং পরক্ষণেই দ্রষ্ট ফিরিয়ে নিয়ে অতীন-
লালের দিকে তাকিয়ে বললে, কি আপনি শুনেছেন নারেবকাকার সম্পর্কে মিঃ
বোস, আমি জানি না—তবে আমি বলতে পারি, ব্যাপারটা সম্পূর্ণই একটা
misunderstanding বা দারোগা লক্ষ্যীকান্তবাবুর misjudgement! যাক, সে
আলোচনা বর্তমানে আমাদের না করলেও চলবে। আর আমার ইচ্ছাও নয়
আপাতত ঐ বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করবার। আপনি বোধ হয় বাবার
উইল এনেছেন?

সর্বিত্ত অস্ত্বুত সংযত কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত কথাগুলি কিরীটীকে বিস্মিত

করে। গতকাল দ্বিপ্রহরের দিকে জৰিমদারী দেখাশোনার ব্যাপারে সর্বিতার ষে অঙ্গুত দ্রঃচ্ছা ও সংযমের পর্যাচর পেয়েছিল, আজও সর্বিতার কঢ়ে যেন ঠিক সেই সুরাটিই ধৰ্নিত হয়ে উঠেছে।

অক্ষমাং কক্ষের মধ্যে যেন একটা অপ্রয় পর্যাচিতি ঘনিয়ে ওঠে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই পরম্পরের মুখের দিকে তাকায়। কিছু-ক্ষণের জন্য একটা স্তৰ্ভূত ঘরের মধ্যে বিরাজ করে।

স্তৰ্ভূত ভঙ্গ করে সলিস্টার অতীনলালই আবার কথা বললেন, হ্যাঁ, উইলটা আমি সঙ্গেই এনেছি বসন্তবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী। পূর্বের অপ্রয় আলোচনাটা যেন কতকটা ইচ্ছা করেই সংপূর্ণ অবস্থা করে, একেবারে অন্য ধারায় বন্ধব্য শুন্ব করলেন, তা সে যাই হোক, তিনি উপস্থিত যখন নেই—ই, আপনাদের সকলের সামনে মৃত্যুর চৌধুরীর উইলটা পড়তে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু উইল পড়বার আগে সর্বিতা দেবী আপনাকে আমার একটা প্রশ্ন আছে—এবং যে প্রশ্নের উপরে উইল এখন আর পড়া না-পড়াটা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছে। অতীনলাল সর্বিতার মুখের প্রতি দ্রষ্টিপাত করলেন।

বিস্মিত জিজ্ঞাসা দ্রষ্টিতে সর্বিতা তাকায় অতীনলালের দিকে, প্রশ্ন ?

হ্যাঁ। যে শিলমোহর-করা খামটা আপনার নামে তাঁর আয়রন-সেফে ছিল সেটা খুলে আপনি আপনার বাবার শেষ চিঠিটা পড়েছেন কি ?

অতীনলালের প্রশ্নে মনে হল সর্বিতা যেন অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছে এবং বিস্ময়সম্মিল্যভূতরা কঢ়ে কোনমতে বললে, বাবার আয়রন-সেফে আমার নামে শিলমোহর করা খামের মধ্যে তাঁর শেষ চিঠি ?

হ্যাঁ, কেন পানিনি আপনি সে চিঠি ? আমার প্রতি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর শেষ নির্দেশ ছিল, যে নির্দেশ তাঁর আকস্মাক মৃত্যুর মাত্র আট দিন আগে জরুরী রেজিস্টার্ড একটা চিঠির মারফৎ পাই যে, এ চিঠি যেটা তিনি তাঁর সেফে রেখে গেলেন, আপনি খুলে না পড়া পর্যন্ত উইল যেন সর্বসমক্ষে তো নয়—আপনাকে পর্যন্তও যেন পড়ে না শোনানো হয়।

কিন্তু বাবার আয়রন-সেফ এবং যে টেবিলে বসে তিনি সাধারণতঃ লেখা-পড়া করতেন, সব আমি বসন্তকাকার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে এখানে আসবার পরাদিনই তাম তাম করে পরালীক করে দেখেছি যদি কোন চিঠি বা এ ধরণের কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় যাতে করে বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে কোন হাদিস পাওয়া যায়, কিন্তু কিছুই তো পাইনি !

সর্বিতার কথায় অতীনলাল কিছুক্ষণ স্থৰ্য হয়ে বসে কি যেন ভাবলেন। অঙ্গুত মুদ্রকঢ়ে বললেন, এ অবস্থায় তাহলে নায়েববাবু, ফিরে না আসা পর্যন্ত বা তাঁর কাছ হতে ঐ চিঠি সম্পর্কে সব না জানা পর্যন্ত তো উইলটা আমি পড়তে পারবো না সর্বিতা দেবী !

নিত্যানন্দ সান্যাল এবারে কথা বললেন, একটা কথা যিঃ বোস, ক্ষমা করবেন, অবশ্য না বলে এক্ষেত্রে আমি পারাছ না। ধরুন যদি সে লেফাপাটার কোন হাদিসই না পাওয়া যায়, তাহলে সর্বিতা মা কি তার উইলটা সম্পর্কেও জানতে পারবে না ?

পারবেন। তবে করেকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

অপেক্ষা করতে হবে মাত্র ঐ সামান্য একটা কারণে ?

কারণটা যে সামান্য, সে কথা আপনি জানলেন কি করে, যিঃ সান্যাল ? ঐ

চিঠির বিষয়বস্তুর সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর উইলেরও এমন একটা ঘনিষ্ঠ
যোগাযোগ আছে যে, যাতে করে ঐ চিঠিটা পূর্বে না পড়া থাকলে উইলের
বিষয়বস্তু সঠিকভাবে উপলব্ধিই করতে পারবেন না অন্ততঃ সর্বিতা দেবী।

তার মানে?

ক্ষমা করবেন মিঃ সান্যাল। বর্তমানে এর বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে
সম্ভব নয়। কারণ যেটুকু আমি বলেছি ঐটুকুই চিঠিতে মৃত্যুর আগে মৃত্যুঞ্জয়
চৌধুরী আমাকে জানিয়েছিলেন। ঐ শিলমোহর করা লেফাপার মধ্যে চিঠিতে
তিনি তাঁর মেয়েকে কি লিখেছিলেন বা না লিখেছিলেন, সে সম্পর্কে আমিও
কিছু জানি না বিশ্বাস করলুন।

দেখ মা—, সর্বিতাকে লক্ষ্য করে নিয়ানল্ড সান্যালই আবার কথা বললেন।
এবং সকলেই নিয়ানল্ড সান্যালের ঘূর্থের দিকে তাকায়।

নিয়ানল্ড বললেন, তুমি মনে হয়ত দৃঢ়থ পাবে মা আমার কথাটা শনে,
কিন্তু কথাটা আমি না বলেও পারছি না। জীবনে কোন দিন মিথ্যার অশ্রে
নিইন—চিরাদিন সত্যকেই জীবনের লক্ষ্য করে এসেছি এবং অপ্রয় হলেও সত্য
ষথন মনে হচ্ছে, বলতে বাধ্য হচ্ছ কথাটা—আমারও এখন স্মৃতিবিশ্বাস হচ্ছে,
এ কাজ বসন্ত ভায়ারই।

তীক্ষ্ণ দৃঢ়ত্বে সর্বিতা তাকাল নিয়ানল্ড সান্যালের দিকে, না।

না, না, না—স্মৃতিভাবে বিবেচনা করে দেখো, সে ছাড়া আর কারো পক্ষেই
মামাবাবু?

মা রে! চুলে পাক ধরেছে, বয়সও আমার অনেক হলো। এ বয়সে
দেখলামও অনেক, অবশ্য বসন্ত ভায়াও আমার বহুদিনের এবং যথেষ্ট পরিচিত।
এ কাজ তার স্বারা সম্পূর্ণ হয়নি প্রমাণ হলে আমার চাইতে এ জগতে আর
কেউ বেশী স্বৰ্গী ও আনন্দিত হবে না হয়ত, তবু চক্ৰবজ্জ্বার খাতিরে অপ্রয়
ও কষ্টকর বলে সত্যকে যদি আমরা অস্বীকার করি, তার চাইতে দৃঢ়থ ও
গ্রানি আর বেশী কিছু থাকবে না মা। তাই বলছিলাম, আমার মনে হয় এই
কাজ তারই। ভেবে দেখো মা, তোমার পিতার আকৃতিক অপঘাতে মৃত্যুর পর
একমাত্র এ বাড়িতে সে-ই তো এ কটা দিন ছিল। এবং তার হাতেই চাবি ছিল।
বিচারবন্ধুর দিয়ে বিবেচনা করে দেখতে গেলেও স্বত্বাবত্তি কি মনে হবে না যে,
লেফাপাটা সরানো তার পক্ষে যতটা সহজ ও স্বীকৃতি ছিল তেমন আর কারো
পক্ষেই স্বীকৃতি ছিল না। শুধু সেই নয় মা, আরো একটা কথা আমাদের
এক্ষেত্রে ভাবতে হবে, মিঃ বোস ষথন বলছেন মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর মাঝ কয়েক-
দিন আগেই শুকে ঐ লেফাপার সংবাদ দিয়ে একটা জরুরী পত্র দিয়েছিলেন,
তখন নিশ্চয় তাঁর Iron-safe-এ লেফাটা ছিল। এবং ছিলই ষথন, তখন সেটা
গেল কোথায়? চাবিবন্ধু Iron-safe-এর ভিতর থেকে পাখা মেলে তো কিছু
আর লেফাপাটা উধাও হয়ে যেতে পারে না!

উপর্যুক্ত নিয়ানল্ড সান্যালের ঘূর্ণিকে কেউ যেন অস্বীকার করতে পারে
না, করবার উপায়ও নেই।

অতীনলালই বলেন, মিঃ সান্যাল ঠিকই বলেছেন সর্বিতা দেবী। কথাটা
ভেবে দেখবার মত।

ভাবতে আর হবে না মিঃ বোস—

অর্থাৎ কঠিন্যের সকলেই একসঙ্গে চমকে বস্তার দিকে ফিরে তাকাই

ঘরের মধ্যে থারা উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গ সম্পত্তির চৌধুরী।

কেউই ঘরের মধ্যে উপস্থিত ইতিমধ্যে তের পায়নি কখন একসময় সম্পত্তির চৌধুরী সবার পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তার উপস্থিতিটা না জানলেও ক্ষণপূর্বে ঘরের মধ্যে যে আলোচনাটা চলছিল সেটা সে শুনছে।

সম্পত্তির চৌধুরী বঙ্গবাটা শেষ করে, সেই শয়তানের কাজ! এখন সময় বুঝে ধরা পড়ে কোশলে গাঢ়াকা দিয়েছে।

আপনি! আপনাকে তো চিনতে পারছি না? কথাটা বললেন মিঃ অতীনলাল সম্পত্তকে লক্ষ্য করে।

আমি! আমার নাম সম্পত্তির চৌধুরী, সর্বিতার জাঠতুতো ভাই আমি। ওর বাবা ও আমার বাবা আপন জাঠতুতো ভাই ছিলেন। দিন তিনেক হলো আমি এডেন থেকে এসে পেঁচেছিই।

অতীনলাল সম্পত্তির চৌধুরীর কথা শুনে তীব্র তীক্ষ্ণ দ্রষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটি কথাও বললেন না।

এতক্ষণ পর্যন্ত কিরীটী একটি কথা উচ্চারণ করেনি। একান্ত নির্লিপ্ত-ভাবেই চক্ৰ কৰ্ণকে সজাগ রেখে এক পাশে চুপ্পটি করে দাঁড়িয়ে সকলের কথা শুনছিল এবং এখনও কোন কথাই বলল না—কেবল অতীনলালের সম্পত্তির চৌধুরীর মুখের প্রাতি নিবৃত্তি স্থিরসম্মানী দ্রষ্টিটাই তাকে যেন বিশেষভাবেই কেটেহলী করে তুলল।

স্পষ্টেই বুঝতে পারছিল কিরীটী, এবাবে অতীনলাল কিছু একটা বলবেন। প্রতীক্ষায় উদ্গীব হয়ে ওঠে কিরীটী।

আপনি সম্পত্তির চৌধুরী? এডেন থেকে এসেছেন? ধীরকষ্টে অতীন-লাল সম্পত্তির মুখের দিকে স্থির-নিবৃত্তি দ্রষ্টিতে তাকিয়েই প্রশ্নটা করলেন। হ্যাঁ।

অস্ত্রুত যোগাযোগ তো! এত আস্তে অতীনলালের কষ্টে কথাটা উচ্চারিত হল যে, একমাত্র কিরীটীর অতিমাত্র সজাগ শ্রবণেক্ষেত্র ব্যতীত ঘরের মধ্যে উপস্থিত অন্য কারোরই শ্রবণে কথাটা প্রবেশ করল না। এমন কি সম্পত্তির চৌধুরীও কথাটা শুনতে পেল না।

কি বললেন মিঃ বোস?

না, কিছু না! অতীনলাল শান্তকষ্টে জবাব দিলেন।

তাহলে উইলটা পড়বার কি হবে মিঃ বোস? প্রশ্নটা এবাবে নিত্যানন্দ সান্যালই করলেন।

উইল! আরো দুটো দিন বসন্তবাবুর জন্য আমি অপেক্ষা করবো এখানে। পরশু সকালে উইল পড়ে শোনাব সকলকে। জবাব দিলেন অতীনলাল।

তুমি কি বল মা সবি? প্রশ্ন করলেন সান্যাল সর্বিতাকে।

ক্ষতি কি, তাই হবে। আপনি কি বললেন মিঃ রায়?

কালকের দিনটা তো মধ্যে, তাই হবে না হয়। কিরীটী জবাব দিল।

প্রভু হে, দয়ামুর! মা কলি, আমার উপাসনার আয়োজন করে দেবে চল মা—বহুক্ষণ সময় উন্নীশ হয়ে গেছে।

নিত্যানন্দ সান্যাল অতঃপর কক্ষত্যাগ করবার জন্যই বোধ হয় চেয়ার হতে গাত্রোথান করে, দুয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাতে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে মিঃ অতীনলালের থাকা-থাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও মা।

পথগ্রন্থে উনি ক্লান্ত—চায়ের ব্যবস্থা করো।
প্রশান্ত পদক্ষেপে কক্ষ হতে নিষ্কান্ত হয়ে গেলেন সান্যাল। পঞ্চাতে
পঞ্চাতে তাঁকে অনুসরণ করে কল্যাণী।

চাকুর বেটারাই বা সব গেল কোথায়? ভদ্রলোককে যে এক কাপ চা দিতে
হয়, সে হঁশও কি বেটাদের নেই? এই বনমালী! বলতে বলতে সম্ভোষ
চৌধুরীও কক্ষ ত্যাগ করলেন।

সত্যজিৎ এরপর ইঙ্গিতে সর্বিতাকে ডেকে নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করল।

॥ ২২ ॥

ঘরের মধ্যে এখন দৃঢ়জন।

কিরীটী ও অতীনলাল সর্লিস্টার।

কিরীটীবাবু! একঙ্গে সর্বপ্রথম অতীনলাল কিরীটীর দিকে তাঁকরে
সম্বোধন করলেন ওকে। দৃঢ়জনেরই পূর্ব-পরিচয় ছিল, কিন্তু একঙ্গ কেউ
সেটা প্রকাশ করেননি।

গতকাল নায়েব বসন্ত সেনের মুখে অতীনলাল বোস সর্লিস্টারের নাম
শোনা অবিধি কিরীটী ভাবছিল এ কোন্ অতীনলাল এবং আজ সর্লিস্টারের
আসার সংবাদ পেরে এই ঘরে প্রবেশ করেই অতীনলালকে দেখে বুঝতে পেরে-
ছিল ইনি তার পরিচিতই।

বলুন?

ব্যাপারটা যেন একটু ঘোরালই মনে হচ্ছে!

একটু নয়, বেশই ঘোরাল মিঃ বোস। ম্দুরুষ্টে কিরীটী জবাব দেয়।

উইলটা পড়া সম্পর্কে কি করা যায় বলুন তো?

উইলের বিষয়বস্তু আপনার জানা আছে তো?

না। মতুঞ্জয় চৌধুরীর এটা নতুন উইল। মাস দেড়েক আগে পূর্বের
উইলটা বদলে তিনি এই নতুন উইলটা করেছিলেন। এ উইলটা যখন লেখা হয়
আমি উপস্থিত ছিলাম না। ফেডারেল কোর্টে একটা মাঝলায় আমাকে দিল্লী
যেতে হয়েছিল—আমার সিনিয়ার পার্টনার উইলটা করে দেন। হঠাৎ তিনি
অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকে উইলটা নিয়ে আসতে হয়েছে।

হঁ। আচ্ছা একটু আগে যে বলছিলেন—মতুঞ্জয়বাবু নিহত হবার দিন
আগেক আগে যে জরুরী চিঠিটা লিখেছিলেন, সে চিঠিটা কি সঙ্গে
এনেছেন?

হ্যাঁ।

দেখতে পারি কি চিঠিটা?

এই যে—, অতীনলাল তাঁর পোর্টফোলিওটা খুলে একটা লেফাপা বের
করে তাঁর ভিতর হতে একটা মুখ-কাটা রেজিস্ট্রী খাম বের করে দিলেন।

কিরীটী চিঠিটা খাম থেকে টেনে বার করল। চিঠিটা বোসের সিনিয়ার
পার্টনারকেই লেখা। এবং তাঁরখ দেখেই বোকা যায় নিহত হবার ঠিক নদিন
পূর্বে চিঠিটা মতুঞ্জয় লিখেছিলেন।

চিঠিটা অবশ্য সংক্ষিপ্ত। চিঠিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে, তিনি একটা

শিলঘোহৰ করে চিঠি তাঁৰ মেয়েৰ নামে লেফাপার মধ্যে রেখে গোলেন ; সেই চিঠিটা তাঁৰ মেয়ে না পড়াৰ আগে যেন কোনমতেই উইল পড়ে শোনানো না হয় তাকে ।

যাই হোক মৃতুঞ্জয় চৌধুৱী লিখিত এই চিঠি ও লেফাপার মধ্যে শিলঘোহৰ কৰে যে গোপন চিঠি তিনি লিখে গিয়েছেন এবং মাত্ৰ মাস দেড়েক আগে আবাৰ নতুন কৰে উইল কৰাৰ ব্যাপারে প্ৰৱেৰ উইল বদল কৰে এ সব কিছু হতে একটা কথা কিৱৰীটীৰ মনে স্বতই উদয় হয়, গত মাস-দুয়েৱ মধ্যে এমন কোন ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছিল যা মৃতুঞ্জয় চৌধুৱীকে যথেষ্ট বিচলিত কৰেছিল ।

এবং যে কাৱণে তাঁকে উইল পৰ্যন্ত বদলাতে হয়েছিল ।

চিঠিটা পড়ে কিৱৰীটী সেটা অতীনলালেৱ হাতে আবাৰ ফেৰত দেয় ।

প্ৰৱেৰ উইলে মৃতুঞ্জয় চৌধুৱী কিভাবে তাঁৰ সম্পত্তিৰ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিৰ্দেশ দিয়েছিলেন আপনার মনে আছে কি মিঃ বোস ?

আছে, তবে details তো মনে নেই !

তবু বলন তো শৰ্ণন ?

দুই ভাগে সম্পত্তি ভাগ কৰা হয়েছিল—এক অংশ তাঁৰ মেয়ে সৰিবতা দেবী পাবেন। বাকী অধৰেকেৱ অৰ্ধাংশ ষদি তাৰ জাঠতুত ভাই রামশঞ্জকৰ চৌধুৱীৰ ছেলে সন্তোষ চৌধুৱী ফিৰে আসেন তো তিনি পাবেন, এবং অবশিষ্ট পাবেন সৌদামিনী দেবী বা তস্য পুত্ৰ ধনঞ্জয় ।

সৌদামিনী ও তস্য পুত্ৰ ধনঞ্জয়—এঁৰা কে ?

তা ঠিক বলতে পাৰিৰ না ।

প্ৰৱেৰ উইলে ঝুঁদেৱ সম্পর্কে তাঁৰ কোন নিৰ্দেশ বা পৰিচিত তো ছিল না ?

আপনাকে বা আপনার সিনিয়াৰ পার্টনাৱকেও ঝুঁদেৱ পৰিচয় দেননি ?

আমি বা আমাৰ পার্টনাৱ কেউই জানি না, তবে বলেছিলেন মিঃ চৌধুৱী যে সময়মত সে সব ব্যবস্থাই তিনি কৰে যাবেন ।

কিৱৰীটী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কি ধৈন ভাবে এবং সহসা একটা কথা মনে পড়ায় আবাৰ প্ৰশ্ন কৰে, আছা মিঃ বোস, বলতে পাৱেন মৃতুঞ্জয় চৌধুৱী যে তাঁৰ প্ৰৱেৰকাৰ উইল বদল কৰে আবাৰ নতুন উইল তৈৱী কৰেছিলেন, এ সংবাদ বসন্তবাৰু জানতেন কিনা ?

মনে হয় জানতেন, কাৱণ প্ৰথমবাৱেৱ উইলে বসন্তবাৰু একজন সাক্ষী ছিলেন, কিন্তু স্বিতীয়বাৱেৱ উইলে শুনোছি আমাৰ সিনিয়াৰেৱ মৃথেই, বসন্তবাৰু সাক্ষী হিসাবে নাবসই কৱেননি। তবে মৃতুঞ্জয়বাৰু ষদি বসন্তবাৰুকে বলে থাকেন পৱে এক সময়ে সেটা অবশ্য বলতে পাৰিৰ না ।

নিবৰ্তীয়বাৱেৱ ঐ নতুন উইল সম্পর্কে আপনার কোন idea নেই তাহলে ?
না ।

ও সম্পর্কে কোন কথা আপনার সিনিয়াৰও কোন দিন আপনাকে বলেননি ?
না ।

কথনও সামান্য discussion—আলোচনাও হয়নি ?
না ।

ভৃত্য প্ৰেটে কৰে চা-জলখাবাৰ নিয়ে ঘৱেৱ মধ্যে এসে প্ৰবেশ কৱল ।

* * *

ଏଇଦିନଇ ମ୍ବିପ୍ରହରେ କିରାଟୀ ତାର ସରେ ସବିତାକେ ଡେକେ ପାଠିରୋଛିଲ ।

ପ୍ରୋଜେନୀୟ କିଛୁ ଆଲୋଚନା ଛିଲ ସବିତାର ସଙ୍ଗେ ଓର ।

ଆଜ ରାତ୍ରେ—ଆପଣି ସେ ସରେ ଓ ସେ ଶ୍ୟାଯ ଶୋନ, ମେ ସରେ ଓ ମେଇ ଶ୍ୟାଯ
ଆପଣାର ଶୋଯା ଚଲବେ ନା ସବିତା ଦେବୀ । କିରାଟୀ ବଲେ ।

କେନେ ?

ଏଥିନ କୋନ ପ୍ରଶ୍ନଇ ଆପଣି ଆମାକେ ଅନ୍ଧଗୁହ କରେ କରବେନ ନା ସବିତା ଦେବୀ
ଓ ସମ୍ପର୍କେ । ସମୟେ ସବଇ ଆପଣି ଜାନତେ ପାରବେନ ।

କିଳ୍ଟୁ—

ଏଇଟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ବଲତେ ପାରି, ସେ ବସିଥା ଆମି କରାଇ ସବ କିଛୁ ବିବେଚନା
କରେଇ ଆମାକେ କରତେ ହଜେ, ଏବଂ ଏଇତେ ବେଶୀ କିଛୁ ଖୁଲେ ବଲା ବର୍ତ୍ତମାନେ
ଆମାର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୟ ସବିତା ଦେବୀ ।

ବେଶ, ତାଇ ହେ । କିଳ୍ଟୁ କୋନ୍ ସରେ ଶୋବ ରାତ୍ରେ ?

ଆପଣାର ବାବାର ସରେ । ଆର ଏ କଥାଟା ଯେଣ କେଉ ଜାନତେ ନା ପାରେ, ଏହିନ
କି କଳ୍ପଣୀ ଦେବୀ ବା ସତ୍ୟଜିତ୍ରବୁନ୍ଦୁ ନା ।

କିଳ୍ଟୁ ବୁଝିବାରେ ପାରାଇ ନା ମିଃ ରାଯ়, ଏକଇ ବାଢିତେ ଓଦେର ସକଳେର ସଙ୍ଗେ
ଥେକେ ସକଳେର ଅଞ୍ଜାତେ ଅନ୍ୟ ସରେ ଶୋଭ୍ୟା କେମନ କରେ ଆମାର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହତେ
ପାରେ !

କୋନ କୋଶଲେ ବୁଦ୍ଧି ଖାଟିରେ ସାମାନ୍ୟ କାଙ୍ଗଟରୁ ସମ୍ପର୍କ କରତେ ଆପଣି
ପାରବେନ ନା ସବିତା ଦେବୀ ?

ସବିତାର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକିରେଇ କିରାଟୀ ବୁଝିବାରେ ପାରେ, ସବିତା ଓ ପ୍ରତାବେ
ସତ୍ୟାଇ ଏକଟ୍ର ବିହରିଲ ହେଁ ପଡ଼େଛେ ।

ଶୁନ୍ଦିନ ସବିତା ଦେବୀ, ଯେମନ usual ଆପଣି ସରେ ଶୁଣୁଟ ଯାବେନ
ନିଜେର ସରେ, ତାରପର ରାତ୍ରେ କୋନ ଏକ ସମୟ ସରେର ଆଲୋ ନିର୍ଭିର୍ଯ୍ୟ ଦିଯେ ଛାଦେର
ଦରଜା ଖୁଲେ ଛାଦ ଦିଯେଇ ପାଶେର ଆପଣାର ବାବାର ସରେ ଗିଯେ ଶୋବେନ । ବୁଝିବାରେ
ପେରେଛେନ ଆମି କି ବଲତେ ଚାଇ ?

ହ୍ୟା । ମୁଁ ନିର୍ବ୍ଲୁଷ୍ମକ କଷେଟ ଜବାବ ଦେଇ ସବିତା ।

ଆର ଏକଟା କଥା ସବିତା ଦେବୀ—

ବଲ୍ଲନ ।

ସୌଦାମିନୀ ଓ ତା'ର ପଦ୍ମ ଧନଙ୍ଗର୍—ଏହିର ଆପଣି ଚେଳେନ ?

କଇ, ଓ ନାମ ଦୂଟୋ କଥନ୍ତି ଶୁଣେଇ ବଲେଓ ତୋ ଆମାର ମନେ ପଡ଼ିଛେ ନା !

ମନେ କରେ ଦେଖନ ତୋ ! ଆପଣାର କୋନ ଦୂର-ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସ୍ତୀଯ ବା—
ନା, ଓ ନାମ ଦୂଟୋ ଜୀବିନେ କଥନ୍ତି ଶୁଣିନି ।

କଥନ୍ତି ଆପଣାର ବାବାର ମୁଖେ କୋନ ଆଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ ?

ନା ।

ଭାଲ କରେ ଆର ଏକବାର ଭେବେ ଦେଖନ ସବିତା ଦେବୀ !

ନା, କଥନ୍ତି ଓ ଦୂଟୋ ନାମ ଶୁଣିନି କାରୋ ମୁଖେଇ ।

କାନାଇଯେର ମାର ମୁଖେଓ ନୟ ?

ନା । କିଳ୍ଟୁ କେନ ବଲ୍ଲନ ତୋ ?

ଓଇ ଦୂଟି ନାମେର ପରିଚଯ ଆମାର ଜାନା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସବିତା ଦେବୀ ।
ଆଜ୍ଞା ଏବାରେ ଆପଣି ସେତେ ପାରେନ ସବିତା ଦେବୀ । ହ୍ୟା ଭାଲ କଥା, ଦୂଟୋ ଦିନ

অন্তত আপনি বাড়ি থেকে কোথাও বের হবেন না। এটিও আমার একটা বিশেষ অনুরোধ।

বেশ।

সবিভাবে বিদায় দিয়ে কিরীটী চটপট প্রস্তুত হয়ে নিল, এখন একবার থানায় যেতে হবে। লক্ষণীকান্ত সঙ্গে কথা আছে।

কিরীটী থানায় গিয়ে পেঁচাল ঘথন বেলা তখন প্রায় তিনটে।

লক্ষণীকান্ত বাইরে অফিস ঘরেই ছিলেন, কিরীটীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে গম্ভীর কণ্ঠে অহ্বান জানালেন, আস্তুন কিরীটীবাবু, বস্তুন।

কিরীটী নিঃশব্দে উপবেশন করল। বললে, বসন্তবাবুর কোন খোঁজ পেলেন মিঃ সাহা?

না। তবে কলকাতায় ঘটনার বিবরণী ও বসন্ত সেনের full description দিয়ে special branch-এ জরুরী তার করে দিয়েছি। যে কোন মহত্বেই সংবাদ একটা কিছু আশা করছি।

আমার মনে হয় দু-চার দিনের মধ্যে হয়ত বসন্তবাবু নিজেই ফিরে এসে ধরা দেবেন মিঃ সাহা!

হঁ! আপনি তাই মনে করেন কিরীটীবাবু? আপনি জানেন না তাহলে ঐসব চারিত্রের লোকদের—they are dangerous! প্রথম হতেই ব্যাপারটা আমি লব্ধ করে নিয়েছিলাম। ভাবতেও পারিন এত জটিলতা আছে ভিতরে। আফসোস হয় আমার—প্রথমেই ও লোকটাকে সন্দেহ করিন কেন? প্রথমেই ওকে গ্রেপ্তার করলে হয়ত এতদিনে সব স্মরাহা একটা হয়ে যেত—

ভাববেন না, সে যাবে কোথায় পালিয়ে, ধরা পড়বেই!

সে আমিও জানি। তবে—

আপনি পরশু বলছিলেন, সন্তোষ চৌধুরীর নিকট অনেক কিছুই নাকি জানতে পেরেছেন!

হ্যাঁ সন্তোষ চৌধুরী দুখানা চিঠি দেখাল মত্তুঝয় চৌধুরীর লেখা রাখতেকরের কাছে।

সে চিঠি দুটোতে কি লেখা ছিল আপনার মনে আছে কি মিঃ সাহা?

সংসারের নানা কথা।

সে চিঠির মধ্যে টাকা বা সম্পত্তির কোন কথা ছিল কি?

না, সে ধরনের কোন কথাই ছিল বলে তো মনে পড়ছে না!

কিরীটী কিছুক্ষণ চূঁপ করে থাকে।

আবার প্রশ্ন করে, কানাইয়ের মার কোন সংবাদ পেলেন মিঃ সাহা?

না। চারিদিকে লোক তো পাঠিয়েছিলাম, কেউই কোন সংবাদ আনতে পারেন।

আপনার লোকদের বিলের চৌহান্দিটা একবার ভাল করে খেঁজে দেখতে বলবেন তো!

কেন বলুন তো?

দেখুন না খোঁজ করে, কানাইয়ের মার সন্ধান না পেলেও, আর কারো সংবাদও তো পেতে পারেন!

বেশ তো, এখন লোক পাঠাচ্ছি। কিন্তু আপনার অনুসন্ধান কতদুর

এগুলো ?

কিরীটী তখন নিম্নকণ্ঠে কতকগুলো কথা লক্ষ্যীকান্তকে বললে।
কিরীটীর কথা শুনতে শুনতে লক্ষ্যীকান্ত বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং
বলেন, আশ্চর্য ! তাহলে তো আমার মনে হয়—

সন্তপ্তে এবারে আমাদের এগুতে হবে। He is desperate now !
মরীয়া হয়ে এবারে হত্যাকারী তার শেষ attempt নেবেই—এবং সেই চৰম
মৃহৃত্তে আমরা red-hand ধৰণৰ তাকে। আপনি প্ৰস্তুত থাকবেন। বিশেষ
কৰে এই কথা বলবার জন্যই আমার এখনে আসা।

ধন্যবাদ। আমি প্ৰস্তুত থাকবো।

প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ কিরীটী সাইকেলে চেপেই আবার প্ৰমোদভবনে ফিরে
এলো।

সন্ধ্যা একসময় উত্তীৰ্ণ হয়ে ঘনৰে এলো অন্ধকাৰ রাত্ৰি চাৰিদিকে ঘন
কালো পক্ষ বিস্তাৱ কৰে।

ক্ৰমে রাত্ৰি বেড়ে চলে, নিষ্ঠত্ব হয়ে আসে চাৰিদিক।

প্ৰমোদভবনেৰ সকলোৱ চোখে নেমে আসে ঘনৰে ঢুলুনি। একটা কিছু
ঘটনাৰ প্ৰতীক্ষাৰ রাত্ৰিৰ নিষ্ঠত্ব প্ৰহৰগুলো কেটে যেতে থাকে কিরীটীৰ।
কিন্তু কোন কিছুই ঘটলো না, ব্যৰ্থ প্ৰতীক্ষাৰ ব্যাকুলতায় নিৰ্শ প্ৰভাত হলো।

একটা অস্বাভাৱিক গুৰোট ভাৰ যেন সমস্ত প্ৰমোদভবনকে প্ৰাস কৰেছে।
চলাফেৱা কৰে সব নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। কাৰো মৃখেই কোন কথা নেই।

এমনি কৱেই কেটে গেল সমস্ত দিন—স্বৰ্য গেল অস্তাচলে, সন্ধ্যাৰ তৱল
ছায়া নেমে এল চাৰিদিকে, রাত্ৰিৰ আসন্ন।

ৱাত্স !

ৱহস্যময়ী রাত্ৰি আসে তাৰ কালো ওড়না মেলে ধৰণীৰ বৰকে শলথ মলথৰ
পদসঞ্চারে। ৱহস্যঘন আশঙ্কাৰ প্ৰৰ্ব্বাভাস যেন রাত্ৰিৰ ঘনীয়ে ওঠা স্তৰতায়।

গেটেৰ পাশে ঝাউগাছগুলো শ্বাস টানছে যেন দেকে থেকে কোন ক্লান্ত
প্ৰেতাভাৱ মতই। বৌৰাণীৰ বিলোৱ অঁথে কালো জল অন্ধকাৰে যেন ঘন জমাট
বেঁধে আছে। কালো ৱহস্যঘন আকাশে তাৱাগুলো ঘিৰিমিটি তাকাচ্ছে ভয়ে
ভয়ে বুৰী।

ঢং...ঢং...ঢং। রাত্ৰি তিনটে ঘোষিত হলো দেওয়াল-ঘড়িটায়।

একটা চাপা পদশব্দ অন্ধকাৰে যেন মৰ্মারিত হয়ে উঠলো। কিৱীটী
প্ৰস্তুতই ছিল সত্যজিৎকে নিয়ে। চকিতে কিৱীটী উঠে দাঁড়াল।

ঘৰেৱ মধ্যে অন্ধকাৰ। আলোটা আগেই নিবিয়ে রাখা হয়েছে।

পা টিপে টিপে কিৱীটী এগিয়ে গেল দৱজাৱ দিকে। দৱজাৱ ঈষৎ ফাঁক
দিয়ে কিৱীটী বাইৱেৰ মৃদু আলোকিত বারান্দার দিকে দৃঢ়িত্পাত কৱল।

শুনতে সে ভুল কৰে নি।

কালো আংৱাখায় আবৃত সেই দীৰ্ঘ মৃত্তি, মৃখেৰ নিম্নাংশে কালো
একটা বুমাল বাঁধা। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুজয় চৌধুৱীৰ ঘৰেৱ
দিকেই।

কিৱীটী আৱ মৃহৃত্তও বিলম্ব কৰে না। ক্ষিপ্র হৰিংপদে ছাদেৱ দৱজা
দিয়ে বেৱ হয়ে ছাদ দিয়েই সৰিতাৱ শয়নকক্ষে গিয়ে প্ৰবেশ কৱল। সৰিতাৱ
ঘৰ ও মৃত্যুজয় চৌধুৱীৰ ঘৰেৱ ঘধ্যাবতী দৱজাটা থুলে যেমন সে হাতেৱ

টচের আলো ফেলেছে ঘরের মধ্যে এবং চাপা দ্রুকষ্টে বলেছে, হাত তোল
বন্ধ—your game is up. আংরাখা-আব্রত মৃত্তি শয়াটার উপরে সবে ঘূর্ণন্ত
সর্বিতার উপরে দৃষ্টি হাত প্রসারিত করে ঝুঁকোছল, চাকতে সোজা হয়ে দাঁড়য়ে
একলাকে দাঙ্কণ দিকে সরে গেল এবং বিদ্যুৎগতিতেই যেন পরম্পর্তে আর
এক লাফে ছাদের দরজা দিয়ে বাইরে অদ্ভ্য হলো।

কিরীটী ও সত্যজিৎ লাফ দিয়ে মৃত্তিকে অনুসরণ করে ছাদের দরজার
দিকে ছুটে যায়। ছাদে এসে কিরীটী দেখলে মৃত্তি ছাদের প্রাচীরের উপরে
উঠে দাঁড়য়েছে এবং চক্ষের পলকে নীচে লাফিয়ে পড়ল।

দৃঢ়জনেই ছুট প্রাচীরের কাছে এল এবং প্রাচীরের উপরে উঠে নীচে
ঝুঁকে দেখতে পেল, আবছা ছায়ার মত মৃত্তিটা তখন নন্দনকাননের পথ ধরে
ছুটছে।

কিরীটী ও সত্যজিৎ কালীবিলম্ব না করে পর পর দৃঢ়জনেই নীচে ঝাঁপয়ে
পড়ল। আশ্চর্য, পায়ে তাদের এতটুকু লাগলো না, যেখানে তারা লাফিয়ে
পড়েছে সেখানকার মাটি বুরুবুরে নরম ধূলোর মত।

এ ব্যবস্থা তাহলে প্রয়োজনের খাতিরে পূর্বাহ্নেই করা ছিল!

কিরীটী আগে আগে এবং পশ্চাতে ছুটলো সত্যজিৎ নন্দনকাননের দিকে।
হঠাতে মনে হলো যেন ঝুপ্ত করে জলের মধ্যে ঝাঁপয়ে পড়বার অস্পষ্ট একটা
শব্দ পাওয়া গেল। শব্দটা কিরীটীর সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়কে এড়াল না।

কিরীটী দাঁড়য়ে পড়ল। পশ্চাতে সত্যজিৎও।

কেউ যেন জলে ঝাঁপয়ে পড়লো বলে মনে হল না? সত্যজিৎই প্রশ্ন
করে।

হ্যাঁ। কিন্তু—চপ! আস্তে! কিরীটী সত্যজিৎকে সতর্ক করে দেয়
চাপা কষ্টে, চেয়ে দেখন গৈ—

সত্য! সত্যজিৎ কিরীটীর চাপাকষ্টের সতর্ক নির্দেশে সামনের অন্ধকারে
জলের দিকে তাঁকিয়ে দেখল, নিঃশব্দ সাঁতারে কেউ একটা কালো সর্পিল রেখার
মত এগিয়ে চলেছে প্রমোদভবনের প্রাচীরের দিকে।

ওদিকে যাচ্ছ যে—

নিশ্চয়ই ওদিকে কোন গৃষ্ট স্বারপথ আছে—wait and see!

অন্ধান মিথ্যা নয়। দেখা গেল কে একজন প্রাচীর ঘেঁষে উঠে দাঁড়য়েছে
অন্ধকারেই ছায়ার মত জল থেকে।

পরম্পর্তেই অস্পষ্ট ছায়ামৃত্তি অদ্ভ্য হয়ে গেল যেন প্রাচীরের মধ্যে
আশ্চর্য ঝল্লবলে!

Now quick, follow me! বলেই কিরীটী জলে নামল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে দৃঢ়জনে সাঁতারয়ে প্রাচীরের সামনে এসে পৌঁছল।
এবং ঐখানে জলের গভীরতা বুরুবার জন্য নিচে পা দিতেই জলের নিচে মাটি
পায়ে অন্তর্ভুক্ত করে। এক কোমরও জল নয় ওখানে।

সামনেই একটা ছোট স্বারপথ—কপাটটা এখনও উল্লিখিত আছে।

সিক্ত অবস্থাতেই আগে আগে কিরীটী ও পশ্চাতে সত্যজিৎ সেই ছোট
স্বারপথ দিয়ে নিচু হয়ে কতকটা হামাগুড়ি দেবার মত করেই ভিতরে প্রবেশ
করতেই দেখলে সরু একটি অপশমিত গালিপথ সামনে—অন্ধকার।

বন্ধ বায়ুর ভ্যাপ্সা গরমে গাল-পথটা যেন কালো মুখ্যাদান করে

আছে।

কোথায় গেছে এই গুপ্ত গালি-পথ! প্রমোদভবনের কোন অংশের সঙ্গে নিশ্চিত ঘোগাঘোগ আছে এই গোপন গালি-পথের!

সতর্ক পদসঞ্চারে দৃঢ়নে অগ্রসর হয়।

কিছুটা অগ্রসর হবার পরই ক্ষীণ একটা আলোর শিখা অধিকারে থেন অনিশ্চিতের মধ্যে আশার হাতছানি জানায়।

আরো অধিক সতর্ক পারে এগিয়ে চলে কিরীটী।

অগ্রসর হয় দৃঢ়নে। একটা কট্টা আমোনিয়ার তীব্র গন্ধ যেন প্লাণেপ্সুরে আসছে। নাক জবলা করে।

অশ্বের হেষাধৰনি শোনা গেল।

তবে কি ওরা আস্তাবলের দিকেই এগিয়ে চলেছে?

হ্যাঁ, কয়েক পদ আর অগ্রসর হতেই দৃঢ়নে—প্রথমে কিরীটী ও পশ্চাতে সত্যজিৎ প্রমোদভবনের আস্তাবলের মধ্যে এসেই প্রবেশ করল।

সামনেই পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অদৃরে সেই মৃত্তি। এক কোণে একটা আলো জবলছে। মৃত্তি তার গা হতে ভিজে জামা-কাপড়গুলো খুলতে ব্যস্ত।

চোখের ইশারায় কিরীটী সত্যজিৎকে বাঁ দিক দিয়ে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজে ডান দিকে এগিয়ে যায়।

হঠাতে অসতর্ক সত্যজিৎের পায়ের নিচে ঘরের মেঝেতে ইতস্তত ছড়ানো ঘোড়ার আহাৰ্য চানার দানা পিণ্ঠ হবার মুচমুচ শব্দে চাকতে মৃত্তি ফিরে ঘুরে দাঁড়ায়।

গায়ের জামাটা খুলেছে মাত্ৰ, মুখের রুমালটা এখনো খোলা হয়নি।

ধৰ্ম্মক করে হিংস্র শ্বাপনের মতই লোকটার চোখের তারা দৃঢ়ো জবলে ওঠে একটা নিষ্ঠুর ক্ষেত্ৰে।

আর্কন্ধক পরিস্রীতিটা কিরীটী মুহূর্তে উপলব্ধ করে নেয় এবং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবার প্ৰবেই লোকটা চাকতে পা বাড়িয়ে ঠিক তার পায়ের নাগালের মধ্যেই অলোচায় প্রচণ্ড একটা লাঠি মারে। বন্ধন করে আলোর চৰ্মান্টা ভেঙে গুড়িয়ে যায়, মুহূর্তে ঘৰটা নিশ্চন্দ্ৰ অধিকারে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

কিরীটী মুহূর্তের জন্য যেন বিহুল হয়ে পড়ে, কিন্তু পৱন্তি নিশ্চন্দ্ৰে অধিকারে আন্দজ করে সম্মুখের দিকে লাফিয়ে পড়ে।

অধিকারেও কিরীটীর লক্ষ্য ব্যৰ্থ হয় না। লোকটাকে জাপটে ধৰে।

জড়াজড়ি করেই কিরীটী লোকটাকে নিয়ে মেঝেতে পড়েই চেঁচিয়ে ওঠে, সত্যজিৎবাবু, টুচ্টা জবলান!

হতভম্ব সত্যজিৎ বিমুচ্যের মত দাঁড়িয়েছিল অধিকারে।

কিরীটীর আদেশে যেন সৰ্বিং ফিরে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই কোমরে ঝোলানো টুচ্টার বোতাম টিপে আলো জবলে।

কিরীটীর বুৰাতে বিলম্ব হয় না, যাকে আক্রমণ করেছে তার গায়ে শক্তি প্রচৰ। যুত করে মাটিতে চেপে ধৰে তার বুকের ওপৰ উঠে বসবার চেষ্টা করে কিরীটী, কিন্তু সৰ্বিধা করে উঠতে পারে না প্রতিপক্ষ ঘৰেষণাত্মী বলে।

সহসা সত্যজিতের নজরে পড়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে একটা মোটা
মত হাত দেড়ক কাঠের টুকরো। এগিয়ে গিয়ে কাঠটা তুলে নিয়ে সত্যজিৎ
সন্ধোগ বৃক্ষে লোকটার মাথায় একটা সজোর আঘাত হানে।

একটা অঙ্গশৃঙ্খলাকাতর শব্দ করে এবাবে প্রতিপক্ষ এলিয়ে পড়ে
নিষ্ঠেজ হয়ে। হাতপা এলিয়ে দেয়।

বৃক্ষতে পারে কিরীটী, মাথায় আঘাত পেয়ে ক্ষণেকের জন্য সংজ্ঞালোপ
হয়েছে প্রতিপক্ষের।

ঘরের কোণ হতে একটা মোটা দাঁড়ি এনে অতঃপর ভৃতলশারী সংজ্ঞাহীন
লোকটার হাত বেঁধে তাকে বন্দী করতে ওদের বেগ পেতে হয় না।

প্রতিপক্ষকে বন্দী করে কিরীটী যখন উঠে দাঁড়াল, গুরু পরিশ্রমে তখন
সে হাঁপাচ্ছে।

কে লোকটা!

রহস্যের মেঘনাদ—মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর হত্যাকারী—, ক্লিষ্ট কষ্টে জবাব দেয়
কিরীটী সত্যজিতের প্রশ্নের।

সত্যজিৎ বলে, সত্য?

হ্যাঁ।

কৌতুহলভরে সত্যজিৎ এগিয়ে গিয়ে বন্দী সংজ্ঞাহীন ভূপতিত বাস্তুর
মধ্য হতে কালো বুরালাটা খুলে নিয়ে যেন ভৃত দেখবার মত চমকে উঠে, এ কি,
পাপ তর্ণি সহ্য করবে।

হ্যাঁ, বজ্জ্বের মাবটে। তবে আসলে ও নামধারী মাত্ৰ—ছম্বনাম ওৱ
ওটা।

ছম্বনাম?

হ্যাঁ।

কিন্তু লোকটাকে তো মনে হতো বুড়ো অকর্ম্য!

সে-ও ওৱ ভেক ধাৰণ কৰা মাত্ৰ। দেখতেই তো পেলেন ওৱ শাস্তিৰ বহু।
কিন্তু এখনে আৱ নয়, চলুন বাইৱে বাওয়া যাক। বাগানে দলবল নিয়ে
লক্ষ্যীকান্ত অপেক্ষা কৰছেন। এ নাটকেৰ শেষ দৃশ্যেৰ এখনও বাকী।

কিরীটী ও সত্যজিৎ বাগান অতিক্রম কৰে বারান্দার দিকেই অগ্রসৱ হতোই
অল্পকাৰ হতে লক্ষ্যীকান্ত সামনে এসে দাঁড়ালেন, কিরীটীবাবু?

মিঃ সাহা! কি ব্যাপার?

চূপ, আস্তে, কানাইয়েৰ মা—

কানাইয়েৰ মা! এসেছে তাহলে? কিন্তু কোথায়?

সন্তোষ চৌধুরীৰ ঘৰে ঢুকেছে।

॥ ২৩ ॥

ঘৰেৰ মধ্যে আলো জৰলাছে।

দৱজাৰ ফাঁক দিয়ে ওৱা দেখলো ঘৰেৰ মধ্যে সন্তোষ চৌধুরী ও কানাইয়েৰ
মা।

তুই আবাৰ ফিরে এলি কেন? রুক্ষ সন্তোষেৰ কণ্ঠস্বৰ।

তুই বলেছিলি আসবি—আসিমান বলে—চল, এবার তোকে সঙ্গে করে
নিয়ে তবে আমি থাব।

আমার থাবার এখনও সময় হয়নি, তুই যা।

না, তোকে না নিয়ে থাবো না।

যা বলছি হারামজাদী! এখনো ফিরে যা, নইলে তোকে খুন করবো
বলছি!

তাই কর, তাই কর। তবু সবুর অংশগুলি আমি করতে দেব না।

রাক্ষসী শয়তানী! সবু তোর কে যে তার জনাই তুই হেদিয়ে ঘরছিস?
তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। তুই থাবি কিনা বল?

না—না—না। তুই যা।

তুই তাইলে থাবি না? কানাইয়ের মা দ্রুকষ্টে প্রশ্ন করে
না।

থাবি না?

না।

এক্ষণ্ডনি তবে আমি চেঁচিয়ে সকলকে ডেকে তোর আসল পরিচয় দেবো!

খুন—খুন করে ফেলবো তবে তোকে রাক্ষসী। হিংস্র রাগে এগিয়ে গিয়ে
সত্য সত্য সন্তোষ কানাইয়ের মার গলা টিপে ধরে।

সেই মহুত্তেই কিরীটীর ইঁগিতে লক্ষ্যীকান্ত দরজার ধাঙ্কা দিয়ে
চেঁচিয়ে ওঠেন, দরজা খোল! দরজা খোল!

কিন্তু ভিতর হতে কোন নেই।

দরজা খোল! না হলে দরজা ভেঙে ঢুকবো!

তথাপি কোন সাড়া নেই।

ভাঙ্গুন দরজা। কিরীটীই বলে।

তিনজনে মিলে একত্রে ধাঙ্কা দিতেই ভিতর হতে মড়াৎ করে দরজার খিল
ভেঙে গেল। তিনজনেই হড়মড় করে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে।

সন্তোষবাবু, you are under arrest! লক্ষ্যীকান্ত গর্জন করে
ওঠেন।

হতচকিত বিহুল সন্তোষ ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, পাশেই আবক্ষ
অবগুঞ্চন টেনে নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে কানাইয়ের মা।

কি, ব্যাপার কি! কি ব্যাপার? খোলা স্বারপথে ঠিক গ্রি সময় সান্যালের
কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

এই যে সান্যাল মশাই! আসুন আসুন—ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন!
সহসা অত্যন্ত উচ্ছ্রিত কণ্ঠে ঘেন সাদর আহবন জানাল কিরীটী স্বারপান্তে
উপনীতি নিত্যানন্দ সান্যালকে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই চমকে বিচ্ছয়ভরা দৃঢ়িতে তাকায় কিরীটীর
মুখের দিকে। এবং সেই মহুত্তে বিদ্যুৎ-চমকের মতই অবগুঞ্চনবতী
কানাইয়ের মা তার দীর্ঘ অবগুঞ্চন সহসা মাথার উপরে তুলে দিয়ে তাকাল
সান্যালের মুখের দিকে।

এ কি, সেই কানাইয়ের মা না? আকস্মিক উত্তেজনায় অসতর্ক কণ্ঠ হতে
নিত্যানন্দের উচ্চারিত হলো কথাগলো।

হ্যাঁ, আমি! ফিরে আসতে হলো আমাকে।

ব্যাপারটা যেন আদোই কিছুই নয় এমনি একটা উদাসীন শান্ত নির্লিঙ্গ
কষ্টে নিত্যানন্দ বললেন, হঠাৎ তুই কড়কে না বলে চলেই বা গেল কেন,
আবার ফিরেই বা এলি কেন? এদিকে তোর জন্য সকলে আমরা ভেবে মারি�!

কানাইয়ের মা নিত্যানন্দ সান্যালের কথার কোন জবাব দিল না, কেবল
তার উচ্চপ্রান্তে অঙ্গুত হাসির একটা বিক্ষম রেখা জেগে উঠলো মাঝ।

বিস্মিত নির্বাক কিরীটী কানাইয়ের মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।
এ তার পূর্ব-পরিচিতা এ বাড়ির পুরাতন দাসী কানাইয়ের মা নয় যেন।

ভৌরু সঙ্গেকচে দৈন্যবিলুপ্তিতা কানাইয়ের মাও নয়।

দাঁড়াবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত যেন পাল্টে গিয়েছে। মাথার উপরে অবগুঠন
স্বল্পিত। মাথার সম্মুখের দিকে কাঁচা-পাকায় মিশানো চুলগুলো। ছোট
ললাট। খোপদুরস্ত একটা সাদা থানকাপড় পরিহিত। গায়ে একটা সাদা
খন্দরের মোটা চাদর।

ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে, এমন কি দাঁড়াবার ভঙ্গীতে পর্যন্ত যেন একটা আভি-
জ্ঞাত্য ফুটে বের হচ্ছে।

সেই চিরপরিচিত কানাইয়ের মা যেন দাসীর পদ হতে অভিজ্ঞত বংশের
এক নারী-পদব্যর্দাদার জ্ঞাতী হয়েছে হঠাৎ। গোত্তম-অভিশাপে পাষাণী
অহল্যা যেন অকস্মাত রাঘবের রাতুল চরণস্পর্শ ঘূর্ম ভেঙে জেগে উঠেছে।

আর কেন, এবার ক্ষান্ত হও দাদা। মাথার উপরে ভগবান আছেন, এত
পাপ তিনি সহ্য করবেন না। অবিচলিত শান্ত কণ্ঠ হতে কানাইয়ের মার
কথাগুলো বছের মতই উচ্চারিত হল।

ঘরের মধ্যে যেন অকস্মাত কানাইয়ের মার নিত্যানন্দ সান্যালকে সম্বোধিত
কথাগুলো উচ্চারিত হল।

নিত্যানন্দ সান্যালের সমস্ত মুখ্য যেন কে একপোঁচ কালি বুলিয়ে দিয়েছে।
কালো মুখখনা থমথম করছে একটা হিংস্র উচ্ছেজনায়।

কিন্তু মৃহৃতে সামলে নিলেন নিত্যানন্দ সান্যাল নিজেকে, কানাইয়ের
মা! অনেক দিনের চাকরানী তুই আমাদের বাড়ির। বালিবিধা হেম তোকে
বড় স্নেহ করত। হেম আমাকে দাদা বলে ডাকত, তুইও তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে
দাদা বলে ডাকতিস। দাসী হলেও তোকে আমি চিরদিন ছেট বেনের গতই
দেখেছি। বুবুতে পারিছ, কোন কারণে তুই মনে বড় ব্যথা পেরেছিস। তাই
বোধ হয় মাথারও ঠিক নেই তোর। চল, পাশের ঘরে চল, বুবুতে পারিছ তোর
বিশ্বামৈর প্রয়োজন—আর—, বলে নিজেই সান্যাল ঘর ছেড়ে যাবার জন্য পা
বাঢ়ান।

কানাইয়ের মা কোন কথা বলার প্রবেশ কিরীটী গমনোদ্যত নিত্যানন্দ
সান্যালকে বাধা দিল, দাঁড়ান সান্যাল শশাই! ঘর ছেড়ে যাবেননা!

নিঃশব্দে ফিরে দাঁড়ালেন সান্যাল এবং চোখ তুলে তাকালেন কিরীটীর
মুখের দিকে।

কিরীটীও তাকিয়ে আছে সান্যালের মুখের দিকে।

বৃথামান দৃঢ়টো শাশিত তরবারি যেন পরস্পরের প্রতি উদ্যত।

সহসা কানাইয়ের মার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, মাথা আমার ঠিকই
আছে দাদা। দেৰ্ঘাছ গোলবোগ ঘটেছে আপনারই, তব শিশুপুত্রকে বকে করে
চিনতে পারছেন না!

তবে রে হারামজাদী—ক্ষমিত ব্যাপ্তির মতই থেন অকস্মাৎ ঝাঁপয়ে পড়ে
দুই হাত দিয়ে কানাইয়ের মার কষ্টদেশ টিপে ধরলেন সান্যাল।

মুখোশট খুলে গেল সান্যালের।

ঘটনাটা এত দ্রুত ও আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল যে, ঘরের মধ্যে উপস্থিত
সকলেই মৃহৃত্তের জন্য হতচাকিত ও বিহুল হয়ে পড়ে।

নিষ্ঠুর পেষণে কানাইয়ের মার গলা দিয়ে একটা গোঁ গোঁ শব্দ কেবল
বের হচ্ছে।

তোকে খুনই করে ফেলবো হারামজাদী,— গর্জতে থাকে ত্রোধাম সান্যাল,
আর পেষণ আরো কঠিন করেন হাতের মুঠিটুর।

কিরীটী সর্বাপ্রে এগিয়ে বলিষ্ঠ দুই বাহুতে সান্যালের কাঁধ টিপে ধরে
প্রবল এক বাঁকুনি দেয়, ছাড়ুন, ছাড়ুন!

কিন্তু মরীয়া হয়ে উঠেছেন সান্যাল। চীৎকার করে ওঠেন, না না—খুন—
খুন করবো ওকে আর্মি। বাধ্য হয়ে কিরীটী তখন ঘৃণ্যস্তুর পাঁচে সান্যালের
কঠিন মুঠিট শিথিল করে কানাইয়ের মাকে মুক্তি দেয়।

কানাইয়ের মা ঢলে পড়ে হাঁচিল, সত্যজিৎ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাকে
ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে। এলিয়ে পড়ে কানাইয়ের মা চেয়ারটার
উপরেই।

বাইরে এমন সময় পদশব্দ পাওয়া গেল। সকলেই সোৎসূক দ্রষ্টিতে
তাকায় খোলা দরজার দিকে। ঘরে প্রবেশ করলেন নায়েব বস্তু সেন।

হ্যাঁ, আর্মি। কিন্তু এসব কি ব্যাপার লক্ষ্যীকান্ত?

জবাব দিল কিরীটী, আস্তুন নায়েব মশাই। আঙ্কের ঘটনার you were
the missing link,—হারানো স্বত্ত্ব।

কিরীটী তখনও নিয়ানন্দ সান্যালকে দুই হাতে ধরে আছে। নিয়া-
নন্দকে অতঃপর অন্য একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে কিরীটী বললে, সুবোধ
বালকের মত এবারে বসন্ত তো সান্যাল মশাই! Don't try to play any
more dirty tricks! আপনার খেলা শেষ হয়েছে।

চোখের জলের মধ্যে দিয়েই কানাইয়ের মা—হতভাগিনী সৌদামিনী তার
জীবনের কলঙ্ক-মাথা ইতিহাসের প্রস্তাগলো একের পর এক মেলে ধরতে
লাগল।

নির্বাক সকলে বসে ঘরের মধ্যে। কিরীটী, সত্যজিৎ, নিয়ানন্দ সান্যাল,
সল্লোচ চৌধুরী, বস্তু সেন, কল্যাণী, সবিতা, সৌদামিনী দেবী, লক্ষ্যীকান্ত
সাহা ও অতীনলাল।

রাত শেষ হয়েছে। ভোরের প্রথম আলো পূর্বাকাশ রাঙিয়ে তুলছে।

সৌদামিনীর কথা

হতভাগিনী কলঙ্কনী সৌদামিনীর কথা কি আর নতুন করে শুনবেন
কিরীটীবাবু! বাংলাদেশের ঘরে ঘরেই তো এগান কত ইতিহাস আছে, কিন্তু
বিয়ানদের উচ্চারণ হলো ক্ষতিতেল করে কত হতভাগিনীর জীবন-প্রদীপ যে
নিভে ধায়—তুষানলে ধর্মিকাধিক জলে নিঃশেষ হয়ে যায় কত সৌদামিনী, দে

সংবাদই বা কজনে এ সংসারে পায় !

তের বৎসর রয়েসের সময় বিবাহ হলো আমার। স্বামী কেমন চিনলাগাই না। খেলাঘরের মতই স্বামীর ঘর আমার নিষ্ঠার পদাঘাতে ভেঙে গুড়িয়ে গেল। হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর ঘুচে এক বৎসরের মধ্যেই ফিরে এলাম বাপের ঘরে, রাঙ্কশুমী পোড়াকপালী আর্মি।

হেম আমার তিন বৎসরের ছোট হলেও আমার খেলার সাথী সে ছিল। সেই ছিল আমার সঙ্গী। ফিরে এসে আবার হেমের সঙ্গেই খেলাঘর পাতলাম। তিনটি বছর কেটে গেল, হঠাত একদিন শিউরে উঠলাম নিজের দিকেই তাকিয়ে। দেহের দৃঢ়কূল ভেঙে নেমেছে কখন জোয়ারের জলোছবাস টেরও পায়নি। অসংব্রত দেহকে যেন কোনমতেই আর লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে পারিব না। এমন সময় হেমের হল বিয়ে।

হেমের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় বিবাহের পর একটা বছর ঘন ঘন আমাদের ওথানে আসত। প্রথম প্রথম মৃত্যুঞ্জয়কে এড়িয়েই চলতাম। কিন্তু হঠাত একদিন সম্ম্যাবেলো ছাদের ওপরে একাকী দাঁড়িয়ে আছি, সহসা কার পদশব্দে ফিরে তাকালাম। যাকে দেখলে আমার এত ভয়, যার চোখের দিকে তাকাতে বুক কেঁপে ওঠে, নিজেকে যেন আর কোনমতেই ধরে রাখতে পারিব না—সেই মৃত্যুঞ্জয়! আমার দেবতা! আমার সর্বস্ব!

* * *

ভয় পেলে সৌদামিনী?

না,— সৌদামিনীর বুক তখন কাঁপছে দৃঢ় দৃঢ়।

তুমি আমাকে এড়িয়ে চল কেন মিনি? আর্মি কি বাব না ভাঙ্গুক? কেন তুমি আমার ভয় কর বল তো?

কই, না তো! ভয় করিব কে বললে? মনে মনে বলে সে, ওগো দেবতা, আমার ভয় নয় গো, ভয় নয়—আর্মি কেমন বিশ হয়ে যাই।

চাও তো দেখি আমার চোখের দিকে? কই, চাও? সহসা হাত বাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় সৌদামিনীর একটা হাত ধরে ফেলেন।

না না, ছাড়—কেউ এসে যাবে এখনি লক্ষ্মীটি!

এত ভয় তোমার সৌদামিনী?

না না! ছিঃ!

সমস্ত যৌবন সৌদামিনীর ঢাঁবিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু সে কৃষ্ণ তার মিটল না। বরং দিনকে দিন যে বেড়েই চলে। শেষ পর্যন্ত যেদিন তার খেয়াল হল, সারা দেহ ছাপিয়ে এসেছে তার অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃ—সেদিন ভয়ে সে নীল হয়ে গেল।

নীলকণ্ঠ সারা বিশ্বের গরল ধারণ করে যেখানে কলক়ালকান্তি জাহবী-বেঁচিত হয়ে অর্পণার দুর্যারে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়েছেন, সৌদামিনী সেখানে ছুটে এলো তার কলাঙ্কিত দেহের যৌবনর্মাথত গরলটুকু নিয়ে; সেই গরলে নীলকণ্ঠ দেবাদিদেবের চরণেরই আশ্রয়ে।

ধনঞ্জয় সেখানেই জন্ম নিল এক সেবাশ্রমে।

সৌদামিনী যেদিন সেবাশ্রম হতে দুই মাসের শিশুপুত্রকে বুকে করে ফিরে এলো, নিত্যানন্দ তখন দুর্যার রোধ করে দাঁড়ালেন, যাও, এখানে নন্ম।

কলঙ্কিনী ! লজ্জা করে না তোর ! দ্বিৰ হ !

কি কৰবে এখন সে ? কোথায় যাবে ? অনন্যোপাস্ত সৌদামিনী আবার কাশীতেই ফিরে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে এক পত্র দিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের পত্র পেয়ে কাশীতে এলেন এবং বললেন, এখানে এভাবে তোমার সন্তানকে তুমি মানুষ করতে পারবে না মিনি। তার চাইতে ওকে কোন অন্ধে আশ্রমে দাও, আমি সব ব্যাপ্তার বহন করবো, আর তুমি আবার ওখানেই চলো।

কি জানি কেন, সৌদামিনী তাতেই রাজি হলো। ধনঞ্জয়কে এক আশ্রমে রেখে সৌদামিনী মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহেই এসে উঠলো।

কিন্তু পরিচয় দিল তার সৌদামিনী নয়—দাসী কানাইয়ের মা বলে।

কানাইয়ের মা পরিচয়েই সৌদামিনী চৌধুরী-গৃহে থেকে গেল। সৌদামিনী মরেছে।

হেমপ্রভার ব্যাপারটা আদো মনঃপ্রত না হলেও, ঘুথে সে কিছু বললে না বটে তবে দৃঢ় পেল স্বামীর ব্যবহারে।

সৌদামিনীর মাতৃস্তোর সংবাদ না পেলেও সৌদামিনীর সম্পর্কে তার স্বামীর দুর্বলতার কথাটা তার অবিদিত ছিল না।

কিন্তু তখনে সৌদামিনীকে হেমপ্রভার সহ্য হয়ে গিয়েছিল, যখন সে দেখলে সৌদামিনী তার গৃহে এলেও সাংত্য-সাংত্যেই দাসীর মতই সে দিন কাটাচ্ছে। সে তার অধিকারের সীমাকে কোন অজ্ঞাতেই লঙ্ঘন করে না বা করবার চেষ্টাও করে না।

সবিতা এলো হেমপ্রভার গড়ে এবং ঐ সময় হচ্ছেই হেমপ্রভা স্বামীর ব্যবহারে একটা পর্যবর্তন লক্ষ্য করতে লাগল। স্বামী যেন তার সদাই গম্ভীর, চিন্তাকুল।

আরো দেখলে, প্রতি মাসে স্বামী তার দাদা নিডানলকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা ইন্সিসওর করে পাঠায়।

একদিন প্রশ্ন না করে আর পারে না, কিন্তু স্বামীর কাছে কোন জবাবই পায় না।

কথাটা একদিন সৌদামিনীর কাছে কিন্তু প্রকাশ হয়ে গেল।

সৌদামিনী ঐ বাড়িতে থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর কোন ব্যাপারেই থাকত না।

কিন্তু হেঘের ঘুথের দিকে চেয়েই একদিন রাতে সৌদামিনী মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরে এসে প্রবেশ করল, ওখানে আসবার দীর্ঘ আট মাস পরে।

দীর্ঘদিন পরে সৌদামিনীকে নিজের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মৃত্যুঞ্জয় পৃষ্ঠ করেন, সৌদামিনী, তাহলে তুমি আজও বেঁচে আছো ?

সৌদামিনী তো অনেকদিন আগেই মরে গেছে চৌধুরী মশাই—এ কানাইয়ের মা—সৌদামিনীর পাপের প্রায়শিক্ষণ করছে, যে পাপ সে তার নিজের কাছে করেছিল। কিন্তু সে কথা যাক, আমি একটা কথা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম চৌধুরী মশাই !

বল ?

প্রতি মাসে আপনি লুধিয়ানায় দাদাকে টাকা পাঠান, এ কথা কি সত্য ?

সৌদামিনীর প্রশ্নে মৃত্যুঞ্জয় কিছুক্ষণ গুরু হয়ে রইলেন, তারপর বললেন,
হ্যাঁ সত্ত। কিন্তু একাত্তই শূন্তে চাও কি কেন?

হ্যাঁ বলুন।

হেমও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে অনেকবার, কিন্তু বলতে পারিনি।
দুর্ধরের ও লঙ্ঘারই কথা, তোমাকে বলছি তবু হেমকে বলতে পারিনি, এবং
কেন পারিনি হেম না বুঝতে পারলেও তুমি বুঝবে। হেমকে বিবাহ করবার
মাস আটেক আগে একবার দেশভ্রমণে বের হয়ে ঘুরতে ঘুরতে উজ্জয়িনীতে
গিয়েছিলাম। সেখানে এক চৌহান রাজপুত্রের মেয়ে কাণ্ডনমালার রূপে মৃত্যু
হয়ে তাকে বিবাহ করি।

চৌধুরী মশাই! একটা আর্ত চীৎকার যেন সৌদামিনীর কণ্ঠ চিরে বের
হয়ে আসে।

ভাবছো আমি মহাপাষণ্ড, না! তাই। আমারও পাপের প্রায়শিক্ষিত শূরু
হয়েছে। মৃষ্টি পাইনি। কিন্তু যা শূন্তে চাইছিলে শোন। বিবাহের পর
মাস তিনিক কেটে গেল, ভাবিছি বাবাকে সব লিখে জানাব এবং বৈকে নিয়ে
দেশে আসব, এমন সময়—কাণ্ডনের এক বন্ধু ছিল রাজপুত—যুবক চেঁ সংঃ,
তারই সঙ্গে একদিন রাত্রে বাগানে কাণ্ডনকে দেখে হিংসায় বুক আমার জৰলে
গেল। ওদের উপর নজর রাখতে লাগলাম। বুঝলাম কাণ্ডন চেঁ সংকে
ভালবাসে। মাঝখানে আমি এসে না পড়লে ওদের বিবাহও হত একদিন।
হিংসায় ক্রোধে অন্ধ হয়ে কাণ্ডনকে ফেলে এক রাতে চুপে চুপে পালিয়ে
এলাম। ওরা আমার ঠিকানাও জানত না। পরে ফিরে এসে মাস আটেক
বাদে হেমকে বিবাহ করি। ওদের আর খোঁজ নিইনি। মাস পাঁচেক পূর্বে
তোমার দাদা নিত্যানন্দের চিঠিতে জানতে পারি, যখন চলে আসি কাণ্ডন তখন
নাকি অন্তঃসংস্থা ছিল। এবং একটি মেয়ের জন্মদান করেই সে মারা গিয়েছে।
মৃত্যুঞ্জয় চুপ করলেন।

তারপর?

তারপর তোমার দাদা নিত্যানন্দ উজ্জয়িনীতে গিয়েছিল বেড়াতে। কেমন
করে জানি না কাণ্ডনের বাপ লক্ষ্যণ সংয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং বৈধ
হয় সে সব কথা জানতে পারে এবং বুঝতে পারে আমিই সেই।

কেমন করে বুঝতে পারলেন তিনি?

কাণ্ডনের কাছে আমার একটা ফটো ছিল সেই ফটোটা দেখে। ফটোটাই
এখন তার সম্পত্তি এবং তারই জোরে গত কয়েক মাস ধরে সে আমাকে শোষণ
করছে। মাথা নীচু করলেন মৃত্যুঞ্জয়।

দাদার এতদ্বয় অথঃপতন হয়েছে!

মাঝে মাঝে ভাবি কি জান সৌদামিনী, কলঙ্কসাগরে তো ড্রবৈছিই।
কাণ্ডনের মেরে সে তো আমারই, তাকে এখানে নিয়ে আসি।

আপনি কি পাগল হলেন? ও চিন্তাও মনে স্থান দেবেন না। এক-
বারটি ভাবুন তো, এ সংবাদ হেম জানতে পারলে সে কত বড় দুর্ধর পাবে?
কিন্তু আমার একটা কথা শুনবেন?

বল?

দাদাকে এখানে একবার আসতে লিখুন, আমি তার সঙ্গে কথা বলবো।

তাতে কি কোন ফল হবে সৌদামিনী, এবং টাকা যেমন সে নিচে নিক।

এতে শব্দি সে সম্ভুষ্ট থাকে তো—

সম্ভুষ্ট ! জানেন না চৌধুরী মশাই, লোড বেড়েই চলে রামে, 'ওর হাঁ
সামলাতে আপনাকে সর্বস্বান্ত হতে হবে। তার চাইতে গিয়ে দিন দাদাকে
এখানে আসতে।

বেশ।

মাসখানেক বাদে নিয়ানল্ড এলেন। সৌদামিনী ভুল করেছিল। নিজের
মায়ের পেটের ভাই হলেও নিয়ানল্ড-চারিত্ব সে ঠিক ব্যবহৃতে পারেনি। থাবার
আগে বরং সে শাসিয়েই গেল উল্টে সৌদামিনীকে।

নিয়ানল্ড চলে গেল বটে, তবে মনে মনে থাবার আগে সে নতুন এক ফল্দৈ
মাথায় নিয়ে ফিরে গেল এবং তারপর দেখা গেল, ঘন ঘন সে কাণ্ঠন্পুরে
যাতায়াত শুরু করেছে। হেমপ্রভার প্রতি তার স্নেহ ও ভালবাসা যেন
উচ্ছবসিত হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন।

বৎসর দ্বাই এইভাবে নিয়ামিত ঘৃত্যুজ্জয়ের ওখানে আসা-যাওয়া করে করে
এবারে সে আর এক মর্ম-ঘাতী তীর নিক্ষেপ করল ঘৃত্যুজ্জয়ের বক্তে।

দুর্বলচিত্ত সলিঙ্ক-চারিত্ব ঘৃত্যুজ্জয় সহজেই সেই নির্মিষ্ট শরাবাতে কাৰ্ব
হয়ে পড়লেন, হেমপ্রভা মধ্যে মধ্যে একমাত্র নিয়ানল্ডকেই পত্ৰ দিত। হঠাত
একবার দুর্দিনের জন্য এসে নিয়ানল্ড হেমপ্রভা ও তার শিশুকন্যাকে সঙ্গে
করে লদ্ধিয়ানায় নিয়ে গেল ঘৃত্যুজ্জয়ের অবৰ্ত্তনান্তে। সেই সময় কিছুদিন ধৰে
হেমপ্রভার সঙ্গে ঘৃত্যুজ্জয়ের মন-ক্ষাৰকষ্টা একটু বেশীই চলছিল। বাড়ী
ফিরে ঘৃত্যুজ্জয় হেমপ্রভাকে না দেখতে পেয়ে মনে মনে ভীষণ অসম্ভুক্ত হলেও
মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। স্বামীকে চিঠিও দিলেন না। হেমপ্রভাও
অভিযানভৱে একথানি চিঠিও স্বামীকে লিখল না। সৌদামিনী এসবের
কিছুই জানত না। দীৰ্ঘ ছয় মাস পৱে হেমপ্রভা আবার ফিরে এল স্বামীর
গহে এবং শৰীর তার তখন থুবই খারাপ। মনে থার ঘুণ ধৰে, দেহ তার
ভাগতে দোরি হয় না। হেমপ্রভারও হয়েছিল তাই। হেমপ্রভা ফিরবার দিন
পাঁচক বাদেই ঘৃত্যুজ্জয় স্বী ও শিশুকন্যাকে নিয়ে প্ৰমোদভবনে উঠে এলেন
এবং ওখানে আসবাব দিন চারেক বাদে এক রাতে স্বামী-স্বামীৰ মধ্যে প্ৰচণ্ড বচসা
হয়ে গেল। নিয়ানল্ডকে নিয়ে হেমপ্রভার চৰাপ্তে সন্দেহ করে স্পষ্টাঙ্গপ্রতিটী
ঘৃত্যুজ্জয় অভিযোগ জানালেন এবং বললেন, নিয়ানল্ড নিজে নাকি চিঠিতে
অনেক দিন আগেই তাকে ও সম্পর্কে ইঞ্জিত দিয়েছিল। ঘৃণার জজ্জায় হেম-
প্রভা একেবারে পাথৰ হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা ! এৰ চেয়ে যে ঘৃত্যুজ্জয়
ছিল ভাল !

এবারে কিৱীটী বললে, এবং সেই দৃঢ়খ ও অপমানেই তিনি বিষপান
করে আঝাহত্যা কৱেন নিশ্চলাই ! কেউ তাকে হত্যা কৱোনি !

সৌদামিনী বললে, হাঁ। কিন্তু আপনি সেকথা জানলেন কি করে মঃ
য়ায় ?

আপনার বৰ্ণত কাহিনী প্ৰথমে সত্যজিৎবাৰুৰ ও পৱে আপনার মুখে
শুনেই বুৰোছিলাম, আসল ও সাত্য কথাটা আপনি গোপন কৱেছেন। আপনার
বৰ্ণত কাহিনীৰ মধ্যে অনেকটা ফাঁক ছিল। তাছাড়া যে মৃহূর্তে বুৰোছিলাম
দীৰ্ঘ উনিশ বৎসৱৰ ব্যবধানে দুটো ঘৃত্যুৰ কাৰণ এক নয় এবং শেষেৱটা ষথন
অৰিসংবাদিত ভাবেই আগৱার কাছে প্ৰতীয়মান হয়েছিল সত্য বলে, তখনই

বুরোছিলাম আগের ব্যাপারটা আঝহত্যা ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না। অবশ্য এরপ ভাববাব আমাৰ দৰ্শন কাৰণ ছিল। প্ৰথমত হেমপ্ৰভা দেবীকৈ একমাত্ৰ হত্যা কৱা সম্ভব ছিল তাৰ স্বামীৰ পক্ষেই, কিন্তু তা তিনি যে কৱেননা সেটা বুৰোছিলাম সাত দিন বাদে কলকাতা হতে ফিরে এসে—তাৰ স্বামীৰ মৃত্যু দেহটা খুঁজে পাওয়াৰ ব্যাপারেই। তিনি প্ৰথম হতেই সন্দেহ কৱেছিলেন তাৰ স্বামী গৃহত্যাগ কৱেছে এবং গেছে নিয়ানন্দবাবুৰ ওখানেই। তাই তিনি অস্থৰ্থা স্বামীৰ একটা কল্পিত চিকিৎসাৰ ভান কৱে যেয়ে ও আপনাকে নিয়ে কলকাতায় যান, কিন্তু আসলে কলকাতা থেকে নিয়ানন্দবাবুৰ ওখানে গিয়ে স্বামীৰ খোঁজ নেওয়াই তাৰ উদ্দেশ্য ছিল—

ঠিক তাই। চৌধুৱীমশাই লুধিয়ানাতেই দাদাৰ ওখানে হেমেৰ খোঁজে গিয়েছিলেন। জবাব দেয় সৌদামিনী।

কিন্তু সেখানে স্বামীৰ খোঁজ না পেয়ে গৃহত্যাগিনী স্বামীকে জন্মেৰ মত ত্যাগ কৱবেন এই মনস্থ কৱে ও নিজেৰ বংশৰ্ম্মাদা ও সম্মান বাঁচাতে রটনা কৱে দিলেন তাৰ মৃত্যুৰ কথা। ফিরে এলেন তিনি এখানে। কিন্তু চৰম দৃঃখ্যেৰ ব্যাপার হচ্ছে স্বামীৰ প্ৰতি তিনি যতই সান্দিহান ইন আসলে হয়তো স্বামীকে সতীই প্ৰাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তাই স্বামীকে অমন কৱে চলে যেতে দেখে মৰ্মান্তিক ধাতনায় ছট্টফট্ট কৱে বৰেৱৰোছিলেন, এমন সময় মৃতা স্বামীৰ দেহ আৰিষ্কৃত হল নন্দনকাননে। তাৰ পৱেৱে ব্যাপারটাও স্বাভাৱিক গতিই নিয়েছে। এ ছাড়া হেমপ্ৰভা যে নিহত হয়নি কাৰো স্বারা সন্দেহ কৱেছিলাম শ্বিতীয় অন্য একটি কাৰণে—হেমপ্ৰভা দেবীকে যদি তাৰ স্বামী না হত্যা কৱে থাকেন আৰ কাৰো পক্ষে যেমন তাঁকে হত্যা কৱবাব কোন কাৰণই থাকতে পাবে না, তেমনি নিহত হলে অন্তত কানাইৱেৰ মা অৰ্থাৎ আপনি সৰ্বদা যখন তাৰ পাশেৰ ঘৰে শৃতেন ও সৰ্বদা প্ৰাণ দিয়ে তাৰ দেখাশূন্ব কৱতেন, আপনি নিশ্চয় সেটা জানতে পাৱতেন। আপনার কাছে সে ধৰা পড়তই এবং সেক্ষেত্ৰে অন্তত আপনি এতদিন পৱে বিশেষ কৱে মৃত্যুঞ্জয়বাবুৰ মৃত্যুৰ পৱে আৰ সে কথা গোপন কৱে রাখতেন না।

সৌদামিনী চৰ্প কৱে রইলেন।

কিৰাটী আবাৰ তাৰ বক্তব্য শুনৰ কৱে, হেমপ্ৰভা দেবীৰ মৃত্যু-ৱহস্যটা আমাৰ কাছে খোলসা হয়ে যাই, যে রাতে সৌদামিনী দেবী এখান হতে চলে যান সেই রাতে ওঁৰ সঙ্গে ঐ সম্পর্কে আলোচনা কৱবাব পৱেই। এবং যে মৃহৃতেৰ ব্যৱলাম হেমপ্ৰভা দেবীৰ মৃত্যুৰ সঙ্গে তাৰ স্বামী মৃত্যুঞ্জয়বাবুৰ মৃত্যুৰ সাক্ষাৎ কোন যোগাযোগ নেই, পৱেক্ষে থাকলেও তখনই ভাবতে লাগলাম এতকাল পৱে তাহলে মৃত্যুঞ্জয়বাবু নিহত হলেন কেন? এইখানে একটা ব্যাপার প্ৰথমটাৰ সতীই আৰাকে বিশেষভাৱে delimma-ৰ যথে ফেলেছিল—অকুস্থানটি। একই স্থানে বকুলবৰ্কতলে দৰ্শন মৃত্যু দেহ কেন আৰিষ্কৃত হল! পৱে অনেক ভেবে দেখেছি এবং সৌদামিনী দেবীৰ মুখে একটা কথা শুনে বুৰোছি, তাৰও সম্ভবত, মানে হেমপ্ৰভা দেবীৰ বকুলতলে আঝহত্যা কৱবাব দৰ্শন কাৰণ ছিল। ১২৯ সৌদামিনী দেবী বলেছিলেন প্ৰমোদভবনে আসা অৰ্থধ তো বটেই, তাৰও প্ৰৱে দৰ্শকবাব হেমপ্ৰভা দেবী নাকি প্ৰমোদভবনে বেড়াতে এসেও ঐ বকুলতলাটিতে গিয়ে ঘৰে বেড়াতেন। স্থানটি নাকি তাৰ বকুল প্ৰয় ছিল, শুনেছি বৌৱাগীৰ বিল বলা হত এই বিলটিকৈ—এই চৌধুৱী-বংশেৱই নাকি কোন

বৌরাণীর ইচ্ছাতেই বিলের ঘাসো এ বিরাম-কুটিরটি তৈরী হয়েছিল বলে এবং পরে এ বিলের জলে সেই বৌরাণী সাঁতার কাটতে গিয়ে তালিয়ে যান আর উঠেন না। সেই হতেই বিলটিকে লোকে বৌরাণীর বিল নাকি বলত। এবং সেই হতেই চৌধুরী-বংশে একটা প্রবাদের মতই শেষে দাঁড়িয়েছিল এ বিল এ বাড়ির বাঁদের পক্ষে নাকি অভিশপ্ত। যাক যা বলছিলাম, ২২ং কারণ হয়ত হেমপ্রভা দেবীর ইচ্ছা ছিল এখানে গিয়েই আস্থাহত্যা করবার, নিজের ঘৃত-দেহটা যাতে আদরিণী একমাত্র কন্যার চোখে না পড়ে। অবশ্য সবই আমার অনুমান। সে শাই হোক, হেমপ্রভা দেবীর ঘৃত্যা-রহস্যটা ধীমারিসত হবার পরই ঘৃত্যাখনবাবুর ঘৃত্যা-রহস্যে আরী ঘন দিই। একটা ব্যাপার অবশ্য—গোড়া হতেই সব ইতিহাস শুনে বুঝেছিলাম, চৌধুরী শশাইয়ের নিহত হবার পথচাতে কোন একটা পারিবারিক জটিল কাহিনী আছে এবং আর অক্ষয়ন ষে রাজ-প্রতানায়—তাও ব্যবতে পারি, তাঁর ভ্রয়ার হতে যে অ্যালবামটি উত্থার কাঁরি তারই ফটোগ্লো দেখে। সেই ফটোগ্লোর মধ্যে একটা ফটো ছিল এক নব-যৌবনা অপরাপ সেল্দব্য়েরী এক নারীর। বুঝলাম মিঃ চৌধুরীর জীবনের কয়েকটি ছিন্ন পৃষ্ঠা সুন্দর এ রাজপ্রতানাতেই ছাড়িয়ে রয়েছে—যার সাক্ষা দিচ্ছে আজও তাঁরই সংয়ুক্তিক্ষিত অ্যালবামটি। কিন্তু কে এই তরুণী? কেন তার ফটো অ্যালবামের মধ্যে স্থানে রাখিত? তার পরই কুড়িয়ে পেলাম নন্দন-কাননে একটি স্বর্ণঅঙ্গুরীয়। বার উপরে খোদাই করা ছিল একটি দেবনাগরী অক্ষর ‘লঁ’। কার অঙ্গুরীয়? অঙ্গুরীয়টি দেখেই বুঝেছিলাম সদ্য না হলেও দৃদ্দশ দিনের মধ্যে কোন এক সময় কারো হাত হতে ঐ অঙ্গুরীয়টি ওখানে খসে পড়েছে। আর একটা জিনিস—এ জায়গায় জলের ধার হৈবে পাড়ে ঘাসের অবস্থা দেখে বুঝেছিলাম নিরামিত কিছুদিন ধরে ওখানে নৌকা বা বোট জাতীয় কিছু এসে ভিড়বার জন্যেই ঘাসগ্লো ঘেন নিস্তেজ হয়ে আছে। বুঝলাম এখানে বোটে চেপে কারো যাতায়াত ছিল। তারও প্রয়াণ পেলাম বিবাম-কুটিরের ঘরে ধূলোর ওপরে জুতোর সোলের ও খালি পায়ের ছাপ দেখে। সন্দেহ হয়ে উঠল মন। খোঁজ নিতে গিয়ে সূর্যমল সিং ও তার নাতনী চন্দ্ৰ-লেখার সন্ধান পেলাম। সূর্যমলের সঙ্গে সামান্য আলাপ করতেই বুঝলাম তারা রাজপুত। এবং চন্দ্ৰলেখার মুখের আদলাটি হ্ৰস্ব একেবারে মিলে গেল। অ্যালবামের ফটোর সেই রাজপুতানী মেয়েটির মুখের সঙ্গে। ছিলসূত্র জোড়া লাগল।

হাঁ, এ চন্দ্ৰলেখাই চৌধুরী শশাইয়ের ঘেনে কাণ্ডনমালার বা লছমীর (কাণ্ডনের ডাকনাম) গৰ্ভজাত কন্যা এবং সৰ্বিতার চাইতে বছৱখানেকের বড়। সূর্যমল লক্ষ্যন্বের ছেঁট ভাই লছমীর কাকা। জবাব দিল সৌদামিনী।

তাহলে ওই আঁটিটা বোধ হয় চন্দ্ৰার ঘায়েরই! কিৱীটী বলে।

লক্ষ্যন্বীকান্ত তখন হঠাৎ বলেন, কিন্তু ক্ষেপসোল দেওয়া কোন জুতো সেখানে পাইন মিঃ রায়!

প্রমোদভবনের আস্তাবল খুজলেই পাবেন। সেটা লছমনের সম্পত্তি।

লছমনের?

হ্যাঁ, কারণ সে-ই যে সেটা ব্যবহার কৰতো! জবাব দেয় কিৱীটী।

কিন্তু—

ভয় নেই। মোক্ষম বল্খনে বাঁধা রয়েছেন শ্রীমান। পালাবার উপায় নেই।

ম্দু হেসে কিরীটী জবাব দেয়, এ বাড়ির ন্টপুর-রহস্যের মেঘনাদ ঐ লছমনই।
আসলে লছমন ওর ছশ্মনাঘ মাতৃ।

ঘরের মধ্যে উপর্যুক্ত সকলৈই বিস্ময়ে কিরীটীর দিকে তাকায়।

বসল্ত সেন বলেন, কি বলছেন আপনি মিঃ রায়? লছমন যে অনেক
দিনকার প্রাতন সহিস এ বাড়ি!

সে প্রাতন সহিস আসল লছমন এতদিন বন্দী হয়ে বৌরাণীর বিলেৰু
দক্ষিণ দিকেৰ বাড়িতে স্বৰ্যমলোৱ হেপাজতে ছিল। তাই না মিঃ সাহা?

হ্যাঁ, তাকে ঘূর্ণি দিয়ে ধানীয়া রেখে এসেছি। জবাব দিলেন লক্ষ্মীকান্ত।

ব্ৰহ্ম লছমনকে গায়েৰ কৱে তাৰ ছশ্মবেশ ধাৰণ কৱে চেৎ সিং, একদা যে
প্ৰথম ঘোৰনে কাণ্ডনমালাৰ পাণিপ্ৰাপ্তী ছিলেন। তাৰ এখানে এসে সকলৈৰ
চোখে ধূলো দিতে কষ্ট হয়নি। প্ৰথমে নানাৱৃপ্ত ভয় দৰ্দিখয়ে ন্টপুৱেৱ শব্দ
শৰ্ণিয়ে চৌধুৱী মশাইকে চেৎ সিং সন্দিক কৱে তোলে। এবং খুব সম্ভবত
হয়ত কৌতুহলী হয়ে অদ্ব্যাদ ন্টপুৱেৱ শব্দ অনুসৰণ কৱতে কৱতে কোন এক
ৱাত্সে ঘটনাচকে যখন হতভাগ্য চৌধুৱী মশাই নলনকানান পৰ্যন্ত চলে যান, সেই
সময় সূৰ্যোগ পেয়ে চেৎ সিং তাকে আকৃষণ কৱে কৌশলে অজ্ঞান কৱে, পৱে
গলা টিপে হত্যা কৱে। ঐ কাৱণেই হয়ত চৌধুৱী মশাইয়েৰ ঘৃতদেহ বকুল-
বৃক্ষতলে পাওয়া থায়। সব ব্যাপারটাই আৰ্কস্মক এবং নিষ্ঠুৱ নিৱার্তি-
চালিত।

সৌদামিনী আবাৰ বলে, মৃত্যুৰ কিছুদিন আগে হতেই প্ৰায় চৌধুৱী
মশাই আমাকে বলতেন হেৱ নাকি প্ৰতাহ রাত্বে তাঁকে ডাকে। তাৰ পায়েৱ
ন্টপুৱ তিনি স্পষ্ট শুনেছেন। হেৱ ন্টপুৱ পৱতে খুব ভালবাসত।

তাহলেই দেখন, অনুমান আমাৰ মিথ্যা নয়। এবাৰে আসা যাক আসল
পৰিকল্পনাকাৰীৰ রহস্য। নিত্যানন্দ সান্যাল—সমস্ত ঘটনাটিৰ তিনিই
ছিলেন ঘূৰ। প্ৰথমে তিনি কাণ্ডনমালাৰ ব্যাপার নিয়ে ঘৃতাঞ্জলি চৌধুৱীকে
ব্যাকমেল কৱেছেন, পৱে নিজেকে হেমপ্ৰভাৰ প্ৰেমিক প্ৰতিপৰ্য কৱে সন্দিক
চৌধুৱীৰ মনে সংশয় এনে দিয়ে further blackmail কৱেছেন। শেষ পৰ্যন্ত
যখন চৌধুৱী মশাই সহেৱ শেষ সীমায় এসে পৰ্ণচেছেন, তখন তিনিই সূৰ্য-
মল প্ৰভৃতিকে এখানে আনিয়ে চেৎ সিংকে চৌধুৱীৰ সংবাদ দিয়ে তাৰ নশৎস
প্ৰতিশোধস্পৰ্হার অংগতে ঘৃতাঞ্জলি দিয়ে তাকে দিয়েই হত্যা কৱিয়েছেন
চৌধুৱীকে। উনি যখন বৰুৱাছিলেন, লোৱা তেওঁতো হয়ে গিয়েছে টিপতে
টিপতে, গাই আৰ দৰ্দ দেবে না, তখন ওদেৱ দিয়ে কাজ হাসিল কৱিয়ে সমস্ত
সম্পত্তি বাগাবাৰ চেষ্টায় ছিলেন। প্ৰতাক্ষ না থেকে পৱোক্ষে বসে কলাকাঠি
ঘূৰিৱেছেন। আৱ ঐ হতভাগ্য ধনঞ্জয়—আমাদেৱ সন্তোষবাবু—সৌদামিনী
দেবীৰ বয়ে-স্বাওয়া-পুত্ৰ সন্তোষ চৌধুৱীৰ পৰিচয় এখানে এসেছিল সম্পত্তিৰ
লোভে। কিন্তু সন্তোষবাবু তো আজ দৃঢ়বৰ্ষৰ ঘৃত, তবে পৰিকল্পনাটি উনি
পেলেন কোথাৱ? সন্তোষেৱ সংবাদ জানলেনই বা কেমন কৱে? বলুন ধনঞ্জয়-
বাবু, অন্যথায় আপনি কিন্তু প্ৰতাৱণার চার্জ পড়বেন।

সন্তোষ নিত্যানন্দেৱ দিকে আঙুল দৰ্দিখয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ—ঐ
নিত্যানন্দই প্ৰলোভন দৰ্দিখয়ে আমাকে এখানে এনেছে। আমাৰ—আমাৰ কোন
দোষ নেই। আমি কিছু জানি না।

কিৰীটী ম্দু হাসে, চমৎকাৰ! একেবাৱে আটঘাট বেঁধেই নেমোছিলেন

সান্যাল মশাই ! এবং এত করেও শেষ বজায় রাখতে পারলেন না । ধৰ্মের কল
এমনি করেই বাতাসে নড়ে । Really I pity you !

উঃ, কি শয়তান উনি ! আপনি জানেন না মিঃ রায়, শুর আরো কীভাবে
আছে । সত্যজিৎ বলে ।

কিরীটী মৃদু হাসির সঙ্গে জবাব দেয়, জানি । শেষ পর্যন্ত মেঝে
কল্যাণীকে আপনার পিছনে লাগিয়েছিলেন, force করে আপনার ও সবিতা
দেবীর মধ্যে গোলযোগ সংষ্টি করতে, তাই না ?

কিন্তু আপনি সে কথা জানলেন কি করে ?

জানাটাই যে আমার কাজ সত্যজিৎবাবু ! কিরীটী জবাব দেয় ।

কল্যাণীর মাথাটা লজ্জায় ন্যুনে আসে ।

লক্ষ্মুৰীকান্তবাবু, আমার বা বলবার ছিল বললাম । কেবল একটা কথা
বসন্তবাবুকে জিজ্ঞাস্য আছে—সেই শীলমোহর করা লেফাপাটা, আয়ৱণ সেফে
যেটা ছিল—, কিরীটী বসন্তবাবুর মুখের দিকে তাকাল ।

হ্যাঁ, আমিই সেটা সরিয়ে ফেলেছিলাম, সবিতার নামে লেখা আছে দেখে
এবং কোত্তহলের বশে খুলে পড়তে গিয়েই চৌধুরীর অতীত জীবনের ইতিহাস
আর্ম সব জানতে পারি । আমার ইচ্ছা ছিল না সবিতা আর ওসব জানতে
পারে, তই আমি আপনাকে ফিরে যেতে বলেছিলাম । সবিতাকেও নিবৃত্ত হতে
বলেছিলাম । শেষকালে যখন বুঝলাগ, আমরা কত অসহায় নির্যাতির হাতে—
তখনই বাধ্য হয়ে লক্ষ্মুৰীকান্তের হাতে না ধরা দিয়ে উজ্জবরিয়নীতে ছুটেছিলাম
ব্যাপারটার শেষ জানতে, কিন্তু গিয়ে তাদের সন্ধান পেলাম না । তখনও
বুঝিবান সান্যাল মশাই এমন জবন্য খেলায় নেমেছেন—

সে চিঠি কোথায় কাকা ? সবিতা প্রশ্ন করে ।

সে চিঠি ছিঁড়ে আমি বৌরাণীর বিলেই ভাসিয়ে দিয়েছি । বাপ যত
অপরাধীই হোন না কেন, তাঁর পদস্থলনের কথা সন্তানের শোনা বা জানাও
মহাপাপ মা । ভুলে যাও সে কথা । বসন্ত সেন বললেন ।

তাহলে এবারে আমার উইলটা পড়তে আর আপনিই নেই—, বলে অতীন-
লাল খাম ছিঁড়ে উইল পাঠ করলেন । নতুন উইলে মতুঞ্জয় চৌধুরী তাঁর
পাপের প্রাপ্তিশক্তি করেছেন । তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সন্তোষ মৃত
জেনে সমান তিন অংশে ভাগ করে দিয়েছেন তাঁর তিন পুত্র-কন্যাদের মধ্যে ।
সবিতা, চন্দ্রলেখা ও ধনঞ্জয় সম্পত্তির সকলেই সমান অংশীদার ।

সবিতা সকলের নিকট হইতে দূরে এসে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে
ছিল । প্রব আকাশকে রাঙা করে সূর্যোদয় হচ্ছে । দিগন্তপ্রসারী বৌরাণী
বিলের জলে কে যেন মুঠো মুঠো রাঙা আবির ছিড়িয়ে দিয়েছে । চৌধুরী-
বংশের সমস্ত পাপ চূলিত করে সর্বপাপঘৃত দিবাকর যেন উদয়াচল থেকে
শান্তির মন্ত্র আকাশে মাটিতে জলে সর্বত্র ছাঁড়িয়ে দিচ্ছেন দিক হতে দিগন্তে ।

সবিতার দু' চাখের কোলে জল ।

মৃত পিতাকে স্মরণ করে দুর্দিত হাত একত্র করে সে প্রণাম জানায়, তার
পিতার আস্থা যেন শান্ত পায় । হে সর্বপাপঘৃত সবিতা—সবিতাকেও ক্ষমা
করো ।

ହାତ୍ତେର ପାଶୀ

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

কিরীটী একটা ঘর খুঁজছিল শ্যামবাজার অঞ্চলে।

শুধু শ্যামবাজার অঞ্চলেই নয়, বিশেষ করে শ্যামবাজার ট্রামডিপোর কাছাকাছি কোন এক জায়গায় হলেই যেন ভাল হয়।

যে সময়কার কথা বলাই তখনও কলকাতা শহরে ভাড়াটে বাড়ি পাওয়ার বিভ্রাটো এখনকার মত এতটা প্রকট হয়ে গেরেন। রাস্তায় যেতে যেতে অনেক 'ট্ৰেলেই চোখে পড়ত।

নির্দিষ্ট অঞ্চলে দু'একটা ঘর যে কিরীটী পার্সন তাও নয়, কিন্তু ঠিক পছলসহ হচ্ছিল না যেন।

বিশেষ করে নির্দিষ্ট একটি পরিধির মধ্যেই নয়, কিরীটী যে একটি ঘর খুঁজছিল ঐ অঞ্চল—তার কারণও অবশ্য একটা ছিল কিন্তু সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ।

এমন সময় অকস্মাত একদিন শ্বিপ্রহরে ডালহাটুসৌ স্কায়ার অঞ্চলে কলেজের একদা সহপাঠী সত্যশরণের সঙ্গে একটা চলমান ট্রামে দেখা হয়ে গেল কিরীটীর। এবং কথায় কথায় সত্যশরণ শ্যামবাজার অঞ্চলেই থাকে শুনে তাকেও ঘরের কথা বলায় সত্যশরণ বললে, আমরা ন্যায়রস্ত লেনে যে সৈমি মেস-বাড়িটায় থাকি সেইখনেই তো কিছুদিন হলো একটি ঘর খালি পড়ে আছে! অতিমাত্রায় যেন উৎসুক হয়ে গেলে।

সাতা কথা বলতে গেলে বাড়িটার মধ্যে দোতলায় সেই ঘরটিই সব চাইতে ভাল। আকারে বড়। দৃঢ়িগ খোলা।

চমৎকার, ঐ ঘরটা তাহলে আমার জন্য ঠিক করে দাও ভাই। কিরীটী অতি মাত্রায় যেন উৎসুক হয়ে গেলে।

আরে সেজন্যে আটকাবে না। ঘরটা তো দেখেই আগে পছন্দ করো, তাছাড়া বাড়িওয়ালা মন্দ লোক নয়, ভাড়াও দেবে যখন।

পছন্দ ঠিক হয়ে যাবে ভাই। অল্পতৎ তোমার মুখে শুনে তাই মনে হচ্ছে। ঘরটা আজই পাওয়া যায় কিন? বল। তাহলে সন্ধ্যার পর তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো!

ব্যাপার কি হে! তোমার যে একেবারে তর সইছে না। তোমার সে শিয়ালদার বাণীভবন যেস কি হলো?

সেখানে ঠিক সূবিধা হচ্ছে না ভাই। তাই অনেক দিন থেকেই ছেড়ে দেবো দেবো ভাবছি।

বেশ তাহলে চল। আমি তো এখন বাসাতেই ফিরছি।

ঠিক আছে, তাই চল। শুভস্য শীঘ্ৰম।

শ্বিপ্রহরের কর্মব্যস্ত কলকাতা শহর।

প্রায় চলছে ঠং ঠং ঘণ্ট বাজিয়ে শ্যামবাজার অভিমুখেই।

কিরীটী সত্যশরণের পাশে বসে মনে মনে ভাবছিল তারই দেওয়া সংবাদটির কথা।

ঘরটা দেখেই কিরীটীর বিশেষ পছন্দ হয়ে গেল।

ন্যায়রস্ত লেনে এমন একটি ঘর পাওয়া যাবে এবং একেবারে ঠিক এতটা মনোমত জায়গায় কিরীটী ভাবেন—আশাও করোন, অঙ্গুত যোগাযোগ।

দিন কয়েক আগে কিরীটীর পৰ্ব-পরিচিত শ্যামপুকুর থানার ও. সি. বিকাশ সেনের ওখানে কিরীটী নিজেই ঘৰতে গিয়েছিল বলতে গেলে একপ্রকার তার

নিজের কৌতুহলেরই তাঁগদে।

গত তিন মাসের মধ্যে শ্যামবাজির ট্রামডিপোর আশেপাশে তিন-তিনটি অত্যন্ত রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

তিনভন নিহতের মধ্যে একজন অবাঙালী বেহারী মধ্যবয়সী, একজন অল্পবয়সী পঞ্জাবী মুসলিমান ও সর্বশেষজন ৩৫/৩৬ বৎসর বয়স্ক বাঙালী যুবক।

এবং কোনবারই মৃত্যের দেহে কোনূপ আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কেবল প্রত্যেকেরই গলায় একটি সরু কালো দণ্ড দেখা গিয়েছে মাত্র।

এবং করোনাস' রিপোর্ট হচ্ছে : "বাসরোধে মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে।

নির্দিষ্ট একটি অশ্বলের এবং বলতে গেলে নির্দিষ্ট একটি পরিধির মধ্যে গত তিন-চার মাসের মধ্যে তিন-তিনটি রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড এবং প্রত্যেকেরই বাসরোধে মৃত্যু ও প্রত্যেকেরই গলায় একটি করে সরু কালো দণ্ড—সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঐ সংবর্দ্ধটি কিরীটীর কৌতুহলকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। এবং ঐ অশ্বলের থানা অফিসার বিকাশের সঙ্গে কিছুটা পূর্বপরিচয় থাকায় শেষ পর্যন্ত কৌতুহলের বশবতী হয়েই কিরীটী বিকাশের ওথানে গিয়ে এক সন্ধ্যারাত্রে হাঁজির হয়।

একথা সেকথার পর আসল কথা উপর করার বিকাশ সেন বলেন, ব্যাপারটা যেন আগাগোড়াই মিস্টারিয়াস কিরীটী। অনেক অনুসন্ধান করেও কোন হিদিস করতে পারিনি আজ পর্যন্ত।

কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ বিকাশ, তিন-তিনটি হত্যাব্যাপারে minutely observe করলে একটা কথাই মনে হয় না কি কোথায় যেন একটি অদ্য ঘোগস্ত্রে ঐ হত্যা-ব্যাপারগুলোর মধ্যে বর্তমান আছে! কিরীটী জবাব দিয়েছিল।

তুম যেন বেশ একটা interested বলেই মনে হচ্ছে রায় এই ব্যাপারে! বিকাশ জবাব দেন।

সত্যি কথা বলতে কি সেন, সেইজন্যাই আমার আস।

হ্যাঁ, তা বেশ তো, দেখ না, যদি কোন কিনারা করতে পার ব্যাপারটার। আমরা পুলিশ বাধা হয়ে হাত ধূলেই বসে আছি ও ব্যাপারে।

বলা বাহুল্য সেই রহস্যগুলি ব্যাপারটার একটা ভাল করে অনুসন্ধান করবার মতলবেই তারপর থেকে কিরীটী ঐ অশ্বলে একটা থাকবার আস্তানা খুঁজছিল। কারণ তার ধারণাই হয়েছিল ঐ হত্যা-ব্যাপারগুলোর প্রচারে বিশেষ কোন একটা রহস্য আছে। এবং ঐ রহস্যের কিনারা করতে হলে সর্বাঙ্গে অকুম্ভানের আশেপাশে বা নিকটে কোথাও তাকে কিছুদিন ডেরা বেঁধে তৈক্ষণ নজর রাখতে হবে।

ত্বর চলেছে মন্থর গতিতে।

কিরীটীর আস্তাচিন্তায় বাধা পড়ল হঠাৎ সত্যশরণের কথায়।

তোমাকে একটা কথা প্ৰেরণ কুলে বলে রাখা ভাল কিরীটী। সত্যশরণ যেন একটা ইত্তেক্ষণ করতে থাকে কথাটা বলতে গিয়েও।

কি বল তো?

বলছিলাম কি ঘরটা পাওয়া যাবে ঠিকই! বাড়ীওয়ালাও ভাড়াটে পেলেই
ভাড়াও দেবেন। কিন্তু—

কিন্তু কি? বল না ভাই কি বলতে চাও?

বলছিলাম এই ঘরটা সম্পর্কেই। ঘরে যিনি পূর্বে ছিলেন, মানে আমাদের অনিলবাবু, আজ থেকে ঠিক একমাস আগে হঠাতে একদিন ভোরে তাঁকে মেসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, তারপর খুঁজতে খুঁজতে মতদেহ আবিষ্কৃত হয় শ্যামবাজার প্রামাণিপোর ঠিক সামনে বড় লাল দোতলা বাড়িটার গার্ড-বারান্দার নিচে। সংবাদপত্রেও অবশ্য ব্যাপারটা প্রকাশিত হয়েছিল—পড়েছিলেন কিনা জানি না।

সত্যশরণের কথায় কিরীটী চমকে ওঠে।

এই অঞ্জলের শেষ হ্যাকান্টির কথা মনের পাতায় সঙ্গে সঙ্গে ভেসে
ওঠে। অঙ্গুত ঘোগাযোগ তো! মনের কোঁচুহল দমন করে কিরীটী শান্ত-
কষ্টে বলে, তাতে আর হয়েছে কি!

না, তাই বলছিলাম আর কি। হাজার হলেও বন্ধুমানুষ তুমি, সব কথা
তোমাকে আগে থাকতে খুলে বলাই ভাল। আর ঠিক তার পাশের ঘরেই আমি
থাকি কিনা।

বটে! তা ভদ্রলোক মানে সেই অনিলবাবুর সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই
আলাপ-পরিচয় ছিল সত্ত? কিরীটী এবারে পাণ্টা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, তা একটু-আধটু ছিল বৈকি। পুলিশ অবশ্য সেজন্য আমাকে প্রশ্ন
করে কম হয়রানি করেনি!

অনিলবাবু তোমাদের ওখানে কতদিন ছিলেন?

তা প্রায় মাস দশক তো হবেই। তাই তো বলছিলাম, শান্তিশঙ্গ নিরীহ
ভদ্রলোক, তিনি যে হঠাতে এই ভাবে মারা যাবেন ভাবতেই পারিনি।

জীবন-মৃত্যুর কথা তো বলা যায় না সত্যশরণ। তাছাড়া কার জীবনে
কখন কেন্ট পথে যে কোন আকস্মিক ঘটনার আবির্ভাব ঘটে কেউ তো তা
বলতে পারে না।

তা যা বলেছ ভাই!

তা ছাড়া হয়ত এমনও হতে পারে, তোমরা তার সম্পর্কে ঘটটুকু জানতে
তার বাইরে এমন কোন ব্যাপার হয়ত তার জীবনে ছিল যেখানে তার ঐ
আকস্মিক মৃত্যুর কোন ঘোগস্ত্র ছিল।

কিরীটীর কথায় সত্যশরণ যেন হঠাতে চমকে ওঠে, বলে আশ্চর্য! তুমি—
তুম সেকথা জানলে কি করে কিরীটী?

কিরীটীও কম বিস্মিত হয়নি সত্যশরণ ঐভাবে হঠাতে তার কথায় চমকে
ওঠায়। নিছক কথার পিঠে কথা হিসাবেই কথাটা কিরীটী বলেছিল।

তাই পরক্ষণেই ম্দুরকষ্টে বলে, এর মধ্যে আম জানাজানির কি আছে! এ
তো অনুমান মাত্র। আর এমন কিছু অসম্ভবও নয়।

আমি অবশ্য পুলিসের কাছে বালিন কিছুই। কারণ পুলিসের ব্যাপার
তো জানই। তিলকে তাল করতে তারা সিদ্ধহস্ত। ওদের যত এড়িয়ে চলা
যায় ততই বৃদ্ধিমানের কাজ।

সত্যশরণের কথায় কিরীটী বেশ যেন একটু চাপ্পল্য অনুভব করে এবং
আরো একটু দেখে বসে প্রশ্ন করে, সত্যই কোন interesting ব্যাপার কিছু,

ছিল নার্কি তোমাদের সেই অনিলবাবুর জীবনে ?

তেমন কিছু না অবশ্য । সত্যশরণ এবাবে আমতা আমতা করে জবাব দেয় ।

কিরীটী বুঝতে পারে, সত্যশরণ বোঁকের মধ্যে হঠাতে কথাটা শুনু করে এখন কোন কারণে এড়িয়ে যেতে চাইছে তাকে ।

কিরীটী তাই এবাবে বুঝে যেনে একটু উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেই কঠে আরো ঘনিষ্ঠতার স্তুর ঢেলে বলে, আহা, বলাই না । শোনাই যাক না । প্রেম-জ্ঞে ঘটিত কিছু নার্কি ?

আশচর্য, সত্য তাই ! But how the devil you could guess !

আন্দাজে অন্ধকারে চিলটা নিক্ষেপ করলেও লক্ষ্যভেদ করেছে । কিরীটী মধু হেসে জবাব দেয়, আরে এ আর এমন কি কঠিন ব্যাপার ? Young man —ওইটাই তো স্বাভাবিক !

সত্যাই তাই । অনিলবাবুর জীবনে সাত বছরের এক মধুর প্রেমকাহিনী ছিল ।

বটে !

বাধা বা সংকোচ যতটুকু ছিল হঠাতে সেটা একবাব অপসারিত হওয়ায় ছিল । তবে একতরফা । অনিলবাবুই যেতেন দেখতাম মধ্যে মধ্যে বিনতা দেবীর সঙ্গে ছিল অনিলবাবুর ভলবাসা । অবস্থার উর্ণাত না করা পর্যবেক্ষণ বিবাহ হবে না, তাই চলেছিল ওদের উভয়ের অপেক্ষার পালা । অনিলবাবু প্রায়ই বলতেন আমাকে, ছেট একটি নিজস্ব নিরালা গৃহকোণ, ব্যাকে কিছু টাকা ও শান্ত নিরপেক্ষ জীবন । দীর্ঘ অপেক্ষার পর গত ফালগনে তাদের বিবাহের সব ক্ষিয়তি একপ্রকার হয়ে গিয়েছিল, সামনের বৈশাখেই শুভকাজ্জল সম্পন্ন করবেন তাঁরা । এবং অনিলবাবুর আকস্মিক রহস্যজনক ম্তুর দিন দুই আগেই ঐ আসন্ন উৎসবের কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনাও হয়েছিল ।

অনিলবাবুর সেই পরিচিতি বিনতা দেবীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি ? না । ফটোই দেখেছি কেবল, সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি ।

উভয়ের আসা-যাওয়া ছিল না ?

ছিল । তবে একতরফা অনিলবাবুই যেতেন দেখতাম মধ্যে মধ্যে বিনতা দেবীর ওখানে । বিনতা দেবীকে কখনো আসতে দেখিনি এখানে ।

অনিলবাবুর ম্তুর সংবাদ পেয়েও আসেনি ?

না । তবে তাঁর দাদা এসেছিলেন ভাগলপুর থেকে । মেসে অনিলবাবুর জিনিসপত্র যা ছিল নিয়ে যেতে ।

বিনতা দেবী কলকাতাতেই কোন স্কুলে বৃক্ষ শিক্ষার্থীর কাজ করতেন ? না । শুনেছি বাগনান গার্লস স্কুলের শিক্ষার্থী তিনি ।

ইতিমধ্যে গাড়ি শ্যামবাজারের কাছাকাছি এসে পড়ায় তখনকার অত আলাপ-আলোচনা বুঝ হয়ে গেল । পরবর্তী স্টপেজে উভয়ে প্লামগাড়ি থেকে অবতরণ করে ।

॥ ২ ॥

অবশ্য ন্যায়রক্ষ লেনে সত্যশরণের বর্ণন্ত নির্দিষ্ট বাসাটা ঠিক বাসা নয়, সেই মেস-বাড়ি, পৰেই সে কথা সত্যশরণ কিরীটীকে জানিবেছিল ।

বাড়িটা দোতলা; ওপরে ও নীচে চার ও তিন সর্বসমেত সার্টিট ঘর। এবং বাড়িটা নার্তপশম্পত গলির একপ্রকার শেষপ্রাঙ্গনে।

ওপরের তলার চারটি ঘরই মাঝারি আকারের। ছোটও নয় খুব, প্রশস্তও নয়। এবং চারটি ঘরের মধ্যে সর্বশেষ ঘরের আগের দর্শকণখোলা ঘরটিই খালি ছিল। ঘরটা কিরীটীর পছন্দ হওয়ায় গৃহকর্তার সঙ্গে সত্যশরণই কিরীটীর হয়ে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করে দিল এবং কিরীটী যথারীতি পরের দিনই দ্বিপ্রভাবে এসে ঘরটি অধিকার করল।

ঘরটি তার পছন্দ হয়েছে এবং বলতে গেলে পূর্বের ভাড়ার চাইতে কয়টি টাকা কর ভাড়াতেই পাওয়া গিয়েছে সত্যশরণের সন্ধারিণী।

কিরীটীর ঘরে কিরীটী একা। বাকী তিনটি ঘরে সত্যশরণকে নিয়ে মোট ছয়জন বোর্ডার আছেন। সত্যশরণকে বাদ দিয়ে বাকী পাঁচজনের মধ্যে দ্বৈজন হরিবলাস ও শ্যামবাবু উভয়েই প্রৌঢ় এবং সর্বাপেক্ষা প্রারম্ভ বাসিন্দা এ বাড়ির। এবং বলতে গেলে তাঁরাই বাকী বোর্ডারদের জুটিয়ে দোতলাটাকে সৈম মেসে পরিণত করেছেন। দু'জনেই মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন এবং প্রতি শনিবার অফিস থেকে আর বাসায় না ফিরে সোজা একেবারে দেশের বাড়িতে চলে যান। শনি ও রবিবারটা সেখানে কাটিয়ে সোমবার ভোরের গাড়িতে ফিরে আর মেসে না গিয়ে সোজা একেবারে অফিস করতে চলে যান। এমনি করেই প্রতি শনি ও রবিবারটা দেশের বাড়িতে কাটিয়ে সোমবার ভোরের গাড়িতে ফিরে অফিস করেন ছাপোয়া নিরীহ কেরানীর মত। এবং একেবারে ঘোরতর সংসারী শুরু দ্বৈজন এক ঘরেই থাকেন।

আর তিনজনই অল্পবয়সী। জীবনবাবু একটা সিনেমার গেটকীপার। মাসে শিশিট টাকা পান ও এক জায়গায় টিউশনি করেন। সুব্রাংশবাবু কোন একটি বিলাতী ঔষধের কোম্পানীর নন-মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং রজতবাবু একটি নামকরা বিলাতী ইন্সিডেন্স কোম্পানীর প্রায়মাণ দালাল। সত্যশরণ বাসাটা সৈম মেস বলেছিল, কারণ ওখানে কেবল থাকবারই ব্যবস্থা আছে। আহারের কোন ব্যবস্থাই নেই। দু'টি ভৃত্য আছে, বলাই ও রতন, বাবুদের প্রয়োজনমত দিনের বা রাতের আহাৰ সামনের প্রায়মাণ্যতার ঠিক ওপরেই অঞ্চল হোটেল থেকে নিয়ে আসা থেকে চা জলখাবার ও অন্যান্য ব্যবহারীয় সর্বপ্রকার ফ্রুট-ফ্ৰেজাসই থেকে থাকে। বেশীর ভাগ সময় দ্বৈবলা বোর্ডারৱা অবশ্য যে যার হোটেলে গিয়েই আহারপৰ্টা সেৱে আসেন প্রতাহ।

অঞ্চল হোটেলটির ব্যবস্থা ও ভালই। দামেও সম্ভা এবং সাধারণ ডাল ভাত তরকারি মাছের ঝোল এবং মধ্যে মধ্যে মাসও পাওয়া যায়।

অঞ্চল হোটেলটি অনেক দিনকার। এবং তার সামনের অংশে ছোট-খাটো একটা পাটিশন তুলে ও গোটা দু'তীন ভাঙ্গা নড়বড়ে চেবিল ও চেয়ার বেশ পেতে রেস্টুৱেটের ব্যবস্থা ও একটা আছে। অঞ্চল হোটেল রেস্টোৱার্ন।

অঞ্চল হোটেল ও রেস্টোৱার্ন মালিক একজন ঢাকার লোক।

ভদ্ৰলোকের নাম ভৃপ্তিচৰণ চাটুয়ে। সৱু প্যাঁকাটির মত রোগা ডিগ-ডিগে এবং কালো কালীর মত গায়ের রং।

বাড়িগোক কামানো, তেল-চকচকে ভাঙ্গা তোবড়ানো একখানা মুখ। পানের রস ও দোষ্টার মেছেতা পড়া ইঞ্জুরের মত ছোট ছোট দু'পাটি দাঁত।

গৱৰ মত দিবারাপ্তি প্রায় সবৰ্দা মুখে পানের জাবর কাটছেন।

লোকটি কিন্তু ভারি অমাধিক ও মিশ্রকে প্রকৃতির। খন্দেরের সূর্য-দুর্ঘৎ সূর্যবিধা-অসূর্যবিধা বেশ বোঝেন। হৃদয় আছে লোকটার। এবং সেইজন্যই পাড়াতে হোটেল বনাম রেস্টোরাঁট চলেও বেশ ভালই।

সত্যশরণদের মেসবাড়ি অর্থাৎ দোতলায় উঠবার সিঁড়িটার কাছেই নৌচের বাঁধানো উঠানের মধ্যে পার্টি শন তুলে উপরের তলার অধিবাসীদের কল-পায়খানার ব্যবস্থা হয়েছে। মোট কথা ওপরের তলার বাসিন্দাদের সঙ্গে নৌচের তলার অর্থাৎ বাড়িওয়ালা ও তাঁর পরিবারবর্গের কোন সম্পর্কই নেই, যদিচ ওপরের ঘরের জানালা ও বারান্দা থেকে নৌচের তলার পার্টি শনের অপর পার্শ্বের বাঁধানো উঠানের প্রায় সবটাই এবং ঘরের সামনেকার বারান্দার কিছুটা অংশ চোখে পড়ে।

নৌচের তলায় থাকেন সবটাই নিয়ে বাড়ির মালিক কবিরাজ শ্রীশাশ্বতের ভিষগ্রঞ্জ সপ্রিয়বারে। শান্ত নির্বিবেধী ভদ্রলোক শিশশেখের ভিষগ্রঞ্জ।

কালো আলকাতরার মত গাহবর্ণ। মেদবহুল থলথলে চেহারা। পিঠ ও বৃক্ষভৰ্ত ঘন কুণ্ঠিত রোমপাচুর্ষে মনে হয় যেন একটি অতিকায় রোমশ ভাঙ্গুক। বিশেষ করে যখন তিনি বাইরের ঘরের তস্তপোশের ওপরে বিস্তৃত মালিন ফরাসের ওপরে বসে থাকেন একটি থেলো হঁকো হাতে নিয়ে।

দাঢ়ি-গোঁফ নিখুতভাবে কামানো। মাথায় তৈলসিঙ্গ বাবরি চূল। কপালে আঁকা সব্দদাই একটি রঙ্গিনসিল্ডের পিপুল্বুক। মূলোর মত সাদা ঝকঝকে দন্তপাটি হাসতে গেলেই শুধু যে বিকশিত হয়ে পড়ে তাই নয়, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত তাঁচকুট সেবনে অভ্যন্ত কালচে বর্ণের মাড়িটও যেন খীঁচিয়ে ওঠে। তাতেই হাসিটা বিশ্রী কুৎসিত দেখায় আরো। কুৎসিত সেই হাসি শিশশেখেরের পুরু কালচে ওষ্ঠপ্রাণে যেন লেগেই আছে। কথায় কথায়ই তিনি হাসেন সেই কুৎসিত হাসি। তবে সশব্দ নয়, নিঃশব্দ। এবং কথা বলেন অত্যন্ত কম। স্বপ্নভাষী। শিশশেখেরকে কেউ বড় একটা কথা বলতেই দেখে না। ভদ্রলোকের সংসারে স্ত্রী—যাকে কখনো বড় একটা দেখাই যায় না এবং গলাও যার বড় একটা শোনাই যায় না, মুখের উপরে সব্দদাই দীর্ঘ একটি অবগুঠন টানা। বাড়ির বাইরেও বড় একটা তাকে দেখা যায় না।

এবং একটি ছেলে অনিলশেখের, বয়স বাইশ-তেইশ হবে।

আর একটি মেয়ে অমলা, বয়স বছর উনিশ-কুড়ির বেশী হবে না।

কি চেহারায় বা গাহবর্ণে কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে তার ছেলে ও মেয়ে অনিলশেখের বা অমলার যেন কোন সৌসাদ্যাই নেই।

অনিলশেখের ও অমলার রূপ যেন ঝলকল করে। যেমনই সৃষ্টাম সৃষ্টির চেহারা তেমনই উজ্জ্বল গৌর গাহবর্ণ।

সংসারে আরো একটি প্রাণী আছে। কবিরাজ মশায়ের দ্রুসম্পর্কীয় ভাগে নিষ্পত্তি।

ছেলেটির বয়স তেইশ-চার্বিশের মধ্যেই। নিষ্পত্তি কবিরাজ মশায়ের কম্পাউন্ডার বা অ্যাসিস্টেন্ট। নৌচের তলার তিনখানি ঘরের মধ্যে বাইরের প্রশস্ত ঘরটিতেই কবিরাজ মশায়ের রোগী দেখা হতে শুরু করে ডিসপেন-সারীর, ঔষধের কারখানা এবং নিষ্পত্তির থাকা-শোয়ার সব কিছু ব্যবস্থা।

ঘরের ২।৩ ও ১।৩ অংশের মধ্যে একটি কাঠের ফেমে চটের পার্টিশন বসানো।

পার্টিশনের একদিকে খানচারেক পুরানো সেকেলে সেগুন কাঠের তৈরি ভারী বার্নিশ ওঠা আলমারি। তার মধ্যে তাকের উপরে সজানো ছোট বড় ঘাসারির নালা অকরের শিশি, বোতল, বয়ম, জার—নানাবিধি কবিরাজী তেল, ভস্তু, গুলি, বিটচুর্ণ প্রভৃতি ঔষধে ভর্ত।

সাইনাসার্মান বড় বড় দ্রুটি তত্পোশ, পাশাপাশি জোড়া দিয়ে উপরে একটি তৈল-চিটাচিটে মালিন ফরাস বিছানো এবং তদুপরি অনুরূপ চারটি তারিয়া।

শাশশেখুর ভিষগ্রস্ত ঐ চৌকির ওপরে উপরিষ্ঠ অবস্থাতেই রোগীদের দেখা ও তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চালান। একপাশে একটি বেশ পেতে রঙিন পুরাতন একটি শাড়ি দর্জির সাহায্যে টাঙিয়ে আড়াল তুলে স্বীরোগীদের দেখবারও ব্যবস্থা আছে।

বাড়িটার উপরের তলাটি ভাড়া দিয়ে, কবিরাজী ব্যবসা করে, নিজস্ব তৈরি পেটেট দ্রুক্ষারিষ্ট, মহাবলচূর্ণ, অক্ষয় অম্বত সংজীবনী সুধা, পারিজাত মোদক, মুক্তাভস্তু, মহাশার্মিত বহুৎ বনরাজী তেল, ব্যাষ্টাবল রসবাটিকা, নয়নরঞ্জন সূর্যা ইত্যাদি সব বিক্রয় করে কবিরাজ মশায়ের যে বেশ দ্রুপ্যসা উপার্জন হয় সেটা তাঁর সচল অবস্থা দেখলেই অনুযান করতে একটুও কষ্ট হয় না। প্রতি মাসে ২২ বা তারিখে একটিবার করে সকালে কবিরাজ মশাইয়ের কাষ্টপাদ্বকার খট্খট্খট শব্দ উপরে ওঠবার সিপিড়ির মুখে ধৰ্মনিত হয়ে ওঠে।

বোর্ডারদের সামনে এসে একের পর এক দাঁড়ান দন্ত ও মাড়িয়োগে নিঃশব্দ কুণ্সিত তাঁর সেই পেটেট হাসিটি নিয়ে।

দেহরোম ও মেদবাহুল্যের জন্যই বোধ হয় কবিরাজ মশাইয়ের গ্রীষ্মবোধটা একটু বেশিই। শীত গ্রীষ্মে কোন প্রভেদ নেই। কবিরাজ মশাই তত্ত্বমতে কালীসাধক।

কপালের রক্তসিদ্ধের ত্রিপুণ্ড্রকটিই তার পরিচয়।

মাথার ঘন বাবরি চূল হতে উগ্র কটু একটা কবিরাজী তেলের গন্ধ কর্ব-রাজ মশাই সামনে এসে দাঁড়ালেই যেন ঘাণেলিন্দ্রয়ে জৰুলা ধৰিয়ে দেয়।

গা পাক দিয়ে ওঠে, বমনোদ্রেক আনে।

কবিরাজ মশাই বলেন, তেলটি তাঁরই নিজস্ব আবিষ্কার। মহাশক্তি-দায়িনী বহুৎ বনরাজী তেল। মি঳তক্ষ শান্ত ও শীতল রাখার অবার্থ মহোর্ধি।

উপরে এসে একটিমাত্র কথাই বলেন কবিরাজ মশাই, গরীব ব্রাহ্মণকে দয়া করুন।

ভাড়াটে ও বাড়িওয়ালা পরম্পরের মধ্যে মাসান্তে একটিবার মাত্র ও ঐ একটি কথারই আদান-প্রদান ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নেই।

ধরভাড়া অবশ্য যে যার সকলেই চুকিয়ে দেন চাওয়া মাত্রই।

বলতে গেলে উপরের তলার অধিবাসীরা প্রতি মাসের দ্রুই তারিখের ঐ সময়টির জন্য যেন পূর্ব হতে প্রস্তুতই হয়ে থাকেন।

দিন পনের হলো কিরীটী এই বাড়ীতে এসেছে এবং ইতিমধ্যেই সকলের সঙ্গেই অঙ্গবিন্দুর আলাপ-পরিচয়ও হয়ে গিয়েছে। সত্ত্বশরণকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বাদবাবাকি পাঁচজন সহ-বোর্ডারদের মধ্যে একমাত্র ইন্সিগ্নেলের দালাল রজত-বাবুই যেন কিরীটীর দ্রষ্টব্য একটু বেশি আকর্ষণ করেছেন।

কিরীটীর ঘরের একপাশে থাকেন রজতবাবু ও অন্যপাশে সত্ত্বশরণ।

রজতবাবুর বয়স যাই হোক না কেন, ৩০-৩১-এর বেশি নয় বলেই মনে হয়। রোগাটে ছিপছিপে গড়ন। উজ্জ্বল শ্যাম গাত্রবর্ণ। চেখেমুখে বৃক্ষের একটা অঙ্গুত্ব ধারালো তৈক্ষ্ণদীপ্তি। চোখে সরু সোনার ফেমে শোর্ছিখ চশমা। ভদ্রলোকের বেশভূষাতেও সর্বদা একটা শোর্ছিখ পরিচ্ছম রঁচির পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্সিগ্নেলের দালালীতে যে তাঁর অর্থাগমটা ভালই ভদ্রলোকের চাল-চলন আচার-ব্যবহার ও রূচিবিলাস হতেই স্পষ্ট বোৱা যায়। হাতও বেশ দরাজ।

কারণ এই বাড়ির সহ-বোর্ডারদের প্রায়ই এটা ওটা পাঁচরকম দামী খাবার এনে থাওয়ান ও নিজেও খান এবং মধ্যে মধ্যে সিনেমা-থিয়েটারেও নিয়ে থান।

আম্যামাণ দালাল, সেইজন্য মধ্যে মধ্যে দুর্চার-পাঁচদিনের জন্য এবং কখনো-কখনো দশদিনের জন্য কলকাতার বাইরে বাইরে তাঁকে ঘুরে বেড়তে হয়।

উপরের তলার অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র রজতবাবুরই নাচে কবিরাজ মশাইয়ের বাহু ও অন্দরমহলে যে যাতায়াত আছে, প্রথম দুর্চারদিনেই কিরীটীর সেটা নজর এড়ানন। এবং রজতবাবুর নাচের তলার অনিষ্টতা সম্পর্কে উপরতলার বোর্ডার সিনেমার গেটকাপার জীবনবাবুর দুর্চারটে অস্ত্রযন্ত্র রসালো মন্তব্য যে কিরীটীর সদাসতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়কে এড়িয়ে গিয়েছে তাও নয়। কিরীটী লক্ষ্য করেছিল নাচের তলাকার অধিবাসীদের মধ্যে কবি-রাজ মশাইয়ের ছেলে ও মেয়ে অনিলশেখের ও অমলা উভয়ের। সঙ্গেই রজত-বাবুর কিঞ্চিৎ বেশ যেন আলাপ-পরিচয় আছে। কেবলমাত্র অবগুপ্তনের অন্তরালবর্তনী, নিঃশব্দচারিণী কবিরাজের গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে কিনা সেটা জানবার সুযোগ হয়নি কিরীটীর। কবিরাজ-গৃহিণীকে তো কখনোও বাইরে বের হতে দেখা যেত না, কারণ শোনা যায় কবিরাজ মশাই নাকি সেটা পছন্দ করেন না। তাঁকে নিজেকেও বড় একটা বাইরে বের হতে দেখা যায় না। বেশীর ভাগ সময় সকাল সাতটা থেকে বেলা একটা পর্বন্ত ও দ্বিপ্রহর দুটো থেকে বেলা পাঁচটা পর্বন্ত ও সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে রাত্তি এগারটা প্রতাহই এবং কোন বোন রাত্রে বারোটা সাড়ে বারোটা পর্বন্ত কবিরাজ মশাই বাইরের ঘরেই থাকেন। এবং তিনি যে আছেন সেটা মধ্যে মধ্যে একটি-মাত্র তাঁর কণ্ঠনিঃস্ত শব্দে জানা যেতঃ মাগো করালবদনী ন্যূন-ডমালিনী, সবই তোর ইচ্ছা মা—

প্রায় সদা নিঃশব্দ লোকটির বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ হতে ঐ করালবদনী ন্যূন-ডমালিনী শব্দ দুর্টি যেন সমস্ত নাচের তলাটা গম গম করে তুলত।

কর্বিরাজ ও তস্য গৃহিণীকে বাড়ির বাইরে না দেখা গেলেও দ্বিজপদ, কিংব সুন্দরী ও কর্বিরাজের ছেলে অনিলশেখর ও মেয়ে অমলাকে প্রায়ই আসতে যেতে দেখা যেত।

তাদের চেহারা চালচলন বেশভূষা কোনটারই যেন কোন সাধারণ খুঁজে পাওয়া যেত না কর্বিরাজের সংস্কৃতির সঙ্গে।

পরিচ্ছন্ন ছিমছাম বেশভূষা উভয়েরই।

অনিলশেখর বি. এ. ক্লাসের চতুর্থ বার্ষিকীর ছাত্র এবং মেয়ে অমলা আই. এ. ক্লাসের ছাত্রী।

একদিন সন্ধ্যার দিকে নিত্যকারের মত সান্ধান্তরণে বের হয়ে গালির মুখে নিম্নকণ্ঠে ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনারত অঘলা ও রজতবাবুকে দেখে কিরীটী বুঝতে পেরেছিল রজতবাবুর নীচের তলায় সত্যকারের আকর্ষণটি কোন্তানে।

কিন্তু ন্যায়রঞ্জ লেনের উপর ও নীচের তলার অধিবাসীদের লক্ষ্য করার চাইতেও যে উদ্দেশ্যে কিরীটী খুঁজে-পেতে কষ্ট করে ঐ অঞ্চলে এসে ডেরা বেঁধেছিল, কিরীটীর চিন্তাধারাটা বিশেষ ভাগ সময় বিক্ষিপ্ত ভাবে তারই মধ্যে আবশ্য থাকত বলাই বাহুল্য।

দিন পনের গত হয়ে গেল কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিশেষ কোন কিছুই এ অঞ্চলের কিরীটীর অনসন্ধিত্বস্থ মনকে নাড়া দিতে পারেন।

তবু তার সতর্কতার অভাব ছিল না! বাইরে থেকে বেকার শান্তিশৃঙ্খল ও একালত নির্লিপ্ত তাকে মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তার তীক্ষ্ণ শ্রবণ-মননশক্তি চারিদিকেই সমভাবে প্রাক্ষিপ্ত হয়ে থাকত।

সকালে ও নিম্নপ্রহরে কিরীটী নিজের ঘর থেকে বড় একটা বেরই হত না। বের হত একেবারে সন্ধ্যা সাতটার পর। এবং রাত বারোটা, কখনো কখনো বা একটা দেড়টা পর্যন্ত আশেপাশে সমস্ত অগুলটার পথে গালিতে সদাসতক দ্বিষ্টতে, অথচ বাইরে নির্লিপ্ত পর্যাপ্তের মত ঘৰে ঘৰে বেড়াত।

এম্বিন করেই দিন চলাছিল।

সহসা এমন সময় একদিন শান্তিশৃঙ্খল পুরুকরণীর জলরাশিতে ছোট্ট একটি জ্বোর্ষাধাতে ঘেমন তরঙ্গ জাগে এবং ক্রমে সেই চক্রকারে ঝুঁমিবিস্তৃতমান তরঙ্গ-চক্র তটপ্রামলে আছড়ে পড়ে শব্দ তোলে, ঠিক সেইভাবেই ব্যাপারটা শব্দায়িত হয়ে উঠলো আচমকা।

বিকেল চারটে হবে।

উপরের তলার সৈম-মেসের বোর্ডাররা কেউই তখন অফিস ও কর্মস্থল থেকে ফেরেন নি, একমাত্র রজতবাবু ব্যতীত। অবশ্য কিরীটী তার ঘরে নিত্যকারের মত দরজাটা ভেজিয়ে ঐদিনকার বহুবার পঠিত সংবাদপত্রটাই আবার উল্টে-পাল্টে দেখছিল।

রজতবাবু দিন চারেক ছিলেন না যেসে। ঐদিন সকালের দিকে পাটনা থেকে ফিরেছেন টুর সেরে।

গুনগুন করে সবৰদাই প্রায় ষষ্ঠ রজতবাবু তাঁর ঘরে থাকেন, গান করা তাঁর একটা অভ্যাস। এবং কিরীটী পাশের ঘর থেকে তাঁর সেই গুনগুনানি শুনেই বুঝতে পেরেছিল রজতবাবু, তাঁর ঘরেই আছেন। আর মাত্র মিনিট কুড়ি আগে যে রজতবাবু নীচে নেমেছিলেন তাঁর জুতোর শব্দেই বুঝতে

পেরেছিল কিরীটী।

হঠাতে নীচের তলা থেকে, বলতে গেলে এখানে আসবার পর এই প্রথম কিরীটী ভিষ্ণুর নাতি-উচ্চ কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে সত্তাই চমকে ওঠে।

ভদ্রলোক ! জেন্টেলম্যান ! তের দেখা আছে আমার। ফের এ-বাড়ি-মধুখো হয়েছো কি ঠাঃ ভেঙে খোঁড়া করে দেবো জম্মের মতো। বেরোও ! বেরিয়ে যাও !

কোতুলে কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ ও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

কবিরাজের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় রজতবাবুর মেঝেলী চংশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আপানি বা অত চেঁচাচ্ছেন কেন বলুন তো মশাই ! বিবাহ করবো তো আমি, আর বিবাহটা হবে অমলার সঙ্গে—আপানি তো অবাঞ্চর তৃতীয় পক্ষ।

বাধের মতই যেন ভিষ্ণু এবারে গর্জে উঠলেন, কি কি বললি বেটা ! আমি তার জন্মদাতা বাপ, আমি তৃতীয় পক্ষ ! আর তুই কোথাকার এক ভবস্থুর ইনসিওরেন্সের দালাল, তুই হলি প্রথম পক্ষ ! বেরো ! বেরো এখান থেকে—

বেরিয়ে আমি নিশ্চয়ই যাবো। মনে রাখবেন কেবল পুরুষ ভদ্রতার খাতিরেই কথাটা বলতে এসেছিলাম, নচে মেঝেও আপনার সাবালিকা এখন। এ বিয়ে আপানি চেঁচা করলেও আটকাতে পারবেন না।

রজতবাবুর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই ভিষ্ণুর কণ্ঠ আবার শোনা গেল, কালই তুই আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। নইলে তোর মত কুরুদের কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি। বেটা নজ্জার পাজী ছঁচো—থাম্বন থাম্বন—অত চেঁচাবেন না, হাতে হাঁড়ি ভেঙে দেবো মশাই !

ওঃ, অথ বিবাহঘটিত ! প্রেম—প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ব্যাপার !

সেই চিরপ্রাতন অথচ চিরন্তন পঞ্চশরের ফুলবাণ পর্ব !

হায় হায় সম্যাসী ! কি করছো তুমি পঞ্চশরের ভস্মরাশি বিশ্বস্ত ছাড়িয়ে দিয়ে জানতে যাদি ! কিন্তু এ যে বেশ গুরুতর ব্যাপার !

প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে, বিবাহটা শেষ পর্যন্ত যাদি ঘটে যাই, ভদ্রলোক শ্রেণিখন রজতবাবুর পক্ষে তাঁর বোমশ ভঙ্গুকার্তি কবিরাজ শ্বশুরমশাইটির তো একেবারে বদহজম ঘটাবে !

নাঃ, আজকালকার আধুনিক মাতিগতির ছেলেমেয়েরা বড় বেশী যেন দৃঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

আবার রজতবাবুর কণ্ঠস্বর কিরীটীর কানে এলো, শুনুন মশাই, ভালুর জন্যই বলাছি, বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না এ নিয়ে। অমলাকে আমি বিবাহ করবোই, আপনার পিতৃস্তর পেনাল-কোডের আইন-কানুন ধোপে টিঁকিবে না। মিথ্যে মিথ্যে কেন আমেলা করছেন ! ভালুয় ভালুয় রাজী হয়ে যান। ভদ্রভাবে ব্যাপারটা চুকেবুকে যাক, all expense আমার I promise !

কে তোমার promise চায় হে ছোকরা ! প্রিজপদ, আমার লাঠিটা দাও তো—কবিরাজ মশাই হাঁক দিলেন।

প্রজ্ঞাপদ ভাবী শ্বশুরের লাঠি ! ভাবী পঞ্জীয় প্রজ্ঞানীয় পিতৃদেব হলেও অব্যবহৃত আধুনিক হবু জামাইয়ের বোধ হয় আর সাহসে কুলায় না। সবেগে

প্রস্থান করলেন। বেচারী রজতবাবু!

এমনিতে বাইরে শোঁখিন প্রকৃতির ও নিরীহ শান্তিশিষ্ট দেখতে হলে হবে কি, রজতবাবু ভদ্রলোকটিকে তো কিরীটীর মনে হচ্ছে এখন বেশ করিতকর্মই।

ইতিমধ্যে একসময় কখন এক ফাঁকে দীর্ঘ সন্দর্ভী করিবারজ-নাল্দিনীর মনোরঞ্জন করে বসে আছেন এবং স্বয়ং পিতৃদেব হয়েও ভিষগ্রস্ত ব্যাপারটির বিশ্লেষণ টের পার্নান।

কিরীটী সংবাদপত্রে আর মনোনিবেশ করতে পারে না।

এবং একটু পরেই রজতবাবুর পদশব্দ সিংড়িতে আবার শোনা গেল।

কিরীটী ব্যৱত্তে পারে রজতবাবু তাঁর ঘরে এসে প্রবেশ করলেন এবং আবার সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দে বোৰা গেল বাইরে বের হয়ে গেলেন।

সেই যে রজতবাবু গেলেন, দিন দ্বাই আর ফিরলেন না মেসে।

কিন্তু আশ্চর্য, উক্ত ব্যাপার নিয়ে সেই দিন বা তার পরের দিনও নীচে ভিষগ্রস্তের অন্দরমহলে কোনপ্রকার সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না !

এমন কি পরের দিন নিয়প্রহরের দিকে কিরীটীকে একটু বের হতে হয়ে-ছিল, ফিরবার পথে গালির মাথায় অমলার সঙ্গে চোখাচোখি ও হয়ে গেল। সঙ্গে তার এক সহপাঠিনী বা বাধ্যবী বোধ হয় ছিল। পরম্পর পরম্পরের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে করিবারজ-গৃহের দিকেই আসছিল।

রজতবাবু ফিরে এলেন দিন দ্বাই পরে নিয়প্রহরে।

জ্যৈষ্ঠের শেষ। প্রথম রোদ্বৃতপ্ত নিয়প্রহরে আকাশটা যেন একটা তাঘার টাটের মত পুড়ে ঝাঁঝাঁ করছে। বাতাসে যেন আগন্তের উপ একটা বিপ্রী ঝাঁঝ।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কিরীটী একটা টেবিলফ্যান চালিয়ে একজোড়া তাস নিয়ে পেসেস খেলছিল—বাইরে থেকে রজতবাবুর গলা শোনা গেল।

ভিতরে আসতে পারি কিরীটীবাবু!

আরে কে ও, রজতবাবু যে ! আসুন আসুন।

দরজা টেলে রজতবাবু এসে কিরীটীর ঘরে প্রবেশ করলেন।

বেশভূষা যেন সামান্য একটু অলিন, মাথার চূল অয়স্ত-বিন্যস্ত, ঘৃঢ়খানি কিন্তু বেশ প্রফুল্ল হনে হল।

হঠাৎ রজতবাবুর ঘূর্ণের দিকে তাঁকয়ে কেন যেন কিরীটীর মনে হয়, মাত্র এই দ্বাই দিনেই ভদ্রলোকের বয়সটা যেন হ্ৰহ্ৰ করে বেড়ে গিয়ে গালে ও কপালে বয়সের রেখা পড়েছে।

বসুন বসুন—তারপর কি থবৰ রজতবাবু ? এ দ্বিদিন ছিলেন কোথায় ?

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে ক্লান্ত অবসম্ব কষ্টে রজতবাবু বললেন, একটু কাজ গিয়েছিলাম বৰ্ধমানে।

কিরীটী উঠে টেবিলফ্যানটা একটু ঘূরিয়ে দিল রজতবাবুর দিকে। বললে, ইন্সওরেন্সের ব্যাপারে বোধ হয় ?

না। দাদামশাইয়ের একটা ঝাঁড় আছে বৰ্ধমানে। মা যত্নদিন বেঁচে ছিলেন ঐখানেই তো ছিলেন। তাঁর ঘৃত্যুর পৰ থেকে ঝাঁড়টা তালা দেওয়াই পড়েছিল। কথাগুলো বলে একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, কলকাতায় আর নষ্ট ভাবছি, এবার সেখানে গিয়েই থাকবো।

কাজকর্মের আপনার অসুবিধা হবে না কলকাতা ছেড়ে গেলে ?

না মশাই। কলকাতা শহর তো নয় যেন একটা বাজার। ঘোনা ধরে গিয়েছে আপনাদের এই ধূলো বালি ধোঁয়া আর ছত্রিশ জাতের মানুষের ভিড়ের কলকাতা শহরের ওপরে! মানুষ থাকে এখানে !

কিরীটী আজকে রজতবাবুর কথাগুলো শুনে যেন বেশ একটু অবাক হয়। কারণ করেকদিন আগেও রজতবাবুকে কিরীটী বলতে শুনেছে, ছোঃ ছোঃ, আপনাদের গ্রাম্যজীবন আর স্বার্ব মাথায় থাক আমার ! বেঁচে থাক আমার এ কলকাতা শহর। কথাটা বলছিলেন রজতবাবু সিনেমার গেটকৌপাল জীবনবাবুকে। আজকাল মানুষের সেরা তীর্থস্থান হল কলকাতা আর বোম্বাই—এই দুটি শহর, বুঝলেন মশাই !

কিন্তু কিরীটী মুখে জবাব দেয়, তা যা বলেছেন।

হঠাৎ পরক্ষণেই রজতবাবু চোয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আচ্ছা চলি মশাই ! দিক্ষণ পাড়ায় একটা জরুরী কাজ আছে, সেরে আসি।

রজতবাবু আর দাঁড়ালেন না। বের হয়ে গেলেন। হঠাৎ যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎই যেন প্রস্থান করলেন।

কেনই বা এলেন আবার হঠাৎ কেনই বা চলে গেলেন কিরীটী যেন ঠিক বুঝতে পারে না।

বধূরানে গিয়েছিলেন এই সংবাদটুকুই মাত্র কিরীটীকে দেবার এমনই বা কি প্রয়োজন ছিল ! না, ভদ্রলোকের আরো কিছু বলবার বা কিছু জানাবার ছিল কিরীটীর কাছে। অন্যমনস্ক ভাবে কিরীটী তাসগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

নিদ্রপ্রহরের স্তৰ্য নির্জনতায় একটা ক্লান্ত রিক্শার ঘিন্টির ঠুঠুঠুঠুঠুঠু শব্দ নীচে গলির পথে ঝুঁমে ঝুঁমে মিলিয়ে গেল।

বাইরে বারান্দায় রেলিংয়ের ওপরে বসে একটা কাক কর্কশ স্বরে কা কা করে ডাকছে।

॥ ৪ ॥

ঐদিনই রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা হবে।

নিয়ন্ত্ৰিত রাতের টিল সেরে কিরীটী ন্যায়রত্ন লেনের বাসায় ফিরছিল। নিয়ম নিয়ম হয়ে গিয়েছে পাড়াটা। গালির মুখে গ্যাসের বাতিটাও যেন স্তৰ্যমত মধ্যরাত্রির ক্লান্ত রাতজাগা প্রহরীর মত একচক্ষু মেলে পিট্ৰ পিট্ৰ করে তাকিয়ে আছে একান্ত নির্লিপ্ত ভাবে।

গলিপথের শেষ পর্যন্ত শেষ গ্যাসের আলোটি পর্যাপ্ত নয়। অস্পষ্ট ধৰ্মাটে একটা আলোছায়ায় যেন রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে গলিপথের শেষপ্রান্তে।

মধ্যপৰ্যন্ত রাতের আকাশের যে অংশটুকু মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে সেখানে শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কঠেকটি ঝকঝকে তারা।

অন্যমনস্ক ভাবে শুল্প পায়ে কিরীটী ফিরছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়া কিরীটী। গলিপথের শেষ প্রান্তের প্রায় সমস্তটাই জুড়ে একটা কালো রঙের সিডন বড় গাড়ির পশ্চাত দিকের অংশটা যেন সামনের শেষ পথটুকুর স্বষ্টাই

প্রায় রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আবছা আলো-অধীরিতে গাড়ির পেছনের প্রজর্বলিত লাল আলোটা হেন
শয়তানের রস্তচক্ষুর মত ধূক্ষণ করে জুলছে।

এবং পথের মাঝখনে হঠাতে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কিরীটীর অন্য-
মনস্ক নিষ্ক্রিয়তাটা কেটে যায়।

সবচল্ল ইন্দ্ৰীয় তাৰ সজাগ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে মৃহৃতে।

এই পরিচিত অপ্রশংস্ত গালিৰ মধ্যে এত রাখ্যে অত বড় চক্ৰকে গাড়িতে
চেপে কাৰ আবাৰ আৰিভৰ্তাৰ ঘটলো!

সঙ্গে সঙ্গে কিৰীটীৰ মনে পড়ে, ইতিপূৰ্বে আৱো দৃদিন এই গালিপথেই
কোন গাড়ি ঠিক আসতে বা ষেতে তাৰ নজৰে না পড়লো—গাড়িৰ টায়াৱেৰ
কাদা-মাখা ছাপে তাৰ চোখে পড়ছে।

তবে হয়ত এই গাড়িৰই টায়াৱেৰ ছাপ ও দেখেছে!

গাড়িৰ পিছনেৰ নাম্বাৰ-প্লেটটাৰ দিকে ও তাকাল।

W. B. B. 6690।

আবছা আলো-অধীকারেও গাড়িৰ কালো মসণ বাঁড়িটা চক্ৰক্ৰ কৱাছে।

হঠাতে কিৰীটী আবাৰ সৰ্তক হয়ে ওঠে গাড়িৰ দৱজা খোলা ও বন্ধ কৱাৰ
শব্দে।

তাৰপৰই কানে এলো দৃষ্টি কথা।

আচ্ছা, তাহলে তাৰ কথাই রইল। একটি চাপা পুৱুৰুষ-কষ্ট।

ম্বিতীয়ৰ কষ্টটি কোন নারীৰ হলেও কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেল না।

সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনেৰ শব্দ শোনা যায়। গাড়িটা ব্যাক কৱাছে।

দ্রুতপদে কিৰীটী পিছিয়ে গিয়ে ঐ গালিৰ মধ্যেই বাঁড়িৰ মধ্যবতৰ্তী সৰু
অধীকার প্যাসেজটাৰ মধ্যে আঘাগোপন কৱে দাঁড়াল।

গাড়িটা ধীৰে ধীৰে ব্যাক কৱে গালিপথ থেকে বেৱ হয়ে গেল।

দায়ী গাড়ি, ইঞ্জিনেৰ বিশেষ কোন শব্দই শোনা গেল না।

আৱো চাৰ-পাঁচ মিনিট বাদে কিৰীটী আবাৰ অগ্রসৱ হল বাসাৰ দিকে
অন্যমনস্কভাৱে ভাবতে ভাবতে।

এবং একটু এগিয়ে যেতেই তাৰ নজৰে পড়লো নৌচেৰ তলায় কৰ্বৱাজ
মশাইয়েৰ বাইৱেৰ ঘৱেৱ খোলা জানলাপথে তখনও আসছে আলোৱ একটা
আভাস।

সদৰ দৱজাটা বন্ধ কিন্তু গালিৰ দিককাৰ জানলা খোলা।

হঠাতে কৌতুহলকে দমন কৱতে না পেৱে কিছুমাত্ৰ ম্বিধা না কৱে সৰ্তক
পদসংগ্ৰহে শিকাৰী বিড়ালেৰ মত পা টিপে টিপে আলোকিত বাইৱেৰ ঘৱেৱ
জানলাটাৰ সামনে এগিয়ে গেল কিৰীটী।

জানলার নৌচেৰ পাট বন্ধ, উপৱেৱ পাটটা খোলা।

ৱাঙ্গলা থেকে জানলা এমন কিছু উচ্চ নয়, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকালেই
ভিতৱেৰ সব কিছু সহজেই নজৰে পড়ে।

জানলার কোণ ধৈঘে দাঁড়িয়ে ত্যারচাভাৱে কিৰীটী আলোকিত কক্ষমধ্যে
দৃষ্টিপাত কৱল। রোমশ ভজ্জুকেৰ মত উদ্গৱে গায়ে জোড়াসন হয়ে কৰ্বৱাজ
ভিষগ্ৰহ ফৰাসেৰ উপৱে বসে আছেন।

আৱ তাৰ অদ্বৰে ঘৱেৱ মধ্যেকাৰ পার্টি-শনেৰ পৰ্দাটা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন

চিন্পার্পর্টের মত অপরূপ লাবণ্যময়ী এক নারী। বয়স কিছুতেই শিশ-বাঁশিরের
বেশী হবে না বলেই মনে হয়।

পরিধানে ধৰ্মধৰে সদা কালো চওড়া শান্তপূরী শাড়ি। মাথার অবগৃষ্টন
খসে কাঁধের উপরে এসে পড়েছে।

গলার চক্রকে সোনার হারের ক্রিয়ৎ দেখা যায়। হাতে সোনার চৰ্দি।
কপালে দুই টানা বাঁকিয় ভৱ্র ঠিক মধ্যস্থলে একটি সিল্কের টিপ, কিন্তু ঐ
সামান্য বেশভূষাতেও তার রূপ যেন ছাঁপিয়ে যাচ্ছে।

কোন মানুষ নয়, যেন পটে আঁকা নিখুঁত একখানি চিত্র। মৃদু কিরীটীর
দৃঢ়চেখের দৃঢ়িট যেন বোবা স্থির হয়ে থাকে।

হঠাৎ চাপাকষ্টে সেই নারীচিত্র যেন কথা বলে উঠলো, ঘথেষ্ট তো হয়েছে,
আর কেন! এবাবে ক্ষমা দাও।

নিঃশব্দ কৃৎসিত হাসিতে ভম্ভুকসদ্শ ভিষগ্রন্থের মৃদুখানা যেন আরো
বীভৎস হয়ে উঠলো মৃহৃত্তে। কেবল একটি কথা সেই নিঃশব্দ কৃৎসিত হাসির
মধ্যে শোনা গেল, পাগল!

আচ্ছা তুমি কি! শয়তান না মানুষ!

আবার সেই কৃৎসিত নিঃশব্দ হাসি ও সেই পূর্বোচ্চারিত একটিমাত্র শব্দ,
পাগলী!

ছিঃ ছিঃ, গলায় দাঢ়ি জোটে না তোমার!

দৃঢ়সহ ঘৃণা ও লজ্জায় যেন ছিঃ ছিঃ শব্দ দৃঢ়িট নারীকষ্ট হতে উচ্চারিত
হল।

এবাবে আর প্রত্যুষেরে হাসি নয়।

সেই পরিচিত দৃঢ়িট কথা।

মাগো! করালবদনী ন্মুণ্ডমালিনী সবই তোর ইচ্ছা মা—

কবিরাজ মশাইয়ের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, যাও। যাও—ভিতরে
যাও। পাগলামি করো না, আমার পূজার সময় হল।

এরপর আর ভদ্রমহিলা দাঢ়িলেন না। কেবলমাত্র তীব্র তীক্ষ্ণ একটা কটাক্ষ
হেনে মাথায় ঘোমটাটা তুলে দিয়ে নিঃশব্দে অন্দরেই বোধ হয় প্রস্থান করলেন।
এবং যাবার সময় তাঁর দৃঢ়চেখের দৃঢ়িটা যেন মৃহৃত্তের জন্য ধারালো ছুরির
ফলার মত ঝিকিয়ে উঠলো বলে কিরীটীর মনে হলো।

ভিষগ্রন্থ মহিলাটির গমনপথের দিকে বাবেকমাত্র তাকিয়ে আবার সেই
নিঃশব্দ কৃৎসিত হাসি হাসলেন দলতপাটি বিকশিত করে। এবং নিম্নকষ্টে
বললেন, মাগো করালবদনী ন্মুণ্ডমালিনী!

ভদ্রমহিলাটি কে?

ইতিপূর্বে কিরীটী শুঁকে কথনও দেখেনি।

তবে কি উনিই কবিরাজ মশাইয়ের সেই অন্তঃপূর্চারণী সদা-অবগৃষ্টন-
বতী সহধর্মণী! কিন্তু যদি তাই হয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব একটা প্রীতির
সম্পর্ক আছে বলে তো মনে হল না কিরীটীর, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্ষণপূর্বের
কথাগুলো শুনে!

আর অতবড় চক্রকে গাঢ়ি হাঁকিয়েই বা এই গভীর রাহে কে এসেছিল
কবিরাজগ্রহে!

দিনের বেলায় তো কখনো কাউকে অতবড় গাঢ়ি হাঁকিয়ে কবিরাজ-ভবনে

କିରୀଟୀ ଆସତେ ଦେର୍ଖେନ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏବଂ ସେଇ ହୋକ ଆଗମ୍ଭୁକ, ତାକେ ଗାଡ଼ିତେ ବିଦାୟ ଦିତେ ଗିଯେଛିଲ ନିଶ୍ଚରାଇ ଏ ମହିଳାଇ । କବିରାଜ ମଶାଇ ସାରାନି । ତିନି ସରେର ମଧ୍ୟେଇ ଛିଲେନ ।

ଆନେକ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିରୀଟୀର ମାଥାୟ ଏ ଚିନ୍ତାଗ୍ଲୋଇ ସୌରାଫେରା କରତେ ଥାକେ ବାରବାର । କେ ଏ ମହିଳା !

ଆର କେଇ ବା ସେଇ ଆଗମ୍ଭୁକ ନିଶ୍ଚୀଥ ରାତ୍ରେ ଗାଡ଼ି ହାଁକିଯେ ଏସିଛିଲେନ କବିରାଜ-ଭବନେ !

କିରୀଟୀ ଏହି କର୍ମଦିନେ ପାଡ଼ାର ଦୃଢ଼ାରଙ୍ଗନେର କାଛ ଥେକେ ଓ ଅନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ରେସ୍ତେରାରୀଯ ଚାରେର କାପ ନିଯେ ବସେ ବସେ କବିରାଜ ମଶାଇରେ ସମ୍ପର୍କେ ସେ ସଂବାଦ-ଟ୍ରେକୁ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରତେ ପେରେଇଁ ତାତେ କରେ ଏହିଟାଇ ବୋବା ସାର ସେ ଭିଷଗ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକଟ ମନ୍ଦ ନାୟ । ନିର୍ବିବାଦୀ, ଶାନ୍ତିଶଙ୍କତ ଭଦ୍ରଲୋକ ; ପାଡ଼ାର କାରୋ ସଙ୍ଗେ କୋନ ଝଗଡ଼ା-ବିବାଦ ନେଇ । କାରୋ ସାତେଓ ନେଇ ପାଁଚେଓ ନେଇ । ନିଜେର କବିରାଜୀ ସାବଦା ଓ ଉଷ୍ଣଧପତ୍ର ନିଯେଇ ସର୍ବଦା ସ୍ଵକ୍ଷପନ ।

ମିତଭାରୀ କବିରାଜ ମଶାଇ ପାଡ଼ାର କାରୋ ସଙ୍ଗେଇ ବଡ଼ ଏକଟା ମେଶାମେଶ କରେନ ନା । ସଦିଓ ତାଁର ପ୍ରତକଳ୍ୟାର ସଙ୍ଗେ ଅନେକେରାଇ ଆଲାପ-ପରିଚର ଆଛେ ପାଡ଼ାର ମଧ୍ୟେ ।

କବିରାଜ ମଶାଇରେ କଥା ଭାବତେ ଭାବତେ ନତୁନ କରେ ଆବାର କିରୀଟୀର ଅନିଲବାବୁର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ।

କିରୀଟୀର ସରେଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ଛିଲେନ ।

ଏ ଧ୍ୟାରାଧିର ଶାନ୍ତ ନିଷ୍ଠତବ୍ୟତାର ଏକାକୀ ଏ ସରେର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତରୁତ ଏକଟା ଅନ୍ତରୁତ ସେଇ କିରୀଟୀର ମନକେ ଅଞ୍ଚୋପାଶେର କ୍ଲେଦାକ୍ତ ଅଞ୍ଚିବାହୁର ମତ ଚାରପାଶ ଥେକେ ଜୁଡ଼ିଯେ ଧରତେ ଥାକେ ।

ମାତ୍ର ମାସ ଦେଡ଼େକ ଆଗେ ହଠାତ୍ ଏକଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷେ ତାଁକେ ଏ ସରେ ଆର ଦେଖା ଗେଲ ନା—ଏବଂ ପରେ ତାଁର ମୃତ୍ୟେ ଆବିଷ୍କୃତ ହଲ ଶ୍ୟାମବାଜାର ପ୍ଲାମ ଡିପୋର ପିଛନେର ରାଙ୍ଗତ୍ୟା । ଭଦ୍ରଲୋକେର ପ୍ରେମ ଛିଲ ଏକଟି ତରୁଣୀର ସଙ୍ଗେ ।

ବାଗନାନ ଗାର୍ଲ୍‌ସ ସ୍କୁଲେର ଏକଜନ ଶିକ୍ଷୟାତୀ । ନାମ ବିନତା ଦେବୀ ।

ଆଜ୍ଞା, ଭଦ୍ରମହିଳା ଅନିଲବାବୁର ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋନ ଖୋଜିଥିବର ନିଲେନ ନା କେନ ?

ହଠାତ୍ ମନେ ହୟ କିରୀଟୀର, ବାଗନାନେ ଗିଯେ ବିନତା ଦେବୀର ସଙ୍ଗେ ଏକଟିବାର ଦେଖା କରଲେ କେମନ ହୟ !

କଥାଟା ମନେ ହୟର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ କିରୀଟୀ ଠିକ କରେ ଫେଲେ, କାଳ ସକାଳେ ଉଠେଇ ସୋଜା ସେ ଏକବାର !

ଦେଖା କରବେ ମେ ବିନତା ଦେବୀର ସଙ୍ଗେ ଏକବାର ।

ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରେର ଦିନ ସକାଳେ ଉଠେ କିରୀଟୀ ସୋଜା ହାଓଡ଼ା ସ୍ଟେଶନେ ଗିଯେ ଗୋମୋ ପ୍ରୟାସେଜାରେ ଉଠେ ବସି ବାଗନାନେର ଏକଟା ଟିର୍କିଟ କେଟେ । ବେଳା ସାଡେ ନଯାଟ ନାଗାଦ କିରୀଟୀ ବାଗନାନ ସ୍ଟେଶନେ ଏସେ ନାମଲ ।

ଗାର୍ଲ୍‌ସ ସ୍କୁଲଟିର ନାମ ‘ବିଦ୍ୟାଥ୍ରୀ ମନ୍ଦଳ’ । ଏବଂ ସ୍କୁଲଟା ସ୍ଟେଶନ ଥେକେ ମାଇଲଖାନେକ ଦୂରେ ଛୋଟ୍ ଶହରେର ମଧ୍ୟେଇ ।

ଭାଙ୍ଗଚୋରା କାଁଚା ମିଟିନିସିପ୍‌ପାଲିଟିର ସଡ଼କଟ ବୋଧ ହୟ ଶହରେର ପ୍ରବେଶେ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ।

লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে বেলা এগারটা নাগাদ কিরীটী স্কুলে
গিয়ে পৌঁছাল।

এম. ই. স্কুল।

ছোট একতলা একটা বাড়ি। শতখানেক ছাত্রী হবে।

স্কুল তখন বসেছে।

অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকল কিরীটী।

চোখে প্রৱৃত্তি কাঁচের চশমা সূতা দিয়ে মাথার সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা, মাথায়
টাক এক বৃদ্ধি ভদ্রলোক একটা ভাঙা চেয়ারের উপর বসে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে
একটা মোটা বাঁধানো খাতায় কি ষেন একমনে লিখিছিলেন। সামনে আরো
খান-দুই ভাঙা চেয়ার ও একটা নড়বড়ে ভাঙা বেণু।

ও মশাই শুনছেন! কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ডাকে।

ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন প্রৱৃত্তি লেন্সের ওধার থেকে।

ভদ্রলোক একটু বেশ কানে খাটো, কিরীটীর গলার শব্দটাই কেবল বোধ
হয় গোচরাভূত হয়েছিল, বললেন, বগলাবাবু ছলে গেছেন।

বগলাবাবু! বগলাবাবু, আবার কে?

কী বললেন, কাকে?

বলছি শুনছেন—, কিরীটী এবারে কানের কাছে এসে একটু গলা উঠিয়েই
বলে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্ষিতহাস্যে।

ভদ্রলোকও বোধ হয় এবারে শুনতে পান।

বললেন, কি বলছেন?

বিনতা দেবী বলে কোন শিক্ষায়ত্ত্ব আপনাদের স্কুলে আছেন?
আছেন। কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমার তাঁরই সঙ্গে।

তাহলে বসুন, এখন তিনি ক্লাসে। টিফিনে দেখা হবে।

টিফিন কখন হবে?

ঠিক একটায়। বলেই ভদ্রলোক আবার নিজ কাজে মনোনিবেশ করলেন।

অগত্যা কী আর করা যায়, কিরীটীকে বসতেই হল। একটা চেয়ার টেনে
কিরীটী তার উপরে বসে আসবার সময় স্টেশন থেকে কেনা ঐদিনকার সংবাদ-
প্রাপ্তা খুলে চোখ বুলাতে লাগল। সবে বেলা এগারটা। এখনো টিফিন হতে
দুঃস্মণ্টা দৰির!

খবরের কাগজটা খুলে বসলেও তার মধ্যে কিরীটী মন বসাতে
পারছিল না।

বিনতা দেবীর কথাই সে ভাবছিল। হঠাৎ তো মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই
সে এখনে চলে এলো!

ভদ্রমহিলা কোন্ টাইপের তাই বা কে জানে!

তাকে কি ভাবে তিনি নেবেন তাও জানা নেই।

ভাল করে তিনি যদি কথাই না বলেন, কোন কথা না শুনেই যদি তাকে
বিদায় দেন!

কিন্তু কিরীটী অত সহজে হাল ছাড়বে না। যেমন করে হোক তাঁর কাছ
থেকে সব শুনে যেতেই হবে।

কিরীটী বসে বসে ভাবতে থাকে কি ভাবে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা শুরু-

করবে।

কিন্তু বেলা একটা পর্যন্ত সোভাগ্যক্রমে কিরীটীকে অপেক্ষা করতে হল না।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই একটা নারীকণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে কিরীটী মুখ তুলে তাকাতেই তেইশ-চৰিশ বৎসর বয়স্কা এক তরুণীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

পাতলা দোহারা চেহারা। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। চোখ মুখ চিবুক বেশ ধারালো। মাথায় পর্যাপ্ত কেশ এলো খেঁপা করা। দৃহাতে একগাছি করে সরু তারের সোনার বালা। পরিধানে সরু কালাপাড় একখনি তাঁতের শাঢ়ি।

কিরীটীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তরুণী দ্রৃষ্টি ঘূরিয়ে নিয়ে অদৃশে লিখনরত উপর্যুক্ত বৃক্ষের দিকে তাঁকয়ে বললেন, অবিনাশবাবু, আমার মাইনেট কি আজ পাবো?

অবিনাশবাবু বোধ হয় শুনতে পার্নন, বললেন, জমানো—জমানো টাকা আবার কোথা থেকে এলো আপনার?

জমানো টাকা নয়, বলছি মাইনেট আজ মিলবে?

না, আজও ক্যাশে টাকা নেই। কাল-পরশু নাগাদ পেতে পারেন। হ্যাঁ—
ঐ ভদ্রলোকটি আপনাকে খঁজছিলেন বিনতা দেবী।

আমাকে খঁজছেন!

বিনতা দেবী যেন কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গে কিরীটীর মুখের দিকে ঘূরে তাকালেন।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল এবং নমস্কার করে বললে, আপনি অবিশ্য আমাকে চেনেন না বিনতা দেবী। আমার নাম কিরীটী রায়। কলকাতা থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

আমার সঙ্গে!

হ্যাঁ। অবশ্য বেশী সময় আপনার আমি নেবো না।

কি বলুন তো?

কথাটা একটু মানে—, কিরীটী একটু ইতস্তত করতে থাকে।

বিনতা দেবী বোধ হয় বুঝতে পারেন। বললেন, চলুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক।

পাশের ঘরটি ঠিক বসবার উপযুক্ত নয়। স্কুলের বাড়িত জিনিসপত্র ভাঙ্গাচোর চেয়ার বোর্ড ইত্যাদিতে ঠাসা ছিল।

একপাশে একটা ছোট বেঁশ ছিল, তারই উপরে কিরীটীকে বসতে বলে বিনতা দেবীও তার পাশেই বসলেন নিঃসংকোচে।

কিরীটী বিনতা দেবীর সপ্রতিভ ব্যবহারে প্রথম অলাপেই বুঝে নিয়ে-ছিল ভদ্রমহিলার বিশেষ কোন সঙ্কেচের বালাই নেই।

বলুন কি বলছিলেন!

কিরীটী কোনুৰূপ ভাগিতা না করেই স্পষ্টাস্পষ্ট সোজাসুজি তার বক্তব্য শুনু করে, দেখুন আপনাকে আগেই বলেছি বিনতা দেবী, আমি আসছি কল-কাতা থেকে এবং অনিলবাবুর আকস্মিক রহস্যজনক মতু সম্পর্কে—

অনিল ! চমকে কথাটা বলে বিনতা কিরীটীর মুখের দিকে সপ্তম দ্রষ্টব্যে
তাকালেন।

হ্যাঁ । অনিলবাবু, আপনার যে বিশেষ পরিচিত ছিলেন তা আমি জানি।
কিন্তু আপনি—

আমার একমাত্র পরিচয় একটু আগেই তো আপনাকে আমি দিয়েছি। তার
বিশেষ বললেও তো আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। তবে এই সঙ্গে সামান্য
একটু যোগ করে বলতে পারি মাত্র যে অনিলবাবুর মৃত্যুরহস্যটা জানবার আমি
চেষ্টা করছি।

বিনতা অতঃপর কিছুক্ষণ চূপ করে বসে রইলেন। প্রায় মিনিট দ্রু়েক।
তারপর মুখ তুলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা সেজন্য আমার
কাছে আপনি এসেছেন কেন? আপনি কি প্রলিসের কোন লোক?

না না—প্রলিসের লোক ঠিক আমি নই। তবে তাদের সঙ্গে ঘোগাঘোগ
আছে আমার।

কিন্তু সেজন্য আমার কাছে না এসে প্রলিসের সাহায্য নিলেই তো আপনি
পারতেন!

কথাটা ঠিক তা নয়।

তবে?

প্রলিস অনেক সময় অনেক কিছুই জানতে পারে না। এই ধরনের হত্যা-
রহস্যের সঙ্গে এমন অনেক কিছুই হয়ত রহস্য থাকে যা জানতে পারলে
প্রলিসের পক্ষেও অনেক জটিলতার সমস্যা হয়তো সহজেই মিলতে পারত।
ব্যবহৃতে পারছেন বোধ হয় আমি ঠিক কি বলতে চাইছি আপনাকে!

বিনতা দেবী চূপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

কিরীটী আবার ডাকে, বিনতা দেবী?

বলুন।

আপনি তাঁর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাই আপনার কাছে এসেছি যদি
তাঁর সম্পর্কে এমন কোন বিশেষ খবর—

কি জানতে চান আপনি কিরীটীবাবু?

আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করবো, তার জবাব পেলেই আমি সন্তুষ্ট
হবো।

কিন্তু—, বিনতা দেবী ইতস্ততঃ করতে থাকেন।

আপনি কি তাঁকে—কিছু মনে করবেন না, ভালবাসতেন না?

প্রশ্নাত্ত্বে বিনতা দেবী কোন জবাব দেন না।

কেবল কিরীটী দেখতে পায় তাঁর চোখের কোল দৃঢ়ি যেন হঠাতে অশ্রুসজল
হয়ে ওঠে।

তাই বলছিলাম, আপনি কি চান বিনতা দেবী, তাঁর মৃত্যুর রহস্যটা
উন্মোচিত হোক?

চাই।

তবে বলুন, অনিলবাবুর মৃত্যুর কয়দিন আগে শেষবার কবে আপনার
সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল?

তার মৃত্যুর আগের দিন রবিবার কলকাতায় আমি গিয়েছিলাম। সেই
সময়েই শেষবার আমাদের দেখা হয়েছিল।

আচ্ছা তাঁর মৃত্যুর আগে ইদানীং এমন কোন কথা কি তাঁর মৃত্যে আপনি শুনেছেন বা তিনি আপনাকে বলেছেন বা তাঁর ঐ সমস্তকার ব্যবহারে এমন কোন কিছু আপনার দ্রষ্ট আকর্ষণ করেছিল যেটা আপনার অন্যরকম কিছু মনে হয়েছিল ! ব্যবতে পারছেন নিশ্চয় আশা করি কি আরী বলতে চাইছি ?

একটু চূপ করে থেকে বিনতা বললেন, না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না।
তবে—

তবে ? কিরীটী একটু যেন কৌতুহলী হয়ে গঠে।

তবে শেষবার দেখা হওয়ার আগে এক শৰ্মিবার সে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কথায় কথায় বলেছিল, ন্যায়বন্ধ লেনের বাসা নাকি—

কি ! কি বলেছিলেন অনিলবাবু ?

বলেছিল ন্যায়বন্ধ লেনের বাসা নাকি সে ছেড়ে দেবে।

একথা কেন বলেছিলেন ?

তা তো জানি না। তবে বলেছিল বাসাটা নাকি ভাল না।

অন্য কোন কারণ বলেননি বাসাটা ছেড়ে দেবার ?
না।

আচ্ছা বাড়িওয়ালা কবিরাজ মশাই সম্পর্কে বা তাঁর ফ্যামিলির অন্য কারো সম্পর্কে কোন কথা কি তিনি আপনাকে বলেছিলেন কখনো কোনদিন কোন কথাপ্রসঙ্গে ?

না, তবে—

তবে কি ?

তবে কবিরাজ মশাইরের পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল শুনেছিলাম তাই মৃত্যে একদিন কথায় কথায়।

ও। আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অনিলবাবু কর্তাদিন ঐ ন্যায়বন্ধ লেনের বাড়িতে ছিলেন ঘর নিয়ে ?

তা মাস আশ্টেক হবে।

তার আগে কোথায় ছিলেন ?

এক দ্রসম্পর্কীয় আঞ্চলিক বাসায় ঘাদবপুরে।

আর একটা কথা বিনতা দেবী, অনিলবাবুর ইদানীং আয় কি একটু বেড়েছিল ?

কিরীটীর প্রশ্নে বিনতা ওর মৃত্যের দিকে বারেকের জন্য চোখ ভুলে তাকালেন এবং তাঁর ভাবে বোধ হল যেন একটু ইতস্তত করছেন। কিরীটী তাঁর ইতস্তত ভাবাটা ব্যবতে পেরে বলে, তবে নেই আপনার বিনতা দেবী, নির্ভৰ্যে আমার কাছে সব কথা বলতে পারেন।

মন্দকণ্ঠে জবাব দিলেন এবারে বিনতা দেবী, হ্যাঁ। অন্তত মৃত্যে সে না বললেও হাবে-ভাবে-আচরণে সেটা আমার কাছে চাপা থাকেন, তাছাড়া—, কথার শেষাংশে পেঁচে বিনতা যেন আবার একটু ইতস্তত করতে থাকেন।

তাছাড়া কি বিনতা দেবী ?

তীক্ষ্ণ দ্রষ্টিতে বিনতার মৃত্যের দিকে তাঁকয়ে কিরীটী শেষের কথা-গুলো উচ্চারণ করল।

তাছাড়া অবস্থার সে উষ্ণত করতে পারছিল না বলেই আমাদের বিবাহের ব্যাপারটা সে পিছিয়ে দিছিল বার বার এবং নিজে থেকেই উপযাচক হয়ে

বেদিন সে আমার কাছে এসে আমাদের বিবাহের কথা তোলে আমি সেদিন একটু অবাক হয়েই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সত্যিই কি এতদিনে তাহলে সে অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছে?

তাতে তিনি কি জবাব দিলেন?

বিনতা প্রশ্নের জবাবে এবারে চূপ করে থাকেন।

হঁ। তা আপনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করেননি? কেমন করে অবস্থার উন্নতি হলো?

না।

কেন?

কারণ আমি আশা করেছিলাম সব কথা সে নিজেই খুলে বলবে। তা যখন বললো না, আমিও আর কিছু ও সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি।

নিজে থেকেও নিশ্চয়ই আর কিছু তিনি বলেননি?

না।

সামান্য আলাপ-পরিচয়েই কিরীটী বুঝতে পারে যথেষ্ট ব্যবধি রাখেন ভদ্রমহিলা। এবং ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরবর্তী কথাপ্রসঙ্গে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, অনিলবাবুর ইদানীংকার ব্যবহারটা একটু কেমন যেন রহস্যজনক হয়ে উঠেছিল। অর্থ জন প্রতিপত্তির লিঙ্গ মানুষ মাত্রেই থাকে। তবে অনিল-বাবুর যেন একটু বেশীই ছিল। কর্তাদিন বিনতা বলেছেন, বেশী দিয়ে আমাদের কি হবে! তার জবাবে নাকি অনিলবাবু বলেছেন, সাধারণ ভাবে জীবনযাপন তো সকলেই করে। তার মধ্যে thrill কোথায়! এমনভাবে বাঁচতে আমি চাই যাতে দশজনের মধ্যে মাথা উঁচু করে আমি থাকতে পারি, সত্যিকারের স্বীকৃতি ও প্রাচুর্যের মধ্যেই। অতি সাধারণ ভাবে বাঁচার মধ্যে জীবনের কোন মাধ্যম্য উপভোগ করবার মত কিছু নেই। সেটা একপক্ষে মতৃকারী নামান্তর।

বিনতা দেবী আরো অনেক কথাই কিরীটীকে বললেন, যা থেকে কিরীটীর বুঝতে কষ্ট হয় না, তিনি অনিলবাবুকে সত্য সত্যিই ভালবাসতেন। সে ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। যদিচ অনিলবাবুর ইদানীংকার ব্যবহারের মধ্যে তাঁর দিক থেকে একটা স্বার্থপ্রতার ভাব দেখা দিয়েছিল, তথাপি বিনতার ভালবাসায় কোন তারতম্য হয়নি।

বরং মনে মনে একটু আঘাত পেলেও মুখে কখনো সেটা অনিলবাবুকে জানতে দেননি তিনি।

আর অনিলবাবুকে বিনতা সত্যিকারের ভালবাসতেন বলেই তাঁর মতৃকার পরও তাঁর স্মৃতি নিয়েই কাটাচ্ছেন।

আড়াইটোর ফিরাতি ট্রেনটা না ধরতে পারলে ফিরতে রাত হবে তাই কিরীটী অতঃপর বিনতা দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নমস্কার জানিয়ে স্টেশনের দিকে পা বাঢ়ায়।

॥ ৬ ॥

দৃশ্যের ট্রেনেই কিরীটী কলকাতা ফিরে এল।

ঐদিনটা শনিবার থাকায় অফিসের ছুটি হয়ে গিয়েছিল। সত্যশরণ তাঁর

ঘরেই ছিল।

কিরীটীকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সত্যশরণ কিরীটীর ঘরে এসে ঢুকল। কিরীটী জামার গলার বোতামটা খুলছে তখন।

কিরীটী!

কে, সত্যশরণ, এসো—এসো—

গিয়েছিলে কোথায়?

এই কলকাতার বাইরে একটু কাজ ছিল—

এদিকে পাড়ার বাপার শুনেছো তো সব?

না, কি বল তো?

আজ সকালে যে আবার একটি মৃতদেহ পাওয়া! গিয়েছে এই পাড়ায়!

বল কি? কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী সত্যশরণের দিকে ফিরে তাকায়।

জামার বোতাম আর খোলা হয় না।

হ্যাঁ, এবারে অবিশ্ব একেবারে প্রাম-রাস্তার উপরে—ঐ যে মোড়ে চার-তলা ব্যালকনীওয়ালা লাল বাড়িটা আছে, তারই বারান্দার নীচে মৃতদেহ পাওয়া গেছে এবারে।

বল কি? বাঙালী?

হ্যাঁ।

এবং পোশাক দেখে মনে হয় বেশ ধনীই লোকটা ছিল। বাঁ হাতের দুই আঙুলে দুটো ধীরে-বসানো সোনার আঁটি ছিল—

কিরীটী রীতিমত উৎসাহী হয়ে ওঠে।

তারপর?

তারপর আর কি! পুলিস এসে মৃতদেহ রিমুভ করে—

মৃতদেহের গলায় তেমনি সরু কালো দাগ ছিল?

সরু কালো দাগ!

কথাটা সত্যশরণ ব্যবহারে না পেরে বিস্তৃত দৃষ্টি মেলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ।

তা তো জানি না ঠিক।

ওঃ—

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে কিরীটীও বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল।

সত্যশরণ জিজ্ঞাসা করে, মৃতদেহের গলায় কি সরু কালো দাগের কথা বলছিলে কিরীটী?

কিরীটী অগত্যা যেন কথাটা খোলাখুলি ভাবে না বলে একটু ঘূরিয়ে বলে, সংবাদপত্রে তোমরা লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না, এর আগের আগের বাবের মৃতদেহের description প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল মৃতদেহের গলায় একটা সরু কালো দাগের কথা। তা পুলিস কাউকে arrest করেছে নাকি?

না। তবে আশেপাশের বাড়ির লোকদের অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছে শুনলাম।

মৃতদেহ প্রথম কার নজরে পড়ে?

তা ঠিক জানি না।

সন্ধ্যার দিকেই কিরীটী থানায় গেল বিকাশের সঙ্গে দেখা করতে।

বিকাশ তখন এ এলাকারই একটা মোটর-আর্কাসডেটের রিপোর্ট নিছিল। কিরীটীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বললে, এই ষে কিরীটী, এসো—বসো, এই রিপোর্টটা শেষ করে নিই—কথা আছে।

রিপোর্ট শেষ করে ঘর থেকে সকলকে বিদায় করে দিয়ে বিকাশবাবু বললেন, শুনেছো নাকি তোমাদের পাড়ার সকালের ব্যাপারটা?

সকালের প্রেইনেই কলকাতার বাইরে একটু গিয়েছিলাম। এসে শূন্যলাগ।

আমি তো ভাই আজকের ব্যাপারে একেবারে তাজব বনে গিয়েছি। এই কয় মাসে চার-চারটে মার্ডার একই এলাকায়—বলে একটু থেমে যেন দম নিয়ে আবার বললেন, বড় সাহেবের সঙ্গে আজ তো একচোট হয়েই গিয়েছে। Inefficient, অমৃক-তমৃক, কৃত কি তেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে ঘাচ্ছেতাই করে বললেন অফিসের মধ্যে।

কিরীটী বুঝতে পারে অফিসে বড়কর্তার কাছে মিষ্টি মিষ্টি বেশ দৃঢ়ো কথা শুনে বিকাশ বেশ একটু চপ্পল হয়েই উঠেছে। সতাই তো, একটার পর একটা খুন হয়ে যাচ্ছে অথচ আজ পর্যন্ত তার কোন কিনারা হল না!

কিরীটী হাসতে থাকে।

বিকাশ বলে, তুমি হাসছ রায়—

বস্ত হয়ে তো কোন লাভ নেই। ব্যাপার যা বুঝাই, বেশ একটু জটিলই। সব কিছু গুরুত্বের আনতে একটু সময় নেবে। কিরীটী আশ্বাস দেয়।

বিকাশ কিরীটীর শেষের কথায় ওর মুখের দিকে তাঁকয়ে বলে, কিছু বুঝতে পেরেছো নাকি?

না, মানে—

দেহাই তোমার, যদি কিছু বুঝতে পেরে থাকে তো সোজাসূজি বল। আমি ভাই সত্যিই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তাড়াহুড়োর ব্যাপার তো নয় ভাই এটা। থুব ধীরে ধীরে এগতে হবে।

তারপর আবার জিজ্ঞাসা করে কিরীটী বিকাশকে, হ্যাঁ ভাল কথা—মত-দেহের identification হয়েছে?

না, কই আর হলো! এখন পর্যন্ত কোন খেঁজই পড়েনি!

মতদেহ তো মগেই এখনে আছে তাহলে?

হ্যাঁ। কাল পোস্টমর্ট্য হবে।

মতদেহের আশেপাশে বা মতদেহে এমন কিছু নজরে পড়েছে তোমার suspicion হওয়ার মত, বা কোন clue?

না, তেমন কিছু নয়—তবে কাল শেষরাতে বোধ হয় বৃণ্ট হয়েছিল, যেখানে মতদেহ পাওয়া গিয়েছে সেই বাড়ির বালকনির ধার ঘেঁষে গাড়ির টায়ারের দাগ পাওয়া গিয়েছিল রাস্তায়।

আর কিছু? মানে মতদেহের জামার পকেটে কোন কাগজপত্র বা কোন রকমের ডকুমেন্ট বা—

না।

মগ' গিয়ে একবার মতদেহটা দেখে আসা যেতে পারে ?

তা আর যাবে না কেন !

আজ এখনি ?

এখনি !

হ্যাঁ !

বিকাশবাবু কি একটা ভেবে বললেন, বেশ চল।

দ্বিজনে থানা থেকে বের হয়ে একটা ট্যাঙ্ক নিয়ে সোজা ময়নাঘরে এলেন।

ময়নাঘরের ইনচার্জ ডোমটা ময়নাঘরের সামনেই একটা খাটিয়া পেতে শুয়ে ছিল। ইউনিফর্ম পরিহিত বিকাশকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিল।

আজ সকালে শ্যামবাজার থেকে যে লাশটা এসেছে সেটা দেখবো, ভিতরে চল।

কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে ডোমটা দরজা খুলতেই একটা উপ্প ফর্মালীন ও অনেকদিনের মাংসপচা চামসে মিশ্রিত গন্ধ নাসারণ্শে এসে বাপটা দিল।

ইলঘরটা পার হয়ে দ্বিজনে ডোমের পিছনে পিছনে এসে ঠাণ্ডাঘরে প্রবেশ করল।

একটা স্প্রিচারের উপরে সাদা চাদরে ঢাকা মতদেহটা মেঝেতেই পড়েছিল।

ডোমটা চাদরটা সরিয়ে দিল। বেশ হাঞ্চপুঁট শ্বাসবয়সী একজন ভদ্রলোক।

মৃখটা যেন কালচে মেরে গিয়েছে। নিখুঁতভাবে দাঁড়ি-গৌঁফ কামানো। ডান গালের উপরে একটা মটরের মত কালো আঁচল।

পরিধানে ফিনাফিনে আচ্ছদ পাঞ্জাবি ও সরু কালোপাড় মিহি মিলের ধৃতি।

আচ্ছদ জামার তলা দিয়ে নেটের গেঁঁজ চোখে পড়ে।

কিরীটী নৈচৰ হয়ে দেখলে, গলায় আধ ইঁচ্ছি পরিমাণ একটা সরু কালো দাগ গলার সবটাই বেড় দিয়ে আছে।

চোখ দুটো যেন ঠেলে কোটুর থেকে বের হয়ে আসতে চায়, চোখের তারায় সাব-কনজাংটাইভাল হিমারেজও আছে।

মৃখটা একটা হাঁ-করা; কষ বেয়ে ক্ষীণ একটা লালা-মিশ্রিত কালচে রক্তের ধারা জমাট বেঁধে আছে।

মতদেহ উল্টেপাল্টে দেখল কিরীটী, দেহের কোথাও সামান্য আঘাতের চিহ্নও নেই।

স্পষ্টই বোো ধায় কোন কিছু গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করেই হত্যা করা হয়েছে।

ডান হাতের উপরে উল্কিতে 'A' ইংরাজী অক্ষরটি লেখা।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল, চলুন বিকাশবাবু, দেখা হয়েছে।

মগ' থেকে বের হয়ে কিরীটী আর বিকাশবাবুর সঙ্গে গেল না। বিকাশ-বাবুর ভবানীপুরের দিকে একটা কাজ ছিল, তিনি ভবানীপুরগামী প্রামে উঠলেন।

কিরীটী শ্যামবাজারগামী প্রামে উঠল।

রাত বেশী হয়ন। সবে সড়ে আটো।

কলকাতা শহরে প্রীম্বরাণি সাড়ে আটটা তো সবে সন্ধ্যা!

প্রথম থেকে নেমে কিরীটী সোজা একেবারে অষ্টপূর্ণা হোটেল রেস্তোরাঁয়
এসে উঠলো।

এক কাপ চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিতে হবে।

রেস্তোরাঁ তখন চা-পিপাসীদের ভিড়ে বেশ সরগরম।

কিরীটী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একপাশে নিত্যকার মত ছেট
একটা টেবিল নিয়ে কাউণ্টারের মধ্যে বসে আছেন অষ্টপূর্ণা হোটেল ও
রেস্তোরাঁর আদি ও অক্ষয় একমাত্র মালিক ভূপতিচরণ।

রেস্তোরাঁটায় পাড়ার ছেলেদেরই বেশী ভড়। নানা আলোচনা চলছিল
খন্দেরদের মধ্যে চা-পান করতে করতে একেবারে ঔষ সময়টায়।

হঠাৎ কানে এলো কিরীটীর, তার ডান পাশের টেবিলে চারজন সমবয়সী
ছোকরা চা-পান করতে করতে সকালের ব্যাপারটাই আলোচনা করছে।

কিরীটী উদ্ঘাব হয়ে ওঠে।

লাচ্চলওয়ালা পাঞ্জাবি ও সার্টের কর্মবিনেশন জামা গায়ে ৩০। ৩২ বৎসরের
একটি যুবক তার পাশের যুবকটিকে বলছে, তোদের বাড়ি তো একেবারে সাত
নম্বর বাড়ির ঠিক অপজিটে, আর তুই তো শালা রাষ্ট্রিচর, তোরও চোখে কিছু
পড়েনি বলতে চাস ফটকে?

সম্বৰ্ধাত ফাটিক নামধারী যুবকটি প্রত্যুষের বলে, একেবারে যে কিছুই
দেখিনি মাইর তা নয়, তবে ধেনোর নেশার চোখে খুব ভাল করে ঠাওর হয়ন।

কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয় শিকারী বিড়ালের কানের মত সতর্ক সজাগ
হয়ে ওঠে।

ধেনো! বলিস কি ফটকে! তোর তো সাদা ঘোড়া চলে না রে!

ফটিক তার বন্ধু রেবতীর কথায় ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে থাকে। বোৰা
যায় কথাটা তার মনে লেগেছে। তারপর বলে, কি করি ভাই! জানিস তো
অভাবে স্বভাব নষ্ট। গত মাস থেকে মা আৱ দৃশ্যোৱ বেশি একটা পয়সা
দেয় না। শালা দৃশ্যো টাকা মাসের পনের তাৰিখেই ফুটুস ফু! তাই ঐ
ধেনোই ধৰতে হয়েছে। কাল রাতে নেশাটাও একটু বেশী হয়েছিল—

মুখ্যবন্ধু ছেড়ে ব্যাপারটা বল্ তো! রেবতী বলে ওঠে।

তখন বোধ করি ভাই সাড়ে তিনটে হবে। নেশাটা বেশ চড়চড়ে হয়ে
উঠেছে—

ফটিকের শেষের কয়েকটা কথা কিরীটী শুনতে পেল না, কে একজন
খরিদ্দার চপের কিমার মধ্যে নাকি কাঠের গুঁড়ো পেয়েছে, সে চেচাচে, বল ওহে
বংশীবদন! আজকল কিমার বদলে স্রেফ বাবা কাঠের গুঁড়ো চালাচ?
ধৰ্মে সইবে না বাবা, ধৰ্মে সইবে না। উচ্ছবে ঘাবে।

ভূপতিচরণ হোটেলের মালিক হল্তদন্ত হয়ে প্রায় এগিয়ে এলেন, কি
বলছেন স্যার! অষ্টপূর্ণা হোটেল রেস্তোরাঁর প্রেস্টেজ নষ্ট করবেন না!

খানিকটা গোলমাল ও হাসাহাসি চল। হোটেলের সবেধন নৈলম্বণ্য
ওয়েটোর বংশীবদন একপশে দাঁড়িয়ে থাকে বোকার মত। ফটিক তখন বলছে,
এক পসলা তার আগে বঁচিট হয়ে গিয়েছে। জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

দিব্য ঠাণ্ডা হাওয়া দিছে—দেখলাম পূর্বীদিক থেকে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল—
তারপর সেই গাড়ি থেকে একজন লোককে দেখলাম কি একটা ভারী মত
জিনিস ধরে গাড়ি থেকে রাস্তায় নামিয়ে রাখল। তবে শালা গাড়িটা যখন
চলে যায় না তখন দেখছি গাড়িটা একটা ট্যাঙ্ক!

বলিস কি ফটকে! ট্যাঙ্ক!

হ্যাঁ। আর এ পাড়ারই ট্যাঙ্ক।

মাইরি!

তবে আর বলছি কি! W. B. T. 307। গঙ্গাপদ সেই কালো রঙের
চক্রকে প্রকান্ড ডিসোটো ট্যাঙ্ক গাড়িটা—

তারপর?

তারপর আর কিছু জানি না বাবা। কোথায় মাঝরাতে কে কি করছে না
করছে জেনে লাভ কি! সোজা গিয়ে বিছানায় লম্বা। ঘূর্ম ভাঙল আজ সকালে
প্রায় আটটায়, তখন আমার বোন চিন্দুর কাছে শুনিন আমাদের বাড়ির সামনে
নাকি হৈ-হৈ কান্দ! সাত নম্বর বাড়ির করিডরের সামনে কান একটা লাশ
পাওয়া গিয়েছে। পুলিস এসেছে—সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল গত রাত্তির
কথা। তাড়াতাড়ি উঠে আগে শালা জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। তবু কি
বেটোরা রেহাই দেয়! ধাওয়া করেছিল আমার বাড়ি পর্যন্ত। বললে, সামনের
বাড়িতে থাকেন, দেখছেন নাকি কিছু? স্বেফ বলে দিলাম—মাল টানা অভ্যাস
আছে মশাই। অত রাত্রে কি আর জ্ঞানগাম্ভী থাকে!

কথাটা শেষ করে শ্রীমান ফটিক বেশ রসিয়ে আবার হাসতে লাগল।

কিরীটীরও মনে পড়ে ন্যায়রত্ন লেনের মোড়ে অনেক দিন ওর নজরে
পড়েছে ঝক্ককে ডিসোটো ট্যাঙ্ক গাড়িটা। নম্বরটা ধার W. B. T. 307।

ড্রাইভিং সৈটে মোটা কালোমত যে লোকটাকে বসে বসে প্রায়ই ঝিমুতে
দেখা যায়, তার বসন্তের ক্ষতিচ্ছিত গোলালো ঘুর্খানাও কিরীটীর মানসনেন্দ্রে
উঁকি দিয়ে গেল ঐ সঙ্গে।

ডিসোটো ট্যাঙ্ক গাড়ি, W. B. T. 307—

গাড়ির কথাটা ও নম্বরটা বার বার কিরীটীর মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে
থাকে।

এই পাড়ায় গত কয়েক মাস ধরে যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আজ পর্যন্ত চার-
চারটি রহস্যময় মৃত্যু কেবলমাত্র লাশের মধ্যে প্রমাণ রেখে গিয়েছে, ঐ W. B.
T. 307 নম্বরের গাড়ির সঙ্গে কি তার কোন যোগাযোগ আছে?

পরের দিনও সন্ধ্যার পর কিরীটী আবার থানায় গেল।

বিকাশ একটা জরুরী কাজে যেন কোথায় বের হয়েছিলেন, একটু পরেই
ফিরে এলেন।

কিরীটীকে বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন, এই যে কিরীটী! কতক্ষণ?
এই কিছুক্ষণ। তারপর ময়না-তদন্ত হল?

বিকাশ বসতে বসতে বললেন, হ্যাঁ, ময়না-তদন্তও হয়েছে—লোকটার
identity ও পাওয়া গিয়েছে।

পাওয়া গিয়েছে নাকি?

হ্যাঁ। লোকটার নাম অর্বিল দন্ত। এককালে চলননগরের ঐ দন্তরা বেশ

বৰ্ধমান গ্ৰন্থ ছিল। এখন অৰিষ্য পড়ত অবস্থা। তিন ভাই—বীজেন্দ্ৰ, মহেন্দ্ৰ, অৱিল্প। এই মানে অৱিল্পই ছেট স্বার।

হ্যাঁ, তা লোকটাৱ স্বভাব-চৰিত্ৰ কেমন ছিল ইত্যাদি কোন-কিছু খোঁজ-খবৱ পেলে ?

পেয়েছি, আৱ সেইখান থেকে মানে বীজেন্দ্ৰবাৰুৰ ওখান থেকেই আসছি।
বীজেন্দ্ৰবাৰু, আজ বছৰ দশেক হল আলাদা হয়ে পৈতৃক সম্পত্তিৰ ভাগ হিসাবে
কলকাতাৰ ভবানীপুৰ অঞ্চলেৰ বাড়িখানা নিয়ে বসবাস কৱছেন।

তা বীজেন্দ্ৰবাৰুৰ সংবাদ পেলে কি কৱে ?

সেও এক আশ্চৰ্য ব্যাপার !

কি রকম ?

সেও এক ইতিহাস হে ! বলে বিকাশ বলতে শুৱ কৱেন, বলেছ তো
বীজেন্দ্ৰবাৰু চলননগৱেৰ বাসিন্দা। বছৰ আষ্টেক আগে বীজেন্দ্ৰবাৰুদেৱ
এক বিধবা বোন ছিলেন—সুৱৰ্মা। সেই বোন ও দুই ভাই মহেন্দ্ৰ ও অৱিল্প
কাশী ধান। কাশীতে দণ্ডদেৱ একটা বাড়ি আছে বাঙালীটোলায়। তাঁৰা
গিয়েছিলেন মাস দুই কাশীতে থাকবেন বলেই। মধ্যে মধ্যে তাঁৰা ঐভাৱে দুঃএক
মাস কাশীৰ বাড়িতে গিয়ে নাকি কাটাতেন। যা হোক সেবাৱে চার মাস পৱে
দুই ভাই তাঁদেৱ স্বীকৃত পৃথক নিয়ে ঘৰন ফিরে এলেন সুৱৰ্মা ফিরল না তাঁদেৱ
সঙ্গে। ফিরে এসে শুঁৰা রঠালেন সুৱৰ্মা নাকি কাশীতে হঠাৎ দুঃদনেৱ জৰৱে
মারা গিয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নহ—সুৱৰ্মা মৱেনি, গৃহত্যাগ
কৱেছিল এক রাত্রে।

বীজেন্দ্ৰবাৰু, বললেন নাকি ও-কথা ?

হ্যাঁ, শোন—বললাম তো একটা গল্প ! অৱিল্প মধ্যে মধ্যে কলকাতায়
এসে দাদাৱ এখানে উঠতেন। দুঃচার দিন থেকে আবাৱ চলে যেতেন। শুকনো
জৰিমদাৰীৰ কোনো আয় না থাকলেও অৱিল্পবাৰুৰ অবস্থাটা কিন্তু ইদানীং
বছৰ আষ্টেক মন্দ যাচ্ছিল না। বৰং বলতে গেলে বেশ একটা অৰ্থসংজ্ঞাতাই
ছিল তাঁৰ। যাহোক যা বলছিলাম, এবাৱে অৱিল্পবাৰু গত শনিবাৱ মানে
প্ৰায় আটদিন আগে কলকাতায় আসেন চলননগৱ থেকে। এবং অন্যান্য বাবেঁ
মত দাদাৱ ওখানেই ওঠেন। কিন্তু গত বহুস্পতিবাৰ হঠাৎ রাত্ৰি দেড়টাৱ বাড়ি
ফিরে দাদা বীজেন্দ্ৰবাৰুকে ডেকে বলেন, সুৱৰ্মাৰ খোঁজ তিনি পেয়েছেন। এবং
তখনই তিনি তাৰ দাদাকে সুৱৰ্মা সম্পকে আট বছৰ আগেকাৱ সত্য কাৰ্হিনী
খুলে বলেন। বীজেন্দ্ৰবাৰু এৱ আগে আসল রহস্যটা সুৱৰ্মা সম্পকে
জানতেন না।

তাৰপৱ ?

তাৰপৱেৱ ঘটনা খৰবই সংক্ষিপ্ত —

কি রকম ?

বহুস্পতিবাৰ রাত্ৰেৱ পৱ শেষ দেখা হয় অৱিল্পবাৰুৰ সঙ্গে বীজেন্দ্ৰ-
বাৰুৰ শুক্রবাৱ সকালে। তাৰপৱ আৱ দেখা হয়নি। এবং রাবিবাৱ সকালেৱ
ডাকে একথানা থামেৱ চিঠি পান বীজেন্দ্ৰবাৰু।

চিঠি ! কাৱ ?

সুৱৰ্মা দেবীৱ।

কি চিঠি ?

এই দেখ সে চিঠি— বলতে বলতে বিকাশ চিঠিটা বের করে কিরীটীর হাতে দিলেন। খামের উপরে ডাকঘরের ছাপ আছে। শ্যামবাজার পোস্ট অফিসের ছাপ।

কিরীটী ছেড়া খাম থেকে ভাঁজকরা চিঠিটা টেনে বের করল। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

শ্রীচরণেশ্বর বড়দা,

ছোটদা মারা গিয়েছেন। তাঁর মতদেহ বেগুয়ারিশ লাশ হিসাবে পুলিস মর্গে চালান দিয়েছে। সৎকারের বাবস্থা করবেন। ইতি—

আপনাদের হতভাগিনী বোন সুরমা

একবার দ্বিতীয় তিনবার কিরীটী চিঠিটা পড়ল।

সুরমা গৃহত্যাগিনী বোন মত অর্বিন্দ দত্তের! কিন্তু সে অর্বিন্দের মত্ত্য-সংবাদ জানলে কি করে?

নিশ্চয়ই অকুশ্যানে সুরমা উপর্যুক্ত ছিল, না হয় তার জাতেই সব ব্যাপারটা ঘটেছে। অন্যথায় সুরমার পক্ষে ঐ ঘটনা জানা তো কোনমতেই সম্ভবপর নয়। লাশ পাওয়া গিয়েছে শ্যামবাজারেই।

চিঠির ওপরে ডাকঘরের ছাপও শ্যামবাজারের। তবে কি পলাতকা সুরমা শ্যামবাজারেই কোথায়ও আঝাগোপন করে আছে!

কিরীটীর চিন্তাস্ত্রে বাধা পড়ল বিকাশের প্রশ্ন, কি ভাবছে কিরীটী? কিছু না। হঁ, ময়না-তন্ত্রের রিপোর্ট কি?

Throttle করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি কিরীটী, বৌজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পরে থেকে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আরো গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে—

কিরীটী বলে, কিছু clue তো আমাদের হাতে এসেছে। এইবার তো মনে হচ্ছে আমরা তবু এগুবার পথ পেয়েছি!

কি বলছো তুমি কিরীটী?

আমি তোমাকে আরো একটা clue দিচ্ছি—এই অঞ্চলে একটা ডিস্টোটা ট্যাক্সির গাড়ি আছে। নম্বরটা তার W. B. T. 307। ট্যাক্সিটার ওপরে একটা নজর রাখ। হয়তো আরো এঁগিয়ে রেতে পারবে।

বিকাশ যেন বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে থান, কি বলছো তুমি! ট্যাক্সির ড্রাইভার গঙ্গাপদ যে আমার বেশ চেনা লোক হে! অনেকবার আমার প্রয়োজনে ভাড়ায় থেটেছে। তাহাড়া গঙ্গাপদ লোকটাও spotless, ওর সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন রিপোর্টই তো পাইনি।

কিন্তু সেইটাই বড় কথা নয় বিকাশ। মদ্র হেসে কিরীটী বলে।

কিন্তু,— বিকাশ তবু ইতস্তত করতে থাকেন।

বললাম তো, প্রদীপের নীচেই বেশী অশ্বকার। যাহোক আজ উঁচি—আবার দেখা হবে।

কিরীটী আর দ্বিতীয় বাক্যায় না করে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলো।

কিরীটী বাসায় ফিরে এলো ঘথন রাত প্রায় নটা।

রজতবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে দেখে কিরীটী দাঁড়ালো দরজাগোড়ায়।
রজতবাবু তা হলৈ ফিরেছেন! পরশ্ব যে সেই দর্শক কলকাতায় কাজ আছে
বলে চলে গিয়েছিলেন, এ দূর্দিন আর ফেরেননি। রজতবাবুর গলা কালে
এলো, বেশ ভালো করে বাঁধ—রাস্তায় যেন আবার থলে না যায়।

রজতবাবুর ঘরের দরজাটা অর্ধেকটা প্রায় খোলাই ছিল। সেই খোলা
ম্বারপথে উঁচুক দিয়ে কিরীটী দেখল, রজতবাবু মেসের ভৃত্য রতনের সাহায্যে
বাঁক্স-বিছানা সব বাঁধাছাঁদা করছেন।

ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল কিরীটী, কি ব্যাপার রজতবাবু—বাঁধাছাঁদা
করছেন সব?

হ্যাঁ মাঝ রায়, এ বাসা ছেড়ে আমি আজ চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছেন!

তা নয়ত কি? মশাই অপমান সহ্য করেও পড়ে থাকবো?

তা কোথায় যাচ্ছেন?

বালিগঞ্জে—একেবারে লেক অগ্নেল। দোতলার ওপরে একটা চমৎকার
ফ্লাট্ পাওয়া গিয়েছে—ভাড়াটা অবশ্য কিছু বেশী। তা কি করা যাবে, এ
হতচাড়া জায়গায় কোন ভদ্রলোক থাকে? যেমন বাড়ি তেরুন বাড়িওলা! বেটা
অভদ্র ইতর—

কবিরাজ মশাইয়ের ওপরে বস্ত চটে গিয়েছেন দেখিছি—

চটবো না! অভদ্র ইতর কোথাকার!

মেসের শ্বিতীয় ভৃত্যও এসে ঘরে প্রবেশ করল, ট্যাঙ্ক এসে গেছে, বাবু!
ট্যাঙ্ক গালির মধ্যে এনেছিস তো?

হ্যাঁ স্যার—একেবারে দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছি। বলতে বলতে ভৃত্যের
পশ্চাতে যে লোকটি ঘরে এসে প্রবেশ করল, কিরীটী কয়েকটা ঘূর্ণত তার
মুখের দিকে নিজের অজ্ঞাতেই তাকিয়ে থাকে।

বসন্ত-ক্ষতিচ্ছিত সেই গোলালো মৃখ গঙ্গাপদুর। W. B. T. 307-এর
জ্বাইভার গঙ্গাপদ।

জিনিসপত্র কি কি যাবে? গঙ্গাপদ আবার প্রশ্ন করে।

বিশেষ কিছু নয়। এই যে দেখছো এই দুটো সৃত্কেস, এ বেডিংটা, ব্যাস!

অতঃপর ভৃত্যের সঙ্গে ধরাধরি করে গঙ্গাপদই মাল ট্যাঙ্কিতে নিয়ে গিয়ে
তুলল।

রজতবাবুর ঘরটা খালি হয়ে গেল।

রাত দশটার সময় ঐ রাত্রেই সির্পিড়িতে কবিরাজ মশায়ের খড়মের খট্খট্
শব্দ ধূনিত হয়ে উঠলো।

কৌতুহল দমন করতে না পেরে কিরীটী বাইরে এসে দেখলে ভিষণ্ণ রঞ্জ
রজতবাবুর খালি ঘরটার দরজায় একটা তালা লাগাচ্ছেন। কিরীটীকে দেখে
কবিরাজ মশাই বললেন, শুন্য ঘর থাকা ভাল নয় রায় মশাই। তাই তালাটা

লাগ়ে দিয়ে গেলাম। মৃত্যকের উপন্থ হতে পারে।

আরো দিন দুই পরে। বেলা ল্বিষ্ঠহর। মেসের ভূত বলাই আগেই চলে গিয়েছে, রতনও ঘাবার জন্য সির্পিড়তে নেমেছে, পিছন থেকে কিরীটীর ডাক শুনে রতন ফিরে দাঁড়াল।

রতন!

কি বলছেন? রতনের মুখে সুস্পষ্ট বিরাঙ্গ। ভাবটা—ঘাবার সময় আবার পিছু ডাকা কেন!

ঘাবার পথে অজপূর্ণ রেঙ্গেরাঁয় বংশীবদনকে বলে যেও তো এক কাপ চা আমার ঘরে দিয়ে যেতে।

আজই প্রথম নয়। মধ্যে মধ্যে একক ল্বিষ্ঠহরে কিরীটীর চায়ের প্রয়োজন হয় এবং বখ্যাক্ষের লোভে বংশীবদন দিয়েও যায় চা।

চার পয়সা চায়ের কাপের দামের উপর আরো তিন আনা উপরি লাভ হয় বংশীবদনের। পুরো একটা সিকিই দেয় কিরীটী।

যে আজ্ঞে! বলে রতন সির্পি দিয়ে নেমে চলে গেল।

মিনিট কুড়িক বাদেই বংশীবদন এক কাপ চা নিয়ে এসে কিরীটীর ঘরে প্রবেশ করল।

বাবু, চা—

চা-পান করতে করতে কিরীটী বংশীবদনের সঙ্গে আলাপ চালাতে লাগল।

দুঃঢারটা সাধারণ কথাবার্তাৰ পৰ হঠাতে কিরীটী প্ৰশ্ন কৰে, এ পাড়াৰ ট্যাঙ্ক-ড্রাইভাৰ গঙ্গাপদকে চিনিস বংশী?

কোন্ গঙ্গাপদ? ঐ যে হৃদকো মোটা কেলে লোকটা?

হ্যাঁ।

খুব চীনি। ডেকে দেবো নাকি লোকটাকে? গাড়ি চাই বৃৰ্দ্ধি?

হ্যাঁ, তোৱ সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?

না। তবে কত্তাৰ সঙ্গে খুব ভাব। মাঝে মাঝে রাত্ৰে কত্তাৰ ঘৰে আসে যে!

কে, ভূপতিবাবুৰ সঙ্গে?

হ্যাঁ।

তোৱ কত্তাৰ ঘৰে রাত্ৰে আৱ কে কে আসে রে?

ঐ গঙ্গাপদই আসে বেশী। আৱ কই কাউকে তো আসতে দেখিনি বড় একটা, তবে মাঝে মাঝে এই মেসেৰ রজতবাবু যেতেন।

রজতবাবু যেতেন!

হ্যাঁ।

ট্যাঙ্ক বৃৰ্দ্ধি গঙ্গাপদৱাই?

না বাবু, শুনেছি কোন এক বাবুৰ। গঙ্গাপদ তো মাইনে-কৱা লোক।

খুব ভাড়া খাটে ট্যাঙ্কটা, নাৱে?

ছাই! ভাড়া আৱ খাটে কোথাৱ? তবে হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যারাত্ৰে চলে যায়—ফেরে পৱেৱ দিন আবার সন্ধ্যায়!

ভাবাছি কাল একবাৱ ট্যাঙ্কটা ভাড়া নেবো। পাঠিয়ে দিতে পাৰিস ওকে একবাৱ?

কাল বোধ হয় ও যেতে পাৱবে না বাবু!

কেন ?

কাল রাতে গোপন্য যে বলছিল, পরশ্ব মানে কাল রাতে ভাড়ায় যাবে।
ফিরবে পরদিন—সারা রাত ভাড়া খাটালে অনেক পায় কিনা।
চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

একটা সিংক ও চারের কাপটা নিয়ে বৎশীবদ্ধন চলে গেল।

পরের দিন রাত তখন সোয়া আটটা হবে। কিরীটী এক কাপ চা নিয়ে
রেস্তোরাঁর দরজার ধারে একটা টেবিলের সামনে বসে স্থির দণ্ডিতে রাস্তার
দিকে তাঁকয়ে ছিল।

W. B. T. 307 ট্যাঙ্কিটা খোলা দরজা বরাবর রাস্তার ওধারে ফুটপাথ
ঘেঁষে লাইটপোল্টার অল্প দূরে পার্ক করা আছে। এতদ্ব থেকেও আবছা
অঙ্গুষ্ঠ বোরা যায় গাড়ির চালকের সৈটে বসে আছে একজন ছায়ামৃত্তি।
কিরীটী অন্যমনস্কের মত চা-পান করলেও তার সদাজগত দণ্ডিতে ছিল
W. B. T. 307 ট্যাঙ্কিটার ওপরেই। বড় রাস্তার ঠিক মোড়েই সেই সম্ম্যা
থেকে আরো একটা ট্যাঙ্কির দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রমে ক্রমে রাতের প্রহর গাড়িয়ে চলে। একটি দণ্ডিতে রেস্তোরাঁর
খরিদ্দার চলে যেতে থাকে। রাত প্রায় দশটার সময় কিরীটী হঠাত যেন চেকে
ওঠে।

আগামদিন চাদরে আবৃত্ত একটি নারীমৃত্তি এসে W. B. T. 307
ট্যাঙ্কি গাড়িটার সামনে দাঁড়াতেই নিশ্চলে ট্যাঙ্কির দরজাটা খুলে গেল।

নারীমৃত্তি ট্যাঙ্কিতে উঠে বসল এবং উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাঙ্কি
স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করে।

কিরীটীও আর মহুর্ত বিলম্ব না করে রেস্তোরাঁ থেকে উঠে সোজা গিয়ে
দ্রুতপদে বড় রাস্তার মোড়ে যে ন্যিতীয় ট্যাঙ্কিটা অপেক্ষা করছিল তার মধ্যে
গিয়ে উঠলো।

বড় রাস্তায় W. B. T. 307 ট্যাঙ্কিটা প্রামের জন্য আটক পড়ে
তখনও বেশীদ্ব এগোতে পারেনি। কিরীটী ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাঙ্কিটা
চলতে শুরু করে। ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে ট্যাঙ্কিটা প্রস্তুত হয়েই ছিল পূর্ব হতে
সঙ্গেতমত। কিরীটী চাপা গলায় ড্রাইভার মনোহর সিংকে কি যেন নির্দেশ
দিল।

গ্রীষ্মের রাত্য দশটায় কলকাতা শহর এখনো লোকজনের চলাচল ও যান-
বাহনের বৈচিত্র্যে সর্বগৱাম।

আগেকার গাড়িটা সোজা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট ধরে এগিয়ে
গিয়ে বৌবাজারের কাছাকাছি বাঁয়ে বাঁক নিয়ে শিয়ালদহের দিকে এগিয়ে চলল।
শিয়ালদহের মোড়ে এসে ডাইনে বেঁকে এবারে চলল সারকুলার রোড ধরে
সোজা। জোড়াগির্জা ছাড়িয়ে সারকুলার রোডের কবরখানা ছাড়িয়ে বাঁয়ে
বেঁকল।

আগের গাড়িটা চলেছে এবারে আমীর আলি আভিনন্দ ধরে।
হঠাত একসময় আগের গাড়ির স্পীডটা কমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে
মনোহরও তার পা-টা তুলে নেয় গাড়ির আক্সিলারেটারের ওপর থেকে।

ঝীঘ ডিপোটা ছাড়িয়ে বাঁ-হাঁতি একটা সরু গলির মুখে গাড়িটা

দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে পূর্ববর্তী সর্বাঙ্গে চাদরে আবৃত মহিলাটি নেমে গেলেন এবং ট্যাঙ্কিটাও সামনের দিকে চলে গেল। হাত-দশেক ব্যবধানে মনোহর তার ট্যাঙ্কিট দাঁড় করিয়েছিল। বিকাশ প্রশ্ন করেন, ব্যাপার কি কিরীটীবাবু?

কিরীটী ট্যাঙ্কির দরজা খুলে নামতে নামতে বললে, নামুন—এবং মনোহরের দিকে ফিরে তাকে ও কনস্টেবলকে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে চলল।

বিকাশ কিরীটীকে অনন্সরণ করেন। সরু গালিপথ, গালির মধ্যে একটি-মাত্র লাইটপোস্ট। গালির পথ জুড়ে অন্ধুত একটা আলোছায়ার লুকোচৰ্দির চলছে ঘেন।

কিন্তু গালির মধ্যে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না কিরীটী। তবু কিন্তু কিরীটী গালির মধ্যে ঢুকে এগিয়ে চলে। ব্রাইন্ড গাল। কিছুটা এগভূতে শেষ হয়ে গিয়েছে। সামনেই নিরেট দেওয়াল। গালির দুপাশে দোতলা তিনতলা সব বাড়ি আলোছায়ার যেন স্তুপ বেঁধে আছে।

সব কয়টি বাড়িরই দরজা বন্ধ। মাত্র একটি বাড়ির খোলা জানালাপথে থানিকটা আলোর আভাস লাগছে গালিপথে।

জানালাপথে উঠৰ দিয়ে দেখল কিরীটী, সাহেবী কেতায় সোফা-সেটী-কাউচে সুসজ্জিত ড্রাইংরুম। এবং সেই ড্রাইংরুমের মধ্যে একটি সোফার উপরে পাশাপাশি বসে একটি তরুণবয়স্ক পুরুষ ও একটি নারী।

চম্কে উঠে কিরীটী। কারণ পুরুষটিকে না চিনলেও মারীটীকে চিনতে তার কষ্ট হয়নি দেখা মাত্র। সেই ভদ্রমহিলা! যাকে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে রাতে ভিষগ্রস্তের বাইরের ঘরে অনবগুণ্ঠিত দেখেছিল সে।

কিন্তু ভদ্রমহিলাটির আজকের সাজসজ্জার ও সে-রাতের সাজসজ্জার মধ্যে ছিল অনেক তফাত। গা-ভর্তি জড়োয়া গহনা, পরিধানে দায়ী সিল্কের শার্ট।

অপূর্ব রূপ খুলেছে দায়ী সিল্কের শার্ট ও জড়োয়া গহনায়। চোখ যেন একেবারে বাল্সে ঘায়। আর পুরুষটির পরিধেয় সাজসজ্জা দেখলে যেন হয়ে ধনী কোন গুজরাট দেশীয় লোক। কিন্তু চিনতে পারল না চোখে কালো চশমা থাকায়। পুরুষটি হঠাত স্পষ্ট বাংলায় বলে, এসেছ?

আমার গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে—চল—

কিন্তু মাল?

মালও গাড়িতেই আছে।

বেশ, তবে চল।

কিন্তু টাকাটা?

ও হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলে গিয়েছিলাম একদম—বলতে বলতে জামার পকেটে হাত চালিয়ে একতাড়া নোট বের করে মহিলার হাতে তুলে দিল পুরুষটি।

গুনতে হবে নাকি?

তোমার খুশি—

মহিলাটি ম্দু হেসে নোটগুলো এক এক করে সতাই গুনে দেখল। সব একশো টাকার নোট। নোটগুলো গুনে ব্রাউজের মধ্যে চালান করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

চল—

আর একটু বসবে না?

একটু কেন—সারারাতই তো থাকবো সঙ্গে সঙ্গে। চল—ওঠ।
যুবকটি উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু মহিলাটি হঠাতে বাধা দিয়ে বলে, একটু বোস,
আসছি।

মহিলাটি ভিতরে চলে গেল। যুবকটি বসে আছে। হঠাতে পা টিপে
টিপে কে একজন কালো মৃখেশে মৃখ ঢেকে সোফার উপরে উপবিষ্ট যুবকের
অঙ্গতেই তার পশ্চাতে এসে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে দপ্ত করে ঘরের আলো
গেল নিভে।

কি হল! আলো নিভে গেল যে! বিকাশ চাপা কষ্টে বলেন।

চূপ! কিরীটী সাবধান করে দেয়।

অন্ধকারে একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ, একটা ঝাটাপাটি শোনা যাচ্ছে।

পরক্ষণেই কিরীটী আর দেরি না করে গিয়ে বন্ধ দরজার উপরে ধাক্কা দেয়।

দরজায় ধাক্কা দিতেই বুরুলে দরজা ভিতর হতে বন্ধ।

প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিতে দিতে একসময় মট্ট করে শব্দ তুলে ভিতরের
খিলাটা বোধ হয় ভেঙে দরজা খুলে গেল।

দৃজনে হড়ড় করে অন্ধকার বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করে। পাশের ঘরে
চুক্কে অন্ধকারে হাতের টর্চের আলো ফেলতেই কিরীটী চমকে উঠলো।

মেঝের উপরে পূর্বদ্রষ্ট তরঙ্গ যুবকটি উপড়ে হয়ে পড়ে আছে।

ঘরের আলোর সূচিটা সন্ধান করে আলোটা জ্বালানো হল। ভূপাতিত
যুবকটিকে তুলে ধরতে গিয়েই বোঝা গেল সে আর বেঁচে নেই। কিন্তু তার
চেখের চশমাজোড়া খুলে ফেলতেই কিরীটী চমকে উঠে। অস্ফুট কষ্টে তার
শব্দ বের হয় একটা মাত্র, এ কি! রজতবাবু! এবং ম্ত্যু তার পূর্বপূর্বের
মতই। গলায় সেই সরু কালো দাগ।

বিকাশ বললেন, চেনো নার্মক লোকটাকে?

হ্যাঁ। রজতবাবু—আমাদের মেসেই ছিল!

কিন্তু সেই মহিলাটি গেলেন কোথায়?

চল, বাড়িটা খুঁজে একবার দেখি। যদিও মনে হচ্ছে পাওয়া যাবে না আর।

সত্তাই তাই। বাড়ির মধ্যে দোতলার ও একতলার সব ঘরগুলিতেই তালা-
বন্ধ। কোথাও মহিলাটির সন্ধান পাওয়া গেল না।

চল, ফিরি।

কিরীটী ও বিকাশ দ্রুতপদে নিজেদের ট্যাঙ্কিতে এসে উঠে বসতেই মনোহর
ইঁজিত করে দেখাল ওধারে ফটুপাথে W. B. T. 307 ট্যাঙ্কিটা তখনো দাঁড়িয়ে
আছে। কিরীটী ঠিক করলো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।

বেশীক্ষণ কিন্তু অপেক্ষা করতে হল না। দেখা গেল দুটো বাড়ির পরের
গালির ভিতর থেকে একজন চাদরে আবৃত মহিলা বের হয়ে সোজা তাদের
ট্যাঙ্কির দিকেই এগিয়ে আসছে।

নেহাত হিসাবেই ভুল বোধ হল কিরীটীর।

অন্ধকারে ভুল ট্যাঙ্কির খোলা দরজা-পথে ট্যাঙ্কির মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে
সঙ্গেই মহিলাটি ভুল ব্যবহারে পারলেও তখন আর ফিরবার পথ ছিল না।
বিকাশের হাতে উদ্যত লোডেড পিস্তল।

কিন্তু মহিলাটি ঘেন নির্বিকার।

গোলমাল করে কোন লাভ হবে না। চৃপ্তি করে বসে থাকুন। বলেই কিরীটী মনোহরকে নির্দেশ দিল সোজা থানার দিকে গাড়ি চালাতে।

ট্যাঙ্কটা এসে থানার সামনে দাঁড়াতেই, সর্বাপ্রে কিরীটী বিকাশকে ডেকে চুপ চুপ কি কৃতকগুলো নির্দেশ দিয়ে ভদ্রমহিলাটিকে নিয়ে থানার ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল! ভদ্রমহিলাটি এতক্ষণ গাড়িতে সারাটা পথ একটি কথাও সরণ করে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী একটি চেয়ার দেখিয়ে বললে, বসুন। যদি ভুল না হয়ে থাকে তো মনে হচ্ছে আপনিন্ত বোধ হয় বৈজ্ঞানিক ও নিহত অর্বিন্দবাবুদের বোন সুরমা দেবী!

ভদ্রমহিলা কিরীটীর কথায় বারেক চম্কে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন। কিন্তু প্রত্যুক্তিই একটি কথাও বললেন না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

বসুন সুরমা দেবী!

ইতিমধ্যে বিকাশ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আর একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

বসুন! আবার কিরীটী অনুরোধ জানাল।

এবং সুরমা দেবী এবারে একটা চেয়ারে উপবেশন করলেন।

বুরতেই পারছেন নিশ্চয়, নেহাঁ ভাগচেই আপনি আমাদের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছেন! শন্মন সুরমা দেবী, আপনি হয়তো এখনো বুঝতে পারেননি যে আমরা আটঁ-ঘাট বেঁধেই আপনাকে আজ সন্ধ্যার পর অনুসরণ করেছিলাম যখন আপনি ন্যায়বন্ধু লেনের বাসা থেকে বের হয়ে ট্যাঙ্কতে গিয়ে চাপেন।

কিরীটীর শেষের কথায় সুরমা উপর দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

হ্যাঁ, আপনি মুখ বুঁজে থাকলেও অবশ্যম্ভাবীকে আপনি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না সুরমা দেবী। অমরা জাল যে মুহূর্তে গুটিয়ে আনবো সেই মুহূর্তেই আপনাদের দলের অন্যান্য সকলের সঙ্গে আপনাকেও তাদের মাঝে থালে এসে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আমি তা চাই না। আপনি যদি স্বেচ্ছায় সব স্বীকার করেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—সকলের মধ্যে টেনে এলে আপনাকে দাঁড়াবার লজ্জা ও অপমান হতে নিষ্কৃতি দেবো। কারণ আমি বুঝতে পেরেছি, এই বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে যেটুকু আপনি আপনার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক জড়িত হয়ে পড়েছেন, সেটা হয়ত আপনাকে একপকার বাধ্য হয়েই হতে হয়েছে। আরো একটা কথা আপনার জানা দরকার। আমীর আল আয়াভিনুর বাঁড়িতে আজ কিছুক্ষণ পূর্বে রজতবাবুর হত্যা-ব্যাপারটাও আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

ম্বিতীয়বাবার চম্কে সুরমা কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

কয়েকটি মুহূর্ত অতঙ্গের স্থিতিতার মধ্যে দিয়েই কেটে গেল।

কিরীটী সুরমা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল সোজা-সুজি আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার আর তাঁর ক্ষমতা নেই। কোন নারীই ঐ অবস্থায় নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না!

নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকালেন সুরমা দেবী কিরীটীর মুখের দিকে আবার।
দ্বজনের চোথের দ্রিষ্ট পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হল।

কিরীটী চোখে চোখ রেখেই প্রশ্ন করল, তাহলে কি ঠিক করলেন সুরমা
দেবী?

সুরমা দেবী নিশ্চুপ।

ব্যবহৃতেই পারছেন আর চূপ করে থেকে কোন লাভ হবে না! মাঝ থেকে
কেবল পুরুষের টানা-হেঁচড়াতে কেলেঙ্কারিই বাড়বে।

কি বলবো বলুন?

আপনার যা বলবার আছে—

আমার?

হ্যাঁ!

কয়েকটা মুহূর্ত আবার নিঃশব্দে মাথা নীচু করে বসে রইলেন সুরমা
দেবী, তার পর মাথা তুলে ধীরে ধীরে বললেন, হ্যাঁ, বলবো।

তবে বলুন।

হ্যাঁ বলবো, সব কথাই বলবো। নইলে তো আমার পাপের প্রায়শিচ্ছা
হবে না।

বলতে বলতে সুরমা দেবীর দ্বৈচোথের কোল বেয়ে দ্রুটি অশ্রুর ধারা নেমে
এলো।

সুরমা দেবী বলতে লাগলেনঃ

আপনারা তো আমার পরিচয় জানতেই পেরেছেন। তাই পরিচয় দিয়ে
মিথ্যা সময় আমি নষ্ট করতে চাই না। সব বলছি, পনের বছর বয়সের সময়
আমার বিবাহ হয়। এবং বিবাহের ঠিক দশ দিন পরেই, দ্রুতগ্যে আমার,
সর্পাঘ তে আমার স্বামীর মৃত্যু হয় তাঁর কর্মস্থল ময়ূরভঙ্গে। তিনি ছিলেন
ফরেস্ট অফিসার। আমার স্বামীর একটি ছোট জাঠতুত ভাই ছিল সত্ত্বে।
সত্ত্বেন মধ্যে মধ্যে আসত আমাদের বাড়িতে। স্বামীকে চেনবার আগেই তাঁকে
ভাগদোষে হারিয়েছিলাম। আমার তখন ভরা ঘোরন। সেই সময় সত্ত্বেন এসে
আমার সামনে দাঁড়াল। শ্বশুরবাড়ির দিক দিয়ে আমার বৃক্ষে শাশুড়ী ছাড়া
আর কেউ ছিল না। তাই বিধবা হবার পরও মধ্যে মধ্যে সেখানে আয়ার ষেতে
হতো। এবং গিয়ে দুঁচার গাস সেখানে থাকতাও। তখনে সত্ত্বেনের সঙ্গে
হলো ঘনিষ্ঠতা। বলতে বলতে সুরমা দেবী চূপ করলেন।

সুরমা দেবীর জবানবন্দীতেই বলি।

সত্ত্বেনের সঙ্গে সুরমার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতায় যা হবার তাই হল। সুরমা
যখন নিজে ব্যবহৃতে পারল তার সর্বনাশের কথা, ব্যাকুল হয়ে উঠলো সে এবং
লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে তখন সত্ত্বেনকে একদিন ডেকে সব কথা খুলে বলতে
একপ্রকার বাধ্য হল!

সত্ত্বেন লোকটা ছিল কিন্তু আসলে একটা শয়তান। সে বললে, আরে
তার জন্যে ভয়টা কি। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

ব্যবস্থা! কিসের ব্যবস্থা?

কিসের আবার! গোলমাল সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু ভেবো না ভূমি।
তার জন্যে ভয়টা কি! সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সুরমা সত্তেনের কথায় রাজী হয় না। ইত্তত করে বলে, দেখ একট
কাজ করলে হয় না?

কি?

আমি রাজী আছি। বিবাহটাই হবে ধাক।
বিশে!

হ্যাঁ। কেন, তুমি তো—

ক্ষেপেছো! বিশে করবো তোমাকে!

তার মানে?

ঠিক তাই।

কিন্তু এর্তাদিন তো তুমি—

পাগল না কেপা! ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও সুরমা। আমার ব্যবস্থা
তোমায় মেনে নিতেই হবে।

লোহার মত কঠিন ও ঝজু হয়ে এল সুরমার দেহটা মৃহূর্তে। তীক্ষ্ণ
গম্ভীর কণ্ঠে সে কেবল বলল, ঠিক আছে, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।

সুরমা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল।

শোন শোন সুরমা,—, সত্তেন ডেকে বাধা দেয় সুরমাকে।

সুরমা কেবল বললে, চলে যাও এখান থেকে!

পরের দিনই সুরমা চন্দননগরে দাদাদের ওখানে চলে এলো।

মা ও অর্বিবন্দ সমস্ত ব্যাপারটাই জানতে পারল। কেবল জানতে পারল
না আসল ব্যক্তিটি কে। সুরমা কিছুতেই প্রকাশ করল না।

বোন সুরমাকে নিয়ে তারা চলে এলো কাশীতে।

সেইখানেই একদিন কবিরাজ চন্দ্রকান্ত সঙ্গে আলাপ হয় অর্বিবন্দ।

চন্দ্রকান্তকে দিয়েই তারা কাঁটা তুলবার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু চন্দ্রকান্ত সে-পথ দিয়েই গেলেন না। কাশীতে তিনি মৃত্যুভূমি
নাম দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঢোরাই কোকেনের কারবার চালাচ্ছিলেন। এবং ঐ
সময়টায় পুলিশ অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠায় চন্দ্রকান্তও কাশীর ব্যবসা গুটিয়ে
অনাছ কোথাও সরে যাবার মতলব করছিলেন। তাঁর সংসারে ছিল আগের
পক্ষের একটি ছেলে ও মেয়ে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, শোন সুরমা, তুমি যদি রাজী থাকো আমি তোমাকে
বিবাহ করতে রাজী আছি—কেন ও মহাপাপে মা হয়ে নিজেকে জড়াবে! ভূগ-
হত্যা মহাপাপ।

সুরমা প্রথমটায় কবিরাজের প্রস্তাবে বিহুল হয়ে যায়। চন্দ্রকান্ত তাকে
বিবাহ করে সম্মান দেবে! পরে অনেক ভেবে রাজী হয়ে গেল সুরমা চন্দ্র-
কান্তরাই প্রস্তাবে। কারণ সে নিজেও ওই কথাটা ভাবতে পারছিল না।

এক রাত্রে সে গৃহ থেকে পালাল কবিরাজ চন্দ্রকান্তের সঙ্গে।

কবিরাজ সুরমাকে নিয়ে এসে একেবারে কলকাতায় উঠলেন কাশীর সমস্ত
ব্যবসাপাট তুলে দিয়ে। কিন্তু যে আশায় সুরমা গৃহত্যাগ করলো সে আশা
তার ফলবর্তী হল না।

জন্মমৃহূর্তেই সন্তানটিকে সেই রাত্রেই চন্দ্রকান্ত যে কোথায় সরিয়ে দিল
তার অঙ্গাতে সুরমা তা জানতেও পারলে না আর।

বিবাহও হল না এবং সন্তানও সে ফেল না। অথচ বন্দিনী হয়ে রইলো
সুরমা চন্দ্রকান্ত র গ্রহে তারই কট্ট ছক্ষলে।

সন্তানকে একদিন ফিরে পাবে, এই আশায় আশায় চন্দ্রকান্ত সুরমার
গতিরোধ করে রাখল। শুধু তাই নয়, অতঃপর চন্দ্রকান্ত সুরমাকে দিয়েই
তার বিবসা চালাতে লাগল। সুরমাকে টোপ ফেলে বড় বড় রাই-কাতলা গাঁথতে
লাগল। সুরমা প্রথম প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছে, তার জবাবে চন্দ্রকান্ত বলেছে,
আমার কথায়ত র্দ্বি না চল তো তোমার ছেলেকে একদিন হত্যা করে তোমার
সমনে এনে ফেলে দেব।

চোখের জলের ভিতর দিয়েই সুরমা বলতে লাগলেন, সেই ভয়ে আমি
সর্বদা সিঁটিয়ে থাকতাম কিরীটীবাবু। আর আমার সেই দ্বর্বলতার সংযোগ
নিয়ে সে যত কুর্সিত জবন কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিত। শেষটায় ওই
চোরাই ব্যাপারে এলো একদিন সত্যেন।

সত্যেন!

হ্যাঁ। রজতবাবুর আসল নাম সত্যেন। ঘোমটার আড়লে সে আমাকে
দেখতে পারিনি, কিন্তু আর্য তাকে চিনেছিলাম। আর ওই সত্যেনের সাহায্যেই
ওই চন্দ্রকান্ত, যাকে আপনারা শশিশ্বের বলে জানেন, তার অন্য এক অংশীদার
অন্ধপূর্ণা রেস্তোরাঁর মালিক ভূর্পতি চাটুয়ের সাহায্যে অর্তার্কতে একটা কালো
ফিতের সাহায্যে পিছন থেকে ফাঁস লাঁগয়ে চোরাই কারবারের ব্যাপারটা যাব
কাছে এতটুকু জানাজান হয়ে যেত বা আমার উপরে ধারাই লোভ পড়ত তাকে
হত্যা করতো। এমনি করেই দিনের পর দিন চলাছিল নারকীয় কাষ্ঠ, এমন সময়
একদিন আমার দুর্ভাগ্য ছোড়দাও এর মধ্যে এসে পড়লেন ঘটনাচক্রে।

লঙ্জায় মুখ ঢাকলেন সুরমা।

তারপর আবার বলতে লাগলেন, এদিকে শয়তান সত্যেন তখন চন্দ্রকান্তর
মেয়ে অমলাকে ভুলিয়েছে। সত্যেনের মিষ্টি কথায় অমলা ভুললেও আর্য তো
জানি তার মানে, সত্যেনের আসল ও সত্যকারের পরিচয়। আর্য সতর্ক করে
দিলাম চন্দ্রকান্তকে। চন্দ্রকান্ত আমার মুখে সব কথা শুনে কি যেন কী ভেবে
রজতকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিল। তারপরই আমার হতভাগ্য ছোড়দাকে
এক ঝাতে রেস্তোরাঁর মধ্যেই সেই ফিতের সাহায্যে ফাঁস দিয়ে হত্যা করলে
ওরা। এবং রজতকে শেষ করার মতলব করলো। এদিকে ছোড়দার মতৃতে
আর্য দিশেহারা হয়ে ফেলাম। দাদাকে চিঠি দিয়ে জানালাম তার মতুর কথা।

আমরা জানি সে চিঠির কথা। কিরীটী বলে।

জানেন?

হ্যাঁ। তারপর বলুন।

রজতকে তাড়াবার পর সে আসবে না জানতাম। তাই আর্যই তাকে একটা
চিঠি দিই চন্দ্রকান্তর পরামর্শ-মত—যে আর্য নিজে টাকার বিনিয়োগে ভুলিয়ে
নিয়ে তার হাতে অমলাকে তুলে দেবো; এই আশ্বাস দিয়ে পাক' সার্কাসের
গার্ডেনের রজতের সঙ্গে ঝগড়ার পর তাকে ডেকে পাঠাই। এদিকে রজতের
ম্বারা অনিষ্ট হতে পারে এই ভেবে চন্দ্রকান্তও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তাকে তাড়া-
তাড়ি শেষ করে ফেলার জন্য। আর সেই সঙ্গে আমারও ছিল প্রতিহিস্মা।
আমার আজকের এই চরম দৃশ্যমান জন্য তো সেই দায়ী। সেই তো আমাকে
লোভে ফেলে এই চরম সর্বনাশের পথে একদা টেনে এনেছিল। তাই প্রতিজ্ঞা

করলাম মনে মনে, যেতেই যদি হয় তাকে শেষ করে যাবো এবং এইবারই সর্বপ্রথম
ও শেষবার চল্দুকাল্পন দুষ্কৃতিতে তাকে সাহায্য করতে সর্বান্তকরণে এগিয়ে
গিয়েছিলাম। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আপনি কিরীটীবাবু এখানে এনে
আমাকে বলেছিলেন, নিয়াতি-চালিত হয়েই নাকি আপনাদের গাড়িতে এসে
আমাকে উঠতে হয়েছে, কিন্তু তা নয়।

কি বলছেন আপনি সুরমা দেবী? বিকাশ প্রশ্ন করেন।

ঠিক তাই। স্বেচ্ছায় আমি আপনাদের গাড়িতে উঠেছি।

সাত্যি বলছেন?

হ্যাঁ। আপনারা যে টাক্কি করে আমাদের অনুসরণ করছেন সেটা আমি
পূর্বাহৈ টের পেয়েছিলাম। আজ রাত্রে রজতকে শেষ করে পুরুলশের কাছে
এসে সব বলে দেবো পূর্ব হতে সেটা মনে মনে স্থির-সংকল্প হয়েই আমি
প্রস্তুত হয়ে বাঢ়ি থেকে বের হয়েছিলাম। কথাটা বলতে বলতে কিসের একটা
পুরুলয়া হঠাতে সুরমা দেবী হাতের মুঠোর থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন
চোখের পলকে।

বাধা দেবেন না কিরীটীবাবু আর। আমাকে যেতে দিন। সত্যই
কলঙ্কিনী আমি।

আর কথা বলতে পারলেন না সুরমা দেবী।

শেষের কথাগুলো জড়িয়ে তাঁর অস্পষ্ট হয়ে গেল।

কিরীটী বললে হাতঘাড়ির দিকে তাকিয়ে, কিন্তু আর তো দোরি করা
চলে না। আমাদের এখন যেতে হবে। নচে পাখী উড়ে যেতে পারে।

সুরমার মতদেহ ঐখানেই পড়ে রইলো। ওরা থানা থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ৭ ॥

থানা থেকে একজন এ. এস. আই. ও জনার্তনকে কনস্টেবলকে অন্ধপর্ণা
রেস্তোরাঁর ভূপাতিচরণকে গ্রেপ্তার করতে পাঠিয়ে দিয়ে কিরীটী ও বিকাশ
নিজেরা গেল ন্যায়বন্ধ লেনের বাসার দিকে সোজা।

রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ বিকাশ ও কিরীটী সাধারণ বেশেই এসে
ভিষগ্রস্তের সদর দরজায় থাকা দিল।

বিজিপদ এসে দরজা খুলে দিল চোখ মুছতে মুছতে।

কবিরাজ মশাই আছেন?

হ্যাঁ—উপরে ঘুমোচ্ছেন।

ঘাও, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো গে। বলো এক ভদ্রলোক বিশেষ জরুরী
কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

একটু পরেই খড়মের খট্ট খট্ট শব্দ শোনা গেল।

থালিগায়ে কবিরাজ ভিষগ্রস্ত ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন, ব্যাপার কি
মশাই!

আপনার ডিসপেনসারী সার্চ করবো। ওয়ারেন্ট আছে, আমি থানা
থেকে আসছি। বিকাশ রায়ই বললেন।

কবিরাজ মশাই তখন ফ্যালফ্যাল করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন।
এবং বিকাশের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে কিরীটীকেই সম্বোধন করে
বললেন, আমাদের রায় মশাই না?

আজ্জে হ্যাঁ। চিনতে পেরেছেন দেৰ্ঘি তাহলে !

হ্যাঁ। এসবের মানে কি ?

ওঁৰ মুখেই তো শুনলেন। কিৱীটী জবাব দেয়।

কিন্তু কেন, তাই তো জিজ্ঞাসা কৰছি।

সে-কথাটা ওঁকেই জিজ্ঞাসা কৰলুন না।

জিজ্ঞাসা আৱ কৰতে হল না, বিকাশবাৰুই স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হয়ে জবাব দিলেন, মুক্তাভস্ম বলে যে মূল্যবান বস্তুটি এখানে আপনাৰ বিক্ৰি হয়, শূন্লাম সেটোৱ
অন্য একটি পৰিচয়ও আছে—অৰ্থাৎ আবগাৰীতে নিষিদ্ধ মাদক-পদাৰ্থেৱ লিঙ্গট
অনুষ্যাবী যাকে বলা হয় কোকেন।

কোকেন ! আমাৰ এখানে ? কৰিবারজ মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

হ্যাঁ—কোকেন। কোৰ্থায় হে পিংজপদ, মুক্তাভস্ম যে প্যাকেটগুলো
তোমাদেৱ এখান থেকে চালান বায় সৰ্বৰ্ত্ত, সেগুলো বেৱ কৰ তোবাবা !

মশাই কি রাত্ৰে ঘূৰ্ম ভাঙিয়ে ডেকে এনে আমাৰ সঙ্গে রাসিকতা শৰু
কৰলেন ? ভিষণুৱ বলেন।

অনেক রাসিকতাই এই ক-বছৰ ধৰে কৰেছেন কৰিবারজ মশাই আমাদেৱ
সঙ্গে আপনি—এবাৱে আমৱা একটু-আধটু যদি কৰিই ! বিকাশ ব্যঙ্গেষ্ঠি কৱেন।

জানেন, এ ধৰনেৱ অত্যাচাৰ নীৱবে আৰি সহ্য কৱব না ? কৰিবারজ মশাই
গজে ওঠেন।

হিসাবে একটু ভুল কৱেছেন শশিশেখৱাবু। সুৱমা দেবী ইতিপ্ৰবেই
সব আমাদেৱ কাছে ফাঁস কৱে দিয়েছেন। এবং তিনি এখনো থানাতেই বসে
আছেন।

মানে ? কি বলেছেন যা-তা ?

এবাৱে কিৱীটী কথা বললে, কৰিবারজ মশাই, মহাভাৱতখানা আপনাৰ
নিশচয়ই পড়া ছিল, তবে এ ভুল কৱলেন কেন ? শুকুনিৰ হাড়েৱ পাশা অমোৰ
ছিল সত্য, কিন্তু সেই পাশাই কি শেষ পৰ্যন্ত শুকুনিৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হয়ৱিন ?
পাশৰ সাহায্য যে কুৱক্ষেত্ৰ রাঁচিত হৰেছিল সেই কুৱক্ষেত্ৰেই কি শুকুনিকেও
শেষ নিখ্বাস নিতে হয়ৱিন ? আপনাৰ সেই হাড়েৱ পাশা, সুৱমা দেবীই সব
স্বীকাৰ কৱেছেন। অমোৰ সে হাড়েৱ পাশাৰ দান—যখন একবাৱ পড়েছে, আৱ
তো তা ফিৱবে না। অনেক দিন ধৰে জুয়োখেলায় জিতে আসছিলেন, কিন্তু
এবাৱ আপনাৰ হারবাৱ পালা কৰিবারজ মশাই !

কিৱীটীৰ কথায় মুহূৰ্তে শশিশেখৱেৱ মুখেৱ সমস্ত রস্ত কেউ ষেন ব্ৰাইং-
পেপাৱ দিয়ে শুৰূ নিল। নিৰ্বাক স্থানৰ মত শশিশেখুৰ দাঁড়িয়ে রাইলেন।

তা ছাড়া পাঁচটা মাৰ্ডাৱ—

মাৰ্ডাৱ ! কথাটা উচ্চাৱণ কৱে চমকে তাকালেন বিকাশ ও কিৱীটীৰ
মুখেৱ দিকে।

হ্যাঁ। এ পাড়াৱ সব কঠি মাৰ্ডাৱেৱ মূলেই কৰিবারজ মশাইয়েৱ মুক্তাভস্ম।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যাৱা প্ৰাণ দিয়েছে তাৱাও এই মুক্তাভস্মেৱই চোৱা-
কাৱবাৰী ও অংশীদাৱ ছিল। তাৰাড়া আইন নিশচয়ই জানেন, মাৰ্ডাৱ ও
abatement of murder দৃটোৱাই শাস্তি পিনালকোড়ে একই ধাৱায়।

সাত্য নাকি !

হ্যাঁ, চলুন থানায় সব বুঝিয়ে দেবো।